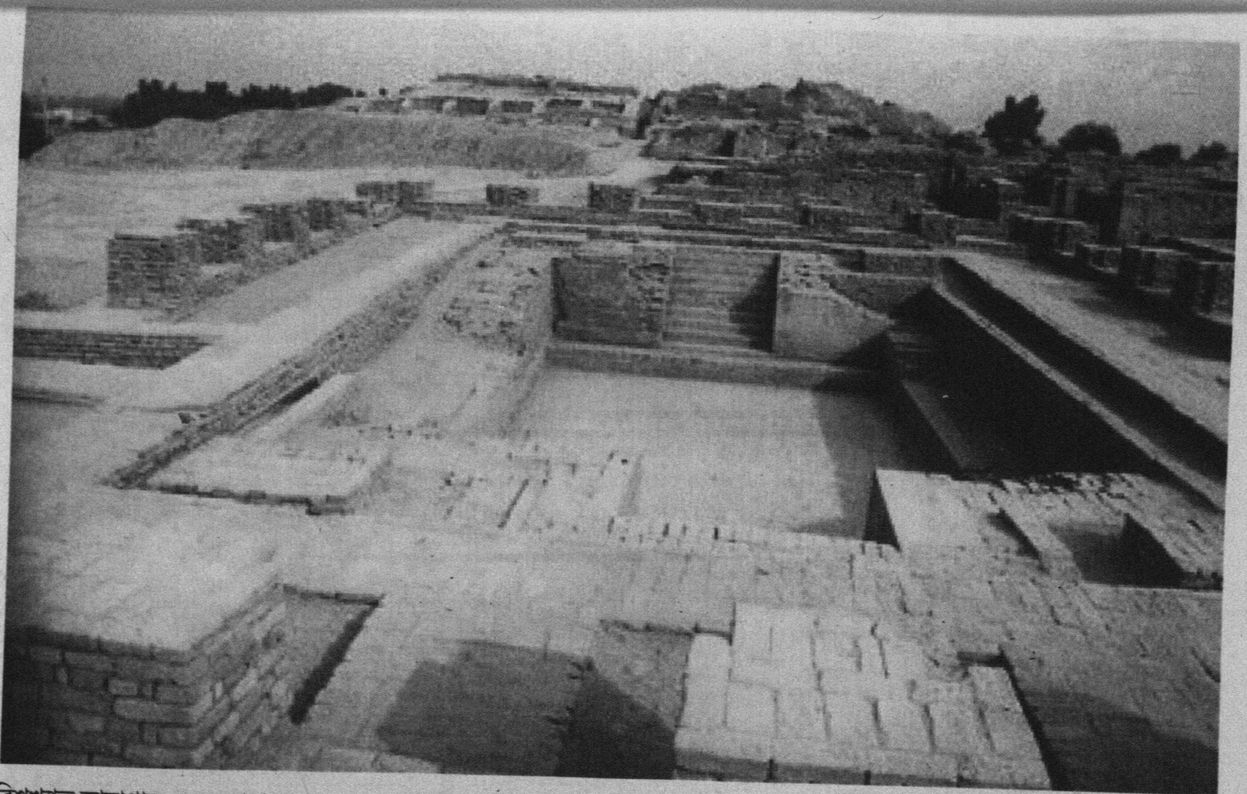
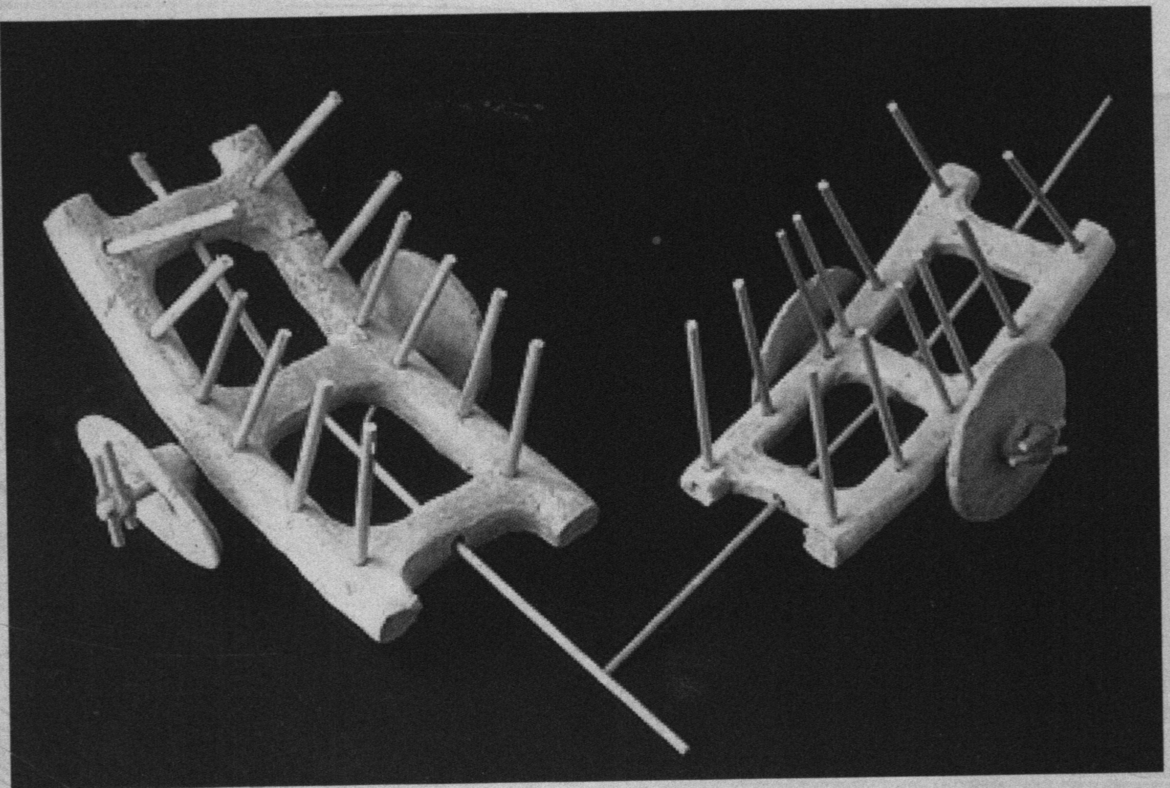


বিশ্বখ্যাত স্নানাগার, মহেঞ্জোদারো।

হরপ্পার অনার্য গরিমা

প্রশান্ত প্রামাণিক

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১, জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা—৭৯৯০০১

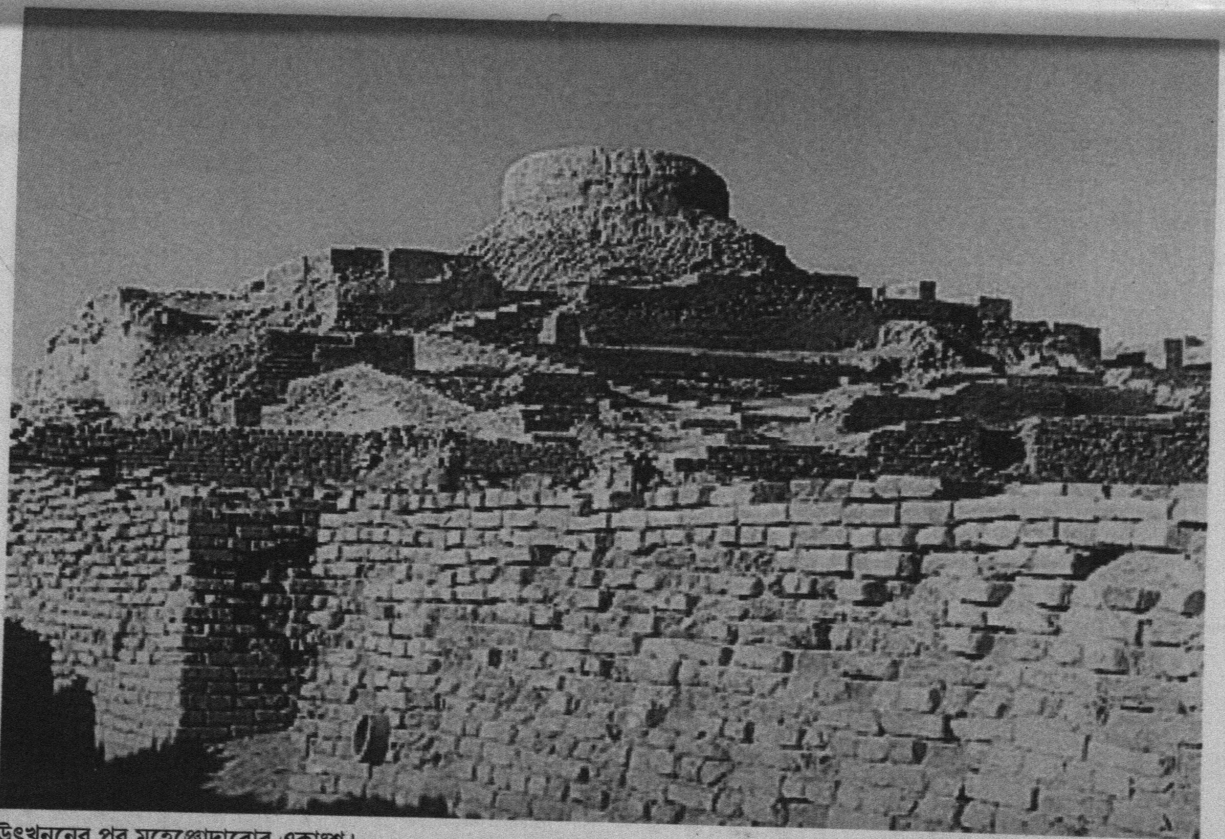


হরপ্পার টেরাকোটার খেলনা গাড়ী।

প্রথম প্রকাশ
১৯৭১

প্রকাশক
দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী

মুদ্রক
জ্ঞান বিচিত্রা অফসেট
যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা



উৎখননের পর মহেঞ্জোদারোর একাংশ।

সহধর্মিণী
শ্রীমতী বীণা



হরপ্পার মৃৎপাত্রের একাংশ।



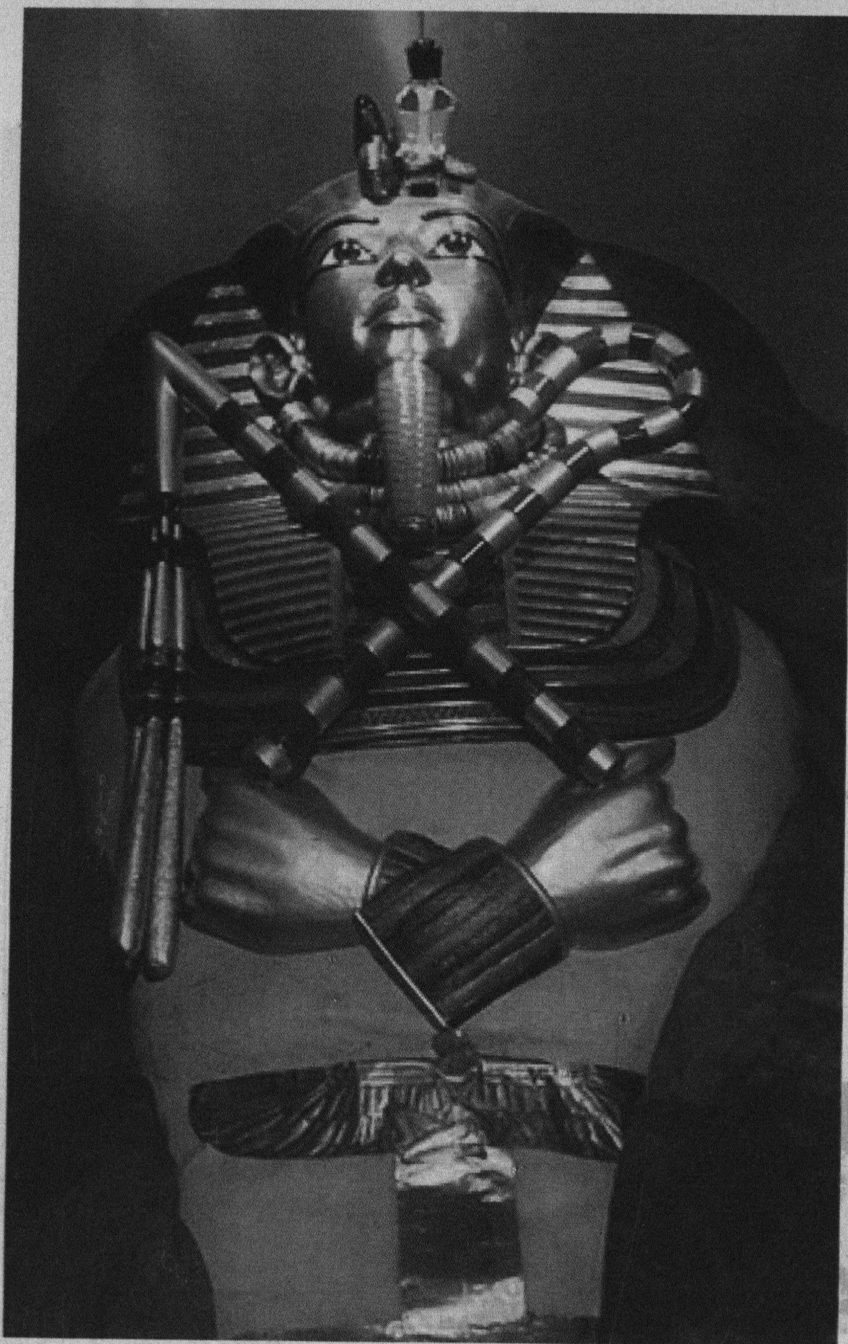
উড়ন্ত গুবরে পোকার নকশা আঁকা সোনা ও লাক্ষার প্রাচীন মিশরীয় ব্রেসলেট (৬ সেমি × ৯ সেমি)।

কিছু বিনম্র নিবেদন

পৃথিবীব বযস প্রায ৪৬০ কোটি বছব। কেউ কেউ অবশ্য বযসেব এই সীমাটা আব একটু বাডিযে দিযে পৃথিবীব বযসটাকে সূর্যের বযসেব সমান করে দেওযাব কথা বলেন। তেজস্ক্রিয ক্ষয থেকে পৃথিবীব বযস এখন অবধি যা পাওযা গেছে তাতে পৃথিবীব বযস ৪৬০ কোটি বছবই দাঁড়ায। নৃতত্ত্ববিদ এবং ভূতাত্ত্বিকবা পৃথিবীব এই বযসটাই মেনে নিযেছেন। কিন্তু এখনকাব একেবাবে আধুনিক তত্ত্ব 'Dust Cloud Hypothesis' এ বিষযে যা বলছে, তা এই বকম। পৃথিবী ও সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ প্রায ৫৫০ কোটি বছব আগে সৃষ্টি হযেছিলো মহাজাগতিক ধূলিকণা ও হাইড্রোজেনেব পাবমাণবিক মেঘ থেকে। এই মত অনুসাবে পৃথিবীর বযস ৫৫০ কোটি বছব। এই ৫৫০ কোটি বছবেব মাত্র ৫৭ কোটি বছব সম্পর্কে আমবা কিছুটা জানি, বাকীটা অজানা। অর্থাৎ পৃথিবীব বযসেব মাত্র এক দশমাংশ আমাদেব কাছে কিছুটা পবিচিত।

যাইহোক, পৃথিবীতে জীবনেব উন্মেষ ঘটেছে প্রায ২০০ কোটি বছব আগে। বিবর্তনেব ধাপ পেবিযে ক্রমবিকাশেব কর্মকাণ্ডে মানুষ এসেছে প্রায পাঁচ লক্ষ বছব পূর্বে। তাবও বেশ কিছুটা আগে থেকেই বানবজাতীয জীবগুলি চেষ্টা কবছিল নানা বৈশিষ্ট্যমূলক শাখা-প্রশাখায নিজেদেব বিবর্তিত কবতে। এ বকম একটা শাখা থেকে উদ্ভূত হয নবাকাব জীবসমূহ [Primates]। এই সব জীবদেব মধ্যে যাবা গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমে এসে আশ্রয নিযেছিল তাদেব অন্যতম হল 'বামাপিথেকাস্' [Ramapithecus]। এখন থেকে প্রায এক কোটি কুড়ি লক্ষ বছব আগে বামাপিথেকাস সর্ব প্রথম উদ্ভূত হযেছিল উত্তব-পশ্চিম ভাবতেব শিবালিক গিবিমালা অঞ্চলে। এই বামাপিথেকাসেব পূর্বপুরুষ হল 'শিবপিথেকাস' [Shivapithecus], আব সমগোত্রীযবা হল সুগ্রীবপিথেকাস, ব্রহ্মপিথেকাস প্রভৃতি নবাকাব জীব। এই বামাপিথেকাসই 'অস্ট্রালোপিথেকাস'-এব [Australopithecus] পূর্ব-পুরুষ। অস্ট্রালোপিথেকাসবা প্রায বিশ লক্ষ বছব আগে এই পৃথিবীব বাসিন্দা ছিল। বিজ্ঞানীবা বলছেন, বামাপিথেকাস থেকে মানুষেব উদ্ভব হযেছে। এখন অধিকাংশ নৃ-বিজ্ঞানী মনে কবেন বামাপিথেকাস থেকে মানুষে রূপান্তবেব বিবর্তন ঘটেছিল ভাবতেব ওই উত্তব-পশ্চিম অঞ্চলে হিমালযেব পাদদেশে। সুতবাং সভ্যতাব আলো পৃথিবীতে সর্ব প্রথম ভাবতবর্ষই জ্বেলে দিযেছিল সেই আদ্যিকাল থেকে। এশিযাব ক্রান্তীয অঞ্চলেই আদিম মানবগোষ্ঠীব উদ্ভব হযে তা ক্রমশঃ ছড়িযে পড়ে পৃথিবীব সর্বত্র। আদম-ইভবা সর্বপ্রথম উদ্ভূত হযেছিল ভাবতবর্ষে—আমাদেব সাধেব এই ভাবতেই।

অস্ট্রালোপিথেকাস এবং প্রকৃত মানুষ [Homo-sapiens]-এব মধ্যবর্তী সমযে মানব জাতীয জীবেব প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বিশ থেকে দশ লক্ষ বছব পূর্বে। পাঁচ লক্ষ বছব আগে এসেছে ঋজুভাবে চলাফেরা কবতে সমর্থ এমন মানুষেবা। 'নিযানডাবথাল' মানুষেবা আসে প্রায দেড় লক্ষ বছব আগে এবং তাবা নিশ্চিহ্ন হযে যায প্রায



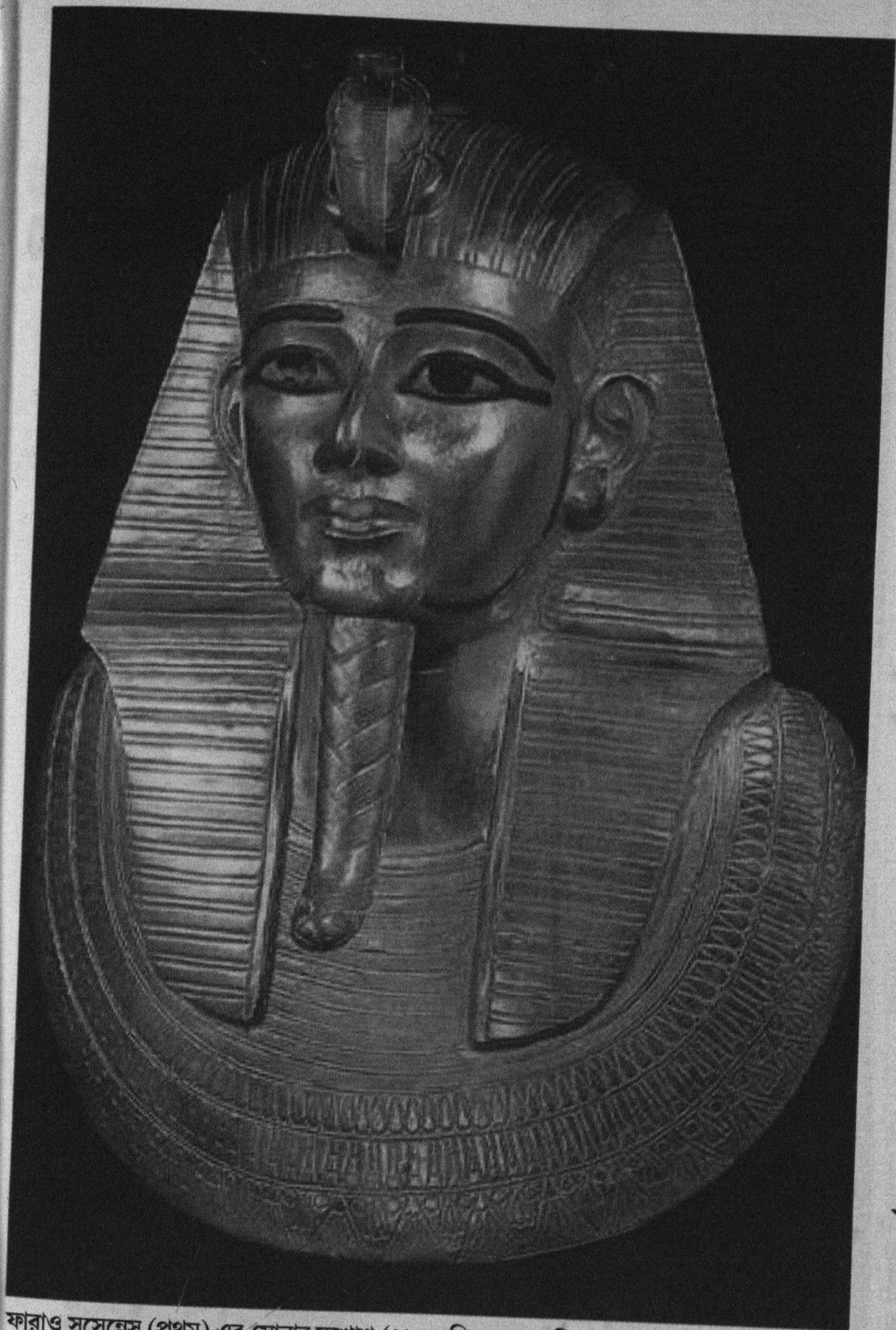
ফারাও তুতানখামেনের মমির খাঁটি সোনার মুখোশ (১৩৩২-১৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তুতানখামেন ১৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মাত্র ১৯ বছর বয়সে মারা যান।

৪০,০০০ বছব পূর্বে। ওদেব জাযগায় আসে 'ক্রোম্যানিয়ন' [Cromagnon] জাতিব মানুষ। বলা হয, এই ক্রোম্যানিযন জাতিব মানুষ থেকেই পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহেব উদ্ভব। এই মানুষেবা ৪০,০০০ বছব আগেই আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। এই পাঁচ লক্ষ থেকে চল্লিশ হাজার বছরেব এক বিশাল ব্যবধানে তারা কী করলো তা অজানা। আবাব ৪০,০০০ থেকে মিশবেব পিরামিড কিংবা হবপ্পা সভ্যতার কাল প্রায় ৩২,০০০ বছব দূরে। আগুন জ্বালাতে শিখবাব পর মানুয ওই ৩২,০০০ বছর ধরে কী কবল, তাও আমরা জানি না। আবার মিশবেব পিরামিড কিংবা হরপ্পা সভ্যতার অনেকটাই আজও অজানা।

পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধতম সভ্যতা হল ভারতের 'হরপ্পা' সভ্যতা। জীবনের ক্রমবিকাশে একদিন যেমন মানুষের আদিপুরুষের উদ্ভব হযেছিল উত্তর-পশ্চিম ভাবতে হিমালযেব পাদদেশে, তেমনি সভ্যতাব প্রথম বিকাশ শুরু হযেছিল উত্তব-পশ্চিম ভাবতবর্ষে প্রায় ৬০০০ বছব আগে। চীন, সুমেব ও মিশরেব প্রাচীন সভ্যতাসমূহেব তুলনায হবপ্পা সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল, কেননা এই সভ্যতার কেন্দ্র সমূহে আবিষ্কৃত হয়েছে ইষ্টকনির্মিত উন্নত পযঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয এবং উন্নত নাগবিক সভ্যতা। এই সভ্যতাব দেড়শোবও বেশি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হযেছে বৃহত্তব ভারতের প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে। মহেঞ্জোদারো, হবপ্পা, আমবি, ধোলাভিবা, কালিবঙ্গান ও লোথাল ইত্যাদি স্থানে নগরসমূহেব ধ্বংসাবশেয সাবা পৃথিবীকে আজ জানাচ্ছে, মানব সভ্যতাব আদি উৎপত্তি স্থান হল এই ভাবতবর্ষ—আমাদেব জন্মভূমি ভাবতবর্ষ।

এই সভ্যতাব নাম ঐতিহাসিকবা দিযেছেন 'হবপ্পা সভ্যতা'। কিন্তু 'হবপ্পা সভ্যতা' কিংবা 'সিন্ধুসভ্যতা' নামকবণ এই বিশাল অত্যুন্নত সভ্যতাব যথোপযুক্ত নামকবণ নয বলে মনে কবেন অনেক নৃতত্ত্ববিদ। তাঁবা তাই একে বলেছেন 'প্রাগার্য সভ্যতা'। এই সভ্যতাই ছিল ভাবতেব তথা সাবা পৃথিবীব প্রথম সভ্যতা— প্রাচীন পৃথিবীব উন্নততম সভ্যতা। পণ্ডিতেরা নানাভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হরপ্পা সভ্যতা ভারতবর্ষে কোনও আগন্তুক সভ্যতা নয। এটি ভাবতেব দেশজ সভ্যতা। ভাবতেই এর ক্রম বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটেছে। 'ভাবতীয আর্য সভ্যতা'ব [Indo-Aryan Civilization] মত হরপ্পা সভ্যতা কোনও বহিবাগত কিংবা আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। হরপ্পা সভ্যতাকে তাই প্রাগার্য সভ্যতাই বলাটা যেন অনেকটা যুক্তিযুক্ত। ইউবোপীয পণ্ডিতরা 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা'-ব নানান গুণ গান কবে এক সময তাঁরা ওই সভ্যতাব উন্নত অবদানগুলিকে 'আর্যগবিমা' বলে প্রচার কবেছেন। পববর্তীকালে অবশ্য ঐতিহাসিকরা এক বাক্যে বলেছেন যে, আর্যবা ছিল এক বর্বব জাতি এবং হবপ্পীয় উন্নত নগর সভ্যতার ধ্বংসকারী।

হবপ্পা সভ্যতাকে আমবা যেমন প্রাগার্য সভ্যতা বলতে পারি, তেমনি একে 'অনার্য' সভ্যতাও বলা যেতে পারে। তবে বহুকাল ধরে আর্যগরিমায় আচ্ছন্ন থাকায় আমরা 'অনার্য' শব্দের আভিধানিক এবং ব্যবহারিক অর্থ কবেছি 'অভদ্র', 'অসভ্য', 'অসাধু', 'নীচ জাতি'। অনার্য শব্দেব মানে যে 'আর্য নয' বা 'আর্যেতব জাতি' (Non-Aryan)



ফারাও সুসেন্নেস (প্রথম)-এর সোনার মুখোশ (২৮ সেমি × ৪৩ সেমি) (১০৮৫ - ১০৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

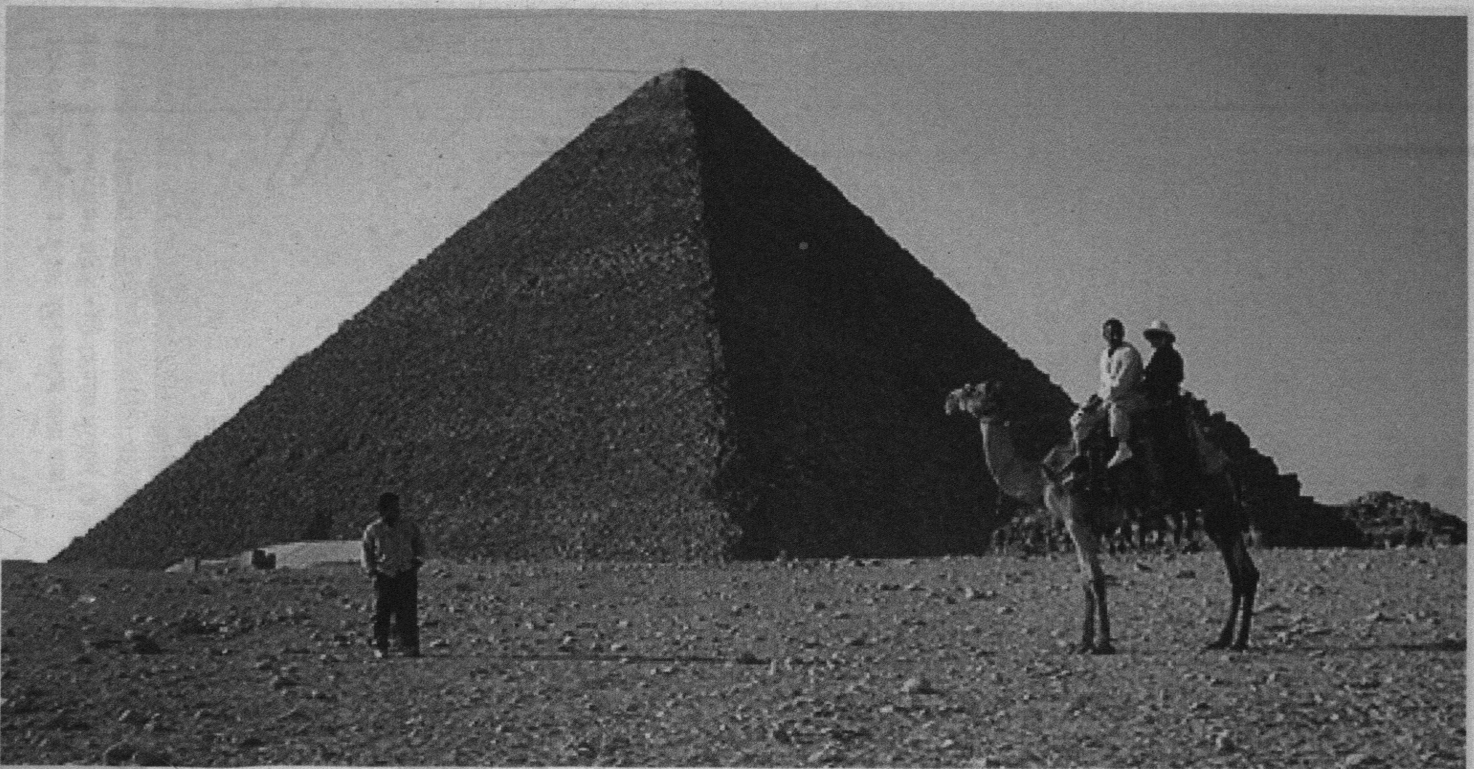
হয় তা আমরা প্রায় ভুলে গেছি। অনার্যরা যে অসভ্য নয়, তা বোঝানোর জন্য বইটির নামে 'অনার্য গরিমা' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছি। সারা বইটি ধরে এটা দেখাবার চেষ্টা করেছি, 'গরিমা' যদি কারো থেকে থাকে তা আর্যদের নয়, ছিল অনার্যদেরই তথা প্রাগার্যদেরই। 'আর্য গরিমা' কল্পকাহিনী মাত্র। পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে যদি সত্যিকারের গরিমাময় অবদান কারো থেকে থাকে তবে তা হরপ্পার অনার্যদেরই। হরপ্পা সভ্যতাই পৃথিবীর প্রাচীনতম অত্যুন্নত সভ্যতা যার অবদান সমৃদ্ধ করেছে পরবর্তীকালের সমস্ত মানব সভ্যতাকে। মানব সভ্যতায় হরপ্পার সভ্যতার দান অসীম। আর হরপ্পার এই অতুলনীয় অবদানই ইতিহাসে 'অনার্য গরিমা' হয়ে চিহ্নিত হয়ে গেছে। 'হরপ্পা সভ্যতা' কখনই 'আর্য সভ্যতা' ছিল না। হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল 'অনার্য' অর্থাৎ যারা আর্য নয়। তাদের গরিমার কথা বলাই এই বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বহুদিন ধরে আর্য গরিমার কথা শুনতে শুনতে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, আর্যরাই সারা পৃথিবীকে সভ্য করেছে এবং হিন্দু সভ্যতা বা হিন্দু সংস্কৃতির প্রায় সবটাই আর্য-সংস্কৃতি। হরপ্পা সভ্যতার নগরসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর পণ্ডিতেরা ১৯২৬ সাল থেকে বলছেন, আর্যরা ছিল এক বর্বর জাতি এবং আধুনিক হিন্দু সংস্কৃতির তিন ভাগ উপাদানই হরপ্পা সংস্কৃতির অবদান। বাকী এক ভাগ উপাদান এসেছে আর্যদের কাছ থেকে। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। যে আর্যরা ছিল বর্বর যুদ্ধবাজ, যে আর্যরা লিখতে পড়তে জানতো না, যে আর্যদের ছিল না কোনও লিপি, সেই আর্যরা কেমন করে একটা সমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী হল, যে ভাষা পরবর্তীকালে 'সংস্কৃত' নামে পরিচিত হয়েছে এবং যে ভাষা পৃথিবীর বহু ভাষারই আদি-জননী। এ নিয়ে কিছু আলোচনা এই বইয়ে করবার চেষ্টা করেছি। সব মিলিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিবর্তনে হরপ্পা সভ্যতাই আদি সভ্যতা এবং পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতার আদি-জননী হল এই সভ্যতা। বলতে চেষ্টা করেছি, হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টাদের, যারা আর্য ছিল না, তাদের সভ্যতার গরিমার কথা, অর্থাৎ 'হরপ্পার অনার্য গরিমা'-র কথা।

আমি ঐতিহাসিক নই, নৃতত্ত্ববিদও নই। 'হরপ্পার অনার্য গরিমা' লিখতে আমি বহু বই ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। এগুলির একটা তালিকা এই বইয়ের শেষে সংযোজিত হয়েছে। এই সব বই, পত্র-পত্রিকার লেখক-লেখিকাদের কাছে রইল আমার অপরিশোধ্য ঋণ এবং অপরিসীম শ্রদ্ধা।

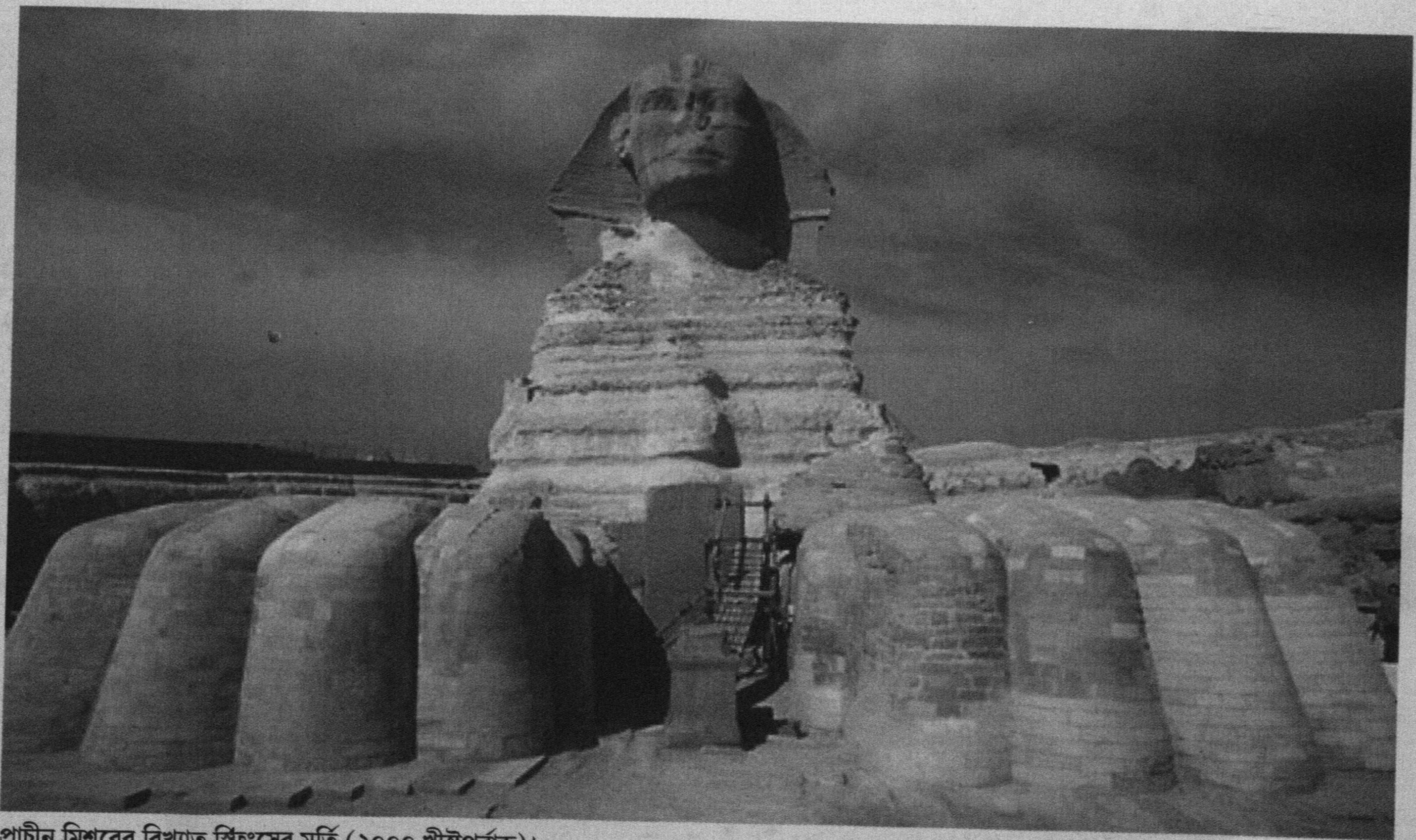
বইটির বাণিজ্যিক সাফল্য হবে না জেনেও 'জ্ঞান বিচিত্রা'র কর্ণধার দেবানন্দবাবু যে বইটি ছাপতে উদ্যোগী হয়েছেন তার জন্য তিনি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন। তথ্য কিংবা তত্ত্বগত কোন ত্রুটি থাকলে তা মার্জনা করে দেবেন সহৃদয় পাঠক। তাঁদের হাতেই ছেড়ে দিলাম বইটির গুণাগুণ বিচারের ভার।

প্রশান্ত প্রামাণিক



মিশরীয় সভ্যতার অনন্য স্থাপত্য গিজার পিরামিড।

• সূচি •



প্রাচীন মিশরের বিখ্যাত স্ফিংসের মূর্তি (২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

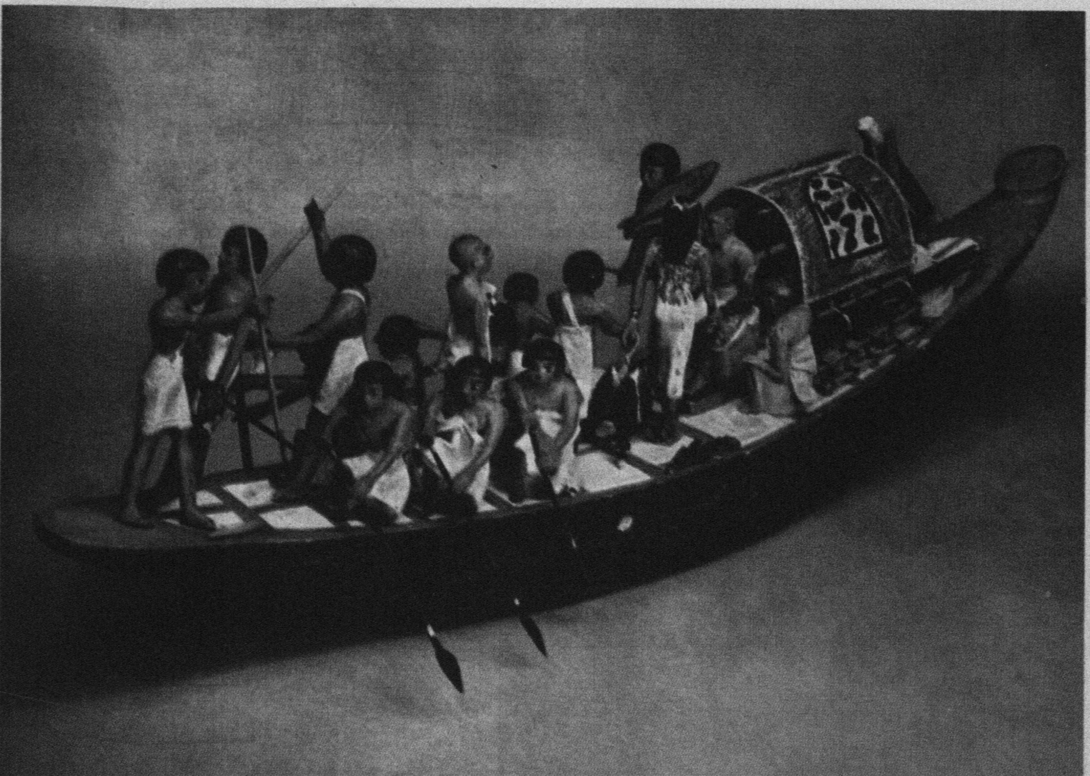
প্রথম পরিচ্ছেদ

সভ্যতার বিবর্তন

মানুষেব বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় দুটি বিশিষ্ট ধাবা। তাব একটা হল 'বায়োলজিক্যাল [Biological] বা জীবজনিত আবযবিক গঠনের বিকাশের ধাবা। অন্য ধারাটি হল 'কালচাবাল' [Cultural] বা কৃষ্টিব বিকাশেব ধারা। জৈবিক বিকাশের ধাবায় ঘটেছে মানুষেব অবযবগত পবিবর্তন—বহিবঙ্গেব বিবর্তন। এবই সঙ্গে মানুষেব কৃষ্টিব বিকাশেব ধাবাই পবিণতি লাভ কবেছে মানব সভ্যতায। পণ্ডিতবা বলছেন, প্রায ২৬০ লক্ষ বছব আগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হযেছিল 'ড্রাইযোপিথেকাস' [Dryopithecus] নামে বানব জাতীব এক জীব। এবই বহুকালেব ক্রমবিবর্তনে অবশেষে এল একালেব মানুষ বা প্রকৃত মানুষ [Homo-sapiens]। এই বিবর্তনে বামাপিথেকাস [Ramapithecus], অস্ট্রালোপিথেকাসদেব [Australopithecus] পেবিয়ে প্রায পাঁচ লক্ষ বছব আগে এসেছে ঋজুভাবে চলাফেবা কবতে সমর্থ 'Homo-erectus' মানুষেবা। এবপব নিযানডাবথাল জাতিব মানুষেবা [Neanderthal Man] আসে প্রায দেড লক্ষ বছব আগে। প্রায ৪০,০০০ বছব পূর্বে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় 'ক্রোম্যানিযন' [Cromagnon] জাতিব মানুষ। এই ক্রোম্যানিযনদেব থেকেই নাকি বর্তমান জাতিসমূহেব উদ্ভব ঘটেছে এই পৃথিবীতে।

বেশিব ভাগ নৃতত্ত্ববিদ মানুষেব বিবর্তনেব এই ধাবাটিকেই মেনে নিযেছেন। তবে এ নিযে বেশ কিছুটা বিতর্কও আছে। সে আলোচনায পবে আসা যাবে। আবাব আবযবিক বিবর্তনেব সঙ্গে কৃষ্টিব বিবর্তনেব একটা সম্পর্ক আছে। সেই জটিল আলোচনাব একটা রূপবেখা দেওযাব চেষ্টা কবা হবে এই পবিচ্ছেদেই। যাইহোক, মানুষের াববর্তনেব সঙ্গে সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে। মানুষেব আবযবিক বিবর্তনেব গতি খুবই ধীব হলেও তাব সভ্যতাব বিবর্তনেব গতি কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত। বিশেষ কবে গত একশ' বছরে সভ্যতাব বিবর্তন এক অস্বাভাবিক দ্রুতি পেযেছে। মানব সভ্যতা এখন ছুঁযে ফেলেছে নতুন নতুন দিগন্ত।

ভূতত্ত্ববিদ, নৃতাত্ত্বিক এবং বিজ্ঞানীদেব অধিকাংশই এখন মেনে নিযেছেন পৃথিবীব বয়স ৪৬০,০০০০,০০০ বা ৪৬০ কোটি বৎসব। তেজস্ক্রিয ক্ষযেব ফলে উৎপন্ন সমস্থানিকদেব [Isotopes] পবিমাণ থেকে বিজ্ঞানীবা পৃথিবীর বযসের এই হিসাব কষে বেব কবেছেন। তেজস্ক্রিয ক্ষযে রুবিডিয়াম-৮৭ [Rubidium-87] রূপান্তবিত



নীলনদে প্রাচীন মিশরীয় ধনী নাগরিকের নৌকাবিহার।

হয স্ট্রনসিযাম-৮৭-তে (Strontium-87]। কোন তেজস্ক্রিয পদার্থের মধ্যে রুবিডিযাম-৮৭ এবং স্ট্রনসিয়াম-৮৭-ব পবিমাণ দেখে তেজস্ক্রিয-ক্ষয় সংক্রান্ত অঙ্কের সাহায্যে হিসাব কবলে পাওযা যায পৃথিবীর বয়স। তেমনি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ সামাবিয়াম-১৪৭ [Samarium-147] এবং এব সমস্থানিক নিওডাইমিয়াম [Neodymium-143] এদেব আকবিকগুলিতে যতটা পবিমাণ আছে, তার থেকেও একইভাবে হিসাবে করে বেব কবা হয়েছে পৃথিবীব বযস। দেখা গেছে, পৃথিবীতে এই সব পদার্থেব আদি সৃষ্টিকাল ৪৬০ কোটি বছব। এইভাবে স্থিবীকৃত হযেছে পৃথিবীব বযস ৪৬০ কোটি বছব।

পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে এক সময যে তত্ত্ব সর্বজন গৃহীত ছিল, তা হল 'Chamberlin-Moulton Theory'। এই তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি অবধি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এই তত্ত্ব অনুসাবে, পৃথিবী ও সৌবমণ্ডলেব অন্যান্য গ্রহগুলি সৃষ্টি হযেছে সূর্যেব কাছাকাছি দিযে সূর্যেব চেযে বড় এক নক্ষত্রেব চলে যাওযাব ফলে। সেই বৃহত্তব নক্ষত্রটিব আকর্ষণে সূর্যেব একটা সামান্য অংশ সূর্যেব থেকে বিচ্ছিন্ন হযে যায। ওই বিচ্ছিন্ন অংশটি নানা কাবণে কযেকটি খণ্ডে বিভক্ত হয এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হযে রূপান্তবিত হয সূর্যেব গ্রহমণ্ডলীতে। এই তত্ত্বানুসাবে গ্রহগুলিব সৃষ্টি হযেছে সূর্যেব থেকেই। এই তত্ত্বেব খুবই পবিচিত অন্য নাম হল 'Tidal Theory'। যে নক্ষত্রেব আকর্ষণে সূর্যেব থেকে তাব গ্রহমণ্ডলীব সৃষ্টি, অনেক পণ্ডিতেব মতে সে নক্ষত্রটি হল চিত্রা নক্ষত্র। Tidal Theory এখন আব ততটা চালু নয। বিজ্ঞানীদেব প্রায সকলেই গ্রহসৃষ্টিব ব্যাপারে এখন 'Dust Cloud Theory'-তে বিশ্বাসী। এই তত্ত্ব ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে বিখ্যাত হযেছে। এব প্রবক্তাবা হলেন জার্মানীব Carl F Von Weizsacker, ওলন্দাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী Gerard P Kuiper এবং আমেবিকাব বসাযনবিদ Harold C. Urey প্রমুখ। Dust Cloud Theory-ব কথায আসাব আগে একটা পৌরাণিক গল্প বলে নিই।

ঋগ্বেদেব ত্বষ্টা হলেন পৌরাণিক বিশ্বকর্মা। দেবশিল্পী ত্বষ্টা তথা বিশ্বকর্মা সূর্যের সঙ্গে নিজেব মেযে সবণ্যুব বিযে দিলেন খুব ধুমধাম কবে। সবণ্যু কিছুদিন সূর্যেব ঘব কবে জন্ম দিলেন যম-যমীব। বহু দিন বহু চেষ্টা কবেও সূর্যেব প্রচণ্ড তাপ সহ্য কবতে না পেরে সরণ্যু একদিন স্বামীব ঘব ছাড়লেন। আদি সূর্যেব প্রবল তেজ সহ্য কবতে না পেবে সরণ্যু সূর্যেব ঘব ছেড়ে বড়বানলরূপে তপস্যা কবতে শুরু করলেন। ওদিকে সূর্য সবণ্যুব খোঁজে শ্বশুববাড়ী গেলেন। শ্বশুব বিশ্বকর্মা তথা ত্বষ্টাকে সব কথা বললেন সূর্য একেবাবে অকপটে। শ্বশুবকে তিনি এও জানালেন যে, সবণ্যু তাঁর প্রচণ্ড তেজ সহ্য কবতে না পেবে ঘব ছেড়েছেন। নিজের তেজ বিক্ষেপে পত্নীর বিবাগী হওযার ঘটনায অনুতপ্ত সূর্য দেবশিল্পী ত্বষ্টাকে অনুরোধ কবলেন তাঁব তেজ কমিযে দিতে। সূর্যেব অনুবোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না ত্বষ্টা। তিনি সূর্যের তেজ প্রশমনের জন্য একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা নিলেন। সূর্যকে চড়িয়ে দিলেন এক



চার হাজার বছরের পুরাতন মেসোপটেমিয়ার সোনা ও রূপার কুঠারের হাতল (১৫ সেমি)।

ঘূর্ণ্যমান 'ভ্রমিযন্ত্রে'। এরপর একটা বাটালি এনে বিশ্বকর্মা-ত্বষ্টা তাঁর গোলাকার জামাতার সাত ভাগ চেঁছে বের কবে নিলেন। অবশিষ্ট অষ্টমভাগ অক্ষয় বলে সেটাকে আর ছাঁটলেন না। সেই অক্ষয় অষ্টমভাগের নাম হল 'ত্বিষা'। সেই ত্বিষা একালের সূর্য হয়েই রয়ে গেল। ত্বষ্টা মাপজোক করে দেখলেন ত্বিষাব ওই তেজ সরণ্যুর সহ্য সীমাতেই রয়েছে। দেখা গেল, আদি সূর্যের সাতভাগ তেজ ছেঁটে বেব কবে নেওয়ার ফলে 'দ্রাবকাগ্নির বাষ্পাচ্ছন্ন তেজ' প্রশমিত হয়েছে। সূর্যেব থেকে ছেঁটে নেওয়া ওই সাতটি অংশ থেকেই তৈরি হয়েছে সাতটি গ্রহ।

এই কাহিনীব রূপকের আববণ ছাড়ালে সূর্য থেকে সাতটি গ্রহ সৃষ্টির ওই আধুনিক তত্ত্ব ' Tidal Theory '-টাই চলে আসে। ঋগ্বেদেব ত্বষ্টা সিদ্ধান্তকালে চিত্রা নক্ষত্র বলেই নির্দিষ্ট হয। সুতরাং চিত্রা নক্ষত্রেব প্রভাবে সূর্য থেকে সাতটি গ্রহেব উৎপত্তি হয়েছিল। আব উপবেব ওই কাহিনীব নাক্ষত্রীয় ব্যাখ্যায় সেই সত্যই ধবা পড়ে। অর্থাৎ সূর্যেব গ্রহমণ্ডলী সৃষ্টিব পৌবাণিক কাহিনী আব তাব আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাব তত্ত্ব একই কথা বলছে। ইদানীং অবশ্য পণ্ডিতেবা আর Tidal তত্ত্বে বিশ্বাস করছেন না। এখন তাঁবা বলছেন Dust Cloud তত্ত্বেব কথা। এই তত্ত্ব বলছে পৃথিবীর বযস প্রায ৫৫০ কোটি বছর। এই তত্ত্ব যা বলছে তা সংক্ষেপে এই রকম।

'ধূলি-মেঘ তত্ত্ব' [Dust Cloud Theory] অনুসাবে আমাদেব সৌবমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল ধীবে ধীবে ঘূর্ণাযমান মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাসের মেঘ থেকে। ওই ধূলিকণা ও গ্যাসেব মেঘ ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে এবং এব ঘূর্ণনবেগও ক্রমশ বাড়তে থাকে। এব ফলে এই বিশাল মেঘেব কেন্দ্র অঞ্চলেব উষ্ণতা বেড়ে এক কোটি ডিগ্রি সেলসিযাসেব বেশি হযে যায়। এই মহাজাগতিক মেঘেব কেন্দ্রস্থল থেকে উৎপন্ন হয় সূর্য এবং এর দু'দিকেব অঞ্চল থেকে সৃষ্টি হয গ্রহমণ্ডলী। ৫৫০ কোটি বছবেব ওই আদি মহাজাগতিক মেঘ থেকে সূর্য সৃষ্টি হযে ছিল প্রায ৫০০ কোটি বছব আগে। আব গ্রহমণ্ডলীব সৃষ্টি হয প্রায ৪৬০ কোটি বছর পূর্বে। এই বযসেব সঙ্গে তেজস্ক্রিয পদার্থগুলি থেকে পাওযা পৃথিবীব বয়স প্রায় কাঁটায় কাঁটায মিলে যায। তবে Dust Cloud তত্ত্বকে একেবাবে সঠিক তত্ত্ব বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন না। এনিযেও কিছু বিতর্ক আছে। সুতবাং একেবাবে নিশ্চিত কবে বলা যায না যে, Dust Cloud তত্ত্ব অনুসরণ কবেই আমাদেব সৌবমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল এবং পৃথিবীর বর্তমান বয়স ৪৬০ কোটি বছর। তবে একালেব অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদ, ভূতাত্ত্বিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী সৌরমণ্ডল সৃষ্টিব ব্যাপাবে এখন এই তত্ত্বই মেনে নিয়েছেন এবং তাঁরা নির্দিষ্ট কবে দিয়েছেন যে, পৃথিবীব বর্তমান বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর।

পৃথিবীর এই ৪৬০ কোটি বছবেব প্রথম ৭০ কোটি বছর ছিল তার শৈশব। সে সময় সে ছিল জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড। পৃথিবীব সবচেয়ে পুরানো যে শিলাস্তব পাওয়া গেছে তার বয়স প্রায় ৩৯০ কোটি বছর। তবে অস্ট্রেলিয়ার এক খনি থেকে আকবিকদের

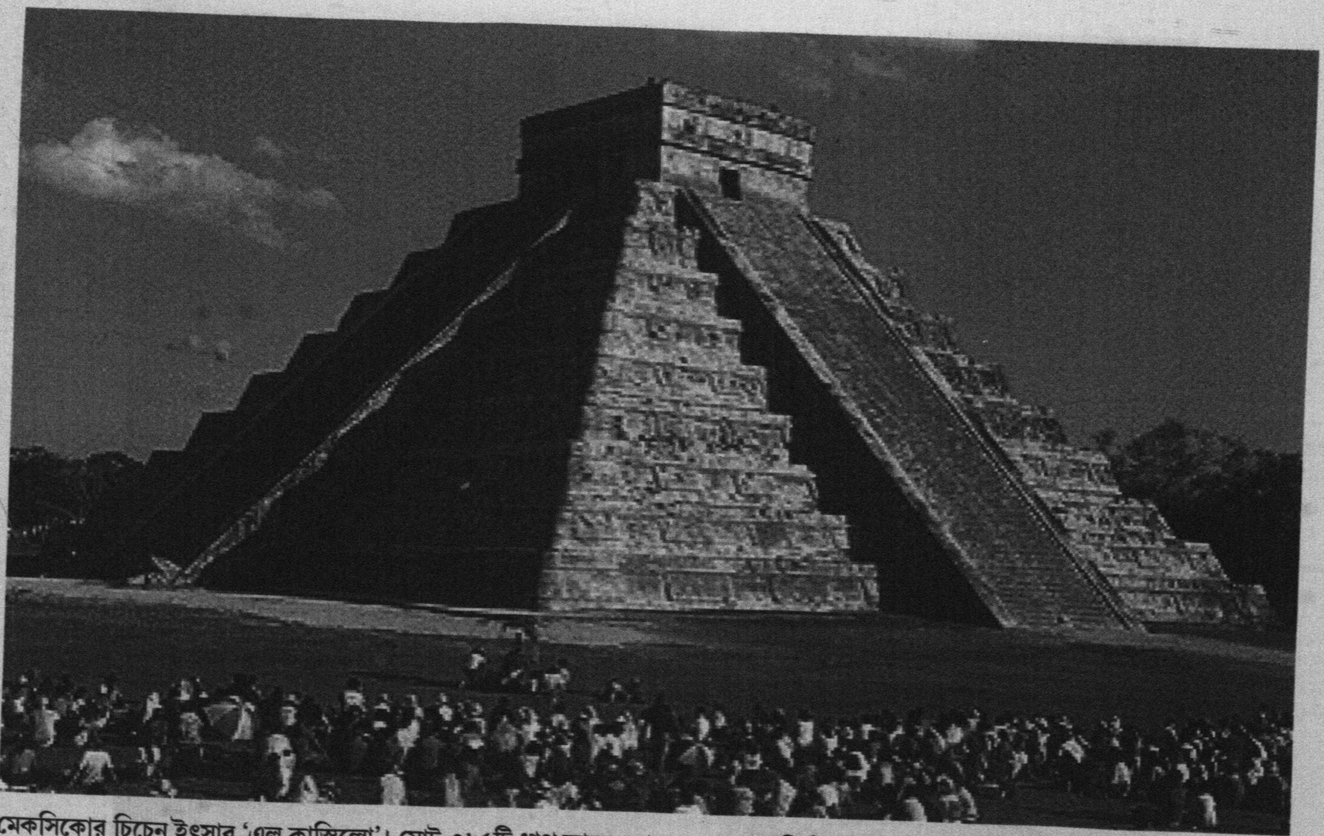


মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সোনার তৈরি হারের লকেট (১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

সঙ্গে পাওয়া কিছু গোমেদের [Zircon] বয়স নির্ণয় করা হয়েছে ৪২৭ কোটি ৬০ লক্ষ বছব। এই বেশি বয়সী গোমেদকে নিযে ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আছেই। তবে পৃথিবীর মহাদেশগুলির বা ভূত্বকেব গড় বয়স নির্ণয় করা হয়েছে ২৫০ কোটি বছর। সুতরাং পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে প্রায় ২০০ কোটি বছর সময় লেগেছে ভূত্বক গ'ড়ে উঠতে। প্রায় ৪০০ কোটি বছব আগে গড়া শুরু হয়ে শেষ হয় ২৫০ কোটি বছর আগে। তবে ওই ৪২৭ কোটি বছর বযসেব গোমেদ নিয়ে অবশ্য সমস্যা আছেই। পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলাস্তরকে বলা হয় 'আর্কিয়ান' শিলাবিন্যাস। এই স্তবের বিবর্তনের ফলেই কোনও একদিন তৈরি হয় ভারতের মধ্যাঞ্চলকে আলোড়িত করে বিন্ধ্যপর্বত। এর অনেক পরে সৃষ্টি হয় হিমালয়। বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় গঙ্গা। সে সব অনেক পরের কথা। আবার আমরা ফিরে আসি পৃথিবীর বয়সের কথায়, তার বিবর্তনের কথায়।

পৃথিবীর ৪৬০ কোটি বছব বযসেব প্রথম ২৬০ কোটি বছব কেটে গেছে তাব সৃষ্টির অঙ্গন প্রস্তুতিতে। এরপব পৃথিবীতে সৃষ্টি হযেছে প্রাণ, এসেছে জীবন এবং জীব। পৃথিবীর মোট বয়সকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হযেছে। এব প্রথম ২৬০ কোটি বছর হল 'অ্যাজোয়িক যুগ'। এরপর যে যুগে প্রাণের প্রথম বিকাশ ঘটে বৈজ্ঞানিকরা তার নাম দিয়েছেন 'প্রিক্যামব্রিয়ান্ যুগ' [Precambrian Age]। এই যুগ শুরু হয়েছিল প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে। এর ব্যাপ্তিকাল ছিল প্রায ১৫০ কোটি বছর। অর্থাৎ এই যুগ ১৫০ কোটি বছর স্থায়ী হযেছিল। অ্যাজোয়িক যুগেব পব প্রিক্যামব্রিয়ান যুগই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ যুগ। খুবই আশ্চর্যেব যে, এই যুগে যে সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের অধিকাংশেরই অস্তিত্বের বিশেষ কোনও সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি প্রাচীন শিলাস্তরগুলির মধ্যে। অতি সামান্য কিছু সরল উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্বের ফসিল [Fossil] খুঁজে পাওয়া গেছে ওই সময়ের শিলাস্তরগুলির মধ্যে। সুতরাং পৃথিবীর ৪৬০ কোটি বছরের প্রায় ৪০০ কোটি বছর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। আমরা বাকী ৬০ কোটি কিংবা বলা যায় ৫৭ কোটি বছর সম্পর্কে অনেকটাই জানি, কিন্তু সবটা নয়। তাই বলা হয়, পৃথিবীর বয়সের শেষ এক-দশমাংশ আমাদের কিছুটা পরিচিত হলেও, তার বাকী নয়-দশমাংশই আমাদের অজানা।

পৃথিবীর সব জৈব বস্তুর মধ্যে কিছুটা অস্থাযী রেডিও-অ্যাকটিভ কার্বন থাকে যা অতি ধীরে ধীরে কার্বনে রূপান্তবিত হয। এই রেডিও-অ্যাকটিভ কার্বনের 'অর্ধ-জীবন কাল' [Half-life Time] হল ৫৭০০ বছর। অর্থাৎ রেডিও অ্যাকটিভ কার্বন শুরুতে যতটা ছিল তার ৫৭০০ বছর পরে তার অর্ধেকটা থাকবে এবং বাকী অর্ধেকটা হয়ে যাবে কার্বন। জীবাশ্ম যখন প্রথম গঠিত হয় তখন তাতে কিছুটা রেডিও-অ্যাকটিভ কার্বন ছিল। সেটার কতটা কার্বন হয়ে গেছে এবং তাতে কতটা রেডিও-অ্যাকটিভ কার্বন আজও অবশিষ্ট আজ তা দেখে ওই ফসিলের বা জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা যায়। এই



মেকসিকোর চিচেন ইৎসার 'এল কাস্তিল্লো'। মোট ৩৬৫টি ধাপ আছে ওপরের শেষ ধাপটি নিয়ে। মায়া পঞ্জিকার সঙ্গে এই ধাপের সম্পর্ক আছে।

পদ্ধতিতে ৫০,০০০ বছর অবধি প্রাচীন জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা যায়। জীবাশ্মদের অধিকাংশেবই বযস এর চেয়ে অনেক বেশি। প্রাচীনতব জীবাশ্মদেব বয়স নির্ণয়ে ব্যবহাব করা হয় সোডিয়াম-আর্গন ডেটিং পদ্ধতি। অস্থায়ী সোডিয়ামেব স্থাযী আর্গনে রূপান্তবিত হতে সময লাগে কয়েক লক্ষ বছর। কোনও জীবাশ্মে এই রূপান্তবের অবস্থা জেনে জীবাশ্মেব বয়স নিরূপণ করা হয। এতে লক্ষ লক্ষ বছবের প্রাচীন জীবাশ্মেব বযস নিরূপণ কবা সম্ভব। প্রিক্যামব্রিয়ান যুগের পবে পৃথিবীতে যে যুগ আসে তাকে বলা হয়েছে প্যালিওজোয়িক যুগ [Palaeozoic Era]। অ্যাজোয়িক [Azoic] যুগ হল জীবহীন যুগ। Azoic মানে 'Without Life'। তেমনি প্যালিওজোযিক বা Palaeozoic মানে হল 'Ancient Life' বা প্রাচীন জীবন। আজ থেকে প্রায ৫০ কোটি বছর আগে এই যুগ শুরু হয় এবং শেষ হয় প্রায ২০ কোটি বছব আগে। এই ৩০ কোটি বছবেব আবাব কয়েকটি ভাগ আছে। তাবপর এসেছে মেসোজোয়িক ও কেনোজোযিক যুগ। এই কেনোজোযিক যুগের একটা অংশই আধুনিক যুগ, যা এখনও চলছে। কেনোজোযিক যুগ হল 'নবজীবীয যুগ'।

সুতবাং পৃথিবীব বযসেব প্রথম ২৬০ কোটি বছবের অ্যাজোযিক যুগে কোনও জীবন বা প্রাণ কোথাও ছিল না। এই যুগের শেষ অবধি সৃষ্টি হয় ঠাণ্ডা হওয়া ভূপৃষ্ঠে জল এবং স্থল। পবিবেশ ক্রমশঃ জীবের বাসযোগ্য হযে ওঠে। এবপব পৃথিবীতে আসে জীব। প্রায ২০০ কোটি বছব আগে এখানে প্রাণের সূচনা হয। আসে অ্যামিবাব মত এককোষী প্রাণীরা। কেমন কবে, কী ভাবে এই প্রাণের সূচনা হল তাব কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস নেই আমাদেব হাতে। বৈজ্ঞানিকবা কিছুটা যুক্তি এবং অনেকটা কল্পনাব সাহায্য নিয়ে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ সৃষ্টির ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দিযেছেন। কিন্তু সে ব্যাখ্যাও বহু বিতর্কিত। একালের বিজ্ঞানীবা বলছেন যে, আদিম যুগে পবিবেশের মৌল উপাদানগুলিব সাহায্যে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং নিউক্লীক অ্যাসিডেব সংশ্লেষণই ছিল পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পথে প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ, যা থেকে DNA ও প্রোটিন অণুব সৃষ্টি হয়েছে, কেননা এই অনুগুলিই জীবের দেহ গঠন, জৈব ক্রিযা ও বৈশিষ্ট্য বক্ষাব প্রধান উপাদান। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, প্রথম প্রাণ সৃষ্টির যে তত্ত্ব এখন বেশিব ভাগ বিজ্ঞানীই গ্রহণ কবেছেন, তা মোটেই বিতর্কবিহীন নয়। এই তত্ত্ব অনুসিদ্ধান্ত [Hypothesis] মাত্র। একে নানা কারণে তত্ত্ব বলে গ্রহণ করা যায় না। সামান্য একটু আলোচনা করলেই আদি প্রাণ সৃষ্টিব আধুনিক ব্যাখ্যাব অসাবতা অত্যন্ত সহজেই বোধগম্য হয়। তবু এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আজও আমরা পাইনি বলেই, এই প্রায় অসম্ভব ব্যাখ্যাটাকে সম্ভব বলেই মেনে নিয়েছি।

জীবনের একটি লক্ষণ হল জীবন্ত জৈব অণুগুলির দৃক-সক্রিয়তা [Optical Activity]। প্রোটিন অণুর জন্য লাগে অ্যামাইনো বা অ্যামিনো অ্যাসিড। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং অন্যান্য জৈব অণুগুলি বামাবর্তী এবং দক্ষিণাবর্তী দুই-ই অথবা কেবল



মায়া সভ্যতার চার হাজার বছরের পুরানো পালেঙ্কের সুবিশাল মন্দির।

বামাবর্তী বা শুধুই দক্ষিণাবর্তী হতে পারে। দক্ষিণাবর্তীকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় D-Forms বা Dextrorotatory। আর বামাবর্তী হল L-forms বা Levorotatory। অ্যামাইনো অ্যাসিডের অধিকাংশই বামাবর্তী অণু। কিন্তু DNA-র শর্করা অণুগুলি অবশ্যই দক্ষিণাবর্তী। তবে যে সব অণু আমাদের পৃথিবীতে জীবন গঠনের কাজ করে তারা 'নিছক বামাবর্তী'। দক্ষিণাবর্তী কিছু অণুও আছে যার জীবন গঠন করেছে, তবে তারা সংখ্যায় বেশ কম। যেমন, পেনিসিলিনে, অ্যানথ্রাকসের কোষের জীবকোষ সংক্রান্ত বস্তুর ডি-গ্লুটামিন অ্যাসিডে, গ্র্যামিসাইডিন ও ট্রায়োসাইডিনে দক্ষিণাবর্তী অণু আছে। বামাবর্তী ও দক্ষিণাবর্তী অণুরা সাধারণত জোড় বাঁধে না, বাঁধার কথাও নয়। একটা আরেকটার শত্রু। জীবাণুরা বামাবর্তী বলে দক্ষিণাবর্তী অণুযুক্ত পেনিসিলিনের প্রভাব জীবাণুদের উপর তাই মারাত্মক। একটা আরেকটার কাছে তাই বিষ। সুতরাং বামাবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিডের অণুর সঙ্গে অন্য বামাবর্তী জৈব অণুর সংযোগ ঘটতে হবে প্রাণসৃষ্টির জন্য। জীবনের জন্য প্রয়োজন ছিল বামাবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে অন্যান্য বামাবর্তী জৈব অণুর সংযোজন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি বামাবর্তী ও দক্ষিণাবর্তী দুই রকমই হতে পারে। তাদের আণবিক গঠন তাই ভিন্ন ধরনের। বামাবর্তী অণুর গঠন বৈশিষ্ট্য দক্ষিণাবর্তী অণুর চেয়ে ভিন্ন হবেই। বিজ্ঞানীরা আরও বলছেন, সৃষ্টি প্রাথমিক পর্যায়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি সব বামাবর্তী ছিল। পরে অন্যান্য সব অণু নিজেরা বামাবর্তী হয়ে নিজেদের অ্যামাইনো অ্যাসিডের বামাবর্তী ধারার উপযোগী করে তোলে। ফলে, প্রাণবন্ত জীব সৃষ্টি হতে আর বাকী থাকে না। এই জন্যই অধিকাংশ জীব বামাবর্তী অনুসমূহের দ্বারা গঠিত। জীবন্ত অণু-সমূহের এই দৃক-সক্রিয়তার ব্যাখ্যা কিন্তু যথেষ্ট যৌক্তিক নয়। কারণ, বামাবর্তী ধারায় অণুদের পরিবর্তিত হওয়ার সিদ্ধান্তটি মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। অথচ তা না হলে বামাবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির সঙ্গে অন্যান্য বামাবর্তী জৈব অনুগুলির সংযোগ ঘটতো না এবং সৃষ্টি হতো না আদি প্রাণ—প্রথম জীবন। সুতরাং ধরেই নিতে হয় যে, সব জৈব অণু যেন বামাবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিডের সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার জন্যই নিজেরা বামাবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও অযৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রথমত, সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণাবর্তী এবং বামাবর্তী উভয় রকমের অণু সৃষ্টি হলো কি করে যদিও পৃথিবী চিরকালই একটা নির্দিষ্ট দিকেই সব সময় ঘুরছে। এতে শুধু বামাবর্তী অণুই সৃষ্টি হওয়ার কথা, দক্ষিণাবর্তী অণু নয়। অথচ পরীক্ষাগারে আমরা দু' ধরনের অণুই পাই। দ্বিতীয়ত, DNA-এর দক্ষিণাবর্তী শর্করা অণু অন্যান্য বামাবর্তী অণুদের সঙ্গে মিশে জীবকোষ গঠন করলো কি করে, যেখানে বামাবর্তী অণুরা দক্ষিণাবর্তী অণুদের শত্রু। তৃতীয়ত, সম্ভাব্যতার সূত্র ধরলে, শুধু বামাবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে একটা সরলতম জীবকোষ গ'ড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। খুব ছোট কোনও



মায়াদের 'যাদুকরের পিরামিড'। উক্সম্যাল (উত্তর উকাটান)-এর এই পিরামিডটি বানাতে অন্ততঃ ৩০০ বছর লেগেছে। মায়া-পুরাণ মতে এটি তৈরি করা হয়েছিল এক রাত্রিতে।

জীবের দেহে অন্ততঃ ২৩৯টা প্রোটিন অণু থাকে। তেমনি একটা প্রোটিন অণু গড়ে উঠেছে বিভিন্ন বকমেব ২০টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আব নানা জটিল উৎসেচক দিযে। সেগুলো আবাব একটা স্থির ধাবাতেই সংযুক্ত হয না, হয বামাবর্তী অবস্থায। সবলতম একটা কোষের শুধু বামাবর্তী অ্যামাইনো অ্যাসিড দিযে গ'ড়ে ওঠার সম্ভাব্যতা হিসাব কবা হযেছে ১ ঃ $১০^{১২৩}$। আবাব এই সব সবলতম কোষের আবেকটা সমধর্মী প্রজাতি সৃষ্টিব সম্ভাবনা সম্ভাব্যতাব অঙ্কে দাঁড়ায ১ ১০ ^{২২১১৭৭৬৯৩০৪}। অবিশ্বাস্য অসম্ভব সংখ্যা। অথচ একালেব বিজ্ঞান বলছে এটাই নাকি সম্ভব হয়েছে। আব আদি প্রাণ নাকি সৃষ্টি হয়েছিল এমনই সম্ভাব্যতাব মধ্য দিযে।

সুতরাং আদি প্রাণ সৃষ্টির আধুনিক ব্যাখ্যায অনেক বিতর্ক বয়েছে, মেনে নেওযা হযেছে বহু আপতন। যেভাবেই থেকে পৃথিবীতে প্রাণেব আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায ২০০ কোটি বছব আগে। পৃথিবীব ৪৬০ কোটি বছব বযসকে যে সব যুগে ভাগ কবা হযেছে তাব তালিকা নিচে দেওযা হল। এই তালিকা হল পৃথিবীব ভূতাত্ত্বিক সমযসূচী। এসংক্রান্ত দু'বকমেব সমযসূচীই দেওযা হল।

● পৃথিবীর বিভিন্ন যুগ ●

যুগ	যুগেব অন্তর্বিভাগ	কত কোটি বছব স্থাযী হযেছিল		আজ থেকে কত কোটি বছব আগে শুরু হযেছিল
কেনোজোযিক	কোযাটাবনাবি		০ ১	০ ১
	টাবসিয়াবি	৭ ৫	৭ ৪	৭ ৫
মেসোজোযিক	ক্রিটেসিযাস		৬ ০	১৩ ৫
	জুবাসিক	১৩	৩ ০	১৬ ৫
	ট্রায়াসিক		৪ ০	২০ ৫
প্যালিওজোযিক	পাবমিয়ান		২ ৫	২৩ ০
	কার্বনিফেবাস		৫ ০	২৮ ০
	ডেভোনিযান		৪ ৫	৩২.৫
	সিলিউবিযান		৩ ৫	৩৬ ০
	অবডোভিসিযান	২৯ ৫	৬ ০	৪২ ০
	ক্যামব্রিযান		৮ ০	৫০.০
প্রিক্যামব্রিয়ান		১৫০	—	২০০
অ্যাজোয়িক		২৬০	—	৪৬০

(পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য ঃ ডঃ তারকমোহন দাস)



মেক্সিকোর পালেঙ্কে অবস্থিত মায়াদের প্রাচীন 'অন্তর্লেখ মন্দির'।

কেনোজোয়িক যুগের কোয়াটারনারি ও টারসিয়ারি বিভাগকে আরও কতকগুলি অন্তর্বিভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। মানুষের বিবর্তনের কথায় এই অন্তর্বিভাগগুলি কাজে লাগে। তাই ওই অন্তর্বিভাগের একটা তালিকাও দেওয়া হল।

কেনোজোয়িক যুগ ও তার অন্তর্বিভাগগুলিব নাম		স্থায়িত্বকাল কোটি বছরে	আজ থেকে কত কোটি বছর আগে শুরু হয়েছিল
কোয়াটাবনারি	আধুনিক	০ ০০২ (কুড়ি হাজার বছব)	০. ০০২ (কুড়ি হাজাব বছর)
	প্লিসটোসিন	০ ১০ (দশ লক্ষ বছব)	০ ১০ (দশ লক্ষ বছর)
	প্লিওসিন	১ ১	১ ২
টাবসিয়ারি	মিওসিন	১.৬	২ ৮
	অলিগোসিন	১ ১	৩ ৯
	ইযোসিন	১ ৯	৫ ৮
	প্যালিওসিন	১ ৭	৭ ৫

এই 'প্লিসটোসিন'-কে অনেকে বলেছেন 'প্লাইস্টোসিন'। এব সময়কাল কেউ বলছেন ১০ লক্ষ বছর, কেউ বলছেন ২০ লক্ষ বছর। এই প্লাইস্টোসিন যুগেই ঘটেছে মানুষেব আবির্ভাব।

উপরেব তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, কোটি কোটি বছবেব হিসাবেব মধ্যে আধুনিক যুগেব কুড়ি হাজার বছর প্রায ধর্তব্যেব মধ্যেই আসছে না। এই ভূতাত্ত্বিক সময়সূচী নিয়েও কিছুটা মতভেদ আছে ভূ-বিজ্ঞানীদেব মধ্যে। আবাব নৃবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তগুলি এব সঙ্গে জুড়লে উপরের তালিকার সময়সীমাগুলি কমবেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ একটা যুগ কিংবা তার অন্তর্বিভাগগুলিব যে সময়সীমা ধরা হয়েছে সেগুলির মান কমবেশি হযে পড়ে। এছাড়াও ইংবেজী শব্দগুলিব বাংলা উচ্চারণের বিভিন্নতা পাঠকদের মনে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এগুলি দূব কবতে আবেকটা তালিকা পরের পাতায় দেওয়া হল পৃথিবীর ৪৬০ কোটি বছর বয়সেব বিভিন্ন বিভাগ সংক্ষেপে জানতে। এবাবের তালিকাটি ভূতত্ত্ববিদ ও নৃবিজ্ঞানীদেব সিদ্ধান্তগুলি মিলিয়ে বানানো। এই তালিকার সময়সীমাগুলি বহুল ব্যবহৃত। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য উপরের তালিকাটিই বেশি ব্যবহার করেন। আর ভূতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা বেশি ব্যবহার করেন পরের তালিকাটি। নামভেদ ও সময়ভেদ নিয়ে পৃথিবীর ৪৬০ কোটি বছর বয়সের ভূতাত্ত্বিক সময়সূচী যেমন দাঁড়ায় তা হল ঃ

● ভূতাত্ত্বিক সময়সূচী ●
(নিচ থেকে উপরে পাঠ্য)

মহাযুগ	যুগ	কত কোটি বছর আগে	ওই সময়ের প্রাণী ও উদ্ভিদ
সেনোজয়েক	প্লাইস্টোসীন	০ ২০	কপি-নর ও মানুষ
বা	প্লাওসীন		আধুনিক গাছপালা
কেনোজোয়িক	মাইয়োসীন	২ ১/২	পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীব
	অলিগোসীন		
	ইওসীন	৭	
মেসোজয়েক	ক্রিটেশস্	১৩ ১/২	ডাইনোসেরস, সাইকেড জাতীয় উদ্ভিদ,
	জুরাসিক	১৮	আদিমতম পক্ষী, অ্যামোনাইটস্,
	ট্রায়োসিক	২২ ১/২	দুরন্ত সামুদ্রিক জীব।
প্যালিওজয়েক	পারমিয়ান	২৭	আদি স্তন্যপায়ী জীব,
	কারবনিফেরাস	৩৫	বৃশ্চিক ও আদি সরীসৃপ,
	ডিভোনিয়ান	৪০	উভচর, ফার্নজাতীয় বৃক্ষ,
	সিলুরিয়ান	৪৪	কীট-পতঙ্গ, মৎস্য, আদি উদ্ভিদ
	অর্ডোভিসিয়ান	৫০	মেরুদণ্ডহীন জীব
	ক্যামব্রিয়ান	৬০	
আর্কিজয়েক	আর্কিয়ান	২০০	জীবনের উন্মেষ
অ্যাজোয়িক		৪৬০	
পৃথিবীর বয়স		৪৬০	

(মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য ঃ ডঃ অতুল সুর)

পৃথিবীব ৪৬০ কোটি বছর বয়সের প্রেক্ষিতে মানুষ এসেছে অনেকটা পরে। এই সেদিন যেন তার আবির্ভাব। পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হয়েছে ২০০ কোটি বছব আগে। অর্থাৎ পৃথিবীব বযসেব ৫৭ শতাংশ ভাগ সময় ছিল জীবনহীন, প্রাণশূন্য। মানুষ এসেছে অনেকটাই পরে। বিশলক্ষ বছর আগে আবির্ভূত হওযা অস্ট্রালোপিথেকাসকে [Australopithecus] মানুষেব পূর্বপুরুষ ধরলে পৃথিবীব বযসেব ৯৯ ৯৫৭% ভাগ সময় জুড়ে পৃথিবী ছিল মানববিহীন। মানুষ এসেছে সবাব শেষে, সবার পিছনে। কিন্তু জীবনের বঙ্গমঞ্চে সে আজ নিয়েছে নায়কের ভূমিকা। সে তার প্রথম আবির্ভাবেব দিন থেকেই এই গৌরব পায় নি। মানুষের সভ্যতা বলতে যা বোঝায়, তাব বযস মাত্র আট-দশ হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ মানুয যতদিন এসেছে তাব ৯৯ ৫% ভাগ সময়ই সে কাটিয়েছে বনে জঙ্গলে, জন্তু-জানোযাবদের সঙ্গে তাদেব মতই জীবনযাপন কবে। সবার উপব আধিপত্য করাব বুদ্ধি তখন তাব ছিল না। সভ্যতাব সূচনা হল তার বুদ্ধির উন্মেষ থেকে। অন্যদেব উপব তাব আধিপত্য কবাব শুরু হল সে সময থেকেই। অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবন, গৃহ ও জনপদ স্থাপন, চাষ-আবাদ শুরু কবে নিবাপত্তা বৃদ্ধি প্রভৃতিব মধ্য দিযে মানুষ অন্যান্য প্রাণীব উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কবেছে। আধুনিক বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তিব সাহায্যে সে এই আধিপত্য আরও বেশি কবে কাযেম করতে পেরেছে। বলা হয, গত তিন-শ' বছবেব মধ্যে মানুয প্রকৃতিব উপর আধিপত্য কবতে গিযে পৃথিবীব জল, স্থল ও বাযুমণ্ডলেব ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক চরিত্রেব এত অভাবনীয পবিবর্তন ঘটিযেছে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে বিপর্যস্ত কবেছে যে, বিগত ২০০ কোটি বছবের মধ্যে কোনও প্রাণী তেমন বিপর্যস্ত কবতে পারে নি। মানুয আব পাঁচ হাজার এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পাববে কিনা তা ঘোরতব সন্দেহের বিষয। অনেকে মনে করেন একবিংশ শতাব্দী শেযে হওয়ায় আগেই মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। তথাকথিত সভ্যতার সেটাই হবে চবম পবিণতি। পৃথিবী শুধু মানুষেব জন্য নয। পৃথিবী লক্ষ-লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী সকলের জন্য। পবিবেশের ভারসাম্য বক্ষিত না হলে মানুষ নিজের নিশ্চিহ্ন হওয়াটা নিজেই ডেকে আনবে। সবার উপর আধিপত্য করার অদম্য লোভই তাকে নিয়ে যাচ্ছে মানবজাতির ধ্বংসের দিকে। সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যাইহোক, সভ্যতাব বিবর্তনের গোড়ার কথায় আবাব ফিবে আসি।

মানুষের বিবর্তন ঘটেছিল ভাবতের উত্তব-পশ্চিম অঞ্চলে হিমালয়েব পাদদেশে, শিবালিক পাহাড়েব বিস্তীর্ণ প্রদেশে। এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে রামাপিথেকাস, সুগ্রীব-পিথেকাস, ব্রহ্মপিথেকাস প্রভৃতি নরাকাব জীবের জীবাশ্ম। পণ্ডিতদের মতে, ভারতের এই অঞ্চলেই ঘটেছিল আদি মানুষের সর্ব প্রথম বিবর্তন। রামাপিথেকাসই [Ramapithecus] মানবজাতীয় জীবগণের [Dryopithecus] মধ্যে প্রথম বৃক্ষ ত্যাগ কবে মাটিতে আশ্রয় নেয়। এই রামাপিথেকাস থেকেই পরে মানুষের উদ্ভব

হয়। প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বছর আগে রামাপিথেকাস আবির্ভূত হয় হিমালয়ের এই অঞ্চলে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই রামাপিথেকাসবাই পরে এই অঞ্চল থেকে আফ্রিকা ও চীন দেশে গিযে সেখানকার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পবিবেশেব প্রভাবে নিজ নিজ বিশিষ্টতা লাভ করে বিবর্তনেব পথে এগিযে গিযেছিল।

রামাপিথেকাস থেকেই প্রায় ২০ লক্ষ বছব আগে জন্ম নেয অস্ট্রালোপিথেকাস [Australopithecus]। এরা ভারত থেকেই এশিযাব দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেব জাভা পর্যন্ত গিয়েছিল। কেনিযা ও তানজানিয়াতে এদের পাওযা গেছে। এরা প্রকৃত মানুষ নয়। কিন্তু এদের থেকে বিবর্তনে এসেছে মানুষ। প্রায পাঁচলক্ষ বছর আগে ঋজুভাবে চলাফেবা কবতে সমর্থ [Homo Erectus] মানুষ এসেছে পৃথিবীতে। এরপর আসে নিয়ানডারথাল জাতিব মানুষ [Neanderthal Man] প্রায দেড লক্ষ বছব বা ১,৫০,০০০ বছব আগে। এরা প্রায ৪০,০০০ বছব আগে নাকি নিশ্চিহ্ন হযে যায। এদেব জাযগায আসে আধুনিক মানুষেব পূর্বপুরুষ 'ক্রোম্যানিযন' [Cromagnon] জাতিব মানুস। অনেকে মনে কবেন, নিযানডাবথাল মানুযেবা নিশ্চিহ্ন হয নি। তাবা মিশে গিযেছিল ক্রোম্যানিযনদেব সঙ্গে। ক্রোম্যানিযন মানুযেরা কী ভাবে আবির্ভূত হযেছিল তার বিশদ বিববণ অজানা। তবে, এটা সবাই মেনে নিযেছেন যে, এই ক্রোম্যানিয়ন মানুযেরাই আধুনিক মানুষেব পূর্বপুরুষ। বলা হয, প্রায ৪০,০০০ বছব আগে এই ক্রোম্যানিযন মানুষেবা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয।

পৃথিবীতে মানুষেবা প্রথম এসেছিল প্লাইস্টোসীন যুগে। প্লাইস্টোসীন যুগে পৃথিবী চাববাব তুষাবাবৃত হয়েছিল। তুষাব ঢাকা পডায এই যুগকে 'তুযাব যুগ' বলা হয। এই তুষার যুগে উত্তব আমেবিকা, ইউবোপ ও এশিযাব উত্তরেব অর্ধাংশ তুষাবাবৃত হয। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী পলভাইস-এব মতে মানুষ হ'ল এই তুষাব যুগের সৃষ্টি — Man is the product of Ice Age.। তাঁব মতে, এই নিদারুণ ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিযে, নানা বকম কলাকৌশলেব আবিষ্কাব কবতে হয মানুষকে এবং এব ফলেই মানুষের মস্তিষ্কেব দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে। বরফ এখনও পুরোপুরি গলেনি, প্রচুর বরফ জমে আছে উত্তব ও দক্ষিণ মেরুতে। অথচ তুষার যুগেব আগে মেরু সন্নিহিত অঞ্চলে বরফেব কোনও চিহ্নই ছিল না। মেসোজোয়িক যুগে সেখানে অরণ্য ছিল। আজও তাই সেখানে কযলাব খনির সন্ধান পাওয়া যায়।

যাইহোক, চারটি তুষার যুগ হল ঃ

(১) প্রথম তুষাব যুগ বা গুনজ [Gunz] তুষাব যুগ।

(২) দ্বিতীয় তুষার যুগ বা মিন্ডেল [Mindel] তুষাব যুগ।

(৩) তৃতীয় তুষার যুগ বা রিস [Riss] তুষাব যুগ।

(৪) চতুর্থ তুষার যুগ বা ভুবম [Wurm] তুষাব যুগ।

আদি তুষাব যুগ এসেছিল ১০,০০,০০০ বা দশ লক্ষ বছর পূর্বে। মধ্যতুষার যুগ আসে ৪,৫০,০০০ বছর আগে এবং অন্তিম তুষার যুগ এসেছিল ১,০০,০০০ বছর পূর্বে। ভাগটা এই রকম ঃ

[১] আদি তুষার যুগ	প্রাক-Gunz তুষার যুগ	
[প্রথম]	Gunz- তুষাব যুগ	দশ লক্ষ বছব আগে
[২] মধ্য তুষাবযুগ	Gunz-Mindel অন্তব যুগ	
[দ্বিতীয]	Mindel তুষার যুগ	সাড়ে চাব লক্ষ বছব আগে
	Mindel-Riss অন্তর যুগ	
[৩] অন্তিম তুষার যুগ	Riss তুষার যুগ	এক লক্ষ বছব আগে
[তৃতীয ও চতুর্থ]	Riss-Wurm অন্তব যুগ	
	Wurm তুষার যুগ	

সুতবাং প্রথম তুষাব যুগ দশ লক্ষ বছব, দ্বিতীয তুষাব যুগ সাড়ে চাব লক্ষ বছব এবং তৃতীয ও চতুর্থ তুষাব যুগ এসেছে এক লক্ষ বছব আগে।

তুষাব যুগ কেন এল তাব কাবণ বিজ্ঞানীবা বলতে পাবছেন না। পৃথিবীব ৪৬০ কোটি বছবেব ইতিহাসেব শেষ পর্যাযে হঠাৎ কোন্ কাবণে চাব চাবটি তুষাব যুগ এসে হাজিব হল তা আজও অব্যাখ্যাত। তবে তুষাব যুগ আসায মানুষেব বুদ্ধিব বিকাশ দ্রুত হয়েছে এটা বলছেন বিজ্ঞানীবা। পণ্ডিতেবা তুষাব যুগ কেন এলো এবং হঠাৎই এলো তাব কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে না পেবে বলছেন ঃ

"Several theories have been put forward such as variations in the strength of solar radiation, sunspot activity causing increased snowfall and rainfall, a change in the position of the poles, which would alter the seasons and have effect on the present polar ice caps seem to be large but their fate over the next ten or twenty thousand years is unknown. Neither do we know whether the Ice Age is over It may be that this is simply another interglacial phase prior to the spread of a new ice-cap over northern Europe and America.

প্লাইস্টোসীন যুগেব আবম্ভে পৃথিবীর যে সব অংশ তুষাব মুক্ত ও উষ্ণ আবহাওযার ছিল সেই সব জাযগায আবির্ভূত হয ঋজুভাবে চলা-ফেবা কবতে পাবে [Homo Erectus] এমন নবাকার জীব। মধ্য প্লাইস্টোসীন যুগে এল নবাকাব জীবসমূহেব মধ্যে মানুষেব লক্ষণযুক্ত কপি-নর বা Ape-man। এব হল অস্ট্রালোপিথেকাস। এবা প্রকৃত নব বা Homo-sapiens নয়, এরা কপি-নব মাত্র। আগেই বলেছি, অস্ট্রালোপিথেকাসবা রামাপিথেকাসদেরই বংশধব। প্লাইস্টোসীন যুগের শেষার্ধে কোনও একটা সময় অস্ট্রালোপিথেকাস ও হোমো-ইবেকটাসবা পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায। কীভাবে তাবা নিশ্চিহ্ন হয় তা আমাদেব অজানা। এবপব আসে

নিযানডারথাল মানুষ। সেও প্রায় ১,৫০,০০০ বছর আগে। এই সব নরাকার জীবদের বুদ্ধিবৃত্তির কতটা বিকাশ ঘটেছিল তা বোঝা যায় তাদের কঙ্কালাস্থি ও মস্তিষ্কের ঘিলুর পবিমাণ [Brain Capacity] থেকে। বুদ্ধিব বিকাশে মাথাব ঘিলুর পরিমাণের একটা ভূমিকা আছে। নরাকাব জীব এবং প্রকৃত মানুষের মস্তিষ্কের ঘিলুর পবিমাণের একটা তালিকা নিচে দেওযা হল, বুদ্ধিব বিকাশে ঘিলুব পবিমাণের প্রভাব বুঝতে।

প্রাণীর নাম	মস্তিষ্কের ঘিলুর পরিমাণ ঘন-সেন্টিমিটারে [সি.সি.]
১। গিবন	৯৯
২। শিম্পাজী	৩৯৭
৩। অস্ট্রালোপিথেকাস	৬৭০
৪। হোমো হ্যাবিলাস	৬৭০
৫। পিথেকানথ্রপাস	৭৭০-৯০০
৬। হোমো-ইবেকটাস	৭০০-১২০০
৭। সিনানথ্রপাস	১০১৫-১২৫৫
৮। বোডেসীয মানুষ	১২৮৩
৯। নিযানডাবথাল মানুষ	১২০০-১৬০০
১০। সোযানকুম মানুষ	১০০০-১৩২৫
১১। আধুনিক মানুষ	১০০০-২০০০ [গড় ১৩০০]

নিযানডাবথাল মানুষেব মস্তিষ্কটা বেশ পবিণতই ছিল। কিন্তু তাবা প্রায ৪০,০০০ বছব আগে কোথায হাওযা হযে গেল তা আমাদেব অজানা। অনেকে মনে করেন তাবা ক্রোম্যানিযনদেব সঙ্গে মিশে গিযেছিল। ৪০,০০০ বছব আগে এসেছে ক্রোম্যানিয়ন মানুষ। ওবাই আধুনিক মানুষ। পণ্ডিতরা বলছেন, এদেব থেকেই উদ্ভূত হযেছে ককাসযেড [Caucasoid], মংগোলযেড [Mongoloid], নিগ্রযেড [Negroid] এবং অস্ট্রালযেড [Australoid] প্রভৃতি মানবগোষ্ঠী। বলা হয, নবগোষ্ঠীব মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য যে সব কাবণে ঘটেছে সেগুলি হচ্ছে ঃ (১) জীনঘটিত পবিব্যক্তি [Gene Mutation], (২) প্রাকৃতিক নির্বাচন [Natural Selection], (৩) জীনেব নিষ্ক্রিযতা [Genetic Drift], (৪) পবিবেশের প্রভাব [Environmental Influence] এবং (৫) জন-মিশ্রণ [Population Mixture]

আদিম মানুষের প্রধান সমস্যা ছিল আত্মবক্ষা এবং আনুষঙ্গিকভাবেই সমস্যা ছিল উদবপূর্তির। তাদেব আবির্ভাবকালে পৃথিবীতে ছিল অতিকায় হাতি [Mammoth], বনমহিষ এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু। সে সময় মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল পশুমাংস। বন্য ফলমূলও তাবা কিছু খেত। উদরপূর্তির জন্য তাদের পশুশিকারে যেত হত। সুতবাং আত্মবক্ষা ও পশুশিকাব এই দুই প্রয়োজনে আদিম মানুষ বানিয়েছিল পাথরেব

আয়ুধ। জীবনযাত্রার সমস্যা সমাধানেব জন্য বানানো পাথরের আয়ুধগুলিই তাদের কৃষ্টিব একমাত্র নিদর্শন। মানুষেব সভ্যতার উন্মেষকালকে তাই বলা হয, 'প্রস্তর যুগ' [Stone Age]। আদি মানবদের নির্মিত পাথরের আয়ুধ আমবা পৃথিবীর বিভিন্ন জাযগা থেকে পেয়েছি। এই সব আয়ুধ বানানো হয়েছে হয় চকমকি পাথর বা Flint, আব তা নয তো নদীব ধারে পাওযা নুড়ি-পাথব [Pebbles] ও কোযার্টজাইট পাথর থেকে।

প্রস্তবযুগকে ভাগ করা হয়েছে তিনভাগে — (১) আদি প্রস্তরযুগ বা 'প্রত্নোপলীয় যুগ' [Palaeolithic Age], (২) মধ্য প্রস্তরযুগ বা 'মধ্যোপলীয় যুগ' [Mesolithic Age], (৩) অন্তিম প্রস্তর যুগ বা 'নবোপলীয় যুগ' [Neolithic Age]। আদি প্রস্তবযুগ হল প্রত্নোপলীয যুগ। এই যুগেব স্থিতিকাল বেশ দীর্ঘ। বলা হচ্ছে, এই যুগ পাঁচ লক্ষ বছব থেকে পঁচিশ হাজাব বছব অবধি বিস্তৃত ছিল। মধ্য প্রস্তব যুগেব বিস্তাব ছিল ২৫,০০০ বছব থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ বছব অবধি। আর নবোপলীয যুগ হল খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ বছব থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর। পণ্ডিতেরা প্রত্নোপলীয যুগকে আবাব আট ভাগে ভাগ কবে তাব বিস্তৃত সময সীমাকে ছোট ছোট ভাগ হিসাবে চিহ্নিত কবেছেন। এই আট ভাগ হল ঃ

	প্রত্নোপলীয় যুগ বিভাগ		কত বছর পূর্বে
[১]	আদি প্রত্নোপলীয যুগ	অ্যাবেভিলিযান	৫,০০,০০০-৪,৭০,০০০
		চেলিযান	৪,৭০,০০০-৪,০৫,০০০
		অ্যাশুলিযান	৪,৩৫,০০০-১,১৫,০০০
[২]	মধ্য প্রত্নোপলীয যুগ	লেভালযসিযান	২,৩০,০০০-৭২,০০০
		মুস্টেবিযান	১,৫০,০০০-৭২,০০০
[৩]	অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগ	অবিগনেসিযান	১,১৫,০০০-৭২,০০০
		সলুট্রিযান	৭২,০০০
		ম্যাগডেলেনিযান	৭২,০০০-২৫,০০০

উপরেব তালিকায যুগ ভাগাভাগিব ওই সমযকাল দেখলে বোঝায় যায় যে, একটা যুগের পুবোপুরি শেষ হতে না হতে শুরু হযে গেছে আরেকটা যুগ। অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায একটা যুগের শেষ কিংবা আবম্ভ নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না। যেমন, অ্যাশুলিয়ান বিভাগ শেষ হযেছে ১,১৫,০০০ বছব আগে, অথচ তার অনেক আগেই অর্থাৎ ২,৩০,০০০ বছব আগেই শুরু হযে গেছে লেভালয়সিয়ান যুগ, যা মধ্য-প্রত্নোপলীয় যুগ বিভাগের একটা ভাগ। কিন্তু অ্যাশুলিয়ান ভাগকে রাখা হয়েছে আদি প্রত্নোপলীয় যুগের অংশ হিসাবে যেহেতু এব শুরু ৪,৩৫,০০০ বছর আগে। আবার যে মধ্যোপলীয় বা মধ্য-প্রস্তর যুগের কথা আমরা একটু আগে বলেছি, এই মধ্য প্রত্নোপলীয় বিভাগ তার সঙ্গে এক নয়। মধ্যোপলীয় বা মধ্য-প্রস্তর যুগ বলতে আমরা বুঝি প্রত্নোপলীয় যুগের শেষে ২৫০০০ বছর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ বছর অবধি বিস্তৃত কালকে।

অর্থাৎ তার পবমায়ু মাত্র ১৫,০০০ বছব। কিন্তু প্রত্নোপলীয় বা পুরা-প্রস্তর যুগের মধ্য ভাগের বিস্তাব ছিল ২,৩০,০০০ বছব থেকে ৭২,০০০ বছব অবধি। আরেকটা বিভাজন অনুসাবে, পুবা প্রস্তব যুগ বলতে প্রায় ২০ লক্ষ বছব থেকে শুরু করে ১২০০০ বছর আগেকার সমস্ত সময়টাকেই বোঝায। এব মধ্যে ৫০,০০০ বছর পর্যন্ত সময়কে আদি পুরাপ্রস্তব যুগ, ৫০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর পর্যন্ত সময়টাকে মধ্য পুরাপ্রস্তব যুগ এবং ২০,০০০ বছর থেকে ১২,০০০ বছব আগে পর্যন্ত সময়কে অন্ত-পুবাপ্রস্তর যুগ হিসাবে ভাগ করে নেওয়া হযেছে। এই বিভাজন বলছে নব্য-প্রস্তর যুগেব শুরু হযেছে ১০,০০০ বছব আগে অর্থাৎ প্রায় ৮,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

আদি মানুযেব আয়ুধগুলিই তাদের কৃষ্টির প্রকাশ। আদি প্রত্নোপলীয যুগেব বিশিষ্ট আয়ুধ ছিল হাত-কুঠাব। এছাড়াও ছিল মাংস কাটাব অস্ত্র [Choppers], মাংস ছেদন কবাব আয়ুধ [Cleavers] ইত্যাদি। মধ্য দশাব প্রত্নোপলীয যুগে অর্থাৎ নিযানডাবথাল মানুযদেব সময মাংস চাঁচবাব আয়ুধ [Scrapers] বিশেষভাবে তৈবি হতে থাকে। এই সময পুবানো বহু আয়ুধ অনেক উন্নততব হয়। নিযানডাবথালদেব এই উন্নততব কৃষ্টিকে মুস্টেবিযান কৃষ্টিও বলা হযে থাকে। প্রত্নোপলীয যুগেব একেবাবে অন্তিমদশায আরও বহু নতুন নতুন আয়ুধ নির্মিত হয। জীবনযাত্রার প্রযোজন মেটাবাব জন্য নতুন নতুন শিল্পেব পত্তন হয। এব মধ্যে ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নির্মিত ছুবিব ফলা এবং খোদাই কববাব যন্ত্র [Burins]। খোদাইযেব যন্ত্রগুলি বেশ ক্ষুদ্রকায হত এবং ওগুলি দিযে নবম পাথব, কাঠ ও হবিণেব শিংযেব উপব নানাবকম চিত্রাঙ্কন কবা হত। এই সময 'পিন' (Pin) এবং বর্শা ফলকেবও আবির্ভাব ঘটে। এগুলি সবই কিন্তু পাথবে নির্মিত। হাবপুন, সূচ, বর্শা-ফলক ইত্যাদি সবই এই সমযেই আবিষ্কৃত হয। অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগেব শেষ পর্যাযে আসে 'মেসোলিথিক' [Mesolithic] যুগ। এই মেসোলিথিক যুগকে আমবা মধ্য-প্রস্তব যুগও বলি, আবাব একে সন্ধিকালেব যুগও বলা হয। কাবণ, এটাই প্রত্নোপলীয যুগ [Palaeolithic Age] ও পববর্তী নবোপলীয় যুগেব [Neolithic Age] মধ্যে সেতুবন্ধন।

অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগেব শেষেব দিকের মানুযেবা পর্বতেব গুহায় ছবি আঁকা শুরু কবে। এই সব গুহা চিত্রাঙ্কনের মধ্যে স্পেনেব আলটামিবা, ফ্রান্স, ইতালি ও ভাবতেব পর্বতগাত্রসমূহে আঁকা চিত্রাবলী উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশেব ভোপাল থেকে ৪২ কিলোমিটাব দূবে অবস্থিত ভীমবেটকা পাহাড়ের গুহাপুঞ্জেই জগতেব বৃহত্তম প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলাসমূহের অবস্থান। ভারতেব অন্যান্য যে সব জাযগায এই সময়েব চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলি হল ঃ মহীশূবেব বেলারী, কেরলের ওযাইনাড়, সিংভূম জেলার মৌভাণ্ডাব ও ঘাটশিলা, বিন্ধ্যপর্বতের কাইমুর শৈলমালা ও সাতপুবা পাহাড়ের ঘোড়ানগব এবং মহাদেও পাহাড়। আবও অনেক জায়গায় এই ভাবতেই পাওযা গেছে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের শেষের দিকের মানুষের আঁকা

চিত্রাবলী। সারা ভারতবর্ষে যেমন বহু জাযগায এই আমলের চিত্রকলা পাওয়া গেছে পর্বতগুহায, পর্বতগাত্রে, তেমনি সাবা পৃথিবীব বহুস্থানেই এ রকম চিত্রকলার নিদর্শন পাওযা গেছে। এই সব চিত্রকলাগুলিব মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত হল ইতিহাস বিখ্যাত আলটামিবাব [Altamira] গুহা চিত্র। এটি স্পেন দেশে। এর কথা সাবা পৃথিবীব অধিকাংশ লোকই জানে। কিন্তু জানে না যে, পৃথিবীব প্রাচীনতম, বৃহত্তম গুহাচিত্রাবলীর সমাবেশ বয়েছে আমাদের ভাবতবর্ষেই, ভোপাল থেকে ৪২ কিলোমিটাব দূবে বিন্ধ্যপর্বতেব প্রাগৈতিহাসিক গুহাসমূহে—ভীমবেটকায়। আসলে ভীমবেটকাব আবিষ্কার খুব অল্পদিন আগেই হয়েছে। মাত্র বছর পঞ্চাশ আগে। তাছাড়া ভাবতীয নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকবৃন্দ ইচ্ছাকৃতভাবেই ভীমবেটকা নিযে তেমন মাথা ঘামাতে রাজী নন। সম্ভবত তাঁদেব মাথাব্যথা না হওযায় কাবণ হল যে, ভীমবেটকাব কোনও পাশ্চাত্য শংসাপত্র নেই। পশ্চিমী দুনিযাব সার্টিফিকেট নেই বলেই স্বাধীন ভাবতেব পণ্ডিতেরাও ভীমবেটকা নিযে মাথা ঘামাচ্ছেন না। অথচ পৃথিবীব বৃহত্তম, প্রাচীনতম, প্রাগৈতিহাসিক এই গুহাচিত্রগুলিই ভাবতেব তথা পৃথিবীব সভ্যতাব বিবর্তন সম্পর্কে অনেক নতুন কথা শোনাতে পাবে—জানাতে পাবে অনেক নতুন তত্ত্ব।

যে আলটামিবাব এতো খ্যাতি, যে আলটামিবাকে বিশ্বেব সব ইতিহাসেব ছাত্রই কমবেশি জানে, প্রথমে সেই আলটামিবাব কথায আসা যাক। উত্তর স্পেনেব স্যানটানডার [Santander] থেকে ৩০ কিলোমিটাব (১৯ মাইল) দূবে আলটামিবা। ১৮৬৮ সালে এক শিকাবী এই গুহা এবং তাব চিত্রকলাব আবিষ্কর্তা। এখানেব চিত্রকলা কোনও জালিযাতি কিনা তা নিযে বহু পবীক্ষা-নিবীক্ষার পব বিংশ শতাব্দীব গোড়াব দিকে এটি সর্বজন স্বীকৃত হয যে, আলটামিরাব গুহাচিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক মানুষদেব আঁকা। এই পবীক্ষা-নিবীক্ষা চালিযেছিলেন স্পেনেব এবং বিদেশেব বহু বিশেষজ্ঞ।

আলটামিবাব গুহা ২৭০ মিটাব। [৮৯০ ফুট] লম্বা। এই গুহাব পার্শ্ব প্রকোষ্ঠ থেকে বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে যেগুলি অরিগনেসিযান [Aurignacian], সলুট্রিযান [Solutrean] এবং অন্তিম বা মধ্য ম্যাগডেলেনিযান [Magdalenian] যুগেব। সুতরাং এগুলির বয়স ১,১৫,০০০ বছর থেকে ২৫,০০০ বছব বলা যেতে পারে। তাহলে এই প্রত্নবস্তুগুলি নিশ্চয়ই নিয়ানডাবথাল মানুষেব। আবাব নিয়ানডাবথাল মানুষেরা যেহেতু ৪০,০০০ বছব আগে লুপ্ত হযে যায কিংবা ক্রোম্যানিয়ন মানুষদেব সঙ্গে মিশে যায, সেইহেতু অন্তিম ম্যাগডেলেনিযান যুগেব প্রত্ননিদর্শনগুলি বা ২৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ বা এই ১৫,০০০ বছরের প্রত্নবস্তুগুলিকে ক্রোম্যানিয়ন মানুষদেব ব্যবহৃত প্রত্নবস্তু বলে অনুমান করলে তা অসঙ্গত হওযাব কথা নয়। এই সব প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল, উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এবং পশুর কাঁধেব চওড়া হাড়ের উপর খোদাই করা নকশা।

আলটামিরাব গুহায প্রকোষ্ঠের সংখ্যা একশোব মত। এব বিখ্যাত যে প্রকোষ্ঠটিতে বেশিব ভাগ চিত্রকলা বযেছে তাব আযতন ১৮ মিটার x ৯ মিটাব বা ৬০ ফুট লম্বা ও ৩০ ফুট চওড়া। এর উচ্চতা সর্বত্র সমান নয। কোথাও ১ ১৫ মিটার [৩.৭৭ ফুট], কোথাও বা ২ ৬৫ মিটাব [৮ ৬৯ ফুট]। এই গুহাব দেওযাল নয, ছাদই বহুবর্ণে চিত্রিত। বহুবর্ণ বলতে এখানে ব্যবহৃত হযেছে মোট তিনটি বং—লাল, কালো এবং বেগুনি [Violet]। বেশিব ভাগ ছবিই হল বাইসনেব [Bison]। বাইসনগুলিব শিল্প সুষমা আশ্চর্য বিস্মযেব। ২৫০০০ বছব আগেব শিল্পীবা এতো সুন্দর ছবি আঁকতে পাবতেন এ যেন ভাবাই যায না। এই প্রকোষ্ঠে বাইসনদেব ছবি ছাড়া আবও যে সব ছবি আছে সেগুলি হল — দুটি বন্য ববাহ, কিছু ঘোড়া, একটি হবিণী এবং আবও কয়েকটি অবযব। এগুলি সবই ওই তিনটি বংযে আঁকা। এঁদেব সঙ্গে বযেছে আটটি নবমূর্তিধাবী দেবতাব খোদাই কবা ছবি [Anthropomorphic Figure], বেশ কিছু হাতেব ছাপ এবং কিছু হাতেব বর্ণালী নকশা-চিত্র। অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলিতে বযেছে কালো বংযে আঁকা নানা মূর্তি। বেশ কিছু মূর্তি এবং অবযব খোদাই কবাও হযেছে প্রকোষ্ঠগুলিব ছাদে এবং দেওযালে। এই সব অঙ্কন-শিল্পীবা এতোই দক্ষ ছিলেন যে, পাথবেব স্বাভাবিক বংকে মিলিযে দিযেছেন নিজেদেব কৃত্রিম বংযেব সঙ্গে বেশ কিছু চিত্রে। আবাব বহু চিত্রে পর্বতগাত্রেব স্বাভাবিক পবিণাহগুলিকে [Contours] সঠিকভাবে ব্যবহাব কবে নিযেছেন চিত্রেব উপযোগী কবে। সুতবাং আলটামিবাব শিল্পীরা যে বেশ দক্ষ শিল্পী ছিলেন সে বিষযে সন্দেহ নেই।

আলটামিবাব লোকেবা ঘোড়াকে পোয মানিযেছিল কিনা তা ওই ছবি থেকে বোঝা যায না। তবে ভীমবেটকাব লোকেবা যে ঘোড়াকে পোয মানিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বোঝা যায, তাদেব আঁকা ঘোড়ায চড়ে শিকাব কবাব দৃশ্য সম্বলিত চিত্রগুলি থেকে। ভীমবেটকাব কথায় একটু পবেই আসছি। আলটামিবাব ছবিগুলিব বযস খুব নির্দিষ্ট কবে বলা না হলেও মোটামুটি এগুলিকে ২৫,০০০ বছবেব পুবানো ধবা হয। অন্তিম ম্যাগডেলেনিযান আমলেব শিল্পীবাই এব স্রষ্টা। সুতবাং সিদ্ধান্তে আসাই যায যে, এই সব চিত্র-ভাস্কর্যেব সৃষ্টি কবেছিলেন ক্রোম্যানিযন মানুষেবাই। আবাবও বলি, ক্রোম্যানিয়ন মানুষেবা পৃথিবীব এই অঞ্চলে আবির্ভূত হযেছিলেন প্রায ৪০,০০০ বছব আগে এবং এবা আধুনিক মানুষেব আদি পুরুষ। তবে এটা অজানা যে, এঁদেব আগে আসা নিযানডারথাল মানুষেবা হঠাৎ বিলুপ্ত হযে গেল কেন? আবাব ক্রোম্যানিযনবা হঠাৎই এতো সভ্য হয়ে গেল কেমন করে এবং কোথা থেকে। নৃতত্ত্ববিদবা এ সব প্রশ্নের উত্তব দিতে পাবেন নি আজও। নিয়ানডাবথালরা যে পরিবর্তিত হযে ক্রোম্যামিয়ন মানুষ হযেছিল — এমন কথাও বলছেন না নৃবিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ অবশ্য বলছেন নিয়ানডারথালরা মিশে গিযেছিল ক্রোম্যানিয়নদের সঙ্গে। বিলুপ্ত হওয়া আব মিশে যাওয়া এক ব্যাপার নয়। যাইহোক, আলটামিবার গুহাচিত্রকেই সারা পৃথিবী

জুড়ে মানুষের তৈরি আদি চিত্রকলা বলে মনে নেওয়া হয়েছে। এগুলির স্রষ্টা ক্রোম্যানিয়ন মানুষ। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই কিন্তু জানেনা ভীমবেটকার কথা। জানে না আলটামিবা নয়, পৃথিবীর আদিমতম, বৃহত্তম, সমৃদ্ধতম চিত্রকলাগুলি রয়েছে ভীমবেটকায়। এগুলি কোন্ মানুষের সৃষ্টি তা অজানা। তবে, রামাপিথেকাসেব দেশ ভাবতবর্ষই যে সমস্ত সভ্যতা এবং কৃষ্টির আদিগুরু তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে ভীমবেটকাব অসংখ্য গুহা এবং তাদেব চিত্রকলা। ভীমবেটকাব আবিষ্কার হয়েছে ১৯৫৭ সালে। আজও পৃথিবীব নৃ-বিজ্ঞানীদের কাছে তেমন পরিচিতি পায় নি এই প্রাচীনতম চিত্রকলা সমৃদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলি।

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী শহর ভোপাল। ভোপাল থেকে ৪২ কিলোমিটাব দূরে ভীমবেটকার অবস্থান। শাল, সেগুন, মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা বিন্ধ্যপর্বতেব কিছুটা অংশের নাম 'ভীমবেটকা'। পাহাড়, ঘন-জঙ্গল, ক্ষযে যাওযা অদ্ভুত আকাবেব পাহাড-চূডা নিয়ে প্রায নির্জন ভীমবেটকা এক অনন্য বিষ্ময। ১৯৫৭ সালে আবিষ্কৃত হযেছে ভীমবেটকা। জন সাধাবণের দেখাব জন্য তা খুলে দেওয়া হযেছে ১৯৯০ সালে। এখানে আবিষ্কৃত হযেছে প্রাগৈতিহাসিক গুহা-মানবদের বিশাল এক বসতি। এখানেই জঙ্গলেব মধ্যে পাহাড়েব গায় আবিষ্কৃত হযেছে ৭৬০টিব বেশি গুহা। এই গুহাগুলিতে নাকি প্রায এক লক্ষ বছব কিংবা তাবও আগে থেকে বাস কবেছে মানুষ। এখানে পাওযা প্রত্ন-নিদর্শনগুলি অন্ততঃ সেই কথাই বলছে। এই ৭৬০টি গুহাব অন্ততঃ সাতশোটি গুহা বঙীন চিত্র-সম্বলিত। এই সব চিত্রে ব্যবহার কবা হযেছে সাদা, লাল, সবুজ ও হলদে বঙ। লক্ষাধিক বছর ধবে আদিম মানবের বিবর্তন ঘটেছে ভীমবেটকায়। অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগ, মধ্যোপলীয যুগ এবং নবোপলীয যুগ পাব হযে তাবা চলে এসেছে অশোকের আমলের সভ্যতায়। এতো দীর্ঘস্থায়ী আদিম-মানব বসতি এবং এতো পুবাতন চিত্রকলা পৃথিবীর আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। আবাব এতো সংখ্যায প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা পৃথিবীতে আব কোথাও নেই। ভীমবেটকায বহু চিত্র বযেছে যাদেব বয়স ১০,০০০ বছব থেকে ৩০,০০০ বছর। বড় কথা হল, একই মানুষ বিবর্তিত হয়ে চলে এসেছে অশোকের আমলের সভ্যতায় বা মৌর্যসভ্যতায এবং সে মানুষেব পূর্ব-পুরুষ এক লক্ষ বছবের বেশি প্রাচীন। আর তারা বাস কবেছে এই ভীমবেটকায এক লক্ষ বছব বা তাবও বেশি সময় ধরে এক নাগাডে। সুতবাং ভীমবেটকায় ৪০,০০০ বছরেব প্রাচীন ক্রোম্যানিযন মানুষেব কোন ভূমিকা আছে কি? ভীমবেটকার মানুযেরা নিয়ানডারথাল বা তাদের সমগোত্রীয কোন মানবগোষ্ঠী নয তো? ভীমবেটকাব বহস্য আজও অনুদ্‌ঘাটিত। নৃতাত্ত্বিকরা এখনও এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পাবেন নি। লক্ষাধিক বছরের প্রাচীন এই মানবগোষ্ঠী কারা? ভীমবেটকার মানুষেরা নিশ্চয়ই 'ক্রোম্যানিয়ন' নয। তবে এরা কারা এবং ক্রোম্যানিয়ান মানুষদের বহু আগেই এরা কীভাবে সৃষ্ট হল বা উদ্ভূত হল? এরা এবং আলটামিরাব লোকেরা কি একই

মানবগোষ্ঠী? এরা কি নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠীর লোক? এসব প্রশ্নের উত্তর অজানা। নৃতাত্ত্বিকরাও এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ব্যর্থই হয়েছেন। সুতরাং এটা মেনে নিতে দ্বিধাই থাকছে যে, ক্রোম্যানিয়ন জাতির মানুষ হতেই পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহের উদ্ভব হয়েছে। কারণ, ভীমবেটকার মানুষেরা ক্রোম্যানিয়ন নয়।

ভীমবেটকা নামটা এসেছে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের নাম থেকে। কথিত আছে, বনবাসের সময় পাণ্ডবেরা বেশ কিছুদিন এখানে কাটিয়েছিলেন। তখন গুহা-মানুষেরা নিশ্চয়ই অনেকটা সভ্য হয়ে গিয়েছে। শিখে গেছে চাষবাস। সম্ভবত এই জনপদের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে পাণ্ডবেরা কিছুদিন এই জায়গায় থেকে যান। 'ভীমের বাটিকা' বা 'ভীমের বৈঠক' থেকেই নাকি জায়গাটার নাম 'ভীমবেটকা। তবে প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা বহুকাল ধরে এখানে বাস করেছে, পাণ্ডবদের আসার বহু আগে থেকেই। এই বসতির অন্য কোন নাম ছিল কিনা তা অজানা। এখানে পাওয়া গেছে অশোকের শিলালেখ। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও এখানে এক বড়সড় জনপদ ছিল। আর সে কারণেই সম্রাট অশোক তার শিলালেখর দ্বারা অনুশাসন প্রচার করেছিলেন এই জনপদে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২০০ ফুট উঁচুতে ভীমবেটকার অবস্থান। ঘনজঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের গায়ে গুহা। ছোট বড় নানা আকৃতির, নানা মাপের। গুহাগুলির কোনটির আয়তন এতো বিশাল যে তাতে ৫০/৬০ জন লোক অনায়াসে বাস করতে পারে। প্রায় ৭৬০টিরও বেশি গুহা রয়েছে ৯ [নয়] কিলোমিটার জুড়ে। এর প্রায় ৭০০টি গুহাতেই রয়েছে চিত্রকলা। সভ্যতার ইতিহাস বলছে, মানুষ পুরোপুরি সভ্য হওয়ার অনেক আগেই ছবি আঁকতে শিখেছে। অর্ধ-সভ্য মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে ছবি এঁকেছে। ছবির মাধ্যমে সে তার বক্তব্য অপরকে বোঝাতে চেয়েছে। এই ছবি থেকেই ক্রমবিবর্তনে এসেছে চিত্রলিপি, ভাবচিত্র লিপি এবং অবশেষে লিপির উদ্ভব হয়েছে। আদিম মানুষের মূল জীবিকা ছিল শিকার। আদিম মানুষদের আঁকা গুহাচিত্রে তাই শিকার দৃশ্যই বেশি করে স্থান পেয়েছে। ভীমবেটকার সর্বত্রই আঁকা হয়েছে শিকার দৃশ্য। সর্বত্রই শিকার দৃশ্যের প্রাধান্য থাকলেও এখানে চিত্রসংখ্যা অনেক হওয়ায় শিকার-চিত্রের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের কিছু ঘটনাও চিত্রায়িত হয়েছে। শিকার দৃশ্য ছাড়াও তাই রয়েছে দলবদ্ধ নাচের দৃশ্য, গানের দৃশ্য, হাতি চড়ার দৃশ্য, পশুদের যুদ্ধ, মধুসংগ্রহের চিত্র, শরীর-সজ্জা, ছদ্মবেশ, মুখোশ পরা নৃত্যের দৃশ্য এবং অন্যান্য নিত্যদিনের গৃহকর্মের চিত্র। পশুচিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে বাইসন [Bison], বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হরিণ, বন্য-বরাহ, হাতি, ঘোড়া, কুকুর, সরীসৃপ, কুমীর প্রভৃতি। বাইসন, বন্য-বরাহ, ঘোড়া, হরিণদের আমরা আলটামিরাতেও দেখেছি। এখানে অতিরিক্ত হিসাবে দেখছি হাতি, গণ্ডার, সিংহ, বাঘ, কুমীর ইত্যাদি। মধ্যপ্রদেশের এই অঞ্চলে এককালে যে গণ্ডার, সিংহ এবং কুমীর ছিল সে কথা বলে দিচ্ছে ভীমবেটকার এই সব চিত্রকলা। হাতি,

বাঘ, কুকুব ইত্যাদিরা আজও এ অঞ্চলে দেখা যায়, কিন্তু গণ্ডার, সিংহ, কুমীর নয়।

শিকাব দৃশ্যে অশ্বাবোহী চিত্রিত হযেছে বহুবাব। তার মানে ভীমবেটকার মানুষেরা ঘোড়াকে পোয মানিযেছিল বহুকাল আগে। তাবা পোয মানিযেছিল হাতিকেও। ধর্মীয় প্রতীক এবং পবিত্র চিহ্ন হিসাবে বাব বার আঁকা হযেছে বেশ কিছু প্রতীকী চিত্র। চিত্রগুলি আঁকা হযেছে মূলতঃ লাল এবং সাদা বঙ দিয়ে। অনেকগুলি ছবিতেই ব্যবহৃত হযেছে, লাল সাদা ছাড়া আবও দুটি বঙ—সবুজ এবং হলুদ। সব মিলিযে বেশ কিছুটা জমজমাট চিত্রকলাব সমারোহ ভীমবেটকার প্রাগৈতিহাসিক গুহাগুলিতে।

ভীমবেটকাব ছবিগুলিব বয়স ২২০০ বছব থেকে ৩০,০০০ বছব কিংবা তারও বেশি। কিন্তু সব ছবিব রঙই আজও গভীব এবং উজ্জ্বল। এটা খুবই আশ্চর্যেব। আশ্চর্যবকমের উজ্জ্বল এবং অমলিন এই সব রঙেব একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও দিযেছেন পণ্ডিতেবা। বিশেষ কবে, ১০,০০০ বছব কিংবা তারও বেশি পুবানো চিত্রেব বঙ আজও এমন উজ্জ্বল থাকল কী কবে তাব ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। ভীমবেটকাব গুহা-মানবেবা বঙ বানাতে ব্যবহার কবেছিল ম্যাঙ্গানিজ [Manganese], লৌহ আকবিক [Haemalite], নবম লাল-পাথব এবং কাঠ-কয়লা। কোথাও কোথাও বংয়ে মেশানো হযেছে পশুব চর্বি, গাছেব পাতাব রস। আদি মানবেরা বঙ বানানোয এমনই পটু হয়েছিল যে, দশ-বিশ হাজার বছব পবেও সে সব বঙ সমান ঝলমলে। চিত্রগুলি দেখলে মনে হয যেন সামান্য কযেকদিন আগে চিত্রগুলি আঁকা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিন্ধ্যপর্বতেব এই অঞ্চলেব পাথবে এক বকম বাসায়নিক পদার্থ আছে, এক ধরনেব অক্সাইড। এই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া হওয়াব ফলেই পুরাতন বঙের এমন জেল্লা। চিত্রগুলি দেখে মনে হয সদ্য আঁকা। আরও বড় কথা হল, বেশির ভাগ গুহাই উন্মুক্ত। রোদ লাগছে, হাওয়া খেলছে, কোনও কোনও গুহাতে বৃষ্টির ছাঁটও ঢুকছে, তবুও বঙ অটুট এবং তাও ১০/২০ হাজার বছর ধবে। পৃথিবীব প্রাচীনতম চিত্রকলা রযেছে ভীমবেটকায়। কোন কোন গুহায় প্রাচীন চিত্রের উপর আঁকা হয়েছে নবীনতর বা নবীনতম চিত্র। অর্থাৎ একই ক্যানভাসে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন সমযে ছবি এঁকেছেন। সে ক্ষেত্রেও নবীনতম চিত্রের বয়স কম করে হাজার পাঁচেক বছর। সে রঙও ১০/২০ হাজাব বছবের পুরানো রঙের মতই উজ্জ্বল। ভীমবেটকায় আদিম অধিবাসীবা রঙ বানানোব যাদুকব ছিলেন। তাঁবা এমন রঙ বানাতে জানতেন যে, সে রঙ ১০/২০ হাজার বছর ধরে নতুনেব মতো উজ্জ্বল থাকতো। অবশ্য তাঁদেব বঙের এই দীর্ঘকালীন স্থায়িত্বের পিছনে বিন্ধ্যপর্বতমালার ওই অঞ্চলের পাথরের গুণাবলীর অবদানও অনেকটাই।

ভীমবেটকার চিত্রকলাগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে সাতটি পর্যাযে বিভক্ত করা হয়। পুরাতাত্ত্বিকদের কবা সেই পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল। ওই পর্যায়গুলিই বলে দেয় সভ্যতাব বিবর্তনের ইতিহাসের অনেকটাই। তবে একটা প্রশ্ন

থেকেই যায়, ভীমবেটকার আদিম মানুষেরা কারা? তাদের সঙ্গে ক্রোম্যানিয়ন মানুষদের কোনও সম্পর্ক ছিল কি? ভীমবেটকাব মানুষদের সঙ্গে হবপ্পার মানুষদের সম্পর্কই বা কতটা? রামাপিথেকাসেব দেশ ভারতবর্ষে সভ্যতাব বিবর্তনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস অবশ্যই পাওয়ার কথা। সে ইতিহাসেব উপযুক্ত প্রত্ননিদর্শন যথেষ্ট সংখ্যায় না পাওয়ার কারণ হল আমাদের ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদেব ব্যর্থতা। ভীমবেটকা কিন্তু সেই ইতিহাসেব অনেকটাই পূরণ কবে দিতে পাবে। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর মানব সভ্যতাব বিবর্তনের ইতিহাসকে অনেকটাই সমৃদ্ধ কবতে পারে ভীমবেটকা। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসকে একটা পূর্ণাঙ্গ এবং যৌক্তিক রূপ দিতে পারে ভীমবেটকাব চিত্রকলা। ভারতবর্ষেব বামাপিথেকাসেব বংশধবদেব বিবর্তনের একটা ধাবাবাহিক ইতিহাস তৈরি করা যেতে পাবে ভীমবেটকাব ওই সব চিত্রকলাব সঠিক মূল্যাযণেব মাধ্যমে।

এবাব ভীমবেটকাব চিত্রকলাগুলিব কালানুক্রমিক বিভাজন নিযে আলোচনায আসা যাক। কালানুসাবে চিত্রগুলিব সাতটি পর্যায।

(১) প্রথম পর্যায় ঃ ভীমবেটকাব বেশ কিছু চিত্রকলা আছে যেগুলি আঁকা হযেছে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগেব শেষেব দিকে অর্থাৎ ম্যাগডেলেনিযান যুগে। সময নির্দেশ কবা হযেছে ৩০,০০০ বছব কিংবা তাবও বেশি। অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগের [Upper Paleolithic Period] এই সব ছবিতে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীবা এঁকেছেন বাইসন, বাঘ এবং গণ্ডাব। ব্যবহাব কবেছেন সবুজ ও ঘন লাল বঙ। এই সব ছবি যে সময আঁকা হয়েছিল তখন মধ্যপ্রদেশেব ওই সব অঞ্চলে গণ্ডাব বাস কবতো। এখন সাবা ভাবতে গণ্ডার রযেছে আসামের কাজিরাঙ্গায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাডায। সুতরাং মধ্যপ্রদেশেব বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চল থেকে গণ্ডাব বিলুপ্ত হওযাব আগেই আঁকা হয়েছিল ওই সব ছবি। এগুলিব বয়স আলটামিবার গুহাচিত্রগুলিব থেকেও বেশি। কোন কোনও মতে অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের শেষ হযেছে ৪০,০০০ বছব আগে। সে বিচাবে ভীমবেটকাব এই ছবিগুলির বযস ৪০,০০০ বছবও হতে পাবে।

(২) দ্বিতীয় পর্যায় ঃ এই পর্যাযেব ছবিগুলি আঁকা হযেছে মধ্য-প্রস্তর যুগে [Mesolithic Age]। এই ছবিগুলিব বযস ২৫,০০০ থেকে ১০,০০০ বছর অবধি। এই পর্যাযেব বেশিব ভাগ ছবিই আঁকা হযেছে ১১/১২ হাজাব বছর আগে। কিছু কিছু ছবি আছে যাদের বযস ১৫/২০ হাজাব বছর। এই পর্যাযেব ছবির পাত্রপাত্রীদের আকাব অনেকটাই ছোট। আকাব-আকৃতি বোঝানো হযেছে বলিষ্ঠ রেখা দিয়ে। বন্য পশু ছাড়াও ছবিতে রয়েছে বহু মানুষ এবং পশু শিকারের দৃশ্য। মানুষের হাতে আছে বর্শা, মাথা সরু করা লাঠি এবং তীর ধনুক। শিকার দৃশ্য ছাডাও আঁকা হয়েছে সমবেত নৃত্য, পাখির ঝাঁক, বাদ্যযন্ত্র, মা ও শিশু, গর্ভবতী নারী, মৃত পশু বহন, সমবেত পান-দৃশ্য এবং মৃতদেহ সমাহিত করাব দৃশ্য। সহজেই বোঝা যায়, এই পর্যায়ে শিল্পীরা

আধুনিক হ্যে উঠেছেন। এই সময় চাব রকমের রঙই ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) তৃতীয় পর্যায় ঃ এই পর্যাযের ছবিগুলিব বযস নয় থেকে দশ হাজাব বছব। এগুলি নব্য-প্রস্তব যুগে আঁকা। এই পর্যাযের শেযেব দিকে আঁকা ছবিগুলি মৃৎপাত্রেব গাযে আঁকা অলঙ্কবণেব অনুরূপ। এই সময ভীমবেটকার অধিবাসীবা মালবের প্রাচীন কৃষিজীবীদেব সংস্পর্শে আসে এবং তাবা কিছু কিছু চাযবাসও শুরু কবে। এবই প্রতিফলন দেখা যায ৯/১০ হাজাব বছবের প্রাচীন এই পর্যাযেব চিত্রকলায়।

(৪) চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় ঃ এই দুটি পর্যায ৯০০০ থেকে ৫০০০ বছব পুবানো। ইতিহাসেব প্রথম দিকে আঁকা হয়েছে এই ছবিগুলি। এই সমযেব শেষেব দিকে হবপ্পা, মিশব, মেসোপটেমিযা সভ্যতাব রমবমা শুরু হযেছে। ভীমবেটকাব শিল্পীরাও তাঁদেব চিত্রকলায ব্যবহাব কবেছেন লাল, সাদা, ও হলদে রঙ। ছবির মানও অনেক উঁচু হয়েছে এই সময়ে। চিত্রে পাত্র-পাত্রীব আকাব-আকৃতিও অনেকটাই আনুপাতিক হয়েছে এই কালে। শিকাব দৃশ্য বেশ কম হয়ে গেছে, ধর্মীয় প্রতীকেব উপস্থাপনা অনেক বেড়ে গেছে চিত্রগুলিতে। অশ্বাবোহীদেব যেমন আঁকা হযেছে, তেমনি আঁকা হয়েছে পোষাকপবা মানুয। এই সমযেব কিছু ছবিতে সম্ভবত ব্যবহৃত হয়েছে ওই কালেব কিছু লিপি, যা অবশ্য দুর্বোধ্য এবং অপাঠ্য। তবে পুবাতত্ত্ববিদবা এগুলি খুঁটিযে দেখছেন ওগুলি সত্যিসত্যি লিপি কিনা। ধর্মীয চিত্রগুলিতে আছে যক্ষ, বৃক্ষ-দেবতা এবং যাদুশক্তি সম্পন্ন আকাশ-বথ। এই সমযেব ছবিগুলি মূলত তাম্রাশ্ম [Chalcolithic] যুগেব।

(৫) ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্যায় ঃ এই পর্যায়েব ছবিগুলি অনেক আধুনিক। এদেব বয়সকাল ২০০০ থেকে ২৫০০ বছব। চিত্রগুলিতে জ্যামিতিক আকাব-আকৃতি বয়েছে। সবল বেখাগুলিও বেশ বলিষ্ঠ। ছবিগুলি আঁকাও হয়েছে বেশ ভাবনা-চিন্তা কবে। কিন্তু এই চিত্রগুলিব অঙ্কন-শৈলী অত্যন্ত ম্যাড়ম্যাড়ে এবং শৈল্পিক সুষমা-বিহীন। যে সুষমা, যে স্বতঃস্ফূর্ততা, যে শৈল্পিকতা, যে সৌন্দর্যবোধ ভীমবেটকাব প্রাগৈতিহাসিক পর্যাযগুলিতে দেখা গেছে, ইতিহাসের কালের এই পর্যাযেব চিত্রগুলিতে তা অনুপস্থিত। এই পর্যাযেব ছবিগুলি দেখে মনে হবে যে, এর শিল্পীবা যেন ভীমবেটকাব সেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীদেব উত্তবসূবিই নয়। হঠাৎই যেন শিল্প-নৈপুণ্যে ঘাটতি ঘটেছে লক্ষ বছবেব পুবাতন ভীমবেটকায। তবে এই সব ছবিতে সবুজ, হলুদ, খযেবি এবং লাল বং বহুল ব্যবহৃত।

ভীমবেটকাব প্রথম গুহায় বযেছে সাদা বঙে আঁকা একটা হাতিব ছবি। তিন নম্বব গুহা বেশ বড়সড়। এটি সভাগৃহ ছিল। চার নম্বর গুহা থেকে ছবিব শুরু। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু গুহা আছে যেগুলিতে ছবি নেই। আট নম্বর গুহা থেকেই চিত্রকলাব প্রাচুর্য। নয় নম্বর গুহায প্রায় একশো জন মানুষ একসঙ্গে থাকতে পাবতো। এখানে বযেছে ঘোড়ায চড়া এক আদিম মানুষের চিত্র। সাধারণতঃ দেহবেখা দিযেই মানুষ আঁকা হয়েছে

ভীমবেটকায়। কিন্তু ঘোড়ায় চড়া ওই মানুষটির দেহাবযবের পুরোটাই রঙ দিয়ে ভরানো। সম্ভবত ইনি দলপতি। এঁর মাথায় পাগড়ি, হাতে পাথরের অস্ত্র। তাঁর সামনের মানুষটির পাগড়ি আবার অন্য রকম। এই মানুষটি সম্ভবত দলপতির দেহরক্ষী।

সমস্ত শিকার দৃশ্যেই ঘোড়ায় চড়া মানুষের ছবি বয়েছে ভীমবেটকায়। আবার হাতি চড়ার দৃশ্যও রয়েছে কোন কোন ছবিতে। অর্থাৎ ভীমবেটকার লোকেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই হাতি এবং ঘোড়া দুই-ই পোষ মানিয়েছিল এবং তারা রীতিমত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতো। প্রাগৈতিহাসিক চিত্রগুলিব অধিকাংশতেই রয়েছে ঘোড়ায় চড়ে শিকারের দৃশ্য। অথচ এদের অনেক পরবর্তীকালে হরপ্পাব লোকেরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতো না বলেই অসভ্য, বর্বব, বিদেশী, যাযাবর আর্যদেব কাছে যুদ্ধে হেরে গিযেছিল। হবপ্পা তথা সিন্ধু-সভ্যতাব পতন ঘটেছিল আর্যদেব আক্রমণে। ভীমবেটকার অশ্বারোহণ দৃশ্য তাই পণ্ডিতদেব ভাবায়। আবাব প্রাগৈতিহাসিক কালে হাতি পোষ মানানোর ব্যাপাবটাও অতি আশ্চর্যেব। ১২/১৩ হাজাব বছব কিংবা তারও আগে শিকাবেব প্রয়োজনে হাতি পোষমানানোব ব্যাপাবটা ঐতিহাসিকদেব কাছেও বিস্ময়কর।

ভীমবেটকায় সাড়ে সাতশোব বেশি গুহাব সাতশোরও বেশি চিত্রকলার কথা এখানে আলোচনা কবা অসম্ভব। তবে এই সব গুহা এবং তাদের চিত্রকলাসমূহ মানব সভ্যতা বিকাশেব অন্যতম দলিল। শুধু তাই নয ভারতেব সভ্যতা বিকাশেব ইতিহাসেবও অতুলনীয় দলিল এই সব চিত্রকলা। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হযেছিল ভাবতবর্ষেই। এব জোবদাব প্রমাণ হল ভীমবেটকার গুহাচিত্রসমূহ। অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগেব ছবিগুলিতে বন্যজন্তুগুলিব আকাব বেশ বড়। মধ্য প্রস্তর যুগে [Mesolithic Age] মানুষ ও জন্তুব চিত্রগুলি কিন্তু বেশ আনুপাতিক। আবার প্রথম দিকের মানুষেরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে পাথর, মাথা-সূঁচালো করা লাঠি, বর্শা-জাতীয় কিছু। মধ্য-প্রস্তর যুগের ছবিগুলিতে মানুষের হাতে উঠে এসেছে তীর-ধনুক। নব্য-প্রস্তর যুগেব ছবিগুলিতে এসেছে কৃষিকার্যেব দৃশ্য। এই দৃশ্য রয়েছে তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের ছবিতেও। অর্থাৎ ধীবে ধীবে সভ্য হয়ে ওঠার অনন্য প্রামাণিক দলিল হল ভীমবেটকার বিভিন্ন যুগে আঁকা বিভিন্ন ছবি। ভীমবেটকা মানব সভ্যতার বিবর্তনের অনন্য দলিল। ভীমবেটকাব প্রায সাড়ে সাতশো গুহাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও অসম্পূর্ণ। এগুলিব পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজও প্রকাশিত হযনি। এখন প্রয়োজন ভীমবেটকার বিশদ গবেষণা, নিবপেক্ষ পবীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এব বিস্তারিত বিবরণীর প্রকাশ।

আলটামিরা ও ভীমবেটকা ছেড়ে আবাব ফিবে আসি মানুষের বিবর্তনের কথায। আগেই বলেছি; অস্ট্রালোপিথেকাস [Australopithecus] পৃথিবীতে এসেছিল বিশ লক্ষ বছর আগে। প্রকৃত মানুষ [Homo-sapiens] এবং অস্ট্রালোপিথেকাসদের মধ্যবর্তী সময়ে মানবজাতীয় জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল বিশ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বছর পূর্বে। পাঁচলক্ষ বছর আগে ঋজুভাবে চলা-ফেরা করতে পারে [Homo-

erectus] এমন মানবদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল তা প্রমাণিত। এর পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে নিয়ানডাবথাল মানুষেরা [Neanderthal Men]। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে নিযানডারথাল মানুষেরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়। তার জায়গায় আসে ক্রোম্যানিযন [Cromagnon] জাতির মানুষ। এই ক্রোম্যানিয়ন জাতির মানুষ থেকেই নাকি পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহের উদ্ভব।

এখনকাব নৃতত্ত্ববিদরা একমত যে, পৃথিবীতে বর্তমান যত জাতি বিদ্যমান, তারা সবাই ক্রোম্যানিয়ন থেকেই উদ্ভূত। তাঁদের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই একই বর্গ [Genus] ও প্রজাতি [Species] হতে উৎপন্ন। তবে বৈশিষ্ট্যমূলক আবযবিক পার্থক্য অনুসাবে তাদের তিনটি মহাজাতিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ (১) ককাসয়েড [Caucasoid], (২) মঙ্গোলয়েড [Mongoloid] ও (৩) নিগ্রয়েড [Negroid]। এদেব আবার বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ কবা হয়েছে। নিচের তালিকায সেই বিভাগগুলি দেখানো হল ঃ

ককাসয়েড	মঙ্গোলয়েড	নিগ্রয়েড
(১) নর্ডিক	(১) এশিয়াটিক	(১) আফ্রিকান
(২) মেডিটেরেনিযান	(২) ওশিয়ানিক	(২) ওশিযানিক
(৩) আলপাইন	(৩) আমেরিকান ইন্ডিয়ান	(৩) নিগ্রিটো

উপবেব মহাজাতি বিভাজনে 'অণু-অস্ট্রালয়েড' বা 'প্রোটো-অস্ট্রালযেড'-দেব কথা বলা নেই। তাই উপবের বিভাজন নিযে অনেক বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। নানাভাবে প্রমাণ কবা যায়, ভাবতের আদিম অধিবাসীরা 'প্রোটো-অস্ট্রালযেড' বা 'অণু-অস্ট্রালযেড'। এক সময় এরা উত্তর ভারত থেকে ইস্টার দ্বীপ অবধি পৌঁছে যায়। ৩০,০০০ বছর আগে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে পৌঁছেছিল। সেটা ছিল অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগেব ব্যাপার। নানাভাবেই প্রমাণ করা যায় যে, 'অস্ট্রালযেড' একটা মহাজাতি। সুতরাং 'অস্ট্রালয়েড' বা 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' একটা মহাজাতি। তাই অস্ট্রালয়েড বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েডকে একটি মহাজাতি ধবলে মোট মহাজাতির সংখ্যা হয চারটি — (১) নিগ্রয়েড, (২) ককাসয়েড, (৩) মঙ্গোলয়েড এবং (৪) অস্ট্রালযেড। হযতো এমনও হতে পারে যে, প্রথম তিনটি মহাজাতি উদ্ভূত হয়েছে ক্রোম্যানিয়ন মানব জাতি থেকে, আব অস্ট্রালয়েডরা এসেছে ভারতের কোন আদি মানবগোষ্ঠী থেকে, যাদেব বিবর্তন হয়েছে ভারতবর্ষেরই মাটিতে—রামাপিথেকাসের দেশ ভাবতবর্ষেই যার আদি উদ্ভব। পণ্ডিতেবা অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত মানবেন না। তবে, একালের কিছু নৃতাত্ত্বিক ভারত ও শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দ্রাবিড় ও অনুরূপ নৃজাতির গঠন সাদৃশ্য ইত্যাদি দেখে, সিদ্ধান্ত করেছেন যে এরা নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড। ভাবতের দেশজ অধিবাসীরা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড এবং দ্রাবিড় বা অনুরূপ জাতিগুলি অনেকাংশে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতি। অনেকেই বলছেন, দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে

নিগ্রোয়েডদের কোনও সম্পর্ক নেই। আদি ভাবতবাসীবা ছিল প্রোটো-অস্ট্রালয়েড। এরাই বিবর্তিত হয়ে দ্রাবিড় জাতিব সৃষ্টি কবে। হবপ্পা সভ্যতার মূল স্থপতি ছিল এই দ্রাবিড় জাতিই। সে কথায় পরে আসছি।

অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে শুধু মাত্র আয়ুধ নির্মাণেব মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেদেব শক্তিশালী করে তুলেছিল তাই নয। তাবা নিজেদেব আবো শক্তিমান কবতে পেবেছিল আগুনের ব্যবহাব শিখে যাওয়াব মধ্য দিযে। আগুন তাদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাতো, বন্য পশুদের হাত থেকে রক্ষা কবতো, মাংস ঝলসানোব কাজে লাগতো। আগুন তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতেও শিখিযেছিল। আগুন জ্বালানো শিখতে মানুষেব বেশ কিছুদিন সময লাগলেও আগুনেব ব্যবহাব তাবা বহুকাল আগে থেকেই কবতে শিখেছিল। প্রত্নোপলীয় যুগেব মানুষেবা আগুন সংগ্রহ কবতো আগ্নেযগিবিব জ্বালামুখ থেকে কিংবা গাছে গাছে ঘর্ষণেব দাবানল থেকে। সেই আগুনকে তাবা সংবক্ষণ কবত, অগ্নিকুণ্ডে কাঠ যোগান দিযে। মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল আগুন ব্যবহাব কবতে জানাব অনেকটাই পবেই। নিযানডাবথাল মানুষবা আগুনের ব্যবহাব জানতো, তবে তাবা আগুন জ্বালাতে জানতো কি না তা অজানা। মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল প্রায ৪০,০০০ বছব আগে। এই সময ক্রোম্যানিযন মানুষেবা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয। নিযানডাবথাল মানুষেবা আয়ুধ নির্মাণ কবতে এবং আগুন ব্যবহাব কবতে শিখেছিল খুব ভালভাবেই। তাদেব মধ্যে ধর্মেব উন্মেষও ঘটেছিল। মৃতদেহ তাবা সমাধিস্থ কবত এবং মৃত দেহটিব সঙ্গে তাব ব্যবহৃত আয়ুধগুলিও সমাধিস্থ কবা হত। আগুন তাদেব সমাজ জীবনে কতটা প্রভাব ফেলতো তাব বর্ণনা দিযেছেন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ কাবলটন এস কুন। তিনি বলছেন ঃ

"But wholly apart from warmth, fire is vital to the social life of human beings After the sun has set, when shadows have faded and darkness is gathering, the air is still, the earth-smells rise and the crises of night-prowlers burst out of the forest, then there is nothing like a bright crackling fire to dispel anxiety and fear. This is the time when the whole band comes together. Teeth and whites of eye-balls gleam. Old hunts are acted upon and new ones planned. In good weather men and women will dance in firelight, some times until dawn. It is hard to imagine an intimate group of human beings living without the social cohesion that firelight gives."

আগুন আদিম মানুষের জীবনে এনেছিল সঙ্ঘবদ্ধতা, এনেছিল তাদের কৃষ্টির

বিকাশ, সভ্যতার বিবর্তন। শেষ তুষারযুগ [Wurm] এসেছিল ১,০০,০০০ বছর আগে। তার বরফ গলতে থাকে ৪০,০০০ বছর আগে। আগেই বলেছি, তুষার যুগ কেন পৃথিবীতে আসে তাব সঠিক কারণ অজানা। তবে অনেকে কারণ হিসাবে পৃথিবীর কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা, সৌর-কলঙ্কজনিত সৌরতাপের পরিবর্তন, পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে অক্ষরেখার স্থিতির পরিবর্তন ইত্যাদির কথা বলেন। তবে সঠিক কারণ আজও বলা যায নি। যাইহোক, তুষারযুগের শেষেই আসে ক্রোম্যানিয়ন মানবগোষ্ঠী। এরা সূচ দিয়ে চামড়া সেলাই করে পোষাক বানিয়ে তা দিযে নিজেদের দেহ ঢাকতো। শীতলতা থেকে নিজের দেহ রক্ষা করতো। হাড়ের সূচ তারা তৈরি করেছিল প্রায় ৩৫,০০০ বছর আগে। বলা হয়, নিয়ানডারথালরা এই ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নবোপলীয় যুগের শুরু অবধি অর্থাৎ ১০,০০০ বছর আগে অবধি মানুষকে খাদ্যের জন্য নির্ভব করতে হয়েছে শিকাবেব উপর। নবপোলীয় যুগেই মানুষ চাষবাস শুরু কবে এবং ক্রমশঃ শিকাবেব উপর নির্ভবশীলতাব শেষ হয়।

অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগটা ছিল মানুষের ইতিহাসে আবিষ্কারের যুগ। এই যুগের মানুষ পশুশিকারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র থেকে আরম্ভ করে, জীবন-চর্যার উপকরণ ও সহায়ক এমন সব জিনিস আবিষ্কার কবল, যা পূর্ববর্তী যুগগুলিব মানুষদের কাছে অজানা ছিল। তাদের কল্পনাতেও এসব জিনিস ছিল না কখনও। এই সব জিনিষেব মধ্যে ছিল — পাতলা দুমুখো ছুবি [Blades], হারপুন [Harpoons], খোদন করাব যন্ত্র [Burins], বাণমুখ [Arrow-heads], সূচ [Needles], চামড়ার পোষাক, বর্শা-নিক্ষেপক [Spear-throwers], ধনুক [Bow] ইত্যাদি। এইগুলির প্রতিটি জিনিসই তাব জীবনযাত্রায এনেছিল যুগান্তকারী পরিবর্তন। এই সময় এক একটা গোষ্ঠী এক একটা 'টোটেম' [Totem] গ্রহণ করা শুরু করে। 'টোটেম' হল কোন গোষ্ঠীর রক্ষক স্বরূপ কোন শুভসাধক পরমাত্মা। এই টোটেমকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধা করতো এবং কখনও তাকে বিনাশ করতো না। কোনও গোষ্ঠীর লোকজন তাদের নিজস্ব টোটেম বৃক্ষের ফল বা টোটেম হিসাবে স্বীকৃত প্রাণীর মাংস কখনও খেত না। প্রতি গোষ্ঠীর মধ্যে এমন একজন বিশেষজ্ঞ থাকতো, যে নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার দ্বারা দলের সেই শুভকারী পরমাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারতো বলে বিশ্বাস করতো ওই দলের লোকজন। এই সংযোগ স্থাপনের ফলে নাকি দলের শুভ সাধন করা সম্ভব হত। এই সব বিশেষজ্ঞরা অভিহিত হত নানা নামে, যেমন, শমন [Shaman], বৈগা [Baiga] ইত্যাদি। এরা কেবল টোটেমকেই প্রসন্ন করতো না, নানা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করতো। দু'রকম পদ্ধতিতে করা হত ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া — (১) সদৃশ বিধানী [Mimetic] এবং (২) সংস্পর্শবিধানী [Contagious]। স্পেন, ফ্রান্স ইতালী এবং ভারতে পাওয়া পর্যতগুহার চিত্রকলাগুলি সম্ভবত ওই সব ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হত। এরা যে শুধু শুভ সাধন করতো এবং

টোটেমের প্রসন্নতার ব্যবস্থা করতো তা নয়, অসুখ সারানোর কাজও এরা করতো। দলের লোকদের অসুখ করলে তারা এদের কাছেই আসত। কোনও গোষ্ঠীর শমন বা বৈগা সে দলের চিকিৎসকও। জগতের আদি পেশা হচ্ছে শমন বা বৈগার অনুসৃত চিকিৎসা-পদ্ধতি।

অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে মানুষ আগুনে ঝলসানো মাংস খেতো। সেলাই করা চামড়ার পোষাক পরতো। সিদ্ধ কবে খাওয়ার ব্যাপারটা কৃষি উদ্ভাবনের আগে তারা রপ্ত করতে পারে নি। জন্তুব চর্বি মিশিযে গেরি-মাটি দিয়ে তারা প্রসাধন করতেও শিখেছিল। এই সময় মানুষেরা এসে মিলত আয়ুধ সংগ্রহেব জন্য অস্ত্র কারখানায়। অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের এই বকম আয়ুধ কারখানা অনেক জায়গায পাওয়া গেছে। আয়ুধ-নির্মাতা নিজে শিকাবে বেব হতে পাবতো না। তাই তাব বা তাদের খাবার ও অন্যান্য প্রযোজনীয় দ্রব্য যোগান দিত আযুধ ক্রেতারা। এইভাবে দ্রব্যেব বিনিমযে কেনাবেচা চালু হয। আযুধ কাবখানাগুলিই ছিল প্রত্নোপলীয যুগের মানুষেব মিলন স্থান। এখানেই এক গোষ্ঠীব মানুষেব সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীব মানুষের দেখা হত এবং তাদেব মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হত। পবস্পব পবস্পবকে নিজেদেব ডেরায় আমন্ত্রণ জানাতো। এইভাবে এক ব্যক্তিব পরিবাবেব সঙ্গে অপব ব্যক্তিব পবিবারের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হত। এব ফলে সমাজ-বিন্যাসেব সূচনা হয অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগে।

আদিম সমাজেব পরিবাব গঠিত হত পিতামাতা ও অপ্রাপ্তবযস্ক সন্তানদেব নিযে। পিতা সন্তানকে উপদেশ দিতেন শিকারের কৌশল সম্বন্ধে। প্রাপ্তবযস্ক পুত্রেবা শিকারে পিতাব সহযোগী হত। মেযেবা ফলমূল ইত্যাদি খাদ্য সংগ্রহ কবতো এবং রাত্রিতে পুরুষদের সঙ্গে নাচগানে যোগ দিত। খাদ্য-সংবক্ষণ কবতে শেখাব পর সবদিন তাদের শিকাবে বেব হওয়ার দবকাব হত না। সেই অবসর সমযটা তাবা তাদের অনুভূতিকে বাস্তবাযিত কবতো, ছবি আঁকতো অন্ধকাব গুহায। স্পেনের আলটামিরা এবং ভারতের ভীমবেটকা তারই ফলশ্রুতি।

সুতরাং অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগে মোটামুটি একটা পরিবার ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছিল। জীবন-চর্যাব সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সে সংক্রান্ত কিছু রীতিনীতিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। জড়েব মধ্যেও প্রাণ আছে এই ধারণাব বশবর্তী হয়ে তারা 'টোটেম' নির্দিষ্ট করেছিল। আয়ুধ নির্মাতা, শমন বা বৈগা, চিত্রকর ইত্যাদিরা স্থান পেযেছিল তাদেব সমাজ বিন্যাসে। বলা হচ্ছে, এই সময়েই প্রায় স্থির হয়ে গিয়েছিল নিষিদ্ধ যৌনমিলনেব সংজ্ঞা। এই সময় মাতার সঙ্গে পুত্রের, পিতার সঙ্গে কন্যার এবং ভাইয়ের সঙ্গে বোনের যৌনমিলন নিষিদ্ধ বলেই ধরা হত। তাদের নান্দনিক অনুভূতির বিকাশও ঘটেছিল এবং তারা ছবি আঁকতো পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় নিজেদের বাসস্থানে কিংবা তাব আশপাশে।

প্রত্নোপলীয় যুগের নানা নিদর্শন ভাবতের অনেক জায়গায় আবিস্কৃত হলেও

ভারতবর্ষে প্রত্নোপলীয় যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস আজও তৈরি করা হয় নি। তবে ভাবতে প্রত্নোপলীয, অন্তিম প্রত্নোপলীয়, এবং নবোপলীয় যুগের আয়ুধসমূহ ও অন্যান্য প্রত্নানিদর্শন বহুল পবিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব আবিষ্কার থেকে বোঝা যায যে, ভাবতেব বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় ও পরে তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত মানব সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল। ১৮৬৩ সাল থেকে ভাবতেব নানা জায়গায প্রত্নোপলীয় যুগেব আয়ুধসমূহ আবিষ্কৃত হযে আসছে।

ভাবতে প্রত্নোপলীয আয়ুধ পাওয়া গেছে মাদ্রাজ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বাজস্থানেব বহু জায়গায়, ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলায়, বিপাশা ও বনগঙ্গা উপত্যকায, কৃষ্ণা, সবরমতী, মহি, ওরসংগ ও নর্মদা নদীসমূহের উপত্যকায়, উত্তব প্রদেশেব বিহংগ নদীর অববাহিকায় ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে তমলুকেব নাটশালে, মেদিনীপুরেব ঝাড়গ্রামে। বিলাসপুব, দৌলতপুর, দেহবা, গুলাব ও নালাগড় ছিল প্রত্নোপলীয যুগের সংস্কৃতিব বিশিষ্ট কেন্দ্র। গুলারে পাঁচটি স্তব আবিষ্কৃত হযেছে, তাব মধ্যে উপবেব চাবটি স্তবে আয়ুধ পাওয়া গেছে। কুবনুল জেলাব বিল্লসুগম গুহাপুঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব গুহাতে পাওয়া গেছে অশ্মীভূত জীবাস্থি ও অস্থিনির্মিত আয়ুধ। প্রত্নোপলীয যুগের কেন্দ্রসমূহে যে সকল আয়ুধ পাওয়া গেছে তাদেব মধ্যে আছে হাত কুঠার, কাটবাব যন্ত্র, নুড়ির তৈবি আয়ুধ, চাঁচবাব বা ঘসবার যন্ত্রফলক ইত্যাদি। অধিকাংশ আয়ুধই তৈরি হয়েছে কোযার্টজাইট পাথবে। প্রত্নোপলীয যুগেব কৃষ্টিব ধাবক মানুষদেব অস্তিত্ব বহুকাল আগেই লুপ্ত হযে গেছে। ক্রোম্যানিযনবা এসেছে চল্লিশ হাজাব বছব আগে। তখন অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগ চলছে। ভাবতের প্রত্নোপলীয যুগেব মানুষেরা নদীর ধারে বা নদীর নিকটে বাস কবত। ঝবনাব ধারেব পাহাড়ের গুহাতে কিংবা পাহাড়েব উপব ছাউনি তৈরি করেও তারা বাস করেছে। ভাবতবর্ষে বহুল. বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অনেক প্রত্নোপলীয যুগের আয়ুধ তথা কৃষ্টিব নিদর্শন পাওযা গেলেও আমাদেব প্রত্নোপলীয় কৃষ্টির একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও তৈবি কবা হয় নি। বহু আবিষ্কাব এখনও বাকি। তবে এটা নিশ্চিত যে, ভাবতেব বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় ও তারপরে তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত সভ্যতাব একটা ধাবাবাহিকতা বিদ্যামান ছিল। প্রত্নোপলীয কৃষ্টি পেরিয়ে এসেছিল নবোপলীয সভ্যতা এবং তার থেকেই আসে হরপ্পা সভ্যতা। কিন্তু হরপ্পাব নগর সভ্যতাব সৃষ্টি কীভাবে হল, তা অবশ্যই পণ্ডিতদের আজও ভাবাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গেও আমরা প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয যুগ অবধি কৃষ্টিব বিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা দেখতে পাই। প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ বাংলার নানা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে। আবও পাওয়াব সম্ভাবনাও বাতিল করা হচ্ছে না। প্রত্নোপলীয় আয়ুধ তথা কৃষ্টিব নিদর্শন পাওযা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অরগণ্ডা, সলদা, অষ্টজুড়ি, শহাবি, ভগবন্ধ, কুকবাধুপি, ঝাড়গ্রাম ও চিলকিগড় প্রভৃতি স্থানে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাব

তমলুকের কাছে নাটশাল অঞ্চলে, বাঁকুড়ার কাল্লা লালবাজার, মানোহর, বন আসুরিয়া, শহরজোড়া, কাঁকড়াদাঁড়া, বাউড়িডাঙ্গা, বিশিণ্ডা, শুশুনিয়া ও শিলাবতী নদীর প্রধান শাখা জয়পাণ্ডা নদীর অববাহিকায়, বর্ধমান জেলার গোপালপুব সাতঘনিহা, বিলগভা, সাগরডাঙ্গা, আরা ও খুরুপির জঙ্গলে। এ ছাড়া প্রত্নোপলীয় কৃষ্টির নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে বীরভূম ও পুরুলিয়ার কয়েকটি স্থানে এবং দক্ষিণ ২৪-পবগণাব দেউলপোতায। এদের মধ্যে বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার গুরুত্ব খুবই বেশি। কাবণ এখানেই আমরা পেযেছি মানুষের তৈরি আয়ুধের সঙ্গে প্লাইস্টোসীন যুগেব জীবের অশ্মীভূত কঙ্কালাস্থি। অর্থাৎ বিশ লক্ষ বছর আগের নরাকার জীবের কঙ্কালের হাড় পাওয়া গেছে এখানে। আবাব অন্তিম প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধও আমরা পেযেছি শুশুনিযায়। সুতরাং মানুষেব আবির্ভাবের দিন থেকেই শুশুনিয়ায মানুষ বাস কবছে। আবাব পশ্চিম মেদিনীপুব জেলার রামগড়ের কাছে কংসাবতী নদীব বামতটে সিজুয়াতে এক মানব চোযালেব অশ্মীভূত নিদর্শন পাওযা গেছে। আজ পর্যন্ত এশিযায প্রকৃত মানবেব অশ্মীভূত যত নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে এটাই সবচেযে প্রাচীন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে মেসোলিথিক এবং নবোপলীয় যুগেরও বহু প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মেসোলিথিক যুগের কৃষ্টির বহু নিদর্শন ১৯৫৪-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে বর্ধমান জেলাব বীবভানপুরে। তমলুকেব নাটশালেও পাওযা গেছে এই যুগের বহু প্রত্ন-নিদর্শন।

ভারতে নবোপলীয় যুগেব আযুধসমূহ পাওযা গেছে কাশ্মীবেব বুরঝাহোমে, তামিলনাড়ুর তিরনেলভেলি জেলায়, সববমতী নদীব উপতক্যায, মহাবাষ্ট্রেব খাণ্ডিবলি ও অন্যান্য স্থানে, গোদাবরী নদীব নিম্নতর অববাহিকায়, নর্মদা ও মহি নদীব উপত্যকায, মহীশূরের ব্রহ্মগিরিতে এবং বিহাব ও পশ্চিমবঙ্গেব নানা স্থানে। নবোপলীয যুগেব আয়ুধের মধ্যে আছে ঃ কুঠার, বাটালি, লাঠি, মসৃণকারী পাথব [Polishing stone], হাতুড়ির মাথা ইত্যাদি। সবই পাথরের তৈরি। এ যুগেব আয়ুধগুলি প্রত্নোপলীয যুগের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। নবোপলীয় যুগের আয়ুধ ও অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শন ভারতবর্ষের আরো যে সব জায়গায পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে আছে ঃ

উত্তর প্রদেশের হামিরপুর, এলাহাবাদ, বান্দা, লক্ষ্ণৌয়ের নাগওয়া, মধ্য ভাবতেব পান্না, মধ্য প্রদেশের সাগর জেলার গারদিমরিলা ও বলুতরাই ইত্যাদি। বিহারেব হাজাবিবাগ, পাটনা, সাঁওতাল পরগণা ও সিংভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, দার্জিলিং, নদীয়া জেলা এবং মেদিনীপুরেব ঝাঁড়গ্রাম, তমলুকের নাটশাল ইত্যাদি। আসামেব গারো ও নাগা পাহাড় এবং কাছাড় জেলা, অন্ধ্র প্রদেশের গুনটুব, বাযচুব ও ওয়ারাঙ্গল, মহীশূরের ব্যাঙ্গালোর ও চিত্রদূর্গ জেলা, তামিলনাড়ুর অনন্তপুব, বেলাবি, চিঙ্গলপেট, উত্তর আর্কট, সালেম ও তাঞ্জোর জেলা। মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশে নবোপলীয় যুগের শেষের দিকে লোকেরা পাথরের সঙ্গে তামার ব্যবহারও শিখে ফেলে। সুতবাং ভারতের বহু বিস্তৃত অঞ্চলে প্রত্নোপলীয় যুগ থেকে নবোপলীয় এবং পরে তাম্রাশ্ম

যুগ পর্যন্ত সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা বজায় ছিল।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রত্নোপলীয় যুগ বিকশিত হয়ে এসেছিল নবোপলীয় যুগ। সুবর্ণরেখা, কংসাবতী ও গন্ধেশ্বরী নদীসমূহের তট, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাব পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল, ভাগীরথী বিধৌত অঞ্চল এবং বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার অন্যত্র ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া গেছে নবোপলীয় যুগের প্রত্ন নিদর্শন। বর্ধমান জেলার পাণ্ডু-রাজার ঢিবি ও ভরতপুর এবং পূর্ব-মেদিনীপুর জেলাব তমলুকের নাটশাল অঞ্চলের তাম্রাশ্ম যুগের অব্যবহিত নিচের স্তরে আমরা তামার তৈরি দ্রব্যাদির সঙ্গে পেয়েছি নবোপলীয় যুগের কুঠার, পাথরের তৈরি কণ্ঠিমালার গুটি, ছোট ছোট পাথবেব আয়ুধ ও চিত্রাঙ্কিত সাদা মৃৎপাত্র। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে প্রত্নোপলীয় ও নবোপলীয় যুগেব কৃষ্টি পেবিয়ে তাম্রাশ্মযুগের কৃষ্টি বিকশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবেই। যে ভূখণ্ড জুড়ে তা হয়েছিল তার মোটামুটি আযতন হল— উত্তবে ময়ুবাক্ষী নদী, দক্ষিণে রূপনাবাযণ নদ, পশ্চিমে কংসাবতী নদী এবং পূর্বে ভাগীরথী।

নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ কৃষ্টিই রূপান্তবিত হযে বিকশিত হযেছিল তাম্রাশ্মযুগেব নগর-সভ্যতায়। যেহেতু তামার সবচেযে বড ভাণ্ডাব ছিল পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলেই, তা থেকে অনুমান করা হয যে, ওই বিবর্তন বাঙলা দেশেই হযেছিল এবং বাঙলাব বণিকবাই তামা সরবরাহ করতো সেই সব জাযগায যেখানে তাম্রাশ্ম সভ্যতাব বিকাশ শুরু হযেছিল। তাম্রাশ্ম যুগের নগব-সভ্যতা গড়ে ওঠার পিছনে বাঙলাব অবদান অনেকটাই। এই সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে তামা সরবরাহের কাজটা কবেছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার লোকবাই। মেদিনীপুর তথা তমলুক অঞ্চলের লোকরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাব পান্না গ্রাম থেকে মাটির ৪৫ ফুট নিচে থাকা এক সমুদ্রগামী নৌকাব কঙ্কাল বিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নবোপলীয় যুগের নৌকাই প্রমাণ করে মেদিনীপুব জেলার ওই অঞ্চলের প্রাচীন লোকদেব নৌ-পারদর্শিতার কথা।

১৯৭৬ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আগুইবানিতে মাটির ৪০ ফুট নিচে পাওয়া গেছে তামার তৈরি একটি সম্পূর্ণ পরশু [কুঠার] ও অপর একটি প্রমাণ সাইজের পরশুব ভাঙা মাথা, ছোট সাইজেব আধভাঙা আরেকটি পবশু, এগাবোখানা তামাব বালা এবং কযেকটি তামার চাঙাবি। গডবেতা থানায আগুইবানি গ্রামেব এই প্রত্ন নিদর্শনগুলিকে বলা হয়েছে হরপ্পাব পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কোন মানবগোষ্ঠীব। অনেক আগে ১৮৮৩ সালে পশ্চিম-মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার তামাজুড়ি গ্রামেও তাম্র-প্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার চাতলা গ্রামেও ওই ধরনের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৯৬৮ সালে অনুরূপ নিদর্শন পাওয়া গেছে পুরুলিয়ার কুলগড়া থানার হুড়া

গ্রামেও। অনুরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওযা গেছে পূর্ব-মধ্যপ্রদেশের রেওযা জেলার পাণ্ডিগাঁয়ে। সেখানে পাওযা যায আগুইবানিব মত একটি তামাব বালা এবং পাঁচখানা পবশু। এব থেকে পাণ্ডিতেরা অনুমান কবেন যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতাব পবিযান বা প্রচবণ [Migration] ঘটেছে ভারতেব পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে। আবার নবোপলীয যুগেব সবচেযে বড় অবদান হল কৃষিকাজেব অবতাবণা। সম্ভবত পৃথিবীতে ধান চাষ প্রথম শুরু হযেছিল এই বাঙলাদেশেই।

নবোপলীয় যুগে মানুষেব ইতিহাসে ঘটেছিল এক বিপুল বিপ্লব। এই যুগেই মানুষ শিখলো চাষ-আবাদ, পশু-পালন এবং বয়ন। তারা স্থাযী বসবাসেব মাধ্যমে প্রথমে গ্রামের এবং পরে নগরেব সৃষ্টি কবে। এব ফলে এই যুগেব মানুযেরা আবিষ্কাব কবলো নতুন নতুন বৃত্তি ও পেশা।

নবোপলীয যুগেব কৃষ্টি পৃথিবীব অনেক জাযগায উদ্ভূত হযেছিল। নবপোলীয় যুগে কৃষ্টিব সূচনা হয মেযেবা যখন ভূমিকর্ষণ কবতে শুরু কবে। জগতেব বিভিন্ন জাযগায বন্য অবস্থায যে শস্য উৎপন্ন হত, মেযেবা ভূমিকর্ষণ কবে সেই সব শস্যই উৎপন্ন কবতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুব তাঁব 'মানবসভ্যতাব নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

''সুতবাং এটা স্বাভাবিক যে গম, যব, ধান ইত্যাদিব উৎপাদন বিভিন্ন স্থানে হযেছিল এবং সেগুলি সবই স্বতন্ত্র নবোপলীয কৃষ্টিব উৎপত্তিস্থল হযে দাঁড়ায। মধ্য-প্রাচীব বন্য অবস্থায উৎপন্ন যে সব শস্য ভূমিকর্ষণ দ্বাবা মেযেবা উৎপাদন শুরু কবেছিল, তা হচ্ছে গম ও যব। আর থাইল্যাণ্ডেব মেয়েরা যে শস্য ভূমিকর্ষণ দ্বাবা উৎপন্ন কবেছিল, তা হচ্ছে ধান। সুতবাং ভূমিকর্ষণ দ্বারা ধানের উৎপাদনকে কেন্দ্র কবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিযাতেও একটা নবোপলীয বিপ্লবের সূচনা হযেছিল। থাইল্যাণ্ডেব নবোপলীয সভ্যতাব বিশদ বিববণ দিযেছেন বোনাল্ড শিলাব (Ronald Schiller)। এব বয়স নিরূপিত হযেছে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ বৎসর। সি ও সযাব (C O Sauer) তাঁব 'এগ্রিকালচাবেল অরিজিনস্ অ্যাণ্ড ডিসপারস্যাল' গ্রন্থে বলেছেন যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিযাই নবোপলীয বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাচীন লীলাকেন্দ্র ছিল। কারলো চিপোলো (Carlo Chipollo) তাঁর 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ওয়ার্লড পপুলেশন' গ্রন্থে বলেছেন যে, ধানেব চাষ বঙ্গোপসাগরেব আশপাশেব মৌসুমী বাযুপ্রবাহ অঞ্চলেই কোন জাযগায শুরু হয়েছিল। পবেশ দাশগুপ্ত তাঁর 'একস্ক্যাভেসনস অ্যাট পাণ্ডু বাজাব ঢিবি' গ্রন্থে বলেছেন যে, ধানের চায বাঙলায় শুরু হয এবং বাঙলা থেকে চীন দেশে যায।''

আবাব পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে সভ্যতার বিস্তাবেব তত্ত্ব প্রমাণিত হয প্রায ৬০০০ বছর আগে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে গম ও যব চাষ শুরু হওযা থেকে। আগেই বলেছি, ভারতেব বহু বিস্তৃত অঞ্চলে প্রত্নোপলীয যুগ থেকে নবোপলীয এবং পরে

তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত সভ্যতার একটা ধাবাবাহিকতা বজায় ছিল। বর্তমানেব আফগানিস্তানের তথা হিন্দুকুশের উত্তব অঞ্চলে প্রায ৬০০০ বছর আগেব নবোপলীয যুগেব প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সময় তাবা চাষবাস কবতে শিখেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, নবোপলীয যুগেব শেষেব দিকে ছয়-সাত হাজাব বছব আগে আফগানিস্তান, বালুচিস্তানের অনেক জাযগায়ই সর্ব প্রথম গম ও যবেব চাষ শুরু হয়। এগুলি তখন ভাবতীয নবোপলীয় সভ্যতাব অংশ বিশেষ। ভাবতেব প্রাক-হবপ্পীয সভ্যতার অবদান হল কৃষিকার্যেব আবিষ্কাব এবং গম ও যবেব চাষেব সূত্রপাত কবা।

নবোপলীয় যুগে মেয়েরা কীভাবে কৃষিকাজ উদ্ভাবন কবলো তা নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকবা সুন্দব একটা সম্ভাবনাব কথা বলেছেন। এই সম্ভাবনাব কিছুটা কল্পনাব হলেও ব্যাপাবটাব মধ্যে সত্যতা হযতো অনেকটাই রয়েছে। মেযেদেব কৃষিকাজ উদ্ভাবনেব কাহিনীটি সম্ভবত এই বকম ঃ

ভূমিকর্ষণই ছিল নবোপলীয যুগেব কৃষ্টিব বুনিযাদ। ঠিক কিভাবে ভূমিকর্ষণেব সূত্রপাত হয়েছিল, তা নিশ্চিতরূপে আমরা জানিনা। তবে নিশ্চিতরূপে যেটা আমবা বলতে পাবি, তা হচ্ছে যে, ভূমিকর্ষণ প্রথম মেযেদেব দ্বাবাই উদ্ভাবিত হযেছিল। প্রত্নোপলীয যুগের মানুষ ছিল যাযাবব প্রাণী। পেটেব জ্বালায তাকে পশুশিকাবেব জন্য নিজ ডেবা থেকে দূবে বন থেকে বনান্তরে যেতে হত। প্রথম দিকে সে নিজ বাসস্থল থেকে বেশি দূরে যেতে পাবত না। নিকটস্থ বনেই পশুশিকাবে লিপ্ত থাকত। কিন্তু অন্তিম প্রত্নোপলীয ও মেসোলিথিক যুগে তুষাবস্তূপেব পশ্চাদপসবণেব সঙ্গে মানুষ শিকাব-অভিযানের পরিধি ক্রমশ প্রসাবিত করতে শুরু কবেছিল। এই সময পুরুষেব প্রায়ই নিজ ডেরাতে ফিরতে দেরী হত। তখন মেয়েবা ক্ষুধাব তাডনায গাছেব ফল এবং ফলাভাবে বন্য অবস্থায় উৎপন্ন খাদ্যশস্য খেযে প্রাণধাবণ কবত। তাবপব তাদেব ভাবনা-চিন্তায স্থান পেল এক কল্পনা। সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদেব জানাই ছিল। যেহেতু ভূমি বন্য অবস্থায় শস্য উৎপাদন কবে, সেই হেতু তাবা ভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা করে নিল। যুক্তির আশ্রয় নিযে তারা ভাবতে থাকল ঃ পুরুষ যদি নাবীরূপ ভূমি কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন কবতে পারে, তবে মাতৃরূপী বা নাবীরূপী পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করতে পারা যাবে না কেন? পরবর্তীকালে আমাদেব সমস্ত ‘ধর্মশাস্ত্রে’ নারীকে ‘ক্ষেত্র’ বা ‘ভূমি’ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। যাইহোক, মেযেবা পুরুষের লিঙ্গরূপ এক যষ্টি বানিযে ভূমি কর্ষণ শুরু করে। আজও আদিম সমাজে ভূমি কর্ষণের জন্য এ ধরনেব যষ্টি ব্যবহাব করা হয। এই বকম যষ্টি থেকেই এসেছে লাঙ্গল। বলা হযেছে, ‘লিঙ্গ’, ‘লাঙ্গল’ ও ‘লাঙ্গুল’ এই তিনটি শব্দ একই ধাতুরূপ থেকে উৎপন্ন। মেয়েরা এইভাবে শস্য উৎপাদন করল। যখন ফসলে মাঠ ভবে গেল, তখন পুরুষরা তা দেখে অবাক হল। তখন তারাও কৃষিকর্মে মেয়েদেব সহাযক হয়ে দাঁড়াল।

কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন। সেজন্য তাকে সেচেরও ব্যবস্থা করতে হল। ফসল কাটার জন্য কাস্তের উদ্ভাবন কবতে হল। মাঠ থেকে কাটা ফসল ঘরে আনবার জন্য গাধা পালন করতে হল। ঘবে ফসল তুলে আনবাব পব তা ঝাড়াই-মাড়াই কববার জন্য কুলা উদ্ভাবন করতে হল। ঝাড়াই-মাড়াইযেব পর শস্য বাখবাব জন্য ঝুড়ি-চুবড়ি ধামা ইত্যাদি উদ্ভাবন কবতে হল। আবাব সংবক্ষিত ফসল পাছে পোকা-মাকড়ে নষ্ট করে, তার জন্য মাটির পাত্র তৈবি কবতে হল। শস্য পেষাইযেব জন্য ঢেঁকি ও জাঁতা উদ্ভাবন করতে হল। মাটিব পাত্রগুলো প্রথমে এবড়োখেবড়ো রূপে হাতেই তৈরি করা হত, কিন্তু পবে কুম্ভকারেব চক্রে নিপুণতার সঙ্গে তৈরি হতে লাগল। প্রথমে গম, যব, ধান ইত্যাদি খাদ্যশস্যই উৎপাদন কবা হল, কিন্তু পরে অন্য ফসলের চাষও আরম্ভ হল। তুলাব চাষ কবে, তা দিয়ে সুতা তৈরি কবে কাপড বযন করতেও আবম্ভ করল। নদীব ধাবে যাবা বাস কবত তাবা আগে থেকেই মাছ খেত, এখন মাছ ধরবাব জন্য বড়শি, মাছ ধববাব জাল ইত্যাদি তৈবি কবতে লাগল। নদীতে পরিবহনেব জন্য প্রথমে ভেলা ও পবে নৌকাব ব্যবহাব শুরু কবল। বাটনা বাটার জন্য শিল-নোড়া ও স্থলপথে পবিবহনেব জন্য গো-শকটও প্রচলিত হল। এইভাবে একের পব এক জিনিস উদ্ভাবন কবে নবোপলীয যুগে মানুষ তাব বৈষয়িক জীবনকে বৈচিত্র্যময় কবে তুলল। এই বৈষযিক জীবনেব রূপাযণে ওই যুগেব মেযেরা যেমন সক্রিয় ভূমিকা নিল, পুরুষবাও তেমনই চুপ কবে বসে বইল না। মেযেদেব সাহায্য করবার জন্য তারা নানা বকমেব উন্নত ধবনেব আযুধ তৈবি কবতে আবম্ভ কবল। সে-সব আযুধ ভাবতের সর্বত্রই পাওযা গিযেছে।

কৃষিজ প্রয়োজনেই মানুষকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে হযেছিল। আব তাব ফলে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রাম ও নগব। নবোপলীয় যুগেব মানুষবা ঘড়বাড়ি তৈবি কবতো মাটি দিয়ে, সেভাবে আজও ভাবতেব বহু আদিবাসী তাদের ঘববাড়ি বানায়। গ্রামের লোকরা এই পদ্ধতিতে আজও বেশ বড বড ঘববাড়ি তৈবি কবে, যেগুলি কল্পনাতীতভাবে বহুকাল টিকে থাকে। বিশেষ কবে, পশ্চিমবাংলার দক্ষিণের কিছু জেলাতে আজও এই পদ্ধতিতে দোতলা মাটির বাড়ি তৈরি কবা হয়ে থাকে। কাদামাটি দিয়ে প্রথমে এক-হাত উঁচু পবিমাণ এক থাক্ দেওযাল তৈরি কবা হয। তারপব সে থাক্ শুকিয়ে গেলে তাব ওপব কাদামাটির দ্বিতীয় আরেকটি থাক্ তৈরি করা হযে থাকে। এই পদ্ধতিতে দোতলা, তিন-তলা বাড়ি বানানো যায। তবে নবোপলীয় যুগেব মানুষেরা সম্ভবত একতলা বাড়িই বানাতো এবং মাটির দেওয়ালের ওপর পাতার ছাউনি দিত। আমাদের দেশে বহু মাটিব বাড়িতে তালপাতাব অথবা খড়ের ছাউনি আজও দেখা যায়। ছ্যাঁচাবেড়ার গায়ে কাদা লেপে বাড়ি তৈরিব ব্যাপারটা আরও অনেক পরের ঘটনা।

নবোপলীয় যুগেব ধর্মাচরণ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলতে পারছেন না

প্রত্নতত্ত্ববিদরা। মানুষ কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ায় সাদৃশ্য আছে জেনে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া কৃষি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে প্রযোগ কবলো। প্রত্নোপলীয় যুগেব অন্তিম দশায মানুয বেশি শিকার পাওযাব আশায পাহাড়েব গুহায় ছবি এঁকে ঐন্দ্রজালিক ক্রিযার সাহায্য নিত। নবোপলীয যুগে ঐন্দ্রজালিক ক্রিযার সাহায্য নেওয়া অব্যাহত থাকলো তবে বদলে গেল পদ্ধতি। এবাব আব শিকারের জন্য নয কৃষিকাজের জন্য তা ব্যবহৃত হল অন্যভাবে। কৃষির সাফল্যেব জন্য তাবা কৃষিভূমিতে মৈথুনক্রিয়া চালু করলো। ফসল তোলার উৎসব হযে গেল এক যৌন-মহোৎসব [Sexual Orgy]। আব সেখানে উদ্ভূত হল লিঙ্গ ও ভূমি-মাতার [Earth Mother] পূজা। এর থেকেই সৃষ্টি হল শিব ও শক্তির কল্পনা। শিব হলেন দেবাদিদেব এবং শক্তি হলেন আদি শক্তি—আদি জননী।

ভাবতবর্ষে নবোপলীর সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওযা গেছে এবং কাববন-১৪ পবীক্ষায তাদেব যে সব বয়স নির্ধারিত হযেছে তা খুবই হতাশাব্যাঞ্জক। যেমন কাশ্মীবেব বুবঝহোমে যেসব নিদর্শন পাওযা গেছে তাদেব বযস বলা হচ্ছে ৪৪১৮-৩৫৯৩ বছব। অথচ হবপ্পা সভ্যতার চবম উন্নতিব কাল এখন থেকে প্রায ৪৫০০ বছব। আর সে সভ্যতা তাম্রাশ্ম সভ্যতা। সে কালে পৃথিবীব সেবা সভ্যতা। তাব বিস্তৃতি ছিল সাবা উত্তর এবং পশ্চিম ভারতেব প্রায ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে। এবকম অবস্থায কাশ্মীবে তখনও নবোপলীয় সভ্যতাই বিবাজ কবছে, তাম্রাশ্ম সভ্যতাব আলো সেখানে পৌঁছাযনি, এমনটা হতে পাবে না। উত্তব-পূর্ব এবং দক্ষিণ ভাবতেও হবপ্পা সভ্যতা হাজাব চাবেক বছর আগে ছড়িয়ে পড়েছিল। অথচ কাশ্মীব, এমন কি কালিবঙ্গানেও ৪৪০০ বছব আগে নবোপলীয সভ্যতাই বযে গেছে, তখনও তাম্রাশ্ম সভ্যতা আসে নি, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাববন-১৪ পবীক্ষায় ভুল থাকতে পারে অথবা প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্তে। অবশ্য প্রাক-হবপ্পীয সভ্যতার বযস ৫৪০০ বছর কিংবা তাবও বেশি বলে প্রত্নতাত্ত্বিকবা স্বীকার করেছেন। সে কথায পবে আসা যাবে। নবোপলীয় যুগের অন্তিম পর্বে মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছে খুবই দ্রুত।

নবোপলীয় যুগের এক কৃষ্টির কথা, ডঃ অতুল সুব তার 'মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইটিতে বলেছেন। এই কৃষ্টি নবোপলীয যুগের প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের। তিনি দেখিয়েছেন, এই কৃষ্টি শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, নবোপলীয যুগে দক্ষিণ ভাবতেও বিদ্যমান ছিল।

"নবোপলীয যুগের মানুষ মৃত ব্যক্তিব সমাধিব ওপবে একখানা লম্বা পাথর খাড়াভাবে পুঁতে দিত। এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত পাথব আমবা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি প্রভৃতি জেলায় লক্ষ্য করি। সেগুলিকে 'বীবকাঁড়' বলা হয়।

এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক আমবা পশ্চিমবঙ্গের যে-সব জায়গায় পেয়েছি, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। বাঁকুড়া শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমে ছাতনায়

এক পুকুরের কাছে এরূপ ঋজুভাবে প্রোথিত স্মৃতিফলক আমরা দেখতে পাই। এগুলি চার-পাঁচ ফুট উঁচু এবং এগুলির গায়ে অপরিণত শৈলীর খোদিত মূর্তি আছে। এগুলি সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যে-সকল সাহসী বীব সৈনিক যুদ্ধ নিহত হন, এগুলি তাদেবই সমাধিব ওপর প্রোথিত।

মেদিনীপুবেব কিযারচাঁদ গ্রামেও একপ ঋজুভাবে প্রোথিত বহু প্রস্তব ফলক দেখতে পাওযা যায। এগুলির বর্ণনায বলা হয়েছে—

'Rounded at the top, they seemed to have been deliberately chiselled and stand on the open field as rigid and uncommunnicative sentinels which they certainly are, continuing to baffle historians as to how they originated.'

একপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তর-ফলক ছাতনাব দু-মাইল দূবে মৌলবনায ও হুগলি জেলাতেও পাওযা গিযেছে। হুগলি জেলাতে এগুলিকে 'বীবকাঁড়' বলা হয। মনে হয, এগুলি প্রোটো-অস্ট্রালযেড জাতির অবদান। কেননা, দক্ষিণ-ভাবতেব আদিবাসীদের মধ্যেও আমবা একপ ঋজুভাবে প্রোথিত প্রস্তবফলক দেখি। নীলগিবি পাহাড়েব আদিবাসী কুড়ুম্বা উপজাতিব লোকবা একপ প্রস্তর-ফলককে 'বীবকল্লু' নামে অভিহিত কবে ও এগুলিব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবে। কুড়ুম্বা ও ইরুলা উপজাতিদেব ভাষায এব অর্থ হচ্ছে 'বীবপুরুষেব স্মৃতিফলক'। এক কথায এগুলি হচ্ছে সমাধিব ওপর স্মৃতিফলক (Menhirs)। সমাধিব ওপব একপ স্মৃতিফলক ছোটনাগপুবেব 'হো' ও 'মুণ্ডা' জাতির গ্রামে ডালটন (Dalton) দেখেছিলেন। নীলগিবি পাহাড়েব কুড়ুম্বাদেব মত ছোটনাগপুবেব [illegible] উপজাতিদেব মধ্যে প্রচলিত একপ স্মৃতিফলক সম্বন্ধে বলা হযেছে—

"Besides the grave-stones, monumental sotnes are set up outside the village to the memory of men of note The Kherias have collections of these monuments in the little enclosure round their houses and libations are constantly made to them.'

মনে হয়, বাঙলাদেশের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর গ্রামের বাইবে যে 'বৃষকাষ্ঠ' প্রোথিত কবা হয, সেগুলি একপ প্রস্তরফলকেরই কাষ্ঠনির্মিত উত্তর-সংস্করণ।"

ভাবতেব নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমাদের আধুনিক সভ্যতায় চলে এসেছে। এই সব প্রাচীন ব্যবহার্য জিনিসগুলির সামান্য কিছু পবিবর্তন কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটলেও বস্তুত নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আজও ধরে রেখেছি। যেমন, ধামা, চুপড়ি, কুলা, ঝাঁপি, বাটনা বাটবার শিল-নোড়া, শস্য-পেষাইয়ের জন্য জাঁতা ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত (জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও সেই প্রথা ছিল) আমরা আমাদের গৃহস্থালিতে

পাথবেরর থালা, গেলাস, বাটি, খোরা ইত্যাদি ব্যবহার করতাম। এগুলি সবই নবোপলীয যুগেব টেকনোলজি অনুযাযী তৈরি হত। এছাড়া, নবোপলীয় যুগের নৌকা, গো-শকট ও জ্বালানি হিসাবে কাঠ ও ঘুঁটে আমরা এখনও ব্যবহার করি। একালের নৃতত্ত্ববিদবা এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"Neolithic habits of living have survived in modern Europe, India, China, South America and other regions of high civilization This does not mean that their inhabitants still cut wood with polished stone tools, but their village life retains Neolithic pattern in its frame of mind. To find whole Neolithic cultures surviving into recent times we must trace the early migrations of food-production to their final goals and see how neolithic man filled in the gaps on the map unoccupied by earlier hunters So efficient was Neolithic technology that by its means men conquered the treeless cold and sailed to new islands across distant seas"

ভাবত তথা আফগানিস্তানেব সভ্যতাব বিকাশ প্রত্নোপলীয যুগ (Palaeolithic Age) পেবিযে কিছুটা সময চলে আসে মধ্য-প্রত্নোপলীয় যুগে (Mesolithic Age)। তাবপব সভ্যতাব বিবর্তন মানুষকে নিযে আসে নবোপলীয বা নব্য প্রস্তব যুগে (Neolithic Age)। নবোপলীয় যুগের শেষে মানুয তার বৈযয়িক কাজকর্মে তামাব ব্যবহাব শুরু কবেছিল। এর ফলে পরিবর্তিত এবং উন্নততর এই নতুন সভ্যতাকে বলা হল 'তাম্রাশ্ম সভ্যতা' (Chalcolithic Civilization)। এই যুগ হল তাম্রাশ্ম যুগ (Chalcolithic Age)। ভারতবর্ষে এই যুগেব সমযকাল খ্রীষ্টপূর্ব চাব হাজাব বছব থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজাব বছর। Chalcolithic শব্দটাব উচ্চাবণ হল 'ক্যাল্‌কোলিথিক'। গ্রীক ভাষায় 'Khalkos' মানে তামা এবং 'Lithos' মানে পাথব। এই বর্ণমালায ইংবেজি 'C' অক্ষবটা নেই। যাইহোক, যে সভ্যতাব ধাবকবা তাদেব ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তামা ও পাথব দিয়ে তৈরি করত, সেই সভ্যতাকে আমবা বলছি তাম্রাশ্ম সভ্যতা। এবপব আসে ব্রোঞ্জ-যুগ (Bronze Age)। ব্রোঞ্জেব ব্যাপক ব্যবহাব শুরু হয। সভ্যতার বিবর্তনও দ্রুত ঘটতে থাকে।

মিশব, সুমেব, সিন্ধু উপত্যকা, চীন সর্বত্রই আমরা তাম্রাশ্ম সভ্যতাব প্রথম দিকে তামাব ব্যবহার দেখতে পাই। অথচ মিশর ও সুমেরে তামা পাওয়া যেত না এবং চীনে তামা খুব অল্পই পাওযা যায। সুতরাং এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জাযগায ঘটেছিল, যেখানে প্রচুর পরিমাণে তামা পাওযা যেত এবং সহজেই পাওযা যেত। এখানে সেখানে তামা অবশ্য কিছু কিছু পাওযা

যেত, কিন্তু একটা সভ্যতা বিকাশের পক্ষে তা ছিল নগণ্য। বাংলাদেশে ছিল যে-যুগেব তামার বৃহত্তম খনি। বাঙলার বণিকবাই 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে, সেই তামা নিয়ে যেত সভ্যতাব বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার সবচেয়ে বড় বন্দবেব নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত ভাবতের তৎকালীন বৃহত্তম তাম্রখনি হতে। ধলভূমগড় অঞ্চলের মুসাবনীতে এখনও তামাব খনি বর্তমান।

প্রসঙ্গত বলা যায, তাম্রাশ্ম যুগেব শেষ ভাগে যখন খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীব পব মিশবে ব্রোঞ্জের (Bronze) প্রবর্তন ঘটল, তখন ব্রোঞ্জে নির্মিত দ্রব্যসম্ভাব মিশরীয় সভ্যতাকে নতুন রূপদান কবল। এই যুগে সোনাব ব্যবহাবও অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল, কেননা এই যুগেব পিবামিডেব মধ্যে শাযিত নৃপতি, যিনি মাত্র ১৯ বছব বযসে মাবা যান, সেই তুতানখামেনেব সমস্ত শবাধাবটাই (Sarcophagus) সোনা দিযে তৈবি করা হয়েছিল। এই সময ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ব্যবহার কবতে লাগল। তাব ফলে মিশবীয সৈন্যবাহিনী আবও বেশি পরিমাণে শক্তিধব হয়ে উঠল।

আগে মনে কবা হত যে, ব্রোঞ্জ সভ্যতা 'came through the agency of sea -traders from the north or through land-traders from Palestine and Syria'। কিন্তু এই মতবাদ বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হযেছে সে সম্বন্ধে Hutchinson's Twentieth Century Encyclopaedia-তে বলা হয়েছে — Recent discoveries in Thailand suggest that the far East, rather than the Near East, was the cradle of Bronze.. Finds of bronze artefacts in North Thailand in 1974-76 showed that a stage of metallurgy had been reached there in 4000 B C which was not reached in Mesopotamia and the rest of the Middle East until 3000 B.C.

সুতবাং দেখা যাচ্ছে, থাইল্যাণ্ড অঞ্চলে ব্রোঞ্জ উৎপাদন শুরু হয়েছিল প্রায় ৬০০০ বছব আগে। অর্থাৎ নবোপলীয যুগেব শেষে কিংবা তাম্রাশ্ম যুগের শুরুতেই এই অঞ্চলে ব্রোঞ্জ তৈবি কবা শুরু হয়েছিল এবং তা ব্যবহৃত হতে থাকে দৈনন্দিন প্রয়োজনেব আসবাবপত্রে, অস্ত্রশস্ত্রে। ব্রোঞ্জ সঙ্কব ধাতু — তামা ও টিনের (Tin) মিশ্রণে প্রস্তুত হয। থাইল্যাণ্ডেব নিজস্ব টিনেব খনি আছে বটে, কিন্তু তামাব খনি নেই। সেই জন্যই মনে হয, খুব সম্ভবত তাবা তামাব জন্য বাঙলার ওপর নির্ভব কবত। যদি তাই হয, তা হলে আমাবা অনুমান কবতে পারি যে, বাঙালী বণিকরা বাণিজ্য অভিযানে বেবিয়ে, থাইল্যাণ্ডে তামা বিক্রয করে, সেখান থেকেই সর্বপ্রথম ব্রোঞ্জ পশ্চিমের দেশসমূহে নিযে গিয়েছিল। পরে হযতো ব্রোঞ্জের প্রস্তুত প্রণালীটা জানবার পব তাবা নিকটস্থ সূত্র থেকে টিন সংগ্রহ কবে বাঙলাব তামার সঙ্গে মিশিয়ে ওই সঙ্কর ধাতু নিজেরাই তৈবি কবতে সমর্থ হযেছিল।

ভারতেব তাম্রাশ্ম সভ্যতাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' , 'হরপ্পা সভ্যতা' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয। এই সভ্যতাব বিস্তৃতি ছিল আধুনিক আফগানিস্তানেব পশ্চিম সীমা অবধি। 'হবপ্পা সভ্যতা' কিংবা 'সিন্ধু সভ্যতা' নামটি কিন্তু এই ব্যাপক বিস্তৃত অত্যুন্নত সভ্যতাব যথাযথ নামকবণ হওযা উচিত নয়। এই সভ্যতাব ব্যাপ্তি সিন্ধু উপত্যকা কিংবা হবপ্পা অঞ্চল ছাড়িয়ে আবও বহুদূর বিস্তৃত। তাই এব যথাযথ নামকরণ হওযা উচিত 'প্রাগার্য সভ্যতা' (Pre-Aryan Civilization)। ঐতিহাসিকবা এখন একে 'হবপ্পা সভ্যতা' নামেই মেনে নিয়েছেন। তাই আমরাও এই সভ্যতাকে 'হরপ্পা সভ্যতা'-ই বলব। এই সভ্যতাব কথা সংক্ষেপে বলা সহজ কাজ নয়। এই সভ্যতা ভাবতেবই দেশজ সভ্যতা। হবপ্পা সভ্যতাই বিস্তৃত হযেছিল আফগানিস্তানেব 'মুণ্ডিগাক' অবধি। সম্ভবত এটাই ছিল ওই সভ্যতাব পশ্চিম সীমানা। আব পূর্বদিকে এই সভ্যতা বিস্তৃত হযেছিল 'পাণ্ডুবাজার ঢিবি' পর্যন্ত। ●

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের হরপ্পা সভ্যতা

শীতের এক নির্জন মধ্যাহ্ন। এক অশ্বরোহী পথ হারিয়ে চলেছেন মরুভূমির মধ্য দিয়ে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এই অশ্বারোহী আগেও এ অঞ্চলে অনেকবার এসেছেন, কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলেন নি। এবার কিন্তু পথ হারিয়েছেন। আসলে সিন্ধু নদীর তীরে দাঁড়ালে অনেকটা দূরে এই অঞ্চলেব পাহাড় প্রমাণ উঁচু বালির টিবিগুলি বেশ ভালোভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু প্রায মরুভূমিব এই মাটিব টিলাগুলির ঘেবাটোপেব মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে এখান থেকে বের হওযা অনেক সময় মুশকিল হয়ে যায়। হারিয়ে যায় পথ। যেমন পথ হারায় মধ্যপ্রদেশের চম্বল উপত্যকার 'বেহেড়' অঞ্চলে। পথ হারানো ওই অশ্বারোহী থামলেন এক উঁচু টিলাব নিচে। ঝোপঝাড় রয়েছে টিলার এখানে-ওখানে। ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিলেন চরে বেড়ানোর জন্য। নিজে বিশ্রাম নিতে বসলেন টিলার পাদদেশে। বিশ্রাম নেবার সময় হঠাৎই তাঁর পায়ে ঠেকলো একটি চকমকি পাথরেব ছুরি (Flint Knife)। অশ্বাবোহী ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। ওই পাথবের ছুরিই তাঁকে পথ দেখালো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রত্ন-আবিষ্কারের। আবিষ্কৃত হল বিখ্যাত মহেঞ্জোদারো। পৃথিবী জানলো এক নতুন সভ্যতার কথা। ভারতের তথা পৃথিবীর ইতিহাস গেল বদলে। এর আগে ভাবতবর্ষের ইতিহাস শুরু হত ভারতীয় আর্য-সভ্যতার (Indo-Aryan Civilization) কথা দিয়ে। বলা হত, আর্যরা ভারতের বাইরের থেকে এসে অসভ্য ভারতবাসীকে সভ্য করেছে। বদলে গেল সে ইতিহাস। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের পর সারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বাঞ্চল জুড়ে আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাক থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার টিবি অবধি প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে নানা স্থানে খুঁজে পাওয়া গেল এক অত্যুন্নত নগর সভ্যতার বহুল নিদর্শন। মাটি খুঁড়ে বের হল দেড়শোরও বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর ও জনপদ। এই সভ্যতা হল, 'তাম্রাশ্ম' (Cholcolithic) সভ্যতা। ঐতিহাসিকরা এর নাম দিয়েছেন 'হরপ্পা সভ্যতা'। একে আমরা 'সিন্ধু সভ্যতা' বলেও জানি। ভারতবর্ষেব ইতিহাস শুরু হল এই হরপ্পা সভ্যতা দিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসেও হরপ্পা সভ্যতা মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সঙ্গে জায়গা করে নিল। আর্যদের সভ্যতার এবং সংস্কৃতির গরিমা ধূলিসাৎ হল। দেখা গেল, হরপ্পা সভ্যতাই প্রাচীনতম এবং সেকালের উন্নততম মানব সভ্যতা। এর আবিষ্কারক ওই অশ্বারোহীটি আর কেউ নন, তিনি হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিখ্যাত এই বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের

পশ্চিমাঞ্চলের সুপারিনটেনডেন্ট। তিনি ওই চকমকি পাথরের ছুরিটি পেয়েছিলেন ১৯২১-২২ সালের শীতকালে। সে সময় ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনাধীন। তখন ভারতবর্ষ থেকে প্যাকিস্তান ও বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয় নি।

সুপণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলেন এই বিখ্যাত প্রাচীন সভ্যতা। আসলে তিনি ওই অঞ্চলে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন অন্য এক প্রত্ন-নিদর্শন। তার বদলে তিনি আবিষ্কার করলেন অমূল্য প্রত্নবস্তুসমূহ যেগুলি বদলে দিল পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাস। রাখালদাস পশ্চিমাঞ্চলের সুপরিনটেনডেন্ট হওয়ার পর সিন্ধু নদীর শুকিয়ে যাওয়া তটভূমি অঞ্চলে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আলেকজাণ্ডারের বিজয়স্তম্ভ (Victory Pillar)। প্রাচীন গ্রীকদের একটা প্রথা ছিল। তারা কোন দেশ জয় করলে সে দেশে অন্ততঃ একটা বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করতো। গ্রীক ঐতিহাসিকরা অনেক পরবর্তীকালে লিখেছেন যে, আলেকজাণ্ডার তাঁর বিশ্ব বিজয়ের যাত্রাপথ জুড়ে এরকম কতকগুলি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। রাখালদাস এবং অন্যান্য কয়েকজন ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল আলেকজাণ্ডার তাঁর পুরু-বিজয়ের স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন ওই অঞ্চলে। রাখালদাস তাঁর অনুসন্ধান শুরু কবেন ১৯১৮ সাল থেকে। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল অবধি চার বছর ধরে প্রতিটি শীতকালে তিনি অনুসন্ধান চালাতেন সিন্ধুর তীর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরের ওই সব টিলাগুলিতে। ওখানেই তিনি ১৯২১-২২ সালের শীতকালে আকস্মিকভাবে পথ হারালেন, পেয়ে গেলেন চকমকি পাথরের ছুরি। তাবপর ১৯২১-২২ এবং ১৯২২-২৩ সালের শীতকাল জুড়ে খনন করলেন ওখানেব সবচেয়ে উঁচু টিলাটি। এই খননের ফলে উপরের স্তরে পাওযা গেল বৌদ্ধমঠ, যেটি তৈরি হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে। কিন্তু জন মার্শাল বললেন যে, মঠটি ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি চালু ছিল। পরে অবশ্য দেখা যায়, রাখালদাসের অনুমানই ঠিক ছিল এবং এটি নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে। আরও জানা গেল যে, এই প্রমাণ সাইজের বৌদ্ধমঠটি নির্মাণ করতে নিচের স্তরের তাম্রাশ্ম যুগের বহু উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছিল। এরই নিচের স্তরে যে তাম্রাশ্ম যুগের প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে, রাখালদাস তা অনুমান করেন। তাঁর এই অনুমান আরও কিছুটা পরে বিস্তারিত খননের ফলে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এই বৌদ্ধমঠ অঞ্চলের নিচের স্তরে খননের পর পাওয়া যায় তাম্রাশ্ম যুগের শহরের একাংশ। আবিষ্কৃত হয় প্রাচীন মহেঞ্জোদারো শহর।

রাখালদাস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ওই বৌদ্ধমঠ এবং বিহারের নিচেই রয়েছে তাম্রাশ্ম যুগের এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। তাঁর এই বিশ্বাস পরবর্তীকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। মহেঞ্জোদারোর তাম্রাশ্ম সভ্যতার প্রাচীন শহর আবিষ্কৃত হয়। রাখালদাস কিছুটা খনন শুরু করলেও শেষ কবে যেতে পারেন নি। এমন কি যেটুকু খনন তিনি করেছিলেন ওই প্রাচীন শহরের, তার রিপোর্টও তিনি লিখে যেতে পারেন নি। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যই তাঁর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অবসর নেন এবং মারা যান ১৯২৪

সালেই। মহেঞ্জোদারোর পরবর্তী খনন কার্য চালান স্যার জন মার্শাল। তিনি তাঁর সহকর্মী রাখালদাস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"This does not, however, lessen the credit due to him. His task in Mahenjodaro was far from being as simple as it may now appear. Apart from the discoveries at Harappa, which he had not personally seen, nothing whatever was then known of the Indus Civilization. The few structural remains of the civilization, which he unearthed, were built of bricks identical with those used in the Buddhist stupa and Monastery, and bore a close resemblance to the latter that even now it is always not easy to discriminate between them. Nevertheless, Mr. Banerjee defined and righty defined that these earlier remains must have antedated the Buddhist structure, which were only a foot or two above them, by some two or three thousand years. That was no small achievement. Naturally some of his conclusions have required modifications— it could hardly have been otherwise— but in the main they have been proved by our subsequent researches to be remarkably correct."

বাখালদাস সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদাবো অঞ্চলে আলেকজাণ্ডাবের যে বিজয় স্মাবকের ভগ্নাবশেষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বলে নেওযা যাক। আলেকজাণ্ডার যে তাঁর বিজিত দেশগুলিতে বিজযপথের ধাবে গ্রীক রীতিব অনুসবণে অনেক বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন, এমন কাহিনী তাঁব অনেক পববর্তীকালেব ইউরোপীয ঐতিহাসিকরা বানিয়েছিলেন আলেকজাণ্ডারের শৌর্য-বীর্যেব গবিমাকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরতে। আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য একে 'Alexander Myth' বলে আখ্যা দিয়েছেন। রাখালদাস লারকানা অঞ্চলে ওই 'Myth'-এরই সত্যতা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সন্ধান কবছিলেন আলেকজাণ্ডার নির্মিত ওই সব বিজয়স্তম্ভের। 'মহাবীব' আলেকজাণ্ডার কিন্তু রাজা পুরুর হাতে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়েছিলেন, পুরুই তাঁর বিজয় অভিযান থামিয়ে দেন এবং তাঁকে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। এমতাবস্থায় এই অঞ্চলে তাঁর বিজয়স্তম্ভ বানানোর ব্যাপারটা নিয়ে ঐতিহাসিকরাও সন্দিহান ছিলেন। সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্যই রাখালদাস খুঁজছিলেন ওই ধরনের বিজয়স্তম্ভের অবশেষ। এবই ফলে হঠাৎই আবিষ্কৃত হয় মহেঞ্জোদারো।

আলেকজাণ্ডার জন্মেছিলেন ৩৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসদেশেব ম্যাসিডনে। তাঁর পিতা দ্বিতীয় ফিলিপ (King Philip–II) ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা। তাঁর মা অলিম্পিয়াস (Olympias) ছিলেন ইপিরোটের (Epirote) রাজকুমারী। ঐতিহাসিকরা বিশেষ করে পুরাকালের ঐতিহাসিকরা তাঁর বিজয় অভিযান, বীরত্ব, সাহসিকতা নিয়ে বহু কথাই

লিখেছেন, কিন্তু তিনি যে সুশাসক, সারা পৃথিবীর একতাকামী ছিলেন, একথা প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদের কেউ বলেন নি। বিশ্ব ঐক্যের কথা ভেবেই ছিল তাঁর বিজয় অভিযান— এমন কথা বলছেন একালের অনেক ঐতিহাসিক। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন সে যুগের অতি বিখ্যাত মনীষী অ্যারিস্টটল (Aristotle)। রাণা প্রতাপের প্রিয় ঘোড়া যেমন 'চেতক', তেমনি অলেকজাণ্ডারের প্রিয় ঘোড়া ছিল 'বুসিফেলাস' (Bucephalus)। এই ঘোড়াটি কৈশোর থেকেই তাঁর সঙ্গী ছিল। বুসিফেলাসকে রাজা ফিলিপেব কাছে বিক্রি করতে নিয়ে আসে এক ঘোড়াওয়ালা। কিন্তু কেউই ওকে বশ মানাতে পারছিল না, সবাইকেই ও ফেলে দিচ্ছিল নিজের পিঠ থেকে। কিশোব আলেকজাণ্ডার কিন্তু ওকে বশ মানায় এবং সেই থেকে বুসিফেলাস আলেকজাণ্ডারের খাস ঘোড়া। আলেকজাণ্ডার তাঁর ঘোড়াটিকে হারান পুরুর সঙ্গে যুদ্ধে। সুতরাং বুসিফেলাস মারা যায় এই ভারতবর্ষেই।

আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হন মাত্র ২০ বছর বয়সে ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। নিজেব রাজ্যেব বিদ্রোহীদেব দমন করার পব তিনি দিগ্বিজয়ে বেব হন। ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি পাবস্য সাম্রাজ্য দখল করেন। পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি শেষ হয তৃতীয় দারিয়ুসেব (Darius-III) মৃত্যুর পর। আলেকজাণ্ডারের হাতে তিনি পরাজিত এবং সম্ভবত নিহত হন। সেটা ছিল ৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এরপর তিনি সসৈন্যে ভাবতের দিকে অগ্রসর হন। হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে তিনি আনুমানিক ৩২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। আব সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে তিনি ভারত ছেড়ে ম্যাসিডনে প্রত্যাবর্তনেব পথে ব্যাবিলনেব দিকে যান। দেশে ফেরার পথে তিনি গেদ্রোসিয়া (Gedrosia) মরুভূমি পেরিযে পৌছালেন ব্যাবিলনে। এখানেই তিনি সামান্য জ্বরে ভুগে মাবা যান। সে সময় তাঁর বয়স ৩৩ বছরও পূর্ণ হয় নি। গেদ্রোসিয়া হল একালের বালুচিস্তান। আর সময়টা ছিল ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আসেন তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিসার, অশ্মক, গান্ধার, তক্ষশিলা, পুরু প্রভৃতি কযেকটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। বিতস্তা বা ঝিলম এবং চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল পুরু-রাজ্য। আলেকজাণ্ডার ভারতের প্রবেশপথের কতকগুলি পার্বত্যজাতিকে বিধ্বস্ত করেন এবং নৌ-সেতুর সাহায্যে সিন্ধু নদী পার হন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধেই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু পুরুরাজ বহু সৈন্য এবং হাতি নিয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিতে প্রস্তুত হলেন। গ্রীকসম্রাট রাতের অন্ধকারে গোপনে ঝিলাম পার হয়ে অতর্কিতে পুরুকে আক্রমণ করেন। পুরু বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত ও বন্দী হন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'হিদাস্‌পিসের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। কারণ গ্রীকরা ঝিলমনদীকে 'হিদাস্‌পিস' নাম দিয়েছিল।

পুরুরাজ সত্যি সত্যিই পরাজিত এবং বন্দী, হয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক আছে। বরং উল্টে বলা হয়, আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনীই পর্যুদস্ত হয় পুরুরাজের হাতে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের (ডঃ হরিদাস মিত্র, ডঃ সুধাকর চ্যাটার্জী, ডঃ এইচ.

সি. শেঠ প্রমুখ) অনেকেই আলেকজাণ্ডারেব পরাজয়ের এই মতটাকেই সত্য বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা আলেকজাণ্ডারেব শৌর্য-বীর্য ও গবিমাব প্রচারেব জন্যই ইতিহাস-বিকৃতি ঘটিযে পুরুরাজের বন্দী হওয়ার কাহিনী লিখেছেন। প্রকৃত সত্য হল, পুরুরাজের সঙ্গে সংগ্রামে আলেকজাণ্ডার পরাজিত হন এবং তিনি পুরুরাজের সঙ্গে সন্ধি করেন। পরাজিত সৈন্যদল তাই দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে এবং আলেকজাণ্ডাব তাঁর অভিযান এখানেই শেষ করে দেশে ফিরে যাওযার সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধে পুরুরাজদেব ছোঁড়া আগুনের গোলায (Fire-missiles) আলেকজাণ্ডার তাঁর গোড়ালিতে প্রবল চোট পান। এই চোটই পরে ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং একালের ঐতিহাসিকরা বলছেন, এই ক্ষতই আলেকজাণ্ডাবের মৃত্যুর প্রধান কারণ। এই ক্ষত থেকেই সামান্য জ্বব ভোগেব পব ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি ব্যাবিলনে মৃত্যুবরণ করেন।

আলেকজাণ্ডাব যে পুরুকে হারাতে পাবেননি তার ইথিওপীয (Ethiopic) বিববণের ইংবেজী অনুবাদ এই বকম ঃ

"Porus continued to fight for 20 days, and many of Alexander's horsemen were slain and by reason of this there was such sorrow among them that they wept and howled like dogs, and they wished to throw down the arms which were in their hands and to forsake Alexander and go over to the enemy When Alexander saw this, he drew nigh into their midst, being himself in great tribulation, and he wished to stop fight. And having commanded the soldiers to cease fighting, he cried out saying, "O Poros, King of India, behold, I perceive and know thy strength and might, and moreover, what thou doest lieth hard upon me, and my heart is aweary; and I have considered the fatigue whereby we all are perishing. Now although I may wish to destroy my own life, I would not, that all these men (who are with me) should perish, for it is I who have brought them nigh unto death here, and it is not a right thing for a king to deliver his soliders unto death."

[The Life and Exploits of Alexander the Great (From the Ethiopic texts)— Translated and Edited by Sir E.A. Wallis Budge.]

ডঃ এইচ. সি. শেঠ (Dr. H. C. Seth) এই সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, "If racial prejudices do not enter into the study of history, Alexander will appear to be one of the most ferocious and barbarous figures world ever seen. His brief life is full of orgies of bloodshed, foul

murders and ignoble revenges, unrelieved by any act of chivalry, unless we believe in the fiction of his generosity towards Poros." এই সব কাবণে একালের ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, আলেকজাণ্ডার তাঁর প্রথম পরাজয়ের এই রাজ্যে কোনও বিজয়স্তম্ভ বানান নি কিংবা বানানোর সময় পান নি। সুতবাং রাখালদাস বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আলেকজাণ্ডারের ওই তথাকথিত বিজয়স্তম্ভ লারকানা জেলার এই অঞ্চলে। তাতে লাভ হয়েছিল অতুলনীয়। বিশ্ববিশ্রুত মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হয়েছিল এই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হিসাবেই।

যাইহোক, আলেকজাণ্ডার পুরুর সঙ্গে সন্ধি করে মিত্রতা স্থাপন করেন। তারপব তিনি বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁরা সেনারা আর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে অসম্মত হয়। আলেকজাণ্ডার বাধ্য হয়ে স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা নিলেন। তিনি নিজে একদল সৈন্য নিযে বালুচিস্তানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। আর একদল সৈন্যকে জলপথে পারস্যে পাঠিযে দিলেন। ফিরে যাওয়ার পথে তিনি নির্মম ভাবে মালব, ক্ষুদ্রক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বাজ্যগুলি ধ্বংস কবেন। আগেই বলেছি, তিনি ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হঠাৎই মারা যান ব্যাবিলনে সামান্য জ্বর ভোগের পর। ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার বছব তিনেক ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই সিন্ধু ও পঞ্চনদের অধিবাসীদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। বহু জনপদ এবং নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। গ্রীকদের বিবরণ মতে, কেবলমাত্র সিন্ধুদেশেই আশি হাজার ভারতবাসী প্রাণ হারিয়েছিল। তার চেযেও বেশি লোক বন্দী হযে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীতে পবিণত হয়েছিল। তাঁর অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল ছিল ধ্বংস, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। সুতবাং সেই আলেকজাণ্ডার তাঁর বিজয় পথের ধারে বিভিন্ন জাযগায বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ কবেছিলেন এটা বিশ্বাস্য নয়। তাই রাখালদাস আলেকজাণ্ডারের বিজয়স্তম্ভের নিদর্শন খুঁজে পান নি, কিন্তু পেয়েছিলেন অমূল্য প্রত্ন-নিদর্শন।

'মহেঞ্জোদাবো' শব্দেব অর্থ হল 'মৃতের স্তূপ'। এই নাম অনেক পববর্তীকালে স্থানীয লোকদেব দেওয়া। ওই নগরী ধ্বংস হওয়ার বহুকাল পরে যখন সব নিদর্শনই ঢাকা পড়ে গেছে বালিব তলায় তখন এখানের সবচেয়ে উঁচু টিলাটির নাম স্থানীয অধিবাসীরা রেখেছিল 'মৃতেব স্তূপ' বা 'মহেঞ্জোদারো'। এই উঁচু টিলাটির খননই সর্বপ্রথম শুরু কবেছিলেন রাখালদাস ১৯২১-২২ সালে। পাঁচ হাজাব বছর আগে এই শহরের নাম কী ছিল তা অজানা। আমরা একালে এই শহরের ভগ্নস্তূপকে 'মৃতের স্তূপ' বা মহেঞ্জোদারো বলেই জানি।

ইউফ্রেটিস নদীব তীবে যেমন গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, তেমনি সিন্ধু নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চল জুড়ে উদ্ভূত হয়েছিল এক নগর-ভিত্তিক তাম্রাশ্ম সভ্যতা যার নাম দেওয়া হযেছে 'হরপ্পা সভ্যতা'। অনেক ঐতিহাসিক একে 'সিন্ধু সভ্যতা'ও বলেন। তবে এই সভ্যতা যে শুধু সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয। এই সভ্যতার পশ্চিম সীমানা ছিল একালের আফগানিস্তানের 'মুণ্ডিগাক' এবং পূর্ব-সীমানা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' কিংবা উত্তর চব্বিশ পরগণার

'বেড়াচাঁপা'। চাই কি, তমলুকের 'নাটশাল' অবধি এর পূর্ব সীমানার বিস্তার হতেও পারে। কারণ তাম্রলিপ্তই সম্ভবত ছিল সেকালের প্রধান বন্দব যেখান থেকে এই হরপ্পা সভ্যতার বা তাম্রাশ্ম সভ্যতার তামা সরববাহ করা হত। এ নিয়ে পবে আলোচনা করা হবে। আবার মহেঞ্জোদারোর কথায় ফিবে আসি।

মহেঞ্জোদারো শহরটি তার রমরমাব কালে সিন্ধুনদেব তীরেই অবস্থিত ছিল। এখন সিন্ধুনদের অবস্থান প্রায় ১০ কিলোমিটাব দূবে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন মহেঞ্জোদারো শহর থেকে সিন্ধুর দূরে সরে যাওয়াটা এই শহর ধ্বংস হওয়াব অন্যতম কারণ। সে কালে মহেঞ্জোদারোর খুব কাছেই ছিল সমুদ্র এবং সম্ভবত ওই সমুদ্র ও শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল সুন্দরবনেব মত বিশাল অবণ্য। এখন মহেঞ্জোদারোব থেকে আরব সাগরের দূরত্ব ৩০০ কিলোমিটাবেবও বেশি। এ অঞ্চলে পাঁচ হাজার বছর আগে নিশ্চয়ই প্রবল বৃষ্টিপাত হতো। তাই মহেঞ্জোদারোর সব বাড়িঘর তৈরি করা হয়েছিল পোড়ানো ইট দিযে। পববর্তীকালে যখন বৃষ্টিপাত অনেকটাই কমে যায তখন আবাব কাঁচা ইটই ব্যবহৃত হতে থাকে গৃহ নির্মাণেব উপকবণ হিসাবে। মহেঞ্জোদাবোব উপবের দিকের স্তরে তাই কাঁচা ইটেব তৈবি ঘববাডিব নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বৃষ্টিপাত কমে যাওযাব কাবণ হিসাবে বলা হযেছে যে, মহেঞ্জোদাবো শহর ও আরব সাগরেব মধ্যে যে ঘন জঙ্গল ছিল তা ধীবে ধীবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা এবং সিন্ধুব পলিমাটিতে নতুন তটভূমি সৃষ্টি হওযাব ফলে সমুদ্রেব দূবে চলে যাওযা। বন কেটে বসত বানানোব প্রয়োজনে এবং ইট পোড়ানোব জন্য মহেঞ্জোদারোব লোকবা সমুদ্র তীরবর্তী জঙ্গলকে সম্ভবত নিশ্চিহ্ন কবে ফেলে। এর ফলে এই অঞ্চলে আবহাওয়ার বিশাল পরিবর্তন ঘটে। বৃষ্টিপাত ধীবে ধীবে কমতে থাকে। তাকে ত্বরান্বিত করে সমুদ্রের দূরে স'রে যাওয়া। সিন্ধু নদীর পলিমাটিতে সমুদ্রের তট বৃদ্ধি পায়। সমুদ্র একসময় মহেঞ্জোদারোর কাছাকাছি ছিল। এখন মহেঞ্জোদাবো থেকে সমুদ্র প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূবে। বৃষ্টিপাত কমার সঙ্গে সঙ্গে মহেঞ্জোদাবোর আশপাশেব সুফলা জমি লবণাক্ত ও চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এর উপর ছিল বর্বব আর্যদেব আক্রমণ। প্রায় ৩৮০০ বছর আগে মহেঞ্জোদারো পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয। এই প্রাচীন শহরটি তার তিন-চারটি স্তর নিয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। এব উপর সৃষ্টি হয় বালিয়াড়ি। হাজার দুয়েক বছর আগে ওই বালিয়াড়ির উপরই নির্মিত হয এক বৌদ্ধমঠ ও বিহার। তাতে ব্যবহৃত হয় ওই ৩৮০০ কিংবা ৪০০০ বছব আগেব মহেঞ্জোদাবো নগবীর নানান নির্মাণ উপকরণ। এখনকার মহেঞ্জোদারোর আবহাওয়া পুরোপুবি মরুভূমির মতই। বৃষ্টিহীন বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রদেশ—ইতস্ততঃ ঝোপ-ঝাড়, মশা-মাছির প্রবল উপদ্রব। দিনে প্রবল গরম, রাতে প্রবল শীত।

সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার 'নারা' নদীব পূর্বতীরে মহেঞ্জোদারোর বর্তমান অবস্থান। ভৌগোলিকভাবে এর অবস্থান ২৭°১৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। পাকিস্তানের ডোকরি (Dokri) রেল স্টেশন থেকে ১১ কিলোমিটার এবং

লারকানা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সুপ্রাচীন শহরের মাটি খুঁড়ে বের করা ভগ্নাবশেষ। যে সব টিলা খুঁড়ে এই শহরের অবশেষ বের করা হয়েছে তাদের উচ্চতমটির উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট এবং বাকী টিলাগুলির উচ্চতা ছিল ২০ থেকে ৩০ ফুট। এখন ভগ্নস্তূপ যেটুকু জায়গা জুড়ে রয়েছে তার আয়তন ২৪০ একর হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন মহেঞ্জোদারো শহরের আয়তন ছিল প্রায় এক বর্গমাইল। সম্ভবত হরপ্পার আয়তনও ছিল একই রকম। হরপ্পা মহেঞ্জোদারো থেকে ৬৫০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ইরাবতী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। এরই নামে সভ্যতার নাম 'হরপ্পা সভ্যতা'। এর কথায় পরে আসছি।

৬৪০ একরে এক বর্গমাইল। অর্থাৎ আদি মহেঞ্জোদারো শহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হল বর্তমানের ভগ্নস্তূপের আয়তন, যা ২৪০ একর মাত্র। বাকীটা ধ্বংস হয়ে গেছে সিন্ধুনদীর প্রবল বন্যায় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে। পরবর্তীকালের লবণাক্ত আবহাওয়ায় ক্ষয়ে গেছে বহু ইট। তাই পুরো এক বর্গ মাইল আয়তনের প্রাচীন মহেঞ্জোদারো শহরটিকে মাটি খুঁড়ে পুনরুদ্ধার করা যায় নি, পাওয়া গেছে তাব তিনভাগের এক ভাগ। এককালে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ছিল মনোরম। চাষ-আবাদ নিশ্চয়ই ভাল হত। তাই গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতা। এখন এই অঞ্চলের আবহাওয়া চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর এবং এখানের পরিবেশে প্রবল রুক্ষতা। মশা-মাছি কীট-পতঙ্গের সীমাহীন উপদ্রব।

পণ্ডিতরা একটা কথা জোর দিয়েই বলছেন যে, মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত হত বলেই এই শহরেব সমস্ত পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ পোড়ানো ইট দিয়ে। হরপ্পা সভ্যতার যে দেড়শোরও বেশি প্রাচীন শহর ও জনপদ বৃহত্তর ভারতের প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে আবিষ্কৃত হযেছে এই পর্যায়ে, তার সবগুলিতেই ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ানো ইট। সুতরাং মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে এককালে ভালো এবং প্রচুর ফসলের উপযোগী প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হত। স্যার অরেল স্টেইন (Aurel Stein) বালুচিস্তানে হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীন জনপদেব ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। সেখানে পাওয়া প্রাচীন জলাধারের বিশাল বাঁধের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে, এইসব জলাধারে জল ধরে রেখে চাষের কাজে তা লাগানো হত। কিন্তু এখন সেখানে মরুভূমি। অর্থাৎ মহেঞ্জোদারোর কালে বা হরপ্পা সভ্যতার কালে বালুচিস্তানে মরুভূমি ছিল না, সেখানে বৃষ্টিপাত হত বেশ ভালোই এবং জলাধারে সে বৃষ্টির জল ধরে রেখে তাতে চাষবাস করা হত। সুতরাং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আবহাওয়া ভীষণভাবে বদলে গেছে—তাতে সন্দেহ নাই। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া শীলমোহরগুলির (Seals) অনেকগুলিতে আঁকা হয়েছে বাঘ, গণ্ডার। এই দুটি প্রাণীই জলাভূমিযুক্ত জঙ্গলেই বাস করে। সুতরাং মহেঞ্জোদারোর কাছাকাছি নিশ্চয়ই জলাজঙ্গল ছিল এবং তাতে গণ্ডার ও বাঘের বাস ছিল। মহেঞ্জোদারোর লোকরা গণ্ডার এবং বাঘ দেখতে নিশ্চয়ই জলদাপাড়া বা সুন্দরবন অঞ্চলে আসেনি। সুতরাং মহেঞ্জোদারোর রমরমার কালে এই অঞ্চলে বেশ বর্ষা হত

এবং এই প্রাচীন শহরের দক্ষিণে সমুদ্র অবধি নিশ্চয়ই বিস্তীর্ণ বাদা-জঙ্গল ছিল। এখানের আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম এবং চাষোপযোগী ছিল বলেই প্রচুর ফসল ফলতো। এরই ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছিল অত্যুন্নত নগব-সভ্যতা।

রাখালদাস মহেঞ্জোদারোতে প্রথম খনন কার্য চালান ১৯২১-২২ এবং ১৯২২-২৩ সাল অবধি তা চলে। এরপর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি অবসর নেন এবং ১৯২৪ সালে দেহত্যাগ করেন। মাধো স্বরূপ ভাট (M. S. Vat) ১৯২৩-২৪ সালে এখানে সামান্য কিছু খনন কার্য কবেন। এরপর ১৯২৪-২৫ সালেও কিছুটা খোঁড়াখুঁড়ি কবেন কে. এন. দীক্ষিত (K. N. Diksit)। এরপর স্যার জন মার্শাল (Sir John Marshall), হারগ্রীভস (Hargreaves), রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানী, আমেরিকাব প্রত্নবিদ আবনেস্ট ম্যাকেদের (E. Mackay) সঙ্গে নিয়ে বৃটিশ সবকারের অর্থানুকূল্যে ওই ১৯২৪-২৫ সালেই প্রবলভাবে খনন কার্য চালানো শুরু কবেন। ১৯২৭ সাল অবধি এই খননকার্য চললো। এর মধ্যে অতিবিখ্যাত স্নানাগার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হল। ১৯২৭ সালেব ২২শে ডিসেম্বব ম্যাকে-র নেতৃত্বে নতুন এলাকা (DK Area) খোঁড়া শুরু হল। এই সময় তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী সুপাবিনটেনডেন্ট ননীগোপাল মজুমদার (N. G. Majumdar)। মার্শালসাহেব যখন খোঁড়া শুরু কবেন তখন তাঁব ধারণা ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার (Alexandria) মত কোনও নগবীর ধ্বংসাবশেষেব সন্ধান তিনি পাবেন এই সব বালিযাড়ীর নিচে। একটা নগবের অবশেষ তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই, তবে তা আলেকজাণ্ডারের আলেকজান্দ্রিযাব মত নয়, তা আবও উন্নত, আবও অনেক প্রাচীন এক নগব সভ্যতার এক মহানগরেব, যাব বয়সকাল ৪০০০ বছ্বেরও বেশি।

১৯৩২ সাল অবধি প্রথম পর্যাযের এই খনন কার্য চলে মহেঞ্জোদারোয়। ১৯২২ সালে শুরু হয়ে প্রায় দশবছরেরও বেশি সময ধরে চলেছিল এই কাজ। এরপব ১৯৩৮ সালে ম্যাকে আবাব উৎখনন চালান। এই সব উৎখননেব ফলে মহেঞ্জোদারোর প্রায পুরোটাই উৎখনিত হয় এবং হরপ্পা সভ্যতাব স্বরূপ সম্পর্কে আমবা অনেক কিছুই জানতে পারি। হরপ্পা নগরীর কথায় পরে আসছি। এখন মহেঞ্জোদাবোব কথা বলে নিই। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার মোর্টিমার হুইলার (Sir M. Wheeler) পুনরায় খনন কার্য চালান মহেঞ্জোদারোতে। এখানেও তিনি হরপ্পা নগরীব অনুরূপ দুর্গ-প্রাকার আবিষ্কার করেন। এমন দুর্গ-প্রাকার বা নগরীর ইষ্টক-নির্মিত প্রাকাব তিনি ১৯৪৬ সালে হরপ্পায় আবিষ্কার করেছিলেন। এরপর হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো উভয়েই দেশ বিভাগেব ফলে পাকিস্তানে চলে যায়। ১৯৫০ সালে হুইলার যখন মহেঞ্জোদারোতে উৎখনন চালান তখন তাঁকে তা করতে হয়েছিল পাকিস্তান সরকারের অধীনে। যাইহোক, এরপর ধরে নেওয়া হয় মহেঞ্জোদারোর মাটির নিচে আর কোন প্রাচীনতর মনুষ্যবসতির নিদর্শন নেই। কারণ হুইলারের ১৯৫০ সালের ওই খননের পর তলদেশে জল বেরিয়ে পড়ে এবং আর কোনও স্তর ওর নিচে নেই এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাস নস্যাৎ করে দিয়ে ১৯৬৪ সালে ওই স্তরের নিচের স্তরে মনুষ্যবসতির বহু

নিদর্শন পুনরায় আবিষ্কৃত হয়। যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের বয়স ৫০০০ বছর বা তাবও বেশি। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ এফ্ ডেলস্ লাহোবের ইণ্ডাস ভ্যালী কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সহায়তায় এখানে টেস্ট বোরিং (Test Boring) করেন। এর ফলে আবিষ্কৃত হয় প্রকাশমান জলতলের ৩৯ ফুট নিচে প্রাচীনতর মনুষ্যবসতির নিদর্শন।

এই পর্যায়ের মহেঞ্জোদারো সম্পর্কে স্বামী শঙ্করানন্দ তাঁর 'History of Mohenjodaro and Hapappa' বইযে লিখেছেন ঃ

"The excavations of Mohenjodaro has brought out a city civilization of ancient India of Fifth-Fourth Millennia B. C. The layout of the city, the Architecture, Arts and Crafts, all point to a very high degree of refinement attained by the people. Such refinement and cultural upheaval cannot be explained as a freak of nature, as some of the diggers tried to explain it, obviously, to undervalue an achievement unknown to that age. It was surely the result of gradual development, and of a long evolutionary process to which the ancient village-cultures of Indus Valley were subjected to. The perfection attained in metallurgy and scientific achievements by which they could invest the earliest "Bronze, Glass and Porcelain," bespeaks of a very long undisturbed and continued attempt. It surely took millennia to attain the perfection noticed in the age of Mohenjodaro and Harappa."

পণ্ডিতবা বলছেন যে, হরপ্পা সভ্যতা দেশজ সভ্যতা। প্রাক-হরপ্পীয় কৃষিপ্রধান সভ্যতা ৫৫০০ বছর আগের থেকে বিবর্তিত হয়ে ৪৫০০ বছর আগে চরমভাবে বিকশিত হয় নগর সভ্যতায়। আর প্রায় ৪০০০ বছর আগে পর্যন্ত এই নগর সভ্যতা অটুট থাকে। এবপব প্রাকৃতিক পরিবর্তন, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এই সভ্যতার ভিত্তিভূমি কৃষিজ উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক পণ্যসম্ভার বপ্তানিকে দুর্বল করে দেয। এরপর আসে বর্বর আর্যজাতিব আক্রমণ। ফলে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এর সংস্কৃতি টিকে থাকে এবং তা বিজয়ী বর্বর আর্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে হিন্দু-ধর্ম তথা হিন্দু-সংস্কৃতির সৃষ্টি করে। উদ্ভূত হয় কিছুটা পরবর্তীকালের 'ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি' (Indo-Aryan Culture)। সে সব কথায় পরে আসছি।

মহেঞ্জোদারোর Test Boring-এ যে স্তর পাওয়া গেল সে সম্পর্কে ডঃ অতুল সুর তাঁর 'সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা' বইটিতে লিখেছেন ঃ

"কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে প্রাক্-হরপ্পা কৃষ্টির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ

জাগে। আগেই বলেছি যে, রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষার পর হরপ্পা সভ্যতার বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২২৪৫ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দ পর্যন্ত, আর মহেঞ্জোদারোর বয়স নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত। সুতরাং যদি আমরা অনুমান কবি যে, আগন্তুক আর্যগণ কর্তৃক বিপর্যস্ত হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬০ অব্দ নাগাদ হরপ্পাবাসিগণই ৪০০ মাইল দক্ষিণে সবে গিয়ে মহেঞ্জোদারো নগরীতে গিয়ে বাস করছিল, তা হলে আমাদেব অনুমান কি একেবারেই ভুল হবে? ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ এফ্ ডেলস Test Boring দ্বাবা বর্তমান উপরের স্তব থেকে ৩৯ ফুট গভীরে মানুষের বসতির সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু তা পৃথক কৃষ্টির মানুষের বসতি।"

ডঃ সুরেব এই অনুমান সম্ভবত ঠিক নয। কারণ হবপ্পীয় সভ্যতার শহরসমূহের অনেকগুলিতেই নিম্নতম স্তরে পাওযা গেছে প্রাক-হবপ্পীয় কৃষ্টিব নিদর্শন। সুতরাং মহেঞ্জোদাবোব প্রকাশমান জলস্তবের ৩৯ ফুট নিচে যে সব ৫০০০ বছরের পুরাতন প্রত্ননিদর্শন পাওযা গেছে, সেগুলি প্রাক-হবপ্পীয কৃষ্টিবই হওয়া স্বাভাবিক। আব হরপ্পা সভ্যতা যেহেতু দেশজ সভ্যতা তাই প্রাক-হবপ্পীয কৃষ্টির বিবর্তনে এব উদ্ভব হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। সুতবাং মহেঞ্জোদাবো নগবেব ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। তাই ওর নিচেব স্তবেব কৃষ্টি পৃথক মানুষেব হতে পাবে না। অর্থাৎ প্রকাশমান জলতলেব ৩৯ ফুট নিচে যে কৃষ্টিব সন্ধান পাওযা গেছে তাবই বিবর্তনে মহেঞ্জোদাবোব নগর সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল—এটাই স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হওযা সম্ভব।

মহেঞ্জোদাবো সম্পর্কে বলা যায যে, এব সমস্ত স্তবেব উৎখনন আজও সম্পূর্ণ কবা যায নি। মাটিব নিচে আজও বযে গেছে প্রাক-হবপ্পীয় কৃষ্টিব বহুল নিদর্শন। নতুন কবে উৎখননেব কথা আজ আব কেউ ভাবছেন বলে মনে হয় না। মহেঞ্জোদাবো শহবের পতন সম্পর্কে স্বামী শঙ্কবানন্দ লিখেছেন ঃ

"They cleared the forests, which covered the entire area. This clearing of the area gave them sufficient timber for the rafters, doors, furniture as well as fuel for baking millions of bricks. After the area was cleared it was mapped. At first appeared the straight roads and streets which cut each other at right angles running east to west and north to south to the points of the compass. After, roads and streets, lanes and by-lanes, were placed in order, the buildings, mostly of pyramid shape, then began to raise their heads. From afar they looked like hills. By the sides of the houses ran the drains which carried the rain water that fell from the pyramid roofs of the houses, as well as the water of house washings."

হরপ্পা সভ্যতার প্রায় সব শহরই এইভাবে নির্মিত হয়েছিল। এই সভ্যতার আরও বিস্তারিত আলোচনায আসার আগে হরপ্পা নগরীর কথায আসা যাক, যে নগরীর নামে

প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত এই সভ্যতার নাম দেওয়া হয়েছে 'হরপ্পা সভ্যতা'।

প্রাচীন হবপ্পা নগরীর অবস্থান ছিল ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চলে। ইরাবতী হরপ্পার উত্তরে দুভাগ হয়ে, শহর প্রদক্ষিণের পর তার দুটি ধারা শহবের দক্ষিণে এক হয়ে চলে যায় সিন্ধু নদীতে। এখান থেকে প্রাচীন মহেঞ্জোদারোর দূরত্ব ছিল ৪০০ মাইল বা প্রায ৬৫০ কিলোমিটার। ইরাবতী তার গতিপথ পরিবর্তন কবে এখন হরপ্পাব ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রায় দশ কিলোমিটাব দূব দিয়ে বইছে। অনেকে মনে করেন, ইরাবতীর এই দূরে চলে যাওয়াটাই হবপ্পা ধ্বংসের প্রধান কারণ। এখন প্রাচীন হরপ্পা দাঁড়িয়ে আছে ইরাবতীর শুষ্ক খাতে।

হরপ্পার ভগ্নাবশেষের কথা বহুকাল ধরেই মানুষের কাছে কিছুটা পরিচিত ছিল। একটা শহরের ভগ্নাবশেষ বহুদূব থেকেই দেখা যেত ওই অঞ্চলে। ইট-চোবেরা জানতো ওখানে অসংখ্য ইট আছে ভেঙে পড়া প্রাচীন ঘরবাড়ির। ওটা ছিল হরপ্পা নগরের উপরের স্তর। ১৮১৬ সালে ম্যাসন (Mason), ১৮৩১ সালে বার্নেস (Barnes) এবং ১৮৫৩ সালে জেনারেল কানিংহাম হরপ্পার ওই ভগ্নাবশেষ পবিদর্শনে আসেন। বার্নেস বলেছিলেন এই ধ্বংসাবশেষেব পরিধি প্রায় তিন কিলোমিটার। প্রায ৩৭ বছর পরে কানিংহাম বললেন এব পবিধি প্রায় দু' কিলোমিটার। অর্থাৎ ইট চোরেরা ওই ৩৭ বছরে হরপ্পার উপরের স্তবের আযতন প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমিযে ফেলেছিল। তিনি ১৮৫৬ সালেও এই অবশেষগুলি আবাব পরিদর্শন করেন। ১৮৭২-৭৩ সালেব বার্ষিক বিবরণীতে তিনি হরপ্পার যে বিপোর্ট ছাপান তাতে এই ভগ্নাবশেযের অবস্থানের একটা নকশাও তিনি সংযোজিত করেন। সেখান থেকে জানা যায় হরপ্পার উপরেব স্তরের ওই ভগ্নাবশেষের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫০০ ফুট। কিন্তু পূর্বদিকে এই দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২০০০ ফুট এবং এই দিকে ৮০০ ফুট জায়গা পুরোপুরি খালি ছিল, যার কাবণ তিনি দেখাতে পারেন নি। তাঁর নকশা অনুযায়ী এর পরিধি ছিল প্রায় ১২,৫০০ ফুট বা আড়াই মাইল। উত্তরপূর্বে ধ্বংসস্তূপেব উচ্চতা ছিল ৬০ ফুট। দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ধ্বংসস্তূপের উচ্চতা ছিল ৪০ থেকে ৫০ ফুট। ইরাবতীর দিকের ভগ্নাবশেষগুলিব উচ্চতা ২০ থেকে ৩০ ফুট। কানিংহাম কিছু সিঁড়ি এবং একটি বিশাল বর্গাকার অট্টালিকার ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করেন। পরিতাপের বিষয় হল, কানিংহাম সাহেবের হরপ্পা পরিক্রমার কিছুটা পরেই হরপ্পার উপরের স্তরের ভগ্নাবশেষেব লক্ষ লক্ষ ইট ব্যবহার করা হয় মন্টেগোমারী জেলার ১০০ মাইল লম্বা রেললাইন পাততে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে হরপ্পাব ওই এলাকাটা সংরক্ষিত এলাকা (Protected Area) বলে ঘোষিত হয়। তার আগে অবধি হরপ্পার উপরের স্তরের অধিকাংশ ইটই ব্যবহৃত হয়ে যায় রেললাইনে। এ সম্পর্কে কানিংহাম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লিখেছিলেন, "I made several excavations at Harappa, but the whole surface had been so completely cleared out by the railway contractors that I found very little worth preserving." অনেকটা পরবর্তী

কালে প্রত্নতাত্ত্বিক মাধো স্বরূপ ভাট (M.S.Vat) লিখেছেন "After eleven years of work by the Archaeological Department, it is all too apparent that General Cunnigham was justified in what he said ; and from the time of his visit in 1856 till the protection of the mounds in 1919, under the Ancient Monument Preservation Act, the depredations, referred to by him, went on to an ever increasing extent. The little that has actually survived is a perpetual puzzle, which at every step baffles the excavator."

পাকিস্তানের মন্টেগোমারী জেলায় যত পুরাতত্ত্ব নিদর্শন আছে সেগুলির মধ্যে আযতনে সবচেয়ে বড় হল হবপ্পার এই ধ্বংসস্তূপ। লম্বায় প্রায় চাব কিলোমিটার। দক্ষিণ-পূর্ব দিকেব ঢিবি, সমাধিক্ষেত্র ও ডিম্বাকাব সমাধি-স্তূপের অংশগুলি জুড়লে হরপ্পাব প্রাচীন নগবী লম্বায প্রায ছয কিলোমিটার দাঁড়ায। কানিংহাম সাহেব যে ৮০০ ফুট লম্বা ফাঁকা জাযগাব কথা বলেছিলেন সেখানে বসেছে আধুনিক থানা ও আধুনিক হরপ্পা শহব।

হরপ্পাব বর্তমান আবহাওযা খুবই রুক্ষ এবং দুবন্ত গ্রীষ্ম ও শীতেব সমাহার। মে মাস থেকে অক্টোবব অবধি দিনে ভীষণ গবম, বাতে বেশ ঠাণ্ডা। সেপ্টেম্বরের শেষেব দিক থেকে তাপমাত্রা কমতে থাকে। সন্ধ্যেব পবই শীত বাডতে থাকে। গরমের দিনে বাত্রে ঝড়ো হাওয়া বয। এ ছাডা সাবাক্ষণই একটা ঝোড়ো হাওযাব মত হাওযা বইতে থাকে। ধূলি ঝড় হয প্রাযশই। মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টিও হয। জুন থেকে আগস্টের মধ্যে কিছুটা বৃষ্টি হয হরপ্পাব এই অঞ্চলে। সাবা বছবে বৃষ্টিপাতের গড় হল দশ ইঞ্চি মাত্র। আগস্ট মাস থেকেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায এবং আবাব বৃষ্টি হয পবেব জুন মাসে।

কিন্তু পাঁচ হাজার বছর আগে হরপ্পাব বমরমাব কালে এখানের আবহাওয়া এমনটা ছিল না। তখন ইরাবতী বইতো শহরেব দু'পাশ দিয়ে। আশপাশের অঞ্চল ছিল সুফলা, শস্যশ্যামলা। কৃষি-ভিত্তিক সভ্যতা থেকেই প্রায ৪৬০০ বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল হরপ্পার নগর সভ্যতা। তখন এর চারপাশে ছিল চাষবাস সমৃদ্ধ এলাকা—এক বিশাল সুসমৃদ্ধ জনপদ। এখানে এক সময় বেশ ভালো বৃষ্টি হত। তাই হরপ্পার প্রাচীন অধিবাসীরা পোড়ানো ইট দিয়েই তাদের ঘরবাড়ি, রাস্তঘাট, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি বানিয়েছিল। হরপ্পায় মোট আটটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। তার সপ্তম এবং অষ্টম স্তরের সমস্ত নির্মাণ পোড়া ইটেব। হরপ্পায় প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতারও বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে পোড়া-ইট ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ লক্ষ। এই লক্ষ কোটি ইট ভালো করে পোড়াতে লেগেছে প্রচুর কাঠ। আর সে কাঠ সংগ্রহের মত বিশাল জঙ্গল নিশ্চয়ই হরপ্পার কাছাকাছি কোথাও ছিল। তাছাড়া নগরের ঘরবাড়ির জন্যও বহু কাঠ লেগেছে। তাও নিশ্চয়ই পাওয়া গেছে, ওই জঙ্গল থেকেই। এর থেকে অনুমান করা হয়, ইরাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলে ঘন জঙ্গল ছিল। নদীবেষ্টিত হরপ্পা নগর ছিল অরণ্য দিয়ে ঘেরা। এই অরণ্য

উচ্ছেদও হরপ্পার ধ্বংসের একটা প্রধান কারণ। তবে হরপ্পার তাম্রাশ্ম সভ্যতা যেটাকে আমরা হরপ্পা সভ্যতা বলছি, সে সভ্যতা টিকে ছিল প্রায় ৩৯৬০ বা ৪০০০ বছর আগে অবধি। তার শুরু ৪৬০০ বছর পূর্বে। আর প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতা, যাব বিবর্তনে হরপ্পা সভ্যতার উদ্ভব, সেটা ধবলে হরপ্পা সভ্যতার শুরু ৫৫০০ বছব আগে। অর্থাৎ ৫৫০০ বছব থেকে ৪৬০০ বছর অবধি চলেছে প্রাক হরপ্পীয় সভ্যতার কাল। এই ৯০০ বছর উন্নততর হয়েছে কৃষি-ভিত্তিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। তারই বিবর্তনে এসেছে হবপ্পাব নগর-সভ্যতা বা তাম্রাশ্ম সভ্যতা এবং যার চরম বিকাশ ঘটেছে প্রায় ৪৬০০ বছর আগে। আর তাব শেষ হয়েছে ৩৯৬০ বছর আগে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোব ধ্বংস হওয়ার সঠিক কারণ আজও অনির্ণীত। পণ্ডিতেবা তিন-চারটি কারণেব কথা বলেছেন। কিন্তু সেগুলির যাথার্থ্য নিয়ে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক আছে। সে সব কথায় পবে আসছি।

হবপ্পায় চাষ হত নানা শস্য। তাদেব মধ্যে প্রধান হল গম ও যব। মটব, সবষে, তিল ইত্যাদির সঙ্গে এখানে খেজুবেব চাষও হত। হরপ্পার অধিবাসীবা আমিষভোজী ছিল। কচ্ছপ-মাংস, মোরগ-মাংস, পাখীর মাংস, ছাগলেব মাংস ইত্যাদি যেমন তাদেব খাদ্য তালিকায় থাকতো তেমনি থাকতো তাদেব প্রিয খাদ্য মাছ। গরুব দুধও তাদেব খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮৭৫ সালেব বার্ষিক বিপোর্টে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেন তাতে জানা যায যে, তিনি হরপ্পা উৎখননেব ফলে বহু শীলমোহব উদ্ধার কবেছিলেন, যেগুলি অজানা লিপি সম্বলিত এবং আবও বহু প্রত্নিদর্শন-তিনি আবিষ্কাব করেছিলেন সেই সময়। এইসব শীলমোহব ও প্রত্ননিদর্শনগুলি স্বাভাবিক কারণেই চলে যায় বৃটিশ মিউজিয়ামে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী নতুন কবে উৎখনন শুরু করেন হবপ্পায়। ১৯২৪-২৫ অবধি তিনি এখানে খনন কার্য চালান। হবপ্পাব বিখ্যাত বিশাল শস্যাগাবের অনেকটাই তিনি খুঁড়ে বের করেন। এরপব হরপ্পার খননকার্যের ভাব পড়ে মাধো স্বরূপ ভাটের উপর। ১৯২৬-২৭ সাল থেকে ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত উৎখনন চলে। ইট-চোরদের হাত থেকে হরপ্পার যেটুকু বেঁচে গিয়েছিল তার প্রায় পুরোটাই মাটি খুঁড়ে বের করা হয়। ১৯৪৬ সালে মোর্টিমার হুইলার (Mortimer Wheeler) আরও কিছু খনন কার্য চালান। এরপর বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাকিস্তান সরকারের তত্ত্বাবধানে এক আমেরিকান প্রত্নবিদ হরপ্পায় আবারো উৎখনন চালান।

হরপ্পা শহরের নগর-দুর্গ অঞ্চলের আয়তন ছিল ১৩০০ ফুট লম্বা এবং ৬৫০ ফুট চওড়া, অর্থাৎ পুরোপুরি আয়তাকার। এখানে পাওয়া গেছে কাদা ও ইটের তৈরি ২০ ফুট উঁচু প্রাচীর-বেষ্টিত এক বিশাল ভিত্তিভূমি বা প্লাটফর্ম। এর উপরে ছটি স্তর পাওয়া গেছে হরপ্পায়। এই ভিত্তিভূমির নিচে কোনও খননকার্য চালানো হয়নি। ফলে, এই প্লাটফর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জানা আজও সম্ভব হয় নি। নগর-দুর্গের উত্তরে পাওয়া গেছে শ্রেণীবদ্ধ বেশ কয়েকটি গোলাকার প্লাটফর্ম। এগুলি ব্যবহৃত হত শস্য মাড়াইয়ের জন্য। এরই লাগোয়া উঁচু প্লাটফর্মের উপর রয়েছে ইষ্ট নির্মিত শস্যাগারের দুটি শ্রেণীবদ্ধ সারি। প্রত্যেক সারিতে

আছে ছয়টি ইষ্টক নির্মিত ঘর। প্রতিটি ঘরের আয়তন ৫০ ফুট x ২০ ফুট। সুতরাং ১০০০ বর্গফুট আয়তনের মোট বারোটি ইষ্টক নির্মিত ঘরই ছিল হরপ্পাব বিখ্যাত শস্যাগার। এ ছাড়া এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে ধাতু গলনেব তথা ধাতু শিল্পের কারখানা এবং তারই পাশে শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের বাসগৃহ— দুটি এক কামরা বিশিষ্ট বিশাল ব্যারাক (Barracks)। হরপ্পায় পাওয়া গেছে সমাধিস্থান, সমাধিস্তূপ। এগুলি মূলতঃ হবপ্পীয়দের সমাধিক্ষেত্র। এখানে কিছু উত্তর-হবপ্পীয়দেব সমাধিও পাওয়া গেছে।

হরপ্পার নিচের স্তরেব প্রত্নদ্রব্যেব MASCA Factor যুক্ত বয়স হলো ২৭৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা ৪৮০০ বছর। অন্যান্য কিছু স্থানে যেখানে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মাত্র কয়েকটির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিব MASCA Factor পরিশোধিত বয়সকাল হল ঃ

স্থান	MASCA পরিশোধিত খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়
১) হরপ্পা	৩৩০০—২০০০
২) আমরি	৩৬৫০- -৩২১০
৩) কোটদিজি	৩৩৮০- -১৬০০
৪) কালিবঙ্গান	৩১১০—১৬০০
৫) সোমনাথ	৩১৬০—১৬৯০
৬) গুমলা	২৯১০—২৬০০
৭) হটালা	২৮৫০—২৫৮০
৮) লোথাল	২৮০০—১৬৪০
৯) মহেঞ্জোদারো	২৬০০—১৯৬০
১০) রোজডি	২৫৫০—১৯৬০
১১) সুরকোটাডা	২১৯০—১৭৭০ ইত্যাদি।

কানিংহাম হরপ্পার নামকরণ সম্পর্কে একটা গল্প লিখেছেন। লোকমুখে শোনা এই গল্প অনুসারে রাজা হরপালেব নাম থেকে ওই জায়গাটার নাম হরপ্পা। বাজা হরপালের সময় ওখানে ছিল এক বিরাট হিন্দু মন্দির। তাঁর সময় এখানে 'গুরু প্রসাদী'র মত 'রাজপ্রসাদী' প্রথা চালু ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী সব প্রজাকেই তাদের নবপরিণীতা স্ত্রীকে প্রথম রাত্রিতে জমিদার বা রাজার কাছে পাঠাতে হত সম্ভোগের জন্য। গুরু-প্রসাদীতেও কুলগুরু সম্ভোগ না করলে কেউ তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে সম্ভোগ করতে পারতো না। রাজা হরপালের সময় এই 'রাজপ্রসাদী' প্রথা চালু থাকায় রাজা একবার অজাচারে লিপ্ত হন। অর্থাৎ এই নিয়ম মেনে তিনি কোনও নিকটাত্মীয়ার সঙ্গে সঙ্গম করেন। কেউ বলেন সেই নিকটাত্মীয়া ছিল হরপালের ভগিনী, কেউ বলেন সে ছিল তাঁর শ্যালিকা কিংবা শ্যালিকা-কন্যা। এই অজাচারের ফলে কষ্ট মেয়েটির

প্রার্থনা শুনে ভগবান তাঁর রাজধানী অগ্নিদগ্ধ কবেন। কেউ কেউ বলেন, ভূমিকম্পে হবপালেব হরপ্পানগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মতান্তরে, তাঁব রাজ্য ধ্বংস হযেছিল বিদেশী আক্রমণে। কানিংহাম বলছেন যে, এটা সম্ভবত ১৩০০ বছর আগেকাব ঘটনা। ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে আববেব মহম্মদ-বিন-কাসিম রাজা হবপালের বাজ্য ধ্বংস করেছিল। পাঞ্জাবেব সমতল অঞ্চলে যত পুরাতন শহবেব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে তাদেব প্রায সবাব সঙ্গে এই বকম অজাচাব কাহিনী জড়িয়ে আছে। সবগুলিই প্রায ধ্বংস হয মহম্মদ-বিন-কাসেমেব হাতে। এমন কি সিন্ধুব হিন্দু রাজা দাহিরেব ক্ষেত্রেও একই গল্প চালু আছে। কানিংহাম লিখেছেন, "The story of the incest also belongs to the same period, as Raja Dahir of Alor is said to have married his own sister."

ভাবতের হবপ্পা সভ্যতাব বিকাশ ঘটেছিল প্রায ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে। এব রমবমার কাল ৪৬০০ থেকে ৪০০০ বছর আগে পর্যন্ত। প্রাচীন ভাবতের ইতিহাসেব পর্যাযকে মোট পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। এটা অবশ্য ঠিক ইতিহাস নয়—বলা যায প্রাক্-ইতিহাস। এব বেশিব ভাগ সময়টা প্রাগৈতিহাসিক। আজকাল অবশ্য ভারতেব প্রকৃত ইতিহাস শুরু কবা হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতার কাল এবং কথা দিযে। এই সবলতম পাঁচ ভাগ হল ঃ ১) ১০,০০০ বছব পূর্ব অবধি প্রাগৈতিহাসিক যুগ, যার মধ্যে আছে আদি, মধ্য ও অন্ত-প্রত্নোপলীয যুগ এবং মধ্যোপলীয় যুগ (Mesolithic Period), ২) নবোপলীয় যুগের চাষবাস ও পশুপালনের কাল, ১০,০০০ বছব থেকে ৫৫০০ বছর আগে অবধি এই কাল বা নবোপলীয কাল (Neolithic Period), ৩) প্রাক-হবপ্পীয কাল—যা ৫৫০০ বছর আগেব থেকে ৪৬০০ বছর পূর্ব অবধি বিস্তৃত , ৪) হবপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতার কাল—৪৬০০ বছব থেকে ৪০০০ বছব আগে অবধি। সম্ভবত এই সময়কাল হবে ৩৭৫০ বছর পূর্ব পর্যন্ত, এবং ৫) উত্তর নগর-সভ্যতার কাল যা ৩৭৫০ বছর থেকে ২৭৫০ বছর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এব মধ্যে বর্বর আর্যদেব আক্রমণের সময় হল ৩৭৫০/৩৮০০ বছর আগের কোনও সময়।

হরপ্পা সভ্যতার পরিমণ্ডলই ছিল প্রাচীন জগতে যে সব সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল তাদেব মধ্যে সর্ব বৃহৎ, সবচেয়ে উন্নত এবং সবচেয়ে প্রাচীন। এতাবৎ প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে এই তাম্রাশ্ম সভ্যতার প্রায় ২০০ কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহম্মদ রাফিক্ মুঘল ১৪৪টি কেন্দ্রের একটা তালিকা বানিয়েছিলেন। এই তালিকায় বাহাওয়ালপুর, পূর্ব পাঞ্জাব, গুজরাট ও বালুচিস্তানের শিবি জেলার কয়েকটি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজার ঢিবি, তমলুকের নাটশাল, বেড়াচাঁপা ইত্যাদির কথা নেই। এগুলি ধরলে এবং ভাবতের অন্যান্য কেন্দ্র ধবলে হরপ্পা সভ্যতার যে সব কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে যায়। যত দিন যাচ্ছে ততই নানা নতুন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হচ্ছে। পাকিস্তানের তৈবি ১৯৭৩ সালের ওই ১৪৪টি কেন্দ্রের তালিকা হল ঃ

(১) মুনড্রা, (২) নবিনাল, (৩) মাডেভা, (৪) টোডিও, (৫) নলিয়া, (৬) আজর,

(৭) কোটাডা, (৮) বুজ, (৯) কোটাডা ভাদলি, (১০) নাকটারনা, (১১) দেশলপুর, (১২) নরপা, (১৩) ভাদা ভিগোড়ি, (১৪) লাখাপট, (১৫) লুনা, (১৬) বন্নি, (১৭) কোটারা, (১৮) নেনু-নি-ধব, (১৯) কোটাড়ি, (২০) মরুও, (২১) কেরসি, (২২) সুরকোটাডা, (২৩) সেলারি, (২৪) রূপার, (২৫) পাবুনাথ, (২৬) লাখাপার, (২৭) কণ্ঠকোট, (২৮) খারিকা-ডাণ্ডা, (২৯) পীরওযাডা খেতর, (৩০) ঝাঙ্গর, (৩১) ফলা, (৩২)লাখাবায়াল, (৩৩) আমরা, (৩৪) গপ্, (৩৫) কিণ্ডনারখেরা, (৩৬) সোমনাথ, (৩৭) কানজেটার, (৩৮) বেনিয়াবাদাব, (৩৯) বোজডি, (৪০) আডকোট, (৪১) ভীমপাটল, (৪২) বাবরকোট, (৪৩) বঙ্পুর, (৪৩) দেবালিয়ো, (৪৪) চাচানা, (৪৬) গনি, (৪৭) পানসিনা, (৪৮) লোথাল, (৪৯) কোঠ, (৫০) নানা সুতারিয়া, (৫১) মেহগাম, (৫২) টেলড, (৫৩) ভগৎবাও, (৫৪) ঘাবো ভিরো, (৫৫) কালিবঙ্গান, (৫৬) আমিলানো, (৫৭) পীব শাহ জুবিও, (৫৮) নেলবাজার বা আল্লাদিনো, (৫৯) গথ হাসান আলি, (৬০) বালাকোট, (৬১) গুজো, (৬২) সোটকা কো, (৬৩) ডাশ্ট্, (৬৪) সুটকাজেন-ডোর, (৬৫) শাহজো, (৬৬) কবচাত, (৬৭) ঢাল, (৬৮) আমরি, (৬৯) চানুধাবো, (৭০) ডামব বুবি, (৭১) গোবাণ্ডি, (৭২) গাজী শাহ, (৭৩) লোহরি, (৭৪) আলি মুরাদ, (৭৫) পাণ্ডি ওযাহি, (৭৬) লহুমজোদাবো, (৭৭) জুডিবজো-দারো, (৭৮) পাঠানি ডামব্, (৭৯) গাণ্ড ডামব্, (৮০) কিবতা. (৮১) কোযেটা মিবি, (৮২) কাওনবি, (৮৩) ডাবব কোট, (৮৪) পেবিযানো ঘুণ্ডাই, (৮৫) রহমন ধেবি, (৮৬) গুমলা, (৮৭) কাটপালোন, (৮৮) নগব, (৮৯) রূপাব, (৯০) ববা, (৯১—১১০) বিকানীরের ২০টি কেন্দ্র, (১১১—১৩৫) ঘগ্গর, হাকবাব শুষ্ক খাতে ২৫টি কেন্দ্র, (১৩৬) কোটাসুর, (১৩৭) বৈনিওযাল, (১৩৮) আলমগীরপুব, (১৩৯) মহেঞ্জোদারো, (১৪০) কোটদিজি, (১৪১) হবপ্পা, (১৪২) চাক পুববানে সইয়াল, (১৪৩) ঝুকর, (১৪৪) নারু-ওয়ারোদারো।

এই সভ্যতাব আবিষ্কারক হলেন বাখাল দাসবন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি খনন করেছিলেন মহেঞ্জোদারো নামের টিলাটি। আগেই বলেছি, লোকরা এই টিলাটিকে বলত "মহেঞ্জোদারো" অর্থাৎ মৃতের স্তূপ। খননেব ফলে টিলার নিচে মাটির তলায় এক সুগঠিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয। প্রত্নতাত্ত্বিক দয়ারাম সাহনী হরপ্পায় অনুরূপ আর একটি নগরী আবিষ্কার করেন। ভারত-ইতিহাসের এক বিস্মৃত যুগ সহসা আত্মপ্রকাশ করে। সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে এই নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় পণ্ডিতরা প্রথমে এর নাম দিয়েছিলেন "সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা"। বর্তমানে একে বলা হয় 'হরপ্পা সভ্যতা'। কারণ এই সভ্যতার যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে হরপ্পার নিদর্শনগুলিই সবচেয়ে প্রাচীন। ফলে মহেঞ্জোদারোর চেয়েও হরপ্পার খননকার্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য প্রধানত ছয়টি ঃ

(১) সুপরিকল্পিত নগরনির্মাণ এবং উন্নত পৌরজীবন, (২) তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হাতিয়ার, তৈজসপত্র এবং মুদ্রা ব্যবহার, (৩) কুমোরের চাকের সাহায্যে মাটির পাত্রনির্মাণ এবং পরিবহনেব জন্য চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার, (৪) পোড়া ইট দিয়ে গৃহনির্মাণ, (৫) চিত্রলিপির ব্যবহার এবং (৬) সোনা, রূপা, পাথর ও শঙ্খের অলঙ্কার ব্যবহার। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, এই সভ্যতা পশ্চিমে আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান হতে পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং দক্ষিণে কাথিয়াওয়াড় ও নর্মদা নদীর মোহানা থেকে উত্তরে হিমালয়ের শিবালিক পাহাড় অবধি বিস্তৃত ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার সিন্ধুপ্রদেশের বর্তমান হায়দারাবাদে, করাচীব উত্তর-পূর্বে গুজো, বিজনো, জাকোবাবাদ প্রভৃতি স্থানে এবং স্যার অরেল স্টাইন সিন্ধুব পশ্চিমতীরে উত্তর-বালুচিস্তানে ও দক্ষিণ-বালুচিস্তানে এই সভ্যতাব নিদর্শন আবিষ্কার কবেছেন। মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক ফেয়ার সার্ভিস বালুচিস্তানের লাবেলা জেলায় পোবলি নদীব তীবে দুটি জনপদেব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কাব কবেছেন। এখানকাব বাড়িগুলিব পাথরের ভিত এবং চার-পাঁচ ফুট উঁচু প্রাচীব এখনও খাড়া আছে। এখানেও অনেক চিত্রিত পাত্র, অলঙ্কার, পাথরের সামগ্রী, মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে।

বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত বিলুপ্ত সরস্বতী নদীর তীবেও এই সভ্যতাব নিদর্শন পাওযা গেছে। রাজপুতানার রঙ্গমহলের কাছে এবং হনুমানগড় ও সুবতগড়ের মধ্যবর্তী কালিবঙ্গান গ্রামে এক প্রাচীন নগবীর অস্তিত্ব দেখা গেছে। কালিবঙ্গান নগরীব নির্মাণরীতি হবপ্পা এবং মহেঞ্জোদাবোব মতই সুপরিকল্পিত।

আবও অনুসন্ধানের ফলে চানহুদাবো, সুৎকাজেনডোব প্রভৃতি স্থানে, পাঞ্জাবেব আম্বালা জেলার রূপার অঞ্চলে, উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলার আলমগীবপুরে, গুজবাটেব রংপুর এবং লোথাল নামক স্থানে হরপ্পার অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন পাওযা গেছে। ইদানীংকালে নর্মদা উপত্যকায়, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুব, হুগলি এবং চব্বিশ পবগণাব বেড়াচাঁপায় মহেঞ্জোদারোর অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কাছে নাটশাল অঞ্চলেও প্রত্নোপলীয়, মধ্যোপলীয়, নবোপলীয় এবং তাম্রাশ্ম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মনে রাখতে হবে, এই তমলুকেই ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর। এটা ঠিক তমলুকেই ছিল না একটু দক্ষিণে এগিযে নাটশাল অঞ্চলে ছিল তা এখন সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয নি। কিন্তু নাটশাল অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রত্ন-নিদর্শন দেখে এটা অনুমান করতে বাধা নেই, পাণ্ডু রাজার ঢিবি নয় নাটশাল অবধিই ছিল এই তাম্রাশ্ম সভ্যতার বিশাল বিস্তাব।

এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচয় হচ্ছে এটা ছিল নগরভিত্তিক সভ্যতা। এর আরও পরিচয় হচ্ছে— এটা ছিল বাণিজ্যিক ও শিক্ষিত সমাজের সভ্যতা। নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের জনগণই বৈষয়িক ধনোৎপাদনে নিযুক্ত থাকত এবং গ্রামের লোকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নগরে পাঠাত, নগরের বাণিজ্যে সাহায্য করবাব

জন্য। নগরের চেহারার সঙ্গে গ্রামের চেহাবার প্রভেদ ছিল। তবে নগরই হউক, আর গ্রামই হউক, উভয়স্থলেই পাথরের যন্ত্রপাতিব সঙ্গে তামা বা ব্রোঞ্জেব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত। সেজন্য তাম্রাশ্ম সভ্যতাব এমন সব কেন্দ্র আবিষ্কৃত হযেছে, যেখানে নগর নেই, কেবল গ্রামেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার যে সব লক্ষণ থাকে, তাব সবই আমরা এই সভ্যতার নগবসমূহে লক্ষ্য করি। আমেবিকাব পেনসিলভ্যানিযা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল (Gregory Possehl) বলেছেন যে, চীন, সুমেব ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের তুলনায় হরপ্পা সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা এই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই আমরা জগতের প্রাচীনতম ইষ্টকনির্মিত পযঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয আবিষ্কার করেছি। এই সভ্যতাব নিদর্শন এক বিস্তৃত অঞ্চলে দেড় শতাধিক স্থানে পাওযা গিযেছে এবং এটা ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হযেছিল। এই সভ্যতাব প্রধান নগবসমূহ হচ্ছে পাকিস্তানে অবস্থিত মহেঞ্জোদাবো ও হবপ্পা এবং ভারতে অবস্থিত কালিবঙ্গান ও লোথাল। এই সকল নগবের বাস্তাঘাট বেশ সুপবিকল্পিত ছিল। ঘববাড়ি দগ্ধ ও অদগ্ধ ইট এবং পাথর দিয়ে তৈবি কবা হত। প্রত্যেক বাড়িতে কূপ থাকত এবং বাড়ির দূষিত জল রাস্তাব বাঁধানো পাকা পযঃপ্রণালীতে গিযে পড়ত। সমস্ত পযঃপ্রণালীই ঢাকা দেওযা থাকতো। তাছাড়া, নগরেব মধ্যে ছিল সুদৃঢ ও উচ্চ প্রাকাববিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগাব, মন্দিব ও সমাধিস্থান। এক কথায় সুসংবদ্ধভাবে নাগবিক জীবনযাপনেব সমস্ত লক্ষণই এই সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল। শৃঙ্খলাযুক্ত শাসনব্যবস্থাও ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহসামগ্রী নির্মাণে তামা এবং ব্রোঞ্জেব বহুল ব্যবহাব ছিল। পবিবহনের জন্য চক্রবিশিষ্ট যান ছিল। ভাষাব রূপদানেব জন্য লিখন-প্রণালীবও ব্যাপক ব্যবহাব ছিল। তার মানে সমাজে লেখাপড়াব প্রচলন ছিল ও তাব জন্য শিক্ষাযতনও ছিল। খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, গম, ধান্য, তিল, মটব, রাই প্রভৃতি শস্য, মেষ, শূকব, কুক্কুট, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস, সমুদ্রেব শামুক এবং শুঁটকি মাছ ইত্যাদি। পোশাক-আসাকের মধ্যে ছিল কার্পাস সুতার বস্ত্র ও চাদব। অঙ্গসজ্জাব জন্য ছিল— সোনা, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের নানারূপ অলঙ্কার, অস্থি ও গজদন্তেব চিরুনি, দর্পণ, ক্ষুব, বঁড়শি, সুচ এবং মেয়েদের মাথার কাঁটা, খেলার জন্য পাশা ও ঘুঁটি ইত্যাদি। সংলগ্ন পুষ্করিণীব সঙ্গে এদের দেবস্থানও ছিল। এবা ঊর্ধ্বলিঙ্গ পশুপতি শিব ও মাতৃকাদেবীর পূজা করত। এ সব নগরের লোকেরা বাইবের জগতের সঙ্গেও ব্যবসা কবত, কেননা, এই সভ্যতার নিদর্শনসমূহ সুমেবে ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত বেহবিং দ্বীপেও পাওযা গিয়েছে।

মহেঞ্জোদাবো, হরপ্পা এবং কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানে নগবনির্মাণ বীতি ও বিন্যাসের ঐক্য দেখে মনে হয় যে, এদের বাস্তু বা স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে কোন সাধারণ শাস্ত্র ছিল, যাব নির্দেশ অনুযায়ীই এরা নগর নির্মাণ করত। তাছাড়া, গণিত, ভাস্কর্য, জ্যোতিষ ও ধাতুবিদ্যাতে এরা পারঙ্গম ছিল।

এই সভ্যতার নগরগুলির আয়তন, গৃহসংখ্যা ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার

যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন, তা নিচে দেওয়া হল ঃ

স্থান	আয়তন বর্গফুটে	মোট গৃহসংখ্যা	অনুমিত জনসংখ্যা
মহেঞ্জোদারো	৫৫,০০,০০০	১০,৪২৮	৪১,২৫০
আমরি	৮,১০,০০০	২,০১২	৬,০৭৫
কোটদিজি	২৪,০০০	৩০০	১,৮০০
চানহুদারো	৭,৯০,০০০	৮,০৭৫	৪,৯৫০
হরপ্পা (স্তূপ)	২,৭০,০০০	৩,৩৭৫	২০,২৪০
হরপ্পা (শস্যাগার অঞ্চল)	৯,৭৯,০০০	১,২২৪	৭,৩৪৪
হরপ্পা (মোট)	৩,১৩,৯৫,০০০	৩,৯২৪	২০,৫৪৪
হরপ্পা (দুর্গাঞ্চল)	১৫,১২,০০০		

হরপ্পা সভ্যতা পৃথিবীব প্রাচীনতম সভ্যতা। মিশর, সুমেব, চীন প্রভৃতি দেশের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির চেয়ে হরপ্পা সভ্যতা পুরাতন। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলি কোন না কোনওভাবে হরপ্পা সভ্যতার কাছে ঋণী। হরপ্পা, কোটদিজি, কালিবঙ্গান ইত্যাদি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়ে দেখা গেছে পরিণত হরপ্পীয সভ্যতার নিচেব তলাব স্তরে প্রাক-হরপ্পীয সভ্যতাব বহু নিদর্শন রয়েছে। পণ্ডিতেরা নানাভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হরপ্পা সভ্যতা ভাবতবর্ষে কোনও আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। পববর্তীকালেব 'ভারতীয আর্য সভ্যতা'র (Indo-Aryan Civilization) মত হরপ্পা সভ্যতা কোন বহিবাগত বা আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। এই সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণ দেশজ সভ্যতা। দেশজ-সভ্যতাব বিবর্তনের পরিণতিতেই হবপ্পা সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই দেশজ সভ্যতা পশ্চিমে আফগানিস্তান বালুচিস্তান থেকে পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

হরপ্পীয় সভ্যতাকে মোট পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব ছিল গ্রামীণ সভ্যতা। চতুর্থ পর্বেই হরপ্পা সভ্যতা নাগরিক রূপ ধারণ করে। এটাই হরপ্পা সভ্যতার পরিণত (Mature) পর্বের সভ্যতা। এই পর্বেই হরপ্পা সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। পঞ্চম পর্ব ছিল হরপ্পা সভ্যতার অবনতি বা পতনের পর্ব। বলা বাহুল্য, হরপ্পা সভ্যতার প্রথম তিন গ্রামীণ পর্বের সভ্যতাকেই আমরা 'প্রাক্-হরপ্পীয' সভ্যতা বলি। আর চতুর্থ পর্বে যখন এ সভ্যতা নাগরিক রূপ ধারণ করেছিল এবং এর চরম বিকাশ ঘটেছিল; সেটাই প্রকৃত হরপ্পা সভ্যতা। আর পঞ্চম পর্বের সভ্যতাকে বলা হয় উত্তরকালীন হরপ্পা সভ্যতা। প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে পাকিস্তানের হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, আমরি ও কোটদিজিতে, ভারতের কালিবঙ্গান, সান্ধনওয়াল ও নাগওয়াড়াতে ;আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাকে ও বালুচিস্তানের পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব্ সাদাত, রানা ঘুণ্ডাই, আঞ্জিরা, পাণ্ডি ওয়াহি, শাহ ডামব্ কুল্লি ইত্যাদি স্থানে।

পূর্ব ও দক্ষিণ বালুচিস্তান ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে যে সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশেব প্রাক্-হরপ্পীয় গ্রামীণ সভ্যতার এক আঞ্চলিক সংস্করণ মাত্র। এখানে প্রাদুর্ভূত প্রাক্-হবপ্পীয় সভ্যতাব প্রথম দশাব লোকদেব বৃত্তি ছিল পশুপালন ও সীমিত পবিমাণ ভূমিকর্ষণ। এই দশাব লোকেরা গরু, মেষ ও ছাগল পালন কবত ও সীমিত পবিমাণে দানাশস্য উৎপাদন করত। তারা পাথরেব ছুবিব ফলা, বাটালি ও বাণমুখ তৈবি কবত। হাডেব তৈরি সূচও তৈবি কবত। এছাড়া তারা হাতে-তৈরি মৃৎপাত্র ও মেঝের ওপব পাতবাব জন্য চাটাই তৈরি কবত। অদগ্ধ, রোদে শুকানো ইট দিযে তাবা ঘববাড়ি তৈবি করত এবং বান্নার জন্য ঘবেব ভিতবে উনুন তৈরি কবত। এই দশাব বযস নির্ণীত হযেছে ৩৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই দশাব কৃষ্টিব নিদর্শন আমবা পাই দক্ষিণ আফগানিস্তানেব মুণ্ডিগাকে ও উত্তর বালুচিস্তানেব কিলিগুল মহম্মদে, বানা ঘুণ্ডাইযে, সুবজঙ্গল ও ডাবব কোটে, ঝোব উপত্যকাব পেরিযানো ঘুণ্ডাইযে এবং আঞ্জিবায। ভাবতেব মেসোলিথিক যুগেব কৃষ্টিব সঙ্গে এই কৃষ্টিব যোগাযোগ ছিল বলে মনে কবা হয।

দ্বিতীয দশাব লোকেবা আবও উন্নতমানেব কৃষ্টিব অধিকারী ছিল। তাদেব মধ্যে পশুপালন ও কৃষিব অগ্রগতি ঘটেছিল। কাদামাটিব ইট ও পাথব দিযে তাবা আরও বড় বকমেব ঘববাড়ি তৈবি কবত। স্থাযী গ্রামীণ জীবনেব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তারা বাঁধ নির্মাণ কবত ও তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে তামাব ব্যবহাব প্রচলিত ছিল। মৃৎপাত্র তাবা হাতে এবং চক্রে, দু'ভাবেই তৈবি কবত। কালোব ওপব লাল চিত্রিত বাটি এবং পাযা-বিশিষ্ট পাত্র তৈবি কবত। পাত্রগুলিব ওপব অঙ্কনেব বিষযবস্তু ছিল সাবিবদ্ধ বন্যছাগ, ককুদবিশিষ্ট এবং ককুদবিহীন বলদ ও নানা প্রকাব জ্যামিতিক নকশা। মৃত ব্যক্তিকে নানা দ্রব্যেব সঙ্গে তারা বাড়ীব মধ্যেই সমাধি দিত। গোরু, ছাগল, মেয ইত্যাদি তাবা বেশ আধুনিক বীতিতেই পালন কবত। যে সব স্থানে প্রথম দশাব সভ্যতাব কৃষ্টিব উন্মেষ হয়েছিল, সেই সব জাযগাতে দ্বিতীয দশাব কৃষ্টিবও উদ্ভব হয।

এই দশাব অর্থাৎ দ্বিতীয় দশাব বযসকাল নির্ণয় কবা হয়েছে ৩৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

তৃতীয় দশায় কৃষিজমিব পূর্ণ ব্যবহাব শুরু হয। এই দশাব লোকেরা পুবোপুরি তামা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহার কবতে শিখে যায। পোডামাটিব বহু মূর্তি পাওযা গেছে এই দশার সমযকালে। মৃৎপাত্রেব উপব জ্যামিতিক নকশাগুলি দ্বিতীয় দফার চেয়ে এই সময় আরও আড়ম্বর-পূর্ণ হয়ে উঠে। আফগানিস্তানেও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

মৃৎপাত্রের ওপর এই সময আমরা অঙ্কিত হতে দেখি অশ্বত্থ পাতা, ককুদবিশিষ্ট বলদ, কেউটে সাপ, পাখি, মাছ ইত্যাদি। বোধ হয অঙ্কিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল। সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে যে তাদেব সংযোগ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া

যায়। এ যুগেই আমরা আমরিতে দরজাবিহীন বহুকক্ষে বিভক্ত বাড়ি নির্মাণ করতে দেখি, কোটদিজিতেও আমরা এ-যুগে দুর্গ-নির্মাণের নিদর্শন পাই। বস্তুত এ-যুগে আমরা সিন্ধুর পূর্বদিকে রাজস্থান পর্যন্ত বসতি স্থাপনের নিদর্শন পাই। এ-যুগেই একটা অঞ্চলীকরণ প্রণালীর সূচনার আভাস পাওয়া যায়। এ-যুগের কৃষ্টির মধ্যে আমরা হবপ্পীয় সভ্যতার অনেক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এর সময়কাল হচ্ছে ৩৩০০ থেকে ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

চতুর্থ দশায় আমরা প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতাকে নাগরিক রূপ গ্রহণ করতে দেখি। ভারতের মধ্যে কালিবঙ্গানের যে স্তরে হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, ঠিক তাব নিচের স্তরেই আমরা প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। এখানকার লোকেরা গোড়া থেকেই প্রাকার-বেষ্টিত গ্রামে বাস করত। দুর্গ নির্মাণের জন্য যে আকারের (৩০ x ২০ x ১০ সেন্টিমিটার) ইট ব্যবহার করত, ঠিক সেই আকারের অদগ্ধ ইট দিয়েই তারা ওই প্রাকার-বেষ্টিত গ্রামের মধ্যে ঘববাড়ি তৈরি কবত। যদিও ঘরবাড়ি তৈবির জন্য অদগ্ধ ইট ব্যবহৃত হত, তা হলেও তারা পয়ঃপ্রণালীর গাঁথনিতে দগ্ধ ইটই ব্যবহাব করত। বাড়িগুলি সাধারণত একতলা এবং তিন চার কামরাবিশিষ্ট হত এবং মাঝখানে একটা উঠান থাকত। রান্নার জন্য ঘরের মেঝেতেই উনুন তৈরি করা হত। উনুনগুলি দুরকমভাবে নির্মিত হত— মেঝের ওপরে ও নিচে। উনুনগুলি মাটি দিয়ে নিকানো হত। একটা লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে চুনকাম করা বেলনাকার (Cylindrical) গর্তের অস্তিত্ব। অনুমান করা হযেছে এগুলি পানীয় জল সংবক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হত।

বিভিন্ন ধরনেব মৃৎপাত্র ছাড়া হরপ্পা সভ্যতায় অন্যান্য যে সব জিনিসপত্র পাওযা গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হল ঃ

"অন্যান্য যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখনীয় মূল্যবান পাথরের তৈরি ছুরির ফলা (কোনও কোনটি করাতের মত দাঁতবিশিষ্ট), পুঁতিব গুটিকা, নরম পাথরেব চাকতি, পোড়ামাটির ও মূল্যবান পাথরেব অন্যান্য দ্রব্য, তামার ও পোড়ামাটির তৈরি হাতের চুড়ি ও বালা, শাঁখা ও রুলি, ছেলেদের খেলনার গাড়ি, বলদ, অস্থিনির্মিত ফুটো করবার যন্ত্র (Point) ও একটি তাম্র-নির্মিত বিচিত্র কুঠার।

কালিবঙ্গানের প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতাব একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার হচ্ছে গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একখণ্ড কর্ষিত ভূমি। হরপ্পা যুগের নগর প্রকারের বাইরে আজ পর্যন্ত যেখানে যত কিছু আবিষ্কাব হযেছে, তাব মধ্যে এটাই হচ্ছে প্রাচীনতম কর্ষিত ভূমিব নিদর্শন। এখানে ছোলা, মটর ও সবিষাব চাষ কবা হত। এখানে কোন লাঙ্গল পাওয়া যায়নি। দানাশস্যও পাওয়া যায়নি। সেজন্য অনুমান করা হয়েছে যে, বর্ষার শেষে প্লাবন অপসারিত হলে হেমন্তকাল থেকে কৃষিকর্ম আরম্ভ করা হত এবং রবিশস্যই উৎপাদন করা হত। কালিবঙ্গানের প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব কাল ধরা হয়েছে ৩১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে। রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষাতেও এর বয়সকাল নির্ণীত হয়েছে

৩১৫০-৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।"

কোটদিজি, আমারি ও কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের উৎখননে আবিষ্কৃত প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শনসমূহ থেকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত কবেছেন যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সভ্যতার একই ধরনেব অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল, যদিও তাদের মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল। এইসব প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার কৃষ্টিকেন্দ্রগুলি ছিল এই বকম ঃ

১। আফগানিস্তানে— মুণ্ডিগাক।

২। বালুচিস্তানে— পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব সাদাত, রানা ঘুণ্ডাই, টোগাউ, শাহ ডামব, আঞ্জিরা, নাল, নুনদাবা, কুল্লি, গাজি শাহ, কোটরাশ, পাণ্ডি ওয়াহি।

৩। পাকিস্তানে— হরপ্পা, আমবি ও থমাঞ্জো বুথি থাববো, কোটদিজি ঘগ্গর-হাকবাব শুষ্ক খাত।

৪। ভারতে— কালিবঙ্গান, সান্ধনওযাল, বাজস্থানেব মরু-অঞ্চল, গুজবাটেব নাগওযাড়া। কিন্তু লোথালে প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতাব কোন নিদর্শন পাওযা যায়নি।

মুণ্ডিগাকের প্রত্ন নিদর্শন থেকে জানা গেছে এখানেব সভ্যতা কমপক্ষে ৫২০০ বছবেব পুরানো। আব কিলিগুল মহম্মদেব প্রাচীন সভ্যতাব বযস ৫৭০০ বছব কিংবা তার কিছুটা বেশি। প্রাক্-হবপ্পীয সভ্যতা মূলত গ্রামীণ সভ্যতা। অনেকে বলছেন, এই সময়েব লোকেবা দূবদেশেব সঙ্গে বাণিজ্যে বা বিনিময়ে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একটা গ্রামীণ সভ্যতা কেমন কবে এক বৃহৎ ও প্রবল সমৃদ্ধিশালী নাগববিক সভ্যতায বিবর্তিত হযেছিল, তা প্রমাণ করবার জন্য যে ধবনেব প্রত্নতাত্ত্বিক ও পবিবেশঘটিত নিদর্শন বা প্রমাণেব প্রয়োজন সেগুলি আজও অনাবিষ্কৃত। কিলিগুল মহম্মদে ব্যাপক উৎখননেব ফলে এবং বালুচিস্তানেব অন্যান্য স্থানে খননের ফলে জানা গেছে এখানকার বিভিন্ন স্থানেব কৃষ্টির মধ্যে ঐক্য ছিল। আবার আফগানিস্তানেব মুণ্ডিগাকের খননকার্য থেকে পাওয়া গেছে কিলিগুল মহম্মদেব অনুরূপ কৃষ্টিসমূহ। অনেকে অনুমান করেন যে, দক্ষিণ আফগানিস্তান ও কান্দাহারেব সমতলভূমির মাঝখান দিযে যে প্রাচীন বাণিজ্য পথ ছিল, সেই পথ দিয়ে এই কৃষ্টি পশ্চিম থেকে আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এমন অনুমান কেবল আনুমান মাত্র। এই সভ্যতা ওখানে গিয়েছিল পূর্বদিক থেকেই।

আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাকেব নিচের থেকে তৃতীয স্তবে পাওয়া গেছে তামা ও ব্রোঞ্জেব ব্যবহারের নিদর্শন। পাওয়া গেছে মাটির তৈবি ভারতীয ককুদবিশিষ্ট বলদ ও ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তি। এগুলি এই সভ্যতাব ভারতীয় চবিত্রই ইঙ্গিত করে। মুণ্ডিগাকের চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ নিচ থেকে তিনটি স্তরেব উপরের স্তরে দেখা যাচ্ছে যে, এই যুগের লোক সুরক্ষিত প্রাকারবেষ্টিত নগরে বাস করছে এবং উচ্চ ঢিবিব উপব রৌদ্রদগ্ধ ইটের মন্দিব নির্মাণ করেছে। প্রমাণ পাওয়া যায যে, নগবটি দুবাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং

দুবারই নগরটিকে পুনর্নির্মিত করা হয়েছিল। এরা মৃৎপাত্রের ওপর লাল প্রলেপ দিয়ে, তার ওপর নানারকম স্বভাবজাত অলঙ্করণ করত। মৃৎপাত্রের ওপর এই সব অলঙ্করণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়— পাখি, বন্যহাঁস, বলদ ও অশ্বত্থ পাতা। ক্ষুদ্রকাযা মৃন্ময়ী মূর্তিও বহু পাওয়া গিয়েছে। এ সবের ভিত্তিতে মুণ্ডিগাকের এই চরম যুগকে হরপ্পা-সভ্যতার সমসাময়িক বলে ধরা হয়েছে, তবে এ সম্বন্ধে কোন রেডিযো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা কবা হয়নি। সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তই এখন গৃহীত হয়েছে যে প্রাক্-হবপ্পীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল ভারতেই। তা পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছিল। মুণ্ডিগাকই ছিল সেই বিস্তারের পশ্চিম সীমানা।

আগেই বলা হয়েছে আফগানিস্তান অঞ্চলেই সম্ভবত নবোপলীয যুগেই সর্ব প্রথম গম ও যবের চাষ হয়। হিন্দুকুশ পর্বতের এই অঞ্চলেই এক সময় কৃষিকার্যের প্রবল বিকাশ ঘটেছিল। সেই বহু পুবাতন কৃষি বিপ্লবই সম্ভবত একালেব অনুন্নত আফগানিস্তানে প্রায সত্তব বকমেব গম পাওয়া যাওয়ার মূল কারণ। আফগানিস্তান অঞ্চলে অন্তত ছয হাজার বছব আগে যে কৃষি বিপ্লব ঘটেছিল তারই অবশেষ রযেছে ওই সত্তব বকমের গমের মধ্যে।

আবাবও বলি, ভারতে নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি স্বাধীনভাবেই উদ্ভূত হযেছিল এবং তা কালেব বিবর্তনে পবিণতি লাভ কবেছিল তাম্রাশ্ম সভ্যতায। এইসব সভ্যতায় ভাবতেব সঙ্গে সামিল ছিল বর্তমানের আফগানিস্তান, বালুচিস্তান ইত্যাদি। ভাবতবর্ষ তখন কেবল সিন্ধু উপত্যকা অবধি বিস্তৃত ছিল না। পশ্চিমে তার বিস্তার ছিল সিন্ধু উপত্যকা, বালুচিস্তান পেবিয়ে কাবুল উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত অবধি। অনেকে আবাব এও মনে কবেন যে, বর্তমানেব ইরাক-ইবানে এককালে যে অতিবিখ্যাত প্রাচীন সুমেবীয সভ্যতাব উদ্ভব ঘটেছিল তাও সম্ভবত ভারতবর্ষের এই প্রাচীন সভ্যতার অবদান।

হবপ্পা সভ্যতাব পর ভাবতবর্ষে তথা একালের আফগানিস্তান অঞ্চলে যে সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল তা হল 'ভারতীয়-আর্য সভ্যতা' (Indo-Aryan Culture)। এই আর্য সভ্যতা এবং হরপ্পা সভ্যতা কোনও মতেই এক নয়। নানা কারণে পণ্ডিতেবা একমত হয়েছেন যে, হরপ্পা সভ্যতা আর্য সভ্যতা নয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা হবে। এখানে হরপ্পা সভ্যতা সম্বন্ধে আরেকটু বলে নিই।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাবোতে অনেক অলংকারও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতায় সোনাব গহনা, পুঁতি এবং নানা মূল্যবান পাথবের অলংকার ব্যবহাব করা হত। সবুজ বর্ণের পাথব (Jade) এবং নীলকান্তমণির (Lapis-lazuli) অলংকার ব্যবহৃত হত। সোনার ফলক (Plaque), সোনার আর্মলেট (Armlet), সোনার শঙ্কু (Conical Ornament), কানের মাকড়ি, গলার হার, কোমরের মেখলা— এইসব শ্রেণীর নানা অলংকার আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই সংস্কৃতিতে তামার বা তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু দিয়ে গড়া ধাতুর অস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। অস্ত্রগুলি নির্মিত হত দুই রীতিতে— ঢালাই করে (Casting) এবং

পিটিয়ে (Forging)। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে কুঠাব ও বর্শার ফলক, বঁড়শি, আয়না ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

যে মানুষেবা প্রাচীনকালে এই উচ্চমানেব সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তারা কোন্ গোষ্ঠীব মানুষ ছিল সে বিষয়েও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পিগোট বলেন, যে সমস্ত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদেব খুলিব হাড় দেখে অনুমান করা যায় যে তাবা প্রধানত আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) শ্রেণীব ছিল। এদেব ললাট অনুন্নত এবং নাসিকা অনতিপ্রশস্ত। ডঃ বিবজাশঙ্কব গুহ এদেব প্রথমে অস্ট্রেলীয় বলে স্বীকাব করে পবে ককেশীয় জাতি বলে মত প্রকাশ কবেছেন। আব একশ্রেণীর কবোটি পাওয়া যায় যা বর্তমান ভারতেব আদিম অধিবাসীদেব অনুরূপ মানুষেব পবিচয় দেয়। অপব এক শ্রেণীব কঙ্কাল পাওয়া যায়, যা ইঙ্গিত কবে এদেব মস্তক লম্বা ছিল, নাসিকা অপ্রশস্ত। ফ্রিডবিকস (Friedericks) ও মুলাব (Muller)-এব ধাবণায় তাবা আদি আর্মেনীয় (Armenoid)। মনে হয়, বেশিব ভাগ অধিবাসীই ছিল আদি-অস্ট্রেলীয় শ্রেণীব।

হবপ্পা সভ্যতাব একটা নিজস্ব লিপি ছিল। এই লিপি সম্ভবত পৃথিবীব প্রাচীনতম লিপি। এই লিপি খোদিত বয়েছে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া এই সভ্যতাব সীলামোহবগুলিতে। গত আশি বছব ধবে এই লিপির পাঠোদ্ধাবের চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু লিপিগুলি আজও অপঠিতই থেকে গেছে। লিপিব পাঠোদ্ধাব সম্ভব হলে হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে আমবা আবও বহু তথ্য জানতে পাবতাম। মোদ্দা কথা হল, সিন্ধু-সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহবগুলিব ওপব খোদিত লিপিব পাঠোদ্ধাবেব কাজ এখনও চলছে। সিন্ধুলিপিতে আনুমানিক ৩০০ চিহ্ন আছে। তাব মধ্যে ২৫০ টি মৌল চিহ্ন। বাকীগুলি আনুষঙ্গিক চিহ্ন মাত্র এবং সেগুলি মৌলচিহ্নেব সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এগুলি হয় স্বববর্ণ, আব নয়তো বর্ণনাকাব চিহ্ন বা যতি চিহ্ন। তবে এসব অনুমান মাত্র। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানা মূল্যবান সহাযক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বইখানা হচ্ছে ইরাবথম মহাদেবন (Iravatham Mahadevan) সংকলিত সিন্ধুলিপির সূচী (Concordance)। অবশ্য, এব আগে ফিনল্যান্ডেব ডঃ আসকো পাবপোলা (Dr. Asko Parpola) একখানা সূচীগ্রন্থ প্রকাশ কবেছিলেন। কিন্তু কার্যকারিতাব দিক থেকে মহাদেবনেব 'সূচী'টাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়া, সোভিয়েট বাশিযাব লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালযের সহকাবী অধ্যাপক ড নিকিটা গুরোব (Nikita Gurov) কম্পিউটারেব সাহায্যে সিন্ধুলিপিব সমস্ত চিহ্নগুলিব বীপ্সামূলক সংঘটন (Frequency Distribution) বিশ্লেষণ কবেছেন।

সাম্প্রতিককালে এই সকল অনুশীলনের ফলে সোভিয়েট রাশিযাব পণ্ডিতমহল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে সকল সীলমোহব পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ওপর যে লিপি খোদিত আছে, তা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় বচিত। হরপ্পা সভ্যতাব এই লিপিগুলির 'ভাষা'র প্রশ্নই গোড়া থেকে পণ্ডিতমহলকে বিব্রত কবে তুলেছে। এ সম্বন্ধে দুটি মত গড়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে লিপিগুলি আর্য

ভাষায় রচিত। সাম্প্রতিককালে এ মতের পোষক হচ্ছেন এস. আর. রাও (S. R. Rao) ও বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতগণ। আর অন্য মত হচ্ছে, এগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় বচিত। এ মতেব পোষক হচ্ছেন তামিলনাড়ুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ডঃ আর. নাগস্বামী, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নিকিটা গুরোব, অধ্যাপক ডঃ জ্ঞরোজোব (Knorozov) ও ফিনল্যান্ডের পণ্ডিত ডঃ আস্কো পারপোলা। রুশ পণ্ডিতগণ তাঁদেব অনুশীলনের ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হচ্ছে (১) লিপিগুলি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত, (২) লিপিগুলি ধর্মমূলক (Hierographic) , (৩) কিছু লিপি জ্যোতিষিক, (৪) লিপিগুলিতে গুণবাচক শব্দগুলি বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হযেছে, (৫) পরিবর্তনশীল (Variable) চিহ্নগুলি যুগ্মমূল্যবিশিষ্ট, যথা, ক, খ, গ, যদি পরিবর্তনশীল চিহ্ন হয় এবং এর পর যদি মীন (মৎস্য) চিহ্ন থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে এর মানে হচ্ছে পরিবর্তনশীল চিহ্ন + মীন। এর দু-একটা উদাহরণ দিযে তাঁরা বোঝাতে চেযেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে এরূপ যুগ্ম চিহ্নেব অর্থ হচ্ছে কৃত্তিকা নক্ষত্র, আবাব কোন ক্ষেত্রে মৃগশিবা নক্ষত্র। (৬) লিপিগুলিতে বহুবচনের পবিবর্তে বিশেষ্যেব সঙ্গে সংখ্যাবাচক চিহ্ন ব্যবহৃত হযেছে। সীলমোহরগুলিব ওপব যে সকল প্রাণী বা অন্য কোনরূপ প্রতীক চিত্র আছে, তাব অর্থও তাঁবা ভাবতীয় পুরাণসমূহে বিবৃত কাহিনীর সাহায্যে লাভ করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁবা মনে কবেন যে, যম, শিব, স্কন্দ প্রভৃতি হিন্দু দেবতাগণ প্রাক্-বৈদিক দেবতা। তাঁবা আরও বলতে চেযেছেন যে, ঔপনিষদিক যুগেই বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতিব একটা সংশ্লেষণ ঘটেছিল, এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে 'হিন্দু সংস্কৃতি'। ডঃ অতুল সুব ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন কবে, স্বাধীনভাবে তিনি ওই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে একথা খাটলেও হরপ্পা সভ্যতাব লিপিগুলি সম্পর্কে এই মত খাটে না। হরপ্পা সভ্যতার ভাষাটা যে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য রুশদেশীয় পণ্ডিতগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন কবেছেন, সেটা এখানে সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। কম্পিউটাবের সাহায্যে তাঁরা প্রথমে চিহ্নগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তারপর তাঁরা ওর বৈশিষ্ট্যগুলিব সঙ্গে সংস্কৃত, সুমেরীয়, ব্রাহুই, দ্রাবিড়, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য তুলনা করেছেন। এর ফলেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই ভাষার গঠন ব্যাপারে দ্রাবিড় গোষ্ঠীব ভাষাসমূহেরই সবচেয়ে বেশি মিল আছে। এ নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা কবা হয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতাব এই মানুষগুলি প্রায় ১৫০০ বছর তাদের উচ্চ সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলে জুড়ে বসবাস করেছিল। সেই ভারতবর্ষের মধ্যে আফগানিস্তানও ছিল। এরপর প্রায় ৪০০০ বছর আগে পশ্চিম দিক হতে এক নতুন জাতি এসে তাদের পর্যুদস্ত করেছিল। তারা প্রথমে এসেছিল আফগানিস্তান অঞ্চলে। তারপর বালুচিস্তান পার হয়ে তারা চলে আসে সিন্ধু উপত্যকায়। ঐতিহাসিকরা

বলছেন এরা পরবর্তীকালে বৈদিক সংস্কৃতির বাহক আর্যজাতি। এরা ছিল যাযাবর এবং গান্ধার তথা আফগানিস্তানে প্রবেশকালে ঘোরতর বর্বর। এই বর্বর যোদ্ধার জাত আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার বহু নগর ধ্বংস করে। অল্প সময়ের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে শুরু করে প্রয়াগ বা এলাহাবাদ অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে। বিজয়ী বর্বর আর্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের হরপ্পীয় সভ্যতার মিশ্রণ ঘটে। সৃষ্টি হয় ভারতীয়-আর্য-সভ্যতা (Indo-Aryan Civilization) বা ভারতীয়-আর্য-সংস্কৃতি (Indo-Aryan Culture)। পরবর্তীকালে আমরা যাকে হিন্দু সভ্যতা বলি তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হল হরপ্পা-সংস্কৃতি এবং মাত্র পঁচিশ ভাগ হল এই বর্বর আর্যদের সংস্কৃতি।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কুর্দু (Courdoux) লক্ষ্য করেন যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক ও লাতিন ভাষার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। স্যর উইলিয়ম জোনস ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনিই প্রথম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই সাদৃশ্য তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সাদৃশ্য হতে তাঁরা অনুমান করেন যে, এই ভাষাগুলি একটি প্রাচীনতর ভাষা হতে উৎপন্ন হয়েছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বপ (Bopp) এ বিষয়ে গবেষণা করে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই অনুমানের সপক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। তিনি এই ভাষাগুলিকে ভারত-ইউরোপীয় (Indo-European) গোষ্ঠীর ভাষা বলে নামকরণ করেন।

এই ভাষাগুলিতে মৌলিক শব্দগুলির, যেগুলি পারিবারিক সম্বন্ধসূচক এবং সংখ্যাসূচক শব্দ, তাদের মধ্যে পরস্পর আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন, সংস্কৃত 'পিতৃ' শব্দ লাতিনে 'পাটের' (Pater) ইংরেজিতে 'ফাদার' (Father), জার্মান ভাষার 'ফাটের' (Vater) এবং ফরাসীতে 'প্যার' (Pere) হয়ে গেছে। সংস্কৃত 'শতম' লাতিন ভাষায় 'সেন্টাম' (Centum)। সংস্কৃত 'ত্রি' ইংরাজিতে 'থ্রি' (Three), জার্মান ভাষায় 'ড্রাই' (Drei), ফরাসীতে 'ত্রোযা' (Trois) ইত্যাদি। এইসব সাদৃশ্য হতে এই রকম অনুমান করা হয় যে, এইসব ভাষাভাষীদের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল এবং তারা একই ভাষায় কথা বলত। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে তারা যখন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাদের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে পরস্পর হতে বিভিন্ন হয়ে গেল। অনুমান করা হয় যে, এই পূর্বপুরুষের গোষ্ঠী কৃষিজীবী ছিল, তারা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল এবং তামা এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত এবং মানুষের আদর্শে কল্পিত (Anthropomorphic) দেবতাদের পূজা করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক যুগে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞের মত অনুষ্ঠান আলতাই টার্কদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে এবং আয়ার্ল্যান্ডে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এখন প্রশ্ন হল, এই আদিম জাতির বাসভূমি কোথায় ছিল। এই নিয়ে প্রচুর মতদ্বৈধ আছে। জার্মান পণ্ডিত কোসিনা (Kosinna) প্রতিপাদিত করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তাদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তর ইউরোপীয় উপত্যকায়। ভারতীয় গবেষক মনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রাচীন আর্য জাতির বাস ছিল ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কোনও সময়ে উত্তর মেরু অঞ্চলে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি তৃতীয় মত গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক জে. এল. মায়ার্স (J. L. Myers), হ্যারল্ড পীক (Harold Peake) এবং চাইল্ড (Childe) এই মতটির সমর্থক। তাঁদের ধারণায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দতে এদের নিবাস ছিল দক্ষিণ রুশিয়াতে এবং তার পূর্বাঞ্চল কাস্পিয়ান সাগরের তীরে। এরা খানিকটা যাযাবর ছিল তবে সামান্য কৃষিকার্য করত এবং স্থায়ী বসতিও স্থাপন করত। তারা মেষ, গরু ও অশ্ব পালন করতে শিখেছিল। তারা মৃতদের সমাধিস্থ করত।

পিগোটের ধারণায় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারত একাধিক জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। ভারত-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষও তাদের অন্যতম ছিল। এই সময় পারস্যের সীমানায় কাসাইট (Kasite) এবং মিটানিয়ানদের (Mittanian) স্থাপিত রাজ্য গড়ে ওঠে। তারা ভারত-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হুইলার-এর ধারণা এই সময়েই ঋগ্বেদে বর্ণিত প্রাচীন আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে এবং হরপ্পা সংস্কৃতির ধারক যে মনুষ্য-গোষ্ঠী ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই সংগর্ষে যারা অধিনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের আদর্শেই ঋগ্বেদের দেবতা ইন্দ্রের চরিত্রটি কল্পিত হয়েছে। তিনি বলেন, ঋগ্বেদে 'পুরন্দর' কথাটি ইন্দ্রের উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত। ইন্দ্র সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে সভ্য প্রাচীন জাতিদের শহর ছিল সেইগুলি ধ্বংস করেন বলেই তাঁর নাম 'পুরন্দর'। সিন্ধুর অববাহিকাবাসীরা প্রস্তরের এবং মৃত্তিকার দুর্গ নির্মাণ করত। তাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই অঞ্চলে সম্প্রতি অনেক আবিষ্কার করেছেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র এই ধরনের বহু দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে তা এই সকল দুর্গকেই সূচিত করে। (Wheeler : Indian Civilisation p. 90f)

পিগোট হুইলারের এই প্রতিপাদ্য গ্রহণ করেছেন (Stuart Piggot : Prehistoric India, Chap VII)। তিনি বলেন, এটা সুবিদিত যে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে ভারতে হরপ্পা সংস্কৃতি পূর্ণ মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাদের সংস্কৃতি ছিল নগরকেন্দ্রিক এবং সেই নগরগুলি দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের দুর্গগুলি ধ্বংস করে দেয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনারই ছায়াপাত ঘটেছে ঋগ্বেদে ইন্দ্রের বীরত্বসূচক কীর্তির বর্ণনায়। বৈদিক সাহিত্যে যে জাতির সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দস্যু বা দাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের আকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা কৃষ্ণকায় এবং 'অনাস' অর্থাৎ তাদের নাক চ্যাপ্টা ছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি, এই প্রাচীনতর জাতির মানুষের অধিকাংশ ছিল অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীভুক্ত। তারা কৃষ্ণকায় এবং তাদের নাক চ্যাপ্টা ছিল। আর আর্যরা ছিল ককাসয়েড (Caucasoid) মহাজাতির নর্ডিক (Nordic) গোষ্ঠীর লোক।

উন্নত হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের সঙ্গে বর্বর আর্যজাতির যে প্রবল সংঘর্ষ হয়েছিল তার

বহুল প্রমাণ মেলে ঋগ্বেদের বহু সূক্তে। পরবর্তী পর্যায়ে ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হবে নর্ডিক আর্যদের ধ্বংসকারী স্বরূপ। এখন আবার হরপ্পার কথায় আসি। ডঃ অতুল সুর তাঁর 'মানব সভ্যতাব নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইটিতে লিখেছেন ঃ

"হরপ্পা সভ্যতা যে আর্যসভ্যতা নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হরপ্পা সভ্যতার লোকরা এক উন্নত বৈষয়িক সভ্যতার ধারক ছিল। অপর পক্ষে আর্যরা ছিল এক বর্বর জাতি। বস্তুত আর্যরা যে এক বর্বর জাতি ছিল, তা গত ষাট্-সত্তব বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কাব ও বৈদিক অনুশীলনের ফলে জানা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. গর্ডন চাইলড্ (V. Gordon Childe)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'দি আরিয়ানস্' (The Aryans) গ্রন্থে বলেছিলেন যে আর্যদের বর্বরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের কার্যকলাপে। জগতেব যেখানেই গিয়ে তারা বসতি স্থাপন কবেছিল সেখানেই তাবা সেখানকার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস কবেছিল। চাইলড-এব এই মন্তব্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতাসমূহের সঙ্গে মিলিযে দেখে, পণ্ডিতসমাজ আজ একবাক্যে স্বীকাব কবে নিযেছেন। এখন আর্যদেব সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়, তখনই তাদের বর্বর জাতি বলে আভিহিত করা হয। সর্বত্রই তাবা উন্নতমানের প্রাগার্যসভ্যতাকে ধ্বংস কবে নিজেদেব হীন ও বর্বর সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে বর্তমান লেখকই প্রথম প্রমাণ কবেন যে, মাত্র এক জাযগাতেই তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভাবতবর্ষে এসে তাবা যে উন্নতমানের সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং যাদেব বাহকদের বিরুদ্ধে তাবা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার কাছেই আর্যদের মাথা অবনত করতে হয়েছিল। কেননা হবপ্পা সভ্যতার মধ্যেই আমরা দেখি পরবর্তীকালের উন্নত হিন্দু সভ্যতার মূল উপাদানসমূহ।"

হবপ্পীযদেব সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে আর্যরা বিজয়ী হয়। আর বিজিত হবপ্পীয় তথা প্রাগার্য বা অনার্য জাতির লোকরা পরবর্তীকালে বৈদিক তথা ভারতীয় আর্য সভ্যতার সমাজে একটি নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করে। নতুন আগন্তুক জাতিরা নিজেদেব আর্য বলত এবং যাদের জয় করে এ দেশে তারা বসতি স্থাপন করেছিল তাদের দাস বা দস্যু বলত। এরাই সম্ভবত পরে শূদ্র জাতিতে পরিণত হয়। ঋগ্বেদে আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে বহু প্রমাণ রয়েছে এর সূক্তগুলিতে।

দাস জাতিকে পরাজিত করে তাদের নিকৃষ্ট স্থানে স্থাপিত করায় যে দেবতা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন ইন্দ্র। বৃত্রকে দমন করা ছাড়া এটি তাঁর অন্যতম প্রধান ভূমিকা। একে ঐতিহাসিক ভূমিকাও বলা যেতে পারে। সম্ভবত ইন্দ্র একজন ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন এবং আর্যদের বিজয় অভিযানে তিনিই মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁকে দেবত্বের পদে উন্নীত করা হয়েছিল।

হরপ্পা সভ্যতার কাল নির্ণয় করা সহজ নয়। কবে এই সভ্যতার শুরু হয়েছিল তা *বলা সম্ভব না হলেও এর নিম্নতম কাল নির্ধারণ করা যায়। সিন্ধুসভ্যতা লৌহযুগের*

পূর্ববর্তী। এখানে লোহার ব্যবহার দেখা যায় না। বিশ্ব-সভ্যতায় লৌহযুগ শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ অথবা পঞ্চদশ শতকে। সুতরাং তাম্র-প্রস্তরযুগের হরপ্পা সভ্যতার নিম্নতম কাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী। খুব সঠিকভাবে বললে দাঁড়ায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দ।

পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, এলাম প্রভৃতি স্থানে সিন্ধু উপত্যকার মত যে সব সীলমোহর পাওয়া গেছে, সেগুলির নিরিখে হরপ্পা সভ্যতার উর্দ্ধতম কাল খ্রী.পূর্ব ৩৩০০ অব্দ নির্ধারণ করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার জন মারশাল সিন্ধুসভ্যতার সূচনা খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ অব্দ এবং খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৫০ অব্দের মধ্যে হয়েছিল বলে মনে করেন। রেডিও-কার্বন পরীক্ষা পদ্ধতির দ্বারা আধুনিক কালে প্রত্নবস্তুর বয়স নির্ণয় করা হয়। এই বিচারে অধ্যাপক অগ্রবাল বলেন, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৫০-২০০০ অব্দে হরপ্পার বিকাশ হযেছিল। তাঁর মতে লোথাল এবং কালিবঙ্গানের সময়সীমা আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২২০০-১৭০০ অব্দ। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন হরপ্পা সভ্যতাব চবম উন্নতি ঘটেছিল ৪৬০০ বছব আগে এবং হরপ্পা সভ্যতার চরম উন্নতিব কাল হল ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই সভ্যতা ৩৭৫০ বছর আগেই ধ্বংস হয় বর্বব আর্যদেব আক্রমণে। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের পর থেকেই হরপ্পা সভ্যতা নানা কাবণে, দুর্বল হযে পড়ে। ফলে, আর্যরা তাদের আক্রমণ করে সহজেই হারিযে দিতে সমর্থ হয়। তারপর ৩৭৫০ বছব আগে থেকে ২৭৫০ বছর আগে পর্যন্ত হরপ্পা সংস্কৃতিব সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে বর্বব আর্যদের সংস্কৃতির। সৃষ্টি হয় 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা', যাব ৭৫% হল হবপ্পা কৃষ্টি এবং ২৫% হল বর্বব আর্যদের কৃষ্টি। এই ভাবতীয আর্য সংস্কৃতিই সৃষ্টি করেছে হিন্দু ধর্ম— যাব ৭৫% উপাদান অনার্য হরপ্পাবাসীদেব এবং বাকী ২৫% উপাদান বর্বর আর্য-সংস্কৃতির।



চিত্র ১
উৎখননের পর মহেঞ্জোদারোর একাংশ

প্রাচীন হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর মত নগরনির্মাণের এত উন্নত প্রণালী সমসাময়িক পৃথিবীর আর কোন দেশে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, নগরগুলি পূর্বপরিকল্পনা মত নির্মিত হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর প্রধান পথগুলি সোজা এবং চওড়া, নগরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। নগরে সরু গলিপথও ছিল। রাস্তার দুধারে ইটের তৈরি বাড়ি, পথের পাশে মাটির নিচে পাথবে বাঁধানো নর্দমা। জল নিকাশের এই সুন্দর ব্যবস্থা দেখে বোঝা যায় যে, নগরবাসীবা পৌরস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল। নগরে ছোট-বড় সব আকারের বাড়ি ছিল। সিঁড়ি দেখে বোঝা যায়, অনেক বাড়ি দোতলা বা তেতলা ছিল। সিঁড়ি, উঠান এবং ঘরের মেঝে ছিল পাথবে বাঁধানো। ঘরগুলিতে দরজা জানালা থাকত। এই নগরটি কতকগুলি পাড়ায় বিভক্ত ছিল। পাড়ার প্রত্যেক বাড়িতেই শয়নঘর , রান্নাঘর, স্নানাগাব, কুয়া ও জল নিকাশেব নর্দমা থাকত। মহেঞ্জোদারোতে সর্বসাধারণেব ব্যবহাবের জন্য স্নানাগার ছিল। এই বকম একটি স্নানাগারেব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। স্নানাগারটির আযতন ছিল দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। স্নানাগারের চাবদিকে ৮ ফুট উঁচু দেওযাল ছিল। স্নানাগাবেব মাঝখানে আবাব ৩৯ ফুট দীর্ঘ, ২৩ ফুট প্রশস্ত ও ৮ ফুট গভীর পরিমাপেব সাঁতাব কাটাব জন্য একটি বড় জলাশয় ছিল। স্নানাগাবটি ছিল বর্তমান যুগেব সুইমিং পুলেব অনুরূপ। এই স্নানাগারে গবম জল সববরাহের ব্যবস্থাও ছিল।

হরপ্পা নগবটি প্রাচীর দিযে ঘেরা ছিল। নগরের মধ্যে এক জায়গায় পাশাপাশি কতকগুলি ছোট ছোট ঘরের ব্যারাক ছিল। অনুমান করা হয়' এই ব্যারাকগুলি নির্মিত



চিত্র ২

মহেঞ্জোদারোর সোজা রাস্তা ও ঢাকা দেওয়া পাথর বাঁধানো নর্দমা

হয়েছিল শ্রমিকদের বসবাসের জন্য। আগেই বলেছি, এই ব্যারাকগুলির কাছে পাওয়া গেছে ধাতুগলন কারখানা, শস্যাগার, শস্য পেষাইয়ের স্থান ইত্যাদি। ঐতিহাসিকরা এই সভ্যতা সম্পর্কে কী বলছেন সংক্ষেপে সে কথায় আসা যাক।

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখলেই বোঝা যায়, তখনকার সমাজে ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণীরই লোক ছিল। এখানে ধনীদের দোতলা, তেতলা বাড়িও দেখা যায়, আবার দরিদ্র শ্রমিকদের বস্তিও দেখা যায়। দরিদ্র বা দাস শ্রেণীর লোকেরা ব্যারাকের মত দু-কামরার ছোট বাড়িতে বসবাস করত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জন হুইলারের মতে নগরের অধিবাসীরা ছিল বাণিজ্যজীবী বুর্জোয়া। ধনীরা নগরের এক বিশেষ মহল্লায় বাস করত। তারা নানা ধবনের আসবাবপত্র, বিভিন্ন ধরনের বাসনপত্র, নানারকম প্রসাধন সামগ্রী ও বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করত। ধনী নারী-পুরুষদের মধ্যে সোনা, রূপা এবং জড়োয়া গহনার প্রচলন ছিল।

দরিদ্ররা নগরের অন্য এক মহল্লায় বাস করত। তাদের ছোট ছোট বস্তিব ঘরে আসবাব এবং বাসনপত্র খুব কমই থাকত। যা কিছু গহনা তাবা পবত তা সবই রূপা, শাঁখ, পাথর এবং পোড়া মাটির।

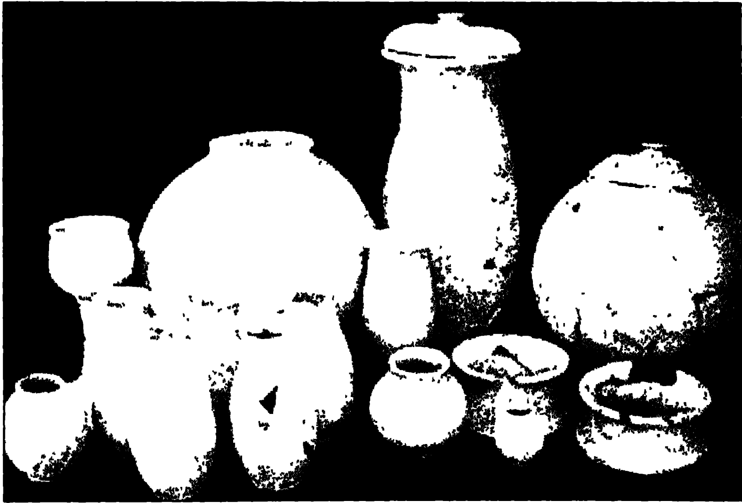


চিত্র ৩
মহেঞ্জোদারোর বিখ্যাত স্নানাগার

এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে আবার বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগও ছিল। পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী প্রভৃতি মানুষরা শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। নগররক্ষীরা এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ছিল। দক্ষ শিল্পী এবং বণিকদের নিজস্ব শ্রেণী ছিল। আর এক শ্রেণীভুক্ত ছিল দাস, শ্রমিক প্রভৃতি মেহনতী মানুষের দল।

এইসব নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে সেযুগের নাগরিকদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক অবস্থার বিষয়ে কিছু অনুমান করা যায়। বান্নাঘবে পাত্রেব মধ্যে গম, যব, খেজুর, মাছের কাঁটা ও পশুর হাড় পাওয়া গেছে। মাছ ধরবার বঁড়শিও পাওয়া গেছে। তাদেব গড়া মূর্তি এবং চিত্র দেখে বোঝা যায়, তারা কাপড় পরত, চাদব গায়ে দিত। সুতী ও পশমেব কাপড় এবং সুচ-সুতো পাওয়া গেছে। পুরুষরা দাড়ি রাখত, কিন্তু গোঁফ বাখত না। মেয়েরা নানা ছাঁদে চুল বাঁধত। তারা নানা বকম প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহাব কত। মেয়ে-পুরুষ সকলেই হার, বালা, আংটি পরত। তবে মেখলা, নথ, কানের দুল, পায়ের মল শুধু মেয়েরাই পরত। এসব গহনার কারিগরি ও গড়ন ছিল অতি সুন্দব। সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, হাতির দাঁত, ঝিনুক এবং নানা বকম মূল্যবান পাথব দিয়ে গহনা তৈরি হত।

গৃহস্থেরা রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, চীনামাটি এবং মাটি দিয়ে তৈরি নানা রকমের বাসনপত্র ব্যবহার কবত। মাটিব পাত্রগুলি চিত্রবিচিত্র কবা হত। মাটি কিংবা হাড়ের টুকবো দিয়ে সুতো কাটবাব তকলি বা টাকু তৈবি কবা হত। হাতির দাঁত দিয়ে চিরুনি, তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে কুঠাব, বর্শা, ক্ষুব, ছুবি, বঁড়শি প্রভৃতি তৈরি হত। শিশুদের খেলার জন্য নানারকম খেলনা, পুতুল, চাকা লাগানো ছোট ছোট গাড়ি, খাট, চেয়ার প্রভৃতি তৈবি হত। সন্দেহ নেই যে, পারিবারিক জীবনে শিশুদের খুবই আদর ছিল।



চিত্র ৪
হরপ্পার মৃৎপাত্র

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীদের প্রকৃত গৌরবেব পরিচয় পাওয়া যায় তাদের শিল্পকলায়। সিন্ধু উপত্যকায় প্রায় আড়াই হাজার সীলমোহর পাওয়া গেছে।

এগুলির উপর আঁকা পশুর ছবি এমন জীবন্ত যে, প্রাচীন শিল্পে তার তুলনা নেই। পালিশ করা চীনামাটির পাত্রের গায়ে ফুল, পাতা, পাখি, হরিণ প্রভৃতির চিত্র দেখতে অপরূপ। পাথর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি যেসব মানুষের মূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের গড়ন ও কমনীয়তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আগুনে পোড়ানো ইট তৈরি করতে এখানকার লোকেরা বেশ দক্ষ ছিল। কোটি কোটি পোড়া ইট তারা ব্যবহার করেছে ঘর-বাড়ি, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির নির্মাণে। কাপড় বোনা এবং আসবাবপত্র নির্মাণেও তাদের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীরা যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা ধনৈশ্বর্য সংগ্রহ করেনি। সামরিক সাজসরঞ্জাম এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে পাওয়া যায়নি। হরপ্পায় একটি দুর্গের আভাস পাওয়া যায়। নগরীটি প্রাচীর ঘেরা হওয়ায় মনে হয় প্রতিরক্ষার কিছু ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড এবং মারাত্মক যুদ্ধের উপযোগী তেমন কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়নি। তীরধনুক, বর্শা, কুঠাব, গদা, পাথব ছুঁড়বার জন্য দড়ির যন্ত্র, ফিঙ্গা প্রভৃতি মামুলি অস্ত্রশস্ত্র কিছু পাওয়া গেছে। অস্ত্রশস্ত্রগুলি তামা, ব্রোঞ্জ অথবা পাথর দিয়ে তৈরি।

হরপ্পা সভ্যতার অধিকারীবা যে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের বাস্তুবিদ্যা, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সেকালেব শিক্ষার উচ্চমানের আভাস দেয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অঙ্কশাস্ত্রেও তাদের প্রবল ব্যুৎপত্তি ছিল। মহেঞ্জোদারোতে একটি ব্রোঞ্জের নর্তকী মূর্তি পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান হয়, সেকালের মেয়েরা নৃত্যচর্চা করত।

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন। শ্রমশিল্পেও বহু লোক নিযুক্ত থাকত। কুমোর, তাঁতী, ছুতার, কামার, স্যাকরা, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি নানাশ্রেণীর শিল্পী-শ্রমিকের কর্মদক্ষতার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও এখানকার লোকেরা রীতিমত দক্ষ ছিল। তারা স্থল ও জলপথে পণ্য সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি করত। একদিকে সুমের ও মিশর, অন্যদিকে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সিন্ধুদেশে কোনও খনির অস্তিত্ব নেই। অথচ এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং অনুমান করা হয় টিন, তামা ও মূল্যবান পাথর অবশ্যই অন্যদেশ থেকে আমদানী করা হত। দুটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এখানকার অধিবাসীরা জলপথে বাণিজ্য করত। মহেঞ্জোদারোর গঠনবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, নগরীটি বাণিজ্যকেন্দ্র রূপেই গড়ে উঠেছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মধ্যে দূরত্ব কয়েকশ মাইল হলেও নদী পথে এই দুই নগরীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। গুজরাটে আমেদাবাদের কাছে লোথালের সুনির্মিত বন্দর ও পোতাশ্রয় হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্য-আশ্রিত সমৃদ্ধ নগর- জীবনের প্রমাণ। তাছাড়া ওজনের দাঁড়িপাল্লা এবং বাটখারা প্রমাণ করে যে হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য জানত।

সিন্ধু উপত্যকায় প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতরা কিছু অনুমান করেছেন। হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারোয় কোনও মন্দির বা উপাসনা গৃহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় নি। এখানে কোন মন্দির বা উপাসনা গৃহ আবিষ্কৃত না হওয়ায় ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা মনে করেন যে হরপ্পা সভ্যতায় পুরোহিত শ্রেণীর কোন প্রধান্য ছিল না। তবে এখানে কতকগুলি বিশেষ আকারের পাথর পাওয়া গেছে। সেগুলি দেখতে শিবলিঙ্গের মত। একটি পোড়ামাটির সীলমোহরে এক যোগীর মূর্তি আছে। তাঁর মাথায় শিংয়ের মুকুট আর দুপাশে কয়েকটি পশু। অনেকেব ধারণা, এই মূর্তিটি পশুপতিনাথ শিবের। সিন্ধু উপত্যকায় আরও কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলিকে দেবীমূর্তি মনে করা হয়। এর থেকে অনুমান হয়, সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা শিব ও মাতৃকা দেবীর উপাসনা করত। সম্ভবত জীবজন্তু এবং বৃক্ষপূজাও সেকালে প্রচলিত ছিল। মৃতদেহ দাহ করা হত অথবা কবর দেওয়া হত।

মহেঞ্জোদাবোব কয়েকটি সীলমোহব মেসোপটেমিয়ায় এবং মেসোপটেমিয়াব কয়েকটি সীলমোহর মহোঞ্জোদাবোয পাওয়া গেছে। এব দ্বারা প্রমাণ হয যে, এই দুই দেশেব মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। সুমের অঞ্চলের সীলমোহর ও খোদাই করা পাথবেব পাত্র এবং মিশরে ব্যবহৃত কিছু তৈজসপত্র সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে। এতে বোঝা যায় যে, সুমের এবং মিশরেব সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত।

অনেকে মনে কবেন, দ্রাবিড়ভাষী এক নরগোষ্ঠীর মানুষ প্রধানত কৃষি-বাণিজ্য নির্ভর এই সভ্যতাব জনক। এরা ভূমধ্যসাগব অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছিল। হবপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কিছু মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এইসব নরকঙ্কালের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে নৃতত্ত্ববিদরা তিনটি নরগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছেন— (১) আদি অস্ট্রেলীয—এই নবগোষ্ঠীই ভাবতের আদিম অধিবাসী। (২) ভূমধ্যসাগরীয়— এরা দ্রাবিড়ভাষী এবং সম্ভবত বালুচিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতের পঞ্চনদ এলাকায প্রবেশ কবেছিল। (৩) আলপাইন বা আলপীয়—এদের মধ্যে একটি মাত্র নবগোষ্ঠীকে এই সভ্যতাব জনক বলে স্বীকার করার মত কোন প্রমাণ আজও আবিস্কৃত হয়নি। স্যার জন হুইলার বলেন, হবপ্পা সভ্যতার স্রষ্টারা ভারতের বাইরে থেকে আসে নি। তারা ভারতেরই স্থানীয় অধিবাসী। গর্ডন চাইল্ড-এর মতে হরপ্পা সংস্কৃতি একান্তভাবেই ভারতীয়। পশ্চিম এশিয়াব সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায যে লিপি পাওয়া গেছে, তার অনুরূপ লিপি আর কোথাও পাওয়া যায নি। এ লিপি একান্তভাবেই ভারতীয়।

হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। হরপ্পা সভ্যতা কেন এবং কিভাবে বিলুপ্ত হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজাব বছর পূর্বে এই সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন, দীর্ঘকাল ধরেই এদের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। মনে হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এই সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে সিন্ধুনদের গতিপথ

পরিবর্তন, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারো কারোর মতে সিন্ধুনদেব প্লাবনের ফলে এই অঞ্চলটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কারো কারোর মতে ভূমিকম্পেব ফলে এই সভ্যতা বিনষ্ট হয়। আবাব অনেকে মনে কবেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র অঞ্চলটি মরুভূমিতে পরিণত হয়। তবে ঐতিহাসিক হুইলার এবং ব্যাসাম হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসেব জন্য বহিরাগত শত্রুর আক্রমণকেই দায়ী করেছেন। এখানে যে সব নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তাতে ধারালো অস্ত্রেব আঘাত দেখেই এই অনুমানেব সত্যতা প্রমাণিত হয়। ব্যাসামের মতে আক্রমণকারীরা বালুচিস্তান থেকে এসেছিল। তবে অনেকেই মনে করেন, বহিরাগত আক্রমণকারীরা সম্ভবত ছিল আর্য। ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েলস্-এর মতে আর্যভাষী এক জনগোষ্ঠী উত্তরভারতের কৃষ্ণবর্ণের জনগোষ্ঠীকে বিধ্বস্ত কবে এবং সেখানে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। আবার আর্যদের ঋগ্বেদে ইন্দ্র কর্তৃক বিজিত যেসব দুর্গের ধ্বংসের বিববণ রযেছে, প্রায় সেই বকম দুর্গ সিন্ধু উপত্যকাতেও পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং আর্যরাই যে এই আক্রমণকাবী সেটা অনুমান কবা যায়।

আগেও বলেছি, আবারও বলি, আবহাওযার পরিবর্তনের জন্য হরপ্পা মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন কমে যায। এতে ব্যবসাজীবী হরপ্পা সভ্যতার রপ্তানি কমে যায। ফলে হরপ্পা সভ্যতাব বড় বড নগরগুলি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময উত্তব-পশ্চিম দিক থেকে ককাসযেড নবগোষ্ঠীর যাযাবর বর্বব নর্ডিক (Nordic) শ্রেণীব লোকেবা, যাদেব আমবা আর্য বলি, তারা হবপ্পা সভ্যতার মূল কেন্দ্রগুলি আক্রমণ করে, নগব ধ্বংস কবে, হবপ্পীযদেব পরাজিত কবে তাদেব সম্পদ, গোধন, শস্য ও নাবীদেব জোব কবে দখল কবে। ঋগ্বেদ পড়লেই এ কথাব সত্যতা অনাযাসে নির্ণয় কবা যায়।

হবপ্পা সভ্যতায লিপি আছে কিন্তু কী ভাষায় তাবা কথা বলতো তা অজানা। আধুনিক গবেষণায জানা গেছে, এই ভাষা ইন্দো-ইউবোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত নয়, আবার সুমেবীয ভাষাও নয়। যদি কোন আধুনিক ভাষাব সঙ্গে এব যোগসূত্র থেকে থাকে তবে তা দ্রাবিড়ীয ভাষা। গত ৭০/৮০ বছব ধবে বহু পণ্ডিত চেষ্টা করছেন হরপ্পার লিপিগুলিব পাঠোদ্ধার করতে, কিন্তু আজও তা অপঠিতই থেকে গেছে। ফলে, এই সভ্যতা সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদেব অজানাই রয়ে গেছে।

আগেই বলেছি, সিন্ধুলিপিতে আনুমানিক ৩০০ চিহ্ন আছে। তাব মধ্যে ২৫০টি মৌল-চিহ্ন বলে সনাক্ত কবা হযেছে। বাকি চিহ্নগুলি আনুষঙ্গিক চিহ্ন মাত্র। সেগুলি মৌল-চিহ্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এগুলি হয় স্বরবর্ণ, আব তা নয়তো বর্ণনাকার চিহ্ন বা যতিচিহ্ন। তবে এ সব অনুমান মাত্র। এ অনুমান যথার্থ হতে পারে, আবার একেবারে ভুলও হতে পারে।

সিন্ধুলিপি আমরা দেখতে পাই মোটামুটি দু'রকম প্রত্নবস্তুর ওপর— (১) নরম পাথবেব তৈরি সীলমোহরের ওপব, যার শীর্ষদেশে আছে একছত্র লিপি ও নিম্নদেশে

কোন জন্তুর প্রতিকৃতি, (২) আর দ্বিতীয়ত কতকগুলি তামার পাতের ওপর। তামার পাতগুলির সাইজ আনুমানিক ২.৩ সেন্টিমিটার বর্গাকার। এগুলি সামান্য মোটা। আর অন্যগুলি হচ্ছে পাতলা, সরু ও লম্বা, যার মাপ হচ্ছে ৩.০ x ১.৩ সেন্টিমিটার থেকে ৩.৮ x ২.৫ সেন্টিমিটার। এই তামার পাতগুলির দু'পিঠেই অঙ্কন আছে। সামনের দিকে কেবলমাত্র লিপি, আর পিছন পিঠে কোন জন্তুব প্রতিকৃতি। তবে নরম পাথরের ওপর খোদিত সীলমোহরগুলির মাত্র এক পিঠেই লিখন আছে। এগুলির কোন obverse বা reverse নেই। এগুলির নমুনা ৫ নম্বর চিত্রে দেখুন।

সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের প্রথম চেষ্টা করেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বরূপ বিষ্ণু। তিনি ১৯টি চিহ্নের ধ্বনিমূল্য নির্ণয় কবে, তিনটি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার প্রকাশ কবেন। তারপর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ. ওয়াডেল 'ইণ্ডো-সুমেরিয়ান সীলস ডিসাইফারড' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করে প্রমাণ করবাব চেষ্টা করেন যে, হরপ্পা সীলের লিখন প্রাচীন সুমেবীয় লিখন রীতি ছাড়া আব কিছুই নয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণনাথ বিলাতের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সীলসমূহের এক নতুন পাঠোদ্ধাব প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধে তিনি বলেন যে, প্রাচীন সুমেবীয় ও প্রাক-বৈদিক-আর্যবা অভিন্ন। তারপর স্যার জন মাবশালের 'মহেঞ্জোদারো' নামক গ্রন্থেব এক অধ্যায়ে সি. জে গাড মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সিন্ধুসভ্যতার সীলমোহরসমূহের (১) লিখন ডান দিক থেকে বাম দিকে পঠনীয়, (২) লেখা সিলেবেল-ঘটিত, (৩) লেখা নামবাচক, ও (৪) নামগুলি প্রাচীন ইণ্ডো-আরিযান ভাষায় লিখিত। এই বইয়ের অন্য এক অধ্যায়ে এস ল্যাংডন মত প্রকাশ কবেন যে, সিন্ধুলিপি পরবর্তীকালের ব্রাহ্মী লিপিরই জনক। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে সি. জে. গাড তাঁর 'সীলস্ অভ এনসিয়েন্ট স্টাইল ফাউণ্ড অ্যাট উর' নামক নিবন্ধে দেখান যে প্রাচীন ইরাকের (সুমেরের) উর নগরে প্রাপ্ত ১০টি সীলমোহর সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন কবছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ অতুলকৃষ্ণ সুর ভারতের নানা পত্রিকার মাধ্যমে ফরাসী পণ্ডিত মঁসিয়ে গুলাউমের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রতি

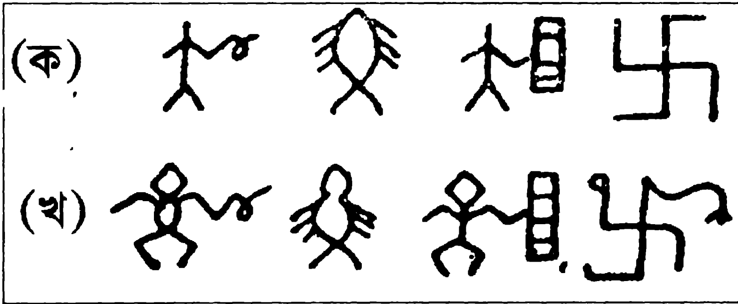




চিত্র ৫
মহেঞ্জোদারোর ভাস্কর্য

ভারতীয় সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই আবিষ্কার অনুযায়ী মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত সীলের ওপর লিখিত ৩০০ চিহ্নের সঙ্গে ইস্টার দ্বীপে প্রাপ্ত লিপির ১৮০টির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। (চিত্র ৬ দেখুন)।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত তাঁর 'প্রি-হিস্টরিক সিভিলিজেশন অফ দি ইণ্ডাস ভ্যালী' নিবন্ধে মত প্রকাশ করেন যে, যদিও সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহের লিপির সঙ্গে প্রাচীন সুমের বা মিশরের লিপির সাদৃশ্য আছে, তা হলেও এর উদ্ভব স্বতন্ত্রভাবে হয়েছিল এবং ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আপতিক ছাড়া আর কিছু নয়। এই সময় জি আর হান্টার অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দি স্ক্রিপট অব মহেঞ্জোদারো অ্যাণ্ড হরপ্পা অ্যাণ্ড ইটস কনেকশন ইউথ আদার স্ক্রিপটস' নামে এক থিসিস পেশ করে পি. এইচ ডি. উপাধি লাভ করেন। তিনি তাঁর থিসিসে নিম্নলিখিত মতবাদ প্রকাশ করেন— (১) সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা অনার্য, (২) সিন্ধু-লিপি হতেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব, (৩) সিন্ধু-লিপি ধ্বনিমূলক, (৪) সিন্ধু-লিপির উদ্ভব ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পূর্বেই হয়েছিল, (৫) মিশরীয় লিপি থেকে কিছু অনুকরণ করাও হতে পারে, (৬) ক্রীটদেশীয় লিপির সঙ্গেও এর কোন রকম সম্পর্ক থাকতে পারে, আর (৭) লিখন-রীতি ডান দিক থেকে বাম দিকে ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ এক



চিত্র ৬
(ক) সিন্ধুলিপি (খ) ইস্টারদ্বীপ-লিপি

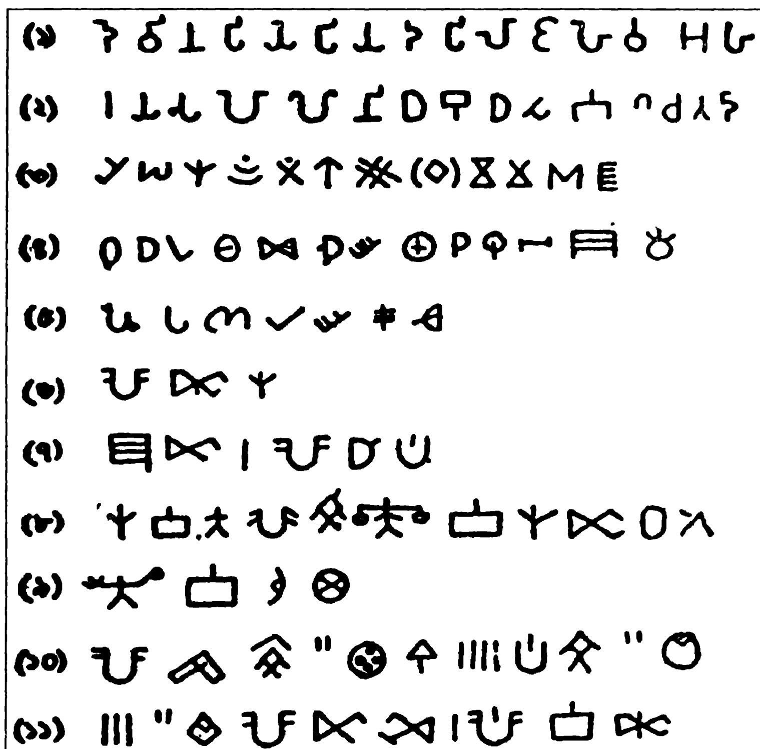
মতবাদ প্রকাশ করেন যে, সীলগুলি বাণিজ্য সম্পর্কে 'কারেন্সি নোট' হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালন এস. সি রস মত প্রকাশ করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতার লোকদের ভাষা ইন্দোনেশীয় ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এন. এস বিলিমরিয়া সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের ঋগ্বেদে বর্ণিত পণিদের সঙ্গে সনাক্ত করেন। এরপর অধ্যাপক হ্রজনী সিন্ধুলিপি হিটাইট লিপি বলে মত প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে আরও অনেকে যথা, এস. কে রায়, ফাদার হেরাস, আর সি হাজরা, এস. কে, রাও ও অধ্যাপক বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তীও সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার পূজাসংখ্যায় ডঃ অতুল সুর এক

নিবন্ধে প্রাচীন ক্রীটদেশীয় লিপি ও প্রাচীন বাঙলার পাঞ্চ-মার্ক-যুক্ত মুদ্রার উপর খোদিত লিপিচিহ্ন পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য দেখান। স্বামী শঙ্করানন্দ তাঁর 'The Rigvedic Culture of the Pre-Historic Indus' বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে হরপ্পার লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। শঙ্করানন্দ কিন্তু বহু পরিশ্রম করেছেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত— সিন্ধু সভ্যতা তথা হরপ্পা সভ্যতা আর্যদেবই সভ্যতা এবং কখনই ভারতে আর্য আক্রমণ ঘটে নি— এমনটা ঐতিহাসিকরা মেনে নিতে পারছেন না। আবার তাঁর লিপি পাঠ সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যে কঠোর সমালোচনা করেছেন তা এই রকম ঃ "... I am of the opinion that his approach to the problem is unscientific and his so-called decipherment of the pictorial scripts in the Indus Valley seals is of no historical value. It is a purely fanciful reconstruction which in my opinion does not deserve serious attention."

আগেই বলেছি, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহবগুলির ওপর খোদিত লিপিব পাঠোদ্ধাবের কাজ এখনও চলছে। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একখানা মূল্যবান সহায়ক পুস্তক প্রকাশিত হযেছে। বইখানা হচ্ছে ইরাবথম মহাদেবন সংকলিত সিন্ধুলিপিব সূচী (Concordance)। অবশ্য, এব আগে ফিনল্যাণ্ডেব ডঃ আসকো পাবপোলাও একখানা সূচীগ্রন্থ প্রকাশ কবেছিলেন। কিন্তু কার্যকারিতাব দিক থেকে মহাদেবনেব 'সূচী'টাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হযেছে। এছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়াব লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকাবী অধ্যাপক ডঃ নিকিটা গুবোব কম্পিউটারেব সাহায্যে সিন্ধুলিপিব সমস্ত চিহ্নগুলিব বীপ্‌সামূলক সংঘটন (Frequency distribution) বিশ্লেষণ কবেছেন।

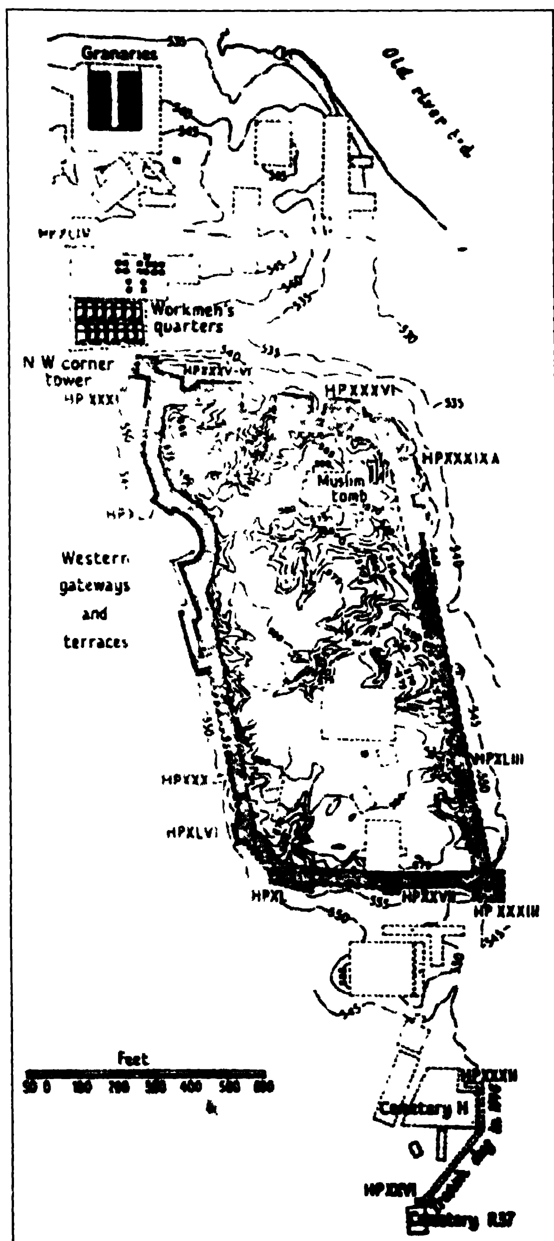
সাম্প্রতিককালে এই সকল অনুশীলনের ফলে সোভিযেত বাশিযাব পণ্ডিতমণ্ডলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন যে, সিন্ধুসভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে যে সকল সীলমোহব পাওযা গিয়েছে, সেগুলির ওপর যে লিপি খোদিত আছে, তা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষায বচিত। বস্তুত ভাষার প্রশ্নই গোড়া থেকে পণ্ডিতমহলকে বিব্রত কবে তুলেছে। এ সম্বন্ধে দুটি মত গড়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে লিপিগুলি আর্যভাষায় বচিত। সাম্প্রতিককালে এ মতেব পোষক হচ্ছেন এস, আর, বাও, ও বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতগণ। আর অন্য মত হচ্ছে এগুলি অনার্য ভাষায় বচিত। এ মত প্রথম প্রকাশ কবেন বর্তমান শতাব্দীব ত্রিশেব দশকেব গোড়ার দিকে ডঃ অতুলকৃষ্ণ সুব। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জি. আর্ হান্টাব অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যে থিসিস পেশ করেন, তাতেও তিনি এই মতই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এখানেও এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি নেই, কেননা প্রশ্ন উঠবে হরপ্পার সীলমোহরের ভাষা অনার্য হলে তা কোন্ অনার্য ভাষা, দ্রাবিড় ভাষা না মুণ্ডারী ভাষা? আগেই বলেছি, রুশদেশীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, এটা দ্রাবিড় ভাষা। ডঃ সুর মনে করেন এটা মুণ্ডারী ভাষা এবং এর থেকেই ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছিল। তবে তাঁর

মতটাই যে ঠিক, তা জোর করে বলা যায় না। আমাদের পুরাণসমূহে উল্লেখিত কিংবদন্তী অনুযায়ী, এটা মুণ্ডারী ভাষা হতে পারে, সে কথাই তিনি বলেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গ বিভিন্ন প্রবন্ধেও আলোচনা করেছেন। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে আমবা যে তিমিরে ছিলান, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছি। বস্তুত সিন্ধুলিপির পাঠ আজ পর্যন্ত অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে।



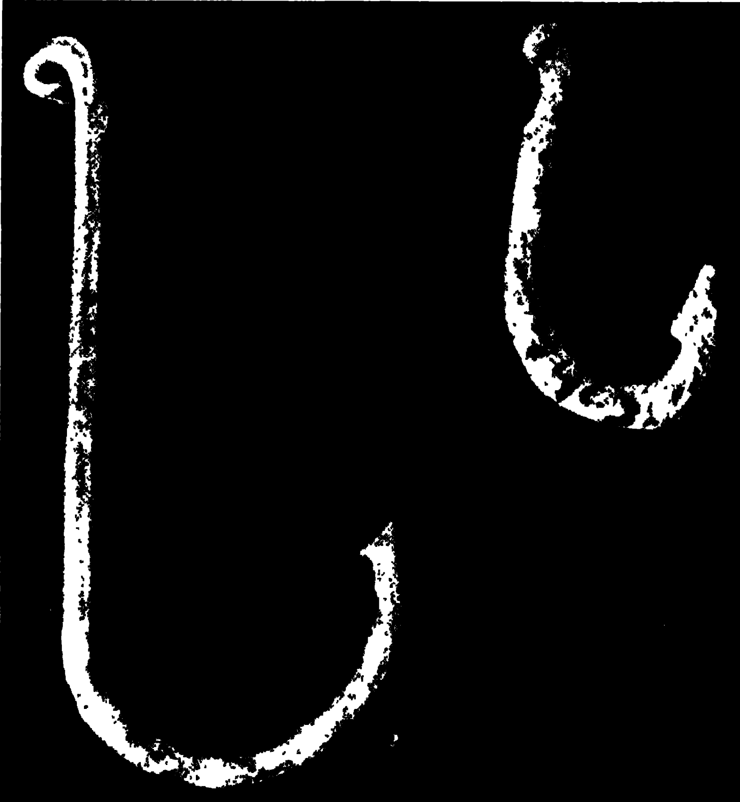
চিত্র ৭

টীকা—(১) অশোক অনুশাসনের ব্রাহ্মীলিপি, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী (২) পিপরহা লিপি, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। (৩) মেগালিথিক বা সমাধিলিপি, ৭০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (৪) দৈমাবাদলিপি, ১৩০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (৫) রঙপুরলিপি, ১৬০০-১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (৬) চণ্ডীগড় লিপি, ১৯০০-১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (৭) রাখি শাহপুরলিপি, ১৯০০-১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (৮) লোথাল 'বি' ১৯০০-১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (৯) রোজডিলিপি, ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (১০) মহেঞ্জোদারোলিপি, ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (১১) লোথাল 'এ' ২০০০-১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। (মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা • ডঃ অতুল সুর)



চিত্র ৮
হরপ্পা নগরের দুর্গাঞ্চলের নকশা

হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি কারণ এর সঠিক পাঠোদ্ধার নির্ভর করছে দুটো জিনিসের ওপর— (১) কোন্ ভাষায় সিন্ধুলিপিতে লিখিত অভিলেখসমূহ রচিত হয়েছিল, এবং (২) সেই সম্পর্কে কোন দ্বিভাষিক অভিলেখের আবিষ্কার ও সিন্ধুলিপিতে লিখিত কোন দীর্ঘ অভিলেখের ওপর। আজ পর্যন্ত যেসব প্রত্নবস্তুর ওপর লিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করত। সেজন্য সেগুলি সংক্ষিপ্ত এবং সেগুলি হয় পাথরের, আর তা নয়তো তামার পাতের ওপর লিখিত। দীর্ঘ অভিলেখ খুব সম্ভবত ভূর্জপত্রের ওপর লিখিত হত, এবং কালের আবর্তনে তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং হরপ্পার লিপিমালা পাঠ করা ক্রমশঃই জটিল হয়ে পড়ছে। একটা দীর্ঘ অভিলেখ এবং একটা দ্বিভাষিক অভিলেখ পেলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারতো। কম্পিউটাবেব সাহায্যে এর পাঠোদ্ধার হবে কিনা তা বলা মুশকিল।



চিত্র ৯
তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বঁড়শির কাঁটা

সুতরাং হরপ্পা লিপি থেকেই যে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব তা বোঝা যায় উপরের লিপিগুলি থেকে। ৪০০০ বছর আগেব হরপ্পা লিপির বিবর্তন বোঝা যায় উপরের বিভিন্ন সময়ের লিপি থেকে। তবে হরপ্পা লিপির উদ্ভব কাল ৫০০০ বছর আগে। ৪০০০ বছর আগে অবধি ছিল সেই লিপির রমরমা।

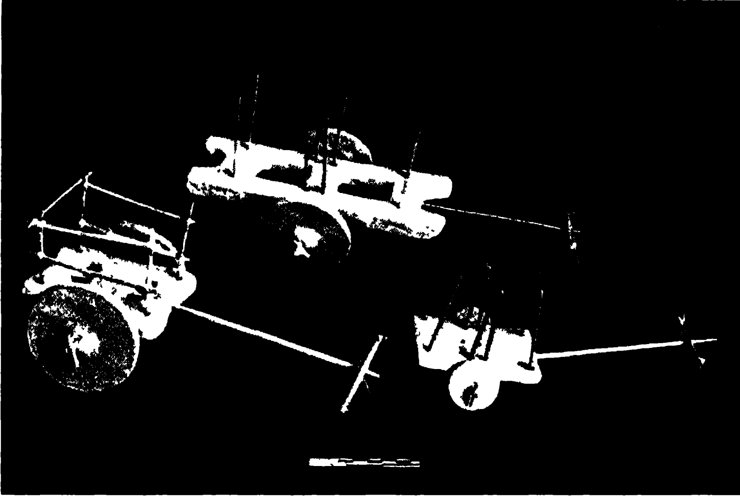
একটু আগেই বলেছি, সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন গোড়া থেকেই পণ্ডিতসমাজকে বিব্রত করেছে, তা হচ্ছে লিপিগুলি কোন্ ভাষায় রচিত? আর্য, না অনার্য? অনেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে সিন্ধুলিপি মূলগতভাবে দ্রাবিড় লিপি। রুশদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই লিপির কম্পিউটার বিশ্লেষণ (Computer-ızed) হবার পর থেকেই, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করছে। আগেই বলেছি, এ মতের পোষক হচ্ছেন তামিলনাড়ুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ডঃ আর. নাগস্বামী ও লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নিকিটা গুরোব ও অধ্যাপক জ্ঞরোজোব (Knerozov) ও ফিনল্যান্ডের পণ্ডিত ডঃ আস্কো পাবপোলা। আর্যদেব যে কোন লিপি ছিল না এবং তারা যে অনার্যদেব কাছ থেকে লিখন প্রণালী ধার করেছিল সে সম্পর্কে ডঃ অতুল সুর বলেছেন ঃ

"আর্যদেব মধ্যে যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল এবং ব্রাহ্মীলিপি তাদেব দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল, তাব স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। ববং বেদাদি শাস্ত্রসমূহ অনার্য-যোনি সম্ভূত ব্যাসদেব কর্তৃক সংকলন ও অনার্য দেবতা গণেশ কর্তৃক মহাভাবতের শ্রুতিলিখন—এই ট্রাডিশন প্রমাণ করে যে, লিখন-প্রণালী আর্যরা অনার্যদেব কাছ থেকে পেয়েছিল।

গণেশ বা বিনায়ক অনার্য দেবতামণ্ডলী থেকে গৃহীত হয়েছিল। তাব পিতা শিব অনার্য দেবতা। ব্রাহ্মণ্যধর্মেব দেবতামণ্ডলীতে গণেশের উদ্ভব অর্বাচীন। বামাযণ এবং অনেক পুরাণে গণেশেব উল্লেখ নেই। আদি মহাভাবতেও গণেশের নাম নেই। তাব নাম আমবা প্রথম পাই যাজ্ঞবল্ক্যে, তাও দেবতা হিসাবে নয, রাক্ষস বা অসুব হিসাবে এবং মানুষেব সকল কর্মের সিদ্ধিনাশক হিসাবে। বিনায়ক নামে এক শ্রেণীব বাক্ষসেব নামও আমরা প্রাচীন সাহিত্যে পাই। মনে হয, আর্যদের মধ্যে যেহেতু কোনরূপ লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল না, সেইহেতু যখন তাদেব একজন লিপিকবের প্রযোজন হয়েছিল, তখন তারা বিনায়ক নামধাবী এক দেশজ জাতিব কাছ থেকেই এক লিপিকরের সাহায্য নিয়েছিল। লিপিকর হিসাবে তিনি আর্যদেব যে প্রভূত উপকার সাধন কবেছিলেন, তার জন্যই ব্রাহ্মণ্যদেবতামণ্ডলীতে তাঁকে দেবতাব স্থান দেওয়া হযেছিল। তখন যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধিনাশক রাক্ষস, সিদ্ধিদাতা দেবতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন। মনে হয়, গণেশ আদিতে ভারতের আদিমতম অধিবাসী অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক ছিল। অস্ট্রিক ভাষা-ভাষীদের (যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, মুণ্ডারী ভাষাভাষীরা) একসময বিস্তৃতি ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। সিন্ধুলিপির সঙ্গে ইস্টার দ্বীপের লিপির সাদৃশ্য এ সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করে, তা বিবেচ্য।"

হরপ্পার মানুষজনেরা ওজন এবং পবিমাপে অত্যন্ত আধুনিক ছিল। সাড়ে চার

হাজার বছর আগে এতো উন্নত ওজন এবং পরিমাপ ব্যবস্থা কল্পনায়ও আনা যায় না। অথচ হরপ্পা সভ্যতার লোকজনরা তেমন পদ্ধতিই আবিষ্কার করেছিলেন। ছোট ওজনের



চিত্র ১০
টেরাকোটার খেলনা গাড়ী

বাটখারার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট একককে ভিত্তি মান ধরে তাব ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ও ৬৪ গুণ ওজনেব বাটখারা তৈবি করা হত। আবার বড় ওজনেব ক্ষেত্রে বাটখারাগুলি হত নির্দিষ্ট এককের ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০ এবং ১২, ৮০০ গুণ। বাটখারাব ক্ষেত্রে এককের মান ছিল ০.৮৫৬৫ গ্রাম। একই ওজনের বাটখারাগুলি নিখুঁতভাবে সমান ওজনেব ছিল। লোথালে বহু সংখ্যক বাটখারা পাওয়ার পব নতুন করে পর্যালোচনা করে, পণ্ডিতবা এখন বলছেন যে, ওজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাটখারা তৈরি করা হয়েছে দশমিক হিসাবে। দুটি গুণিতক শ্রেণীর প্রথমটি হল ০.০৫, ০.১, ০.২, ০.৫, ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০। এর থেকে বোঝা যায় হরপ্পা সভ্যতার বাটখারাগুলি নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রযেছে। হবপ্পার বিভিন্ন নগরে যে সব মাপদণ্ড বা মাপকাঠি পাওয়া গেছে তার দশমিক ভাগ হল ১.৩২ ইঞ্চি করে। আমাদের একফুটের স্কেলের মত ওরা যে স্কেল ব্যবহার করতো আর দৈর্ঘ্য ছিল ১৩ ২ ইঞ্চি। এই স্কেলই হরপ্পার বিভিন্ন শহরে ব্যবহৃত হত। তেমনি ওরা আরেকটি ব্রোঞ্জের তৈরি রড বা দণ্ড ব্যবহার করত দৈর্ঘ্য মাপার জন্য। সেটি ছিল এক-হাতি (Cubit) স্কেল। একালে একহাত ১৮ ইঞ্চিতে হলেও হরপ্পা সভ্যতার লোকদেব কাছে একহাতি স্কেলের দৈর্ঘ্য ছিল ২০.৭ ইঞ্চি। এই রডের ০.৩৬৭ ইঞ্চি দূরে দূরে দাগ কাটা থাকতো। হরপ্পা সভ্যতায় এ ধরনের যত রড পাওয়া গেছে তাদের দৈর্ঘ্য ও তাদের উপরের মাত্রাঙ্কন (Graduation) অদ্ভুতভাবে সমান। এই ধরনের স্কেল

বা রড দৈর্ঘ্য মাপের জন্য ওই সময় ব্যাপক ব্যবহৃত হত পশ্চিম এসিয়া এবং মিশরে।

গণিতবিদ্যাব বিভিন্ন শাখা ও দশমিক প্রথা যে ভারত থেকেই অন্যান্য দেশে গিয়েছিল, তা অনেক আগেই পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত হযেছে। কিন্তু এসব বিদ্যা যে আর্যদেব এদেশে আসবাব আগেই ভারতে অনুশীলিত হত, তার প্রমাণ আমবা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পেয়েছি। সিন্ধুসভ্যতা যে বাণিজ্যিক সভ্যতা, এটা সর্বজনস্বীকৃত। বাণিজ্যের লেনদেন লিপিবদ্ধ কববার জন্য সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের মধ্যে হিসাবরক্ষণ প্রথা ছিল। এটা স্বাভাবিক যে, হিসাববক্ষার জন্য হবপ্পা সভ্যতার লোকেরা নিশ্চয়ই সংখ্যাব ব্যবহার করতো। বস্তুত তাম্রাশ্মযুগে সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, তাব ধারকদের যে পাটিগণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতির বিশেষ বকম জ্ঞান ছিল, তার বহুল নিদর্শন আমবা পেয়েছি। দৈর্ঘ্য মাপবার জন্য তাবা যে দশমিক প্রথা ব্যবহার কবত, তাব প্রমাণও আমরা পেয়েছি ৩ ৩৫ মিলিমিটাব অন্তর দাগ দেওযা মাপকাঠি থেকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে যে সিন্ধু সভ্যতাব ধাবকবা ঋজু (Vertical) ও অনুভূমিক (Horizontal) রেখা-দাগ দ্বাবাই সংখ্যা গণনা কবত। পরবর্তী কালেব খবোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি প্রণালীতেও এরূপ দাগ দ্বাবাই সংখ্যা বোঝানো হত। এমন কি, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অশিক্ষিত লোকদেব মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

সিন্ধুসভ্যতাব বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত ইটসমূহের মাপেব ঐক্য থেকেও বুঝতে পাবা যায় যে ওই সভ্যতাব ধাবকবা গণিতবিদ্যাব সঙ্গে বিশেষভাবে পবিচিত ছিল। এছাড়া, পাশাখেলাব ঘুঁটিব ওপবও আমবা এক থেকে ছয পর্যন্ত সংখ্যাবাচক দাগ দেখি।

উপবে যে দু'বকম মাপদণ্ডেব কথা বলা হযেছে, তাছাড়া, ওজন নির্ণযেব জন্যও যে পাথবেব বাটখাবাব প্রচলন ছিল, সে কথা আগেই বলা হযেছে। এবকম অনেক বাটখাবা পাওযা গিযেছে। এক বকম ছোট বাটখাবা পাওযা গিযেছে, যেগুলো ঘনক আকাবেব। এই শ্রেণীব বাটখাবাব সবচেয়ে ভারি বাটখাবাব ওজন হচ্ছে ২৭৪.৯ গ্রাম। আব এক বকম গোলাকাব ভাবি ওজনেব বাটখাবা পাওযা গিযেছে, যাব সবচেযে ভারি বাটখাবাব ওজন হচ্ছে ১১ কিলোগ্রাম। আগেই বলেছি, ওজন প্রথা ০ ৮৫৬৫ গ্রাম ওজন এককেব (Unit) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এই ভিত্তিবই ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০, ১২৮০০ গুণিতকে বাটখাবাগুলি তৈবি হত। হবপ্পা সভ্যতার দাঁড়িপাল্লাব যে নমুনা পাওযা গিয়েছে, তা আজকালকারই মত। একটা ব্রোঞ্জনির্মিত দাঁড়েব দুদিকে তামাব পাত্র ঝুলানো থাকত।

হবপ্পাব লোকবা যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাবঙ্গম ছিল সে কথা পণ্ডিতেবা বলছেন। এই সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রে থেকে ৩ x ১.৯ সেন্টিমিটাব থেকে ৩.৮ x ২ ৪ সেন্টিমিটাব সাইজের অনেকগুলি পাতলা, সরু ও লম্বা তামার পাত পাওয়া গেছে, যার এক পিঠে লিপি ও অন্য পিঠে জন্তু বা মানুষের মূর্তি খোদিত আছে। রাখালদাস এগুলিকে মুদ্রা বলে অনুমান করেছিলেন। কিন্তু মুদ্রা হতে হলে এগুলির সমপরিমাণ ওজন হওয়ার কথা। তা কিন্তু এদের মধ্যে নেই। ডঃ সুর লিখেছেন ঃ "বোধ হয এগুলি গ্রহশান্তির



চিত্র ১১
মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় পাওয়া তামার পাতের এপিঠ-ওপিঠ

জন্য ব্যবহৃত হত। মনে হয় পাতগুলিব একপিঠে মন্ত্র ও অপর পিঠে সেই গ্রহের রাশিচিহ্নের প্রতিকৃতি থাকত। যে সকল প্রতিকৃতি আমরা পেয়েছি, তা থেকে মেষ, বৃষ, মিথুন, সিংহ, কুম্ভ, ধনু ও মীন রাশি-চিহ্নের প্রতিকৃতি সহজেই চিনতে পাবা যায়। গ্রহশান্তি করতে হলে জাতকের কোষ্ঠী বিচার একান্ত প্রয়োজন। তাব জন্য গণনার দরকার। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে গণিতশাস্ত্রের যে অনুশীলন হত তা সহজেই অনুমেয়। তবে এগুলো Identity Cardও হতে পারে, যার উল্লেখ মহাভারতে আছে।"

হরপ্পার লিপিগুলি পঠিত হলে তবেই হয়তো বোঝা যাবে এই ছোট ছোট পাতগুলি কী— তাবিজ না পরিচয় পত্র। তাবিজ হলে অবশ্য গ্রহ শান্তির কথা আসে, আসে কোষ্ঠির কথা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষবিদ্যার কথা।

রাস্তাঘাট নির্মাণের সমান্তবালতা ও কোণসমূহ (Angles) থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের জ্যামিতিক জ্ঞানও বিলক্ষণ ছিল। নগরগুলি দুই সমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভুজের আকারে গঠিত হত, এবং তার জন্য রীতিমত জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হত। মৃৎপাত্র ও অন্যান্য শিল্পসামগ্রীর ওপর অঙ্কিত নক্শাসমূহ থেকেও আমরা তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় পাই। অস্ত্রশস্ত্র ও কুঠার প্রভৃতির অক্ষবর্তী সামঞ্জস্যও তাদের জ্যামিতিক জ্ঞান নির্দেশ করে। বৃত্তাঙ্কন যন্ত্রও (Compass) যে ব্যবহৃত হত, তা

অনেক সামগ্রীর ওপর অঙ্কিত সমান্তরাল বৃত্তাকার রেখাসমূহ থেকে প্রকাশ পায়।

সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা যে কেবলমাত্র গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন তা নয়। তাঁরা ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও ধাতু বিদ্যাতেও পারঙ্গম ছিলেন। ধাতুবিদ্যাতে তাঁদের পারদর্শিতা, ধাতুগলনের জন্য কয়েকটি চুল্লি ও মুচি থেকে প্রকাশ পায়। এছাড়া তাঁরা চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদও ছিলেন। টিন ব্যবহারের পূর্বে তাঁরা আর্সেনিক দিয়ে ব্রোঞ্জ (Bronze) তৈরি করতেন। এরজন্য আর্সেনিক ঘটিত নানারূপ ব্যাধি দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত হতেন এবং সে সব ব্যাধির চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। একটি করোটিতে এক ছিদ্র থেকে বোঝা যায় যে শল্য চিকিৎসাতেও তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। আর একটি কঙ্কাল থেকে প্রকাশ পায় যে তাঁদের ক্যানসার বোগও হত এবং তার চিকিৎসারও তাঁরা চেষ্টা করতেন।

হরপ্পা সভ্যতা জানতো উন্নতমানের ব্রোঞ্জ, কাঁচ ও চীনামাটির (Porcelain) বাসন তৈরি করতে। অন্ততঃ হাজারখানেক বছর ধরে গভীর অনুশীলন ও চর্চায় তারা এগুলির মান অনেক উন্নত করে। চীনামাটি যে চীনের নয় ভারতের হরপ্পা সভ্যতার অবদান সেটা আজ সকলেবই জানা। কাঁচ যে ইউরোপ বা পারস্য অঞ্চলের আবিষ্কার নয়, সেটা যে হবপ্পার অবদান তাও আজ সকলের জানা।

মহাভারতের কাহিনী যে ঐতিহাসিক তা প্রায় প্রমাণ হতে চলেছে। মহাভারতের মৌসলপর্বে দ্বারকার সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার কাহিনী রয়েছে। সেই কাহিনী প্রায় সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ইদানীং নিমজ্জিত সেই দ্বারকাকে কচ্ছ-উপসাগরের তলদেশে খুঁড়ে বের করা হয়েছে। প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শনের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে ৪২০০/৪৩০০ বছর কিংবা তার কিছুটা বেশি। অর্থাৎ এই প্রত্নবস্তুগুলি হরপ্পা সভ্যতাব সমসাময়িক। সমুদ্রের তলদেশে পাওয়া গেছে দ্বারকানগরীর ধ্বংসাবশেষ। এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, শেষ সিদ্ধান্ত, এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। তবে এটা বলা যায়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এই অনুসন্ধানে সমুদ্রতলে যে নগবীর হদিশ পাওয়া গেছে তা সম্ভবত দ্বারকানগরীর, যা মহাভারতের কালে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। বরাহ মিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' বলছে যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন ৬৫৩ কল্যাব্দে। এখন (২০০২ খ্রীষ্টাব্দে) কলিযুগের ৫১০৩ বছর। সুতরাং মহাভারতের যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন ৪৪৫০ বছর আগে অর্থাৎ ২৪৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সুতরাং যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছিলেন হরপ্পা সভ্যতার রমরমার কালে। মহাভারতের কাহিনী তাই হরপ্পা সভ্যতার সমকালীন কাহিনী এবং তা ঐতিহাসিক।

প্রসঙ্গত বলা যায়, গুজরাট উপকূল থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে ক্যাম্বে উপসাগরের ঘোলাজলের নিচে সমুদ্র-তলদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় ৯৫০০ বছর আগেকার এক প্রাচীন শহরের ভগ্নাবশেষ। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওসেন টেকনোলজি (NIOT), চেন্নাই, গুজরাট উপকূলে সমুদ্র-দূষণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিল। গতবছব (২০০১ খ্রীষ্টাব্দ) তারা দূষণ মাপতে গিয়ে সমুদ্রতলার বেশ কিছু ছবিও তোলে। এই ছবিগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে তারা হদিশ পেলো এক অতি



চিত্র ১২
হরপ্পার সোনার হার

প্রাচীন বিশাল শহরের ধ্বংসাবশেষের। সমুদ্রের তলায় থাকা এই বিশাল নগরের এই অবশেষ থেকে দেখা গেছে এটি প্রায় নয় কিলোমিটার লম্বা। একটা শুষ্ক নদীখাতের ধারে এব অবস্থান। শহরের পরিকল্পনা অনেকাংশে হরপ্পার শহরগুলির মত। একটা নদী বাঁধের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গেছে ওই শুকিয়ে যাওয়া নদী-খাতে। এই NIOT-এর সদস্যেরা ছবিতে এই সব দেখবার পর সমুদ্রের তলদেশ থেকে খুঁড়ে বের করে এনেছে প্রায় ২০০০ প্রত্ন-নিদর্শন। তলদেশে গিয়ে তারা দেখে এসেছে মহেঞ্জোদারোর মত বিশাল স্নানাগার, হরপ্পার মত বিশাল প্লাটফর্ম যার আয়তন ২০০ মিটার x ৪৫ মিটার। ওখানেই দেখা গেছে ১৮৩ মিটার লম্বা শস্যাগার যা অনেকটা হরপ্পার আদলে নির্মিত। জলের তলায় এই বিশাল প্রাচীন শহরটি সবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর বয়স ঐতিহাসিকরা নির্ণয় করতে শুরু করেছেন। গবেষণা চলছে এটি কোন্ সভ্যতার সঙ্গে জড়িত তা জানতে।

প্রত্ননিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে এখন মোটামুটি এই জল-নিমজ্জিত নগরীর যে সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে তা হল ৯৫০০ বছর বা খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫০০ অব্দ। তা হলে কি এই নগরী হবপ্পাব পূর্বসূরী? ৯৫০০ বছর আগে নবোপলীয যুগ চলছে তখন। সেই সময় এই শহর গড়ে উঠেছিল কেমন করে? কারা এই শহরের নির্মাতা? এসব প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। যদি এই আনুমানিক সময়কাল নিশ্চিতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয তা হলে এটাই হবে পৃথিবীর প্রাচীনতম নগব-সভ্যতা। হরপ্পার নগর-সভ্যতা হবে এর উত্তরসূরী। সমস্ত ইতিহাস যাবে বদলে। মানব সভ্যতাব ক্রমোন্নতির ইতিহাস এমন একটা অবস্থায় আসবে যে সভ্যতাব গতি এবং তার উন্নতি কেবল বৈখিক (Linear) এটা আর বলা যাবে না তখন। ভাবতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রাক্তন ডাইরেকটব জেনারেল জগৎপতি যোশী বলেছেন, 'It could provide the missing links in understanding the rise of cities.'। আগেই বলেছি, একটা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা কী করে হরপ্পার মত একটা পরিণত ও পরিপূর্ণ নগর সভ্যতায় রূপান্তরিত হল তার প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ আজও আমরা খুঁজে পাইনি। হরপ্পার মত শহর কিংবা হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি যেন হঠাৎই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে তার বিবর্তনের কোনও নজির আজও আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। ক্যাম্বে উপসাগরের এই আবিষ্কার হয়ত এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ক্যাম্বে উপসাগরকে এখন বলা হয় 'খাম্ভাট উপসাগর' (Gulf of Khambhat)।

অনেক পণ্ডিতজন অবশ্য এই সময়কাল ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে সব মিলিয়ে মনে হয়, ক্যাম্বে উপসাগরের তলায় যে নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা দরকার। জল ওঠার জন্য মহেঞ্জোদারোর নিচের স্তর উৎখনন করা যেমন যায় নি, যা এখনই করা দরকার, তেমনি ক্যাম্বে উপসাগরের

তলায় সদ্য পাওয়া এই প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের পরিপূর্ণ উৎখনন, পরীক্ষণ এখনই প্রয়োজন। আর সত্যিই যদি এই প্রাচীন শহরের বয়স ৯৫০০ বছর হয় তবে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে, যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লেখা হয়েছে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর। আগে আমাদের ইতিহাস শুরু হত বৈদিক সভ্যতার কাল থেকে। আর এখন আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হয় প্রাগৈতিহাসিক কাল পেরিয়ে হরপ্পা সভ্যতার কাল থেকে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের হবপ্পা সভ্যতার অবদান অজস্র। সে আলোচনায় পরে আসবো।

এখন পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাতে হরপ্পা সভ্যতাই ভাবতের প্রাচীনতম সভ্যতা। শুধু ভারতেরই নয় সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং উন্নততম সভ্যতা হল হরপ্পা সভ্যতা। এই সভ্যতা পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম সভ্যতাও। সমকালীন কিছু উন্নত সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পার তুলনামূলক আলোচনা করলেই এব প্রাচীনত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা যায়। তেমনি এক আলোচনা কবা হযেছে পববর্তী পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিছু সমকালীন সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতার সমসামযিক যে তিনটি সভ্যতার কথা এই পবিচ্ছেদে আলোচিত হবে তাদের মধ্যে প্রথমেই আসে 'সুমেব সভ্যতা'র কথা। অন্য দুটি সভ্যতা হল ঃ মিশরীয় সভ্যতা এবং মায়া সভ্যতা। ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদীর তীরে এখন থেকে প্রায পাঁচ হাজাব বা সাড়ে পাঁচ হাজার বছব আগে গ'ড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিযা সভ্যতা। এই সভ্যতার লোকদেব বলা হয় সুমেবীয। তাই এই সভ্যতার আবেক নাম 'সুমেব সভ্যতা' বা 'সুমেবীয সভ্যতা'। দীর্ঘকাল বিস্তৃত এই সভ্যতায় অবদান যুগিযেছিল আক্কাদীয, ব্যাবিলোনীয় এবং অ্যাসিবীযরাও। সুমেবীয়রা যে মেসোপটেমিযাব অধিবাসী ছিল তা আধুনিক বোগদাদ বা বাগদাদ হতে পারস্য উপসাগব অবধি বিস্তৃত ছিল। সংক্ষেপে মেসোপটেমিয়া বলতে বোঝায় ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীদ্বযেব মধ্যবর্তী দোযাব অঞ্চল, যা বোগদাদেব উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। দোয়াব অঞ্চলটাকে আবববা বলতো 'আল-জাজিবা' [Al-Jazırah]। এর দক্ষিণে ব্যাবিলন নগবী। কিছুটা বিস্তৃতভাবে মেসোপটেমিযাব সীমানা ছিল — উত্তবপূর্বে জাগ্রোস পর্বতমালা [Zagros Mountaıns], দক্ষিণ-পশ্চিমে আববীয় মালভূমি, দক্ষিণ-পূর্বে পাবস্য উপসাগর এবং উত্তর-পশ্চিমে অ্যান্টি-টাউবাস পর্বত শ্রেণী [Anti Taurus Mountaıns]। বোগদাদ থেকে পাবস্য উপসাগব অবধি দোযাব অঞ্চল প্রায সমতল। উত্তবেব সঙ্গে দক্ষিণের উচ্চতাব পার্থক্য মাত্র ১০০ ফুট। ফলে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস অত্যন্ত ধীর প্রবাহিনী হয়ে পাবস্য উপসাগরে মিশছে। এই ধীব প্রবাহেব ফলে এই দুটি নদীতে প্রচুর পলি জমত। তাই, ভবাট হওয়া নদীর দুকূল প্লাবিত হযে বন্যা দেখা দিত। দোযায অঞ্চলে প্রথম প্রথম এই বন্যাব জলেই চাষবাস হত। সুমেরীযবা সেচ-ব্যবস্থার আশ্চর্য উন্নতি ঘটিযে ৫০০০ বছব বা তারও বেশি আগে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কবে, নদীব জলকে চাষেব কাজে লাগায়। ফলে, মেসোপটেমিযার দক্ষিণাংশ অত্যন্ত শস্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিকবা বলেছেন, প্রায ১২,০০০ বছর আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব দশ সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে ভালো বৃষ্টিপাত হত, সেই সব জায়গায নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষেরা চাষবাস শুরু করেছিল। এ নিয়ে অবশ্য পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থা চালু করে, নদীর জলকে চাষের কাজে লাগিয়ে সুমেরীয়রা প্রায় ৫০০০/৬০০০ বছর আগে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়াকে অত্যন্ত শস্যশালী করে তোলে।

এই রকম একটা সময়ে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া সংস্কৃতির দিক থেকেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এতোদিন উন্নততর সংস্কৃতির ধারক ছিল উত্তর মেসোপটেমিয়া। শস্য সমৃদ্ধির সঙ্গে সেটা চলে যায় দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার কাছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গত ৮০০০ বছর ধরেই বোগদাদ অঞ্চলের আবহাওয়া প্রায় একই রকম রয়েছে। সুমের সভ্যতার রমরমার ব্যাপ্তি প্রায় তিন হাজার বছর। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এর সবচেয়ে সমৃদ্ধির ব্যাপ্তি ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। হরপ্পা সভ্যতার রমরমার কালও ছিল ওই রকম একটা সময় জুড়ে। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ নাগাদ আর্যরা সিন্ধু অঞ্চলে আক্রমণ চালায়। হরপ্পা সভ্যতার বিনাশ শুরু হয়ে যায় এবং ৩০০ বছরের মধ্যেই তারা আর্যাবর্তের অনেকটা নিজেদের অধিকারে আনে।

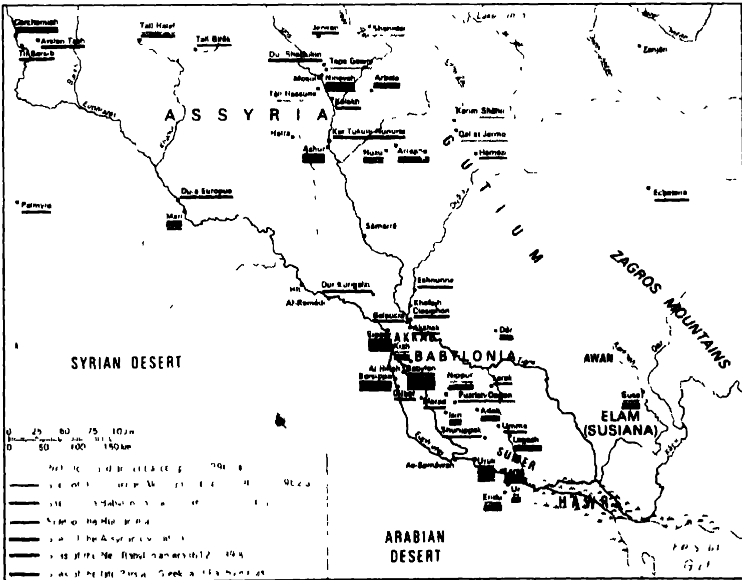
সুমেরীয়রা এক অজ্ঞাত গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। তবে তাদের আবয়বিক গঠনে হরপ্পীয়দেব সঙ্গে প্রবল মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বেশ কিছু পণ্ডিতের মতে, হবপ্পীয়বাই মেসোপটেমিয়া গিয়ে সেখানে এই নগরভিত্তিক উন্নত সভ্যতার পত্তন কবে। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, তাঁদেব মতে, হরপ্পা সভ্যতাবই কিছুটা পবিবর্তিত রূপ। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার সাল হতে ভাষাগত ভিত্তিতে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। কতকাল আগে এবং কোথা হতে ব্যাবিলনে তথা তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে তারা এসেছিল তা এখনও সঠিকভাবে জানা যাযনি। এদের লিপিব নাম দেওযা হয়েছে কীলকাক্ষর বা ক্যুনিফর্ম লিপি [Cuneıform Letters]। মোট ৪২টি অক্ষব দিযে তারা তৈবি কবেছিল এই বর্ণমালা। নরম মাটির ফলকের উপর শব বা নলখাগড়ার কলম দিযে তারা কীলকাক্ষরে লিখতো। হাজার হাজার মাটির ফলক পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল খুঁড়ে। সে কালে ইউরোপ যখন নব্য প্রস্তর যুগে পাথরের ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করছে তখন সুমেরীয়বা চর্চা করছে লিপির। সুমেরীয়রা তখন তাদের দলিল-দস্তাবেজে সীলমোহরের ছাপ লাগাচ্ছে। রপ্তানি করা মালপত্রে দিচ্ছে সীল। তাদের সীলমোহরগুলি মাত্র পৌনে এক ইঞ্চি থেকে সোয়া দু'ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা। খাজনা আদায় করা হত রসিদ দিয়ে। সেই রসিদেও থাকতো সীলমোহরের ছাপ। সুমেরীয়রা বেলনাকার [Cylındrıca!] সীলমোহরও ব্যবহার করতো। অনেক হরপ্পীয় সীলমোহর যেমন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে পাওয়া গেছে, তেমনি বহু সুমেরীয সীলমোহর পাওয়া গেছে হরপ্পা, লোথাল, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারো প্রভৃতি অঞ্চলে। এক অত্যুন্নত নাগরিক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল সুমেরীযরা। হাজার হাজার মাটির ফলকে তাবা উৎকীর্ণ করতো শাসন ব্যবস্থার কথা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা। রচনা করতো মহাকাব্য। মাটির ফলকে উৎকীর্ণ করা, ক্যুনিফর্ম লিপিতে লেখা দুটি মহাকাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এর একটি হল 'গিলগামেশ মহাকাব্য', অন্যটি 'এতান মহাকাব্য'। গিলগামেশ লেখা হয়েছিল ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং এতান লেখা হয় ৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সুবিধা হল, কীলকাক্ষর লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

ফলে, সুমের সভ্যতার অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল, হরপ্পার লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। সুমেরীয় সভ্যতার উন্নতির মান হরপ্পা কিংবা মিশরীয় সভ্যতার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। হরপ্পা সভ্যতারই যেন এক বিবর্তিত রূপ হল সুমেরীয় সভ্যতা।

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার সীল-সম্পর্ক নিয়ে সি. জে. গাড। [C. J. Gadd] সে সময় বৃটিশ অ্যাকাডেমিব কাছে একটা রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টে অন্ততঃ ২৬টি হরপ্পীয় সীলমোহর, যেগুলি মেসোপটেমিয়ার উর [Ur], কিশ [Kish] এবং লাগাশ [Lagash] অঞ্চলে পাওয়া গেছে, সেগুলির কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই রিপোর্টের বেশ কিছুটা অংশ প্রণিধানযোগ্য।

গাডসাহেব তাঁর 'Seals of Ancient Indian Style found at Ur' নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"The very great interest which has, in the last few years, been attracted to the excavations of two early sites, Mohenjodaro and Harappa, in the valley of the Indus, was first aroused by Sir John Marshall's revelation of his discoveries in the autumn of 1924. Notable similarities to various Mesopotamian antiquities were not long in being observed and pointed out, but the most remarkable



চিত্র ১৩
মেসোপটেমিয়া সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে যে সব অঞ্চলে

of all the objects found, the seals engraved with animal figures and inscriptions in a completely unknown character, were not in themselves comparable with Mesopotamian seals, even if the new signs were ocassionally reminiscient of the early sumerian pictographs. It is not a little surprisig, therefore, that in the preceding autumn [1923] a specimen of these Indian seals had been found by a Scientific Expedition working at the site of the ancient city of Kish, near the Euphrates.

"With this evidence alone it became manifest that the cultural similarities between the two regions must have depended upon a definite contact in historical times : at what period could not be inferred from the position in which the seal was found at Kish, beyond the assurance that it was at least before 2,000 BC."

সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পার যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো তা নয়, সাংস্কৃতিক সম্পর্কও তাদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। সিন্ধু সভ্যতাব সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় সুমেরীয় সভ্যতার। প্রাচীন সুমের সভ্যতায একটা কিংবদন্তী আছে। সেই কিংবদন্তী অনুযায়ী সুমেরীয়রা সুমেরের দেশজ অধিবাসী ছিল না। তাদেব কিংবদন্তী অনুযায়ী তাবা প্রাচ্য দেশের কোন পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমুদ্রপথে সুমেব এসেছিল। ডক্টর হল একসময় এই মতবাদ প্রকাশ কবেছিলেন যে সুমেরীযবা ভাবত থেকে গিযে সুমেরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

এ সম্পর্কে ডঃ অতুল সুর তাঁর 'মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইটিতে লিখেছেন ঃ "১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি 'ইন্ডিয়ান হিস্টবিক্যাল কোয়াটাবলি' পত্রিকায় 'যোগিনীতন্ত্র' থেকে এ সম্বন্ধে একটা শ্লোক উদ্ধৃত কবেছিলাম। সে শ্লোকটা হচ্ছে — 'পূর্বে স্বর্ণনদী যাবৎ করতোয়া পশ্চিমে/দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ বিহগাচল ঃ অষ্টকোণ চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।' "দিক্করবাসিনীর পীঠস্থান হচ্ছে সেই অষ্টকোণাকৃতি 'সৌমার' দেশে যার পূর্বসীমান্ত হচ্ছে স্বর্ণনদী, পশ্চিম সীমান্ত করতোযা নদী, দক্ষিণে মন্দ পর্বত ও উত্তরে বিহগাচল নামক পাহাড়।' এই শ্লোক যে অঞ্চলটাকে ইঙ্গিত করছে সেটা হচ্ছে আসাম। সকলেরই জানা আছে যে, আসামের কামাখ্যা হচ্ছে শক্তিধর্মেব পীঠস্থান। বস্তুতঃ আসাম ও বঙ্গদেশেই শক্তিধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল। সুমেরে শক্তিধর্মের প্রাবল্য ও তাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী যে তারা পূর্বদিকের কোনও পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমুদ্র পথে এসেছিল, তার দ্বারা কি বোঝায়, তা বিচার্য। কেননা আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই মাতৃকাদেবীর উপাসনা পৃথিবীর দূরদেশসমূহে নিয়ে গিয়েছিল।

সুমের ও ভারতের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে কতকগুলো মূলগত সাদৃশ্য দেখে

মনে কোনও সংশয় থাকে না যে, এই উভয় দেশের মাতৃপূজা একই সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই সাদৃশ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, [ক] উভয় দেশেই মাতৃদেবী 'কুমারী' হিসাবে কল্পিত হতেন, অথচ তাঁর ভর্তা ছিল, [খ] উভয় দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ ও তাঁর ভর্তার বাহন বলীবর্দ, [গ] উভয় দেশেই মাতৃদেবীর নারীসুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরুষোচিত কর্ম, যেমন যুদ্ধে লিপ্ত হতেন, [ঘ] মেসোপটেমিয়ার লিপিসমূহে তাঁকে বারংবার, 'সৈন্যবাহিনীর নেত্রী' বলা হয়েছে। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর 'দেবী মাহাত্ম্য' বিভাগেও বলা হয়েছে যে, দেবতারা যখন অসুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা মহিষাসুর বধ করবার জন্য দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন; [ঙ] সুমেরে মাতৃদেবী পর্বতেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য তাঁকে 'পর্বতের দেবী' বলা হত, ভারতের মাতৃদেবীর 'পার্বতী', ' হৈমবতী', 'বিন্ধ্যবাসিনী', প্রভৃতি নামও তাই সূচিত করে; [চ] সুমেরে দেবীব নাম ছিল 'নানা', সে নাম হিংলাজে নানাদেবীব নামে এখনও বর্তমান। [ছ] দু'দেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি [সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন] দেওয়া প্রচলিত ছিল।''

মেসোপটেমিয়ায় সুমেব সভ্যতার চরম বিকাশের আগে এখন থেকে প্রায় ১২,০০০ বছর পূর্বে এই অঞ্চলে নব্য-প্রস্তর যুগের বিকাশ ঘটে। ধীবে ধীরে প্রায় ছয়টি স্তর পেরিয়ে হাজার পাঁচেক বছর আগে সুমেব সভ্যতা তার চবম বিকাশ লাভ কবে। প্রথম অবস্থায় এই অঞ্চলে বাস করতো নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ। শিকাবই ছিল তাদেব জীবিকা। তারা ছিল যাযাবর। এর সঙ্গে তারা পশুপালনও শুরু করে। দ্বিতীয় পর্যাযে তারা চাবা গাছের চাষ শুরু করে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে চাষবাস শুরু হয়। তৃতীয় পর্যাযে, চাষবাসকে কেন্দ্র করে গ'ড়ে ওঠে স্থাযী বসতি, এবং সে সব বসতিতে দেবদেবীর মন্দির। চতুর্থ পর্যায়ে চালু হয় মৃতদেহ সমাধিস্থ করার নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রক্রিয়া। পঞ্চম পর্যায় হল, মাটির তৈজস-পত্র নির্মাণ। প্রথম প্রথম হাতেই এগুলি তৈরি করা হত। পরে চাকার আবিষ্কার হল। তখন এগুলি চাকেই বানানো হতে থাকল — কুমাবের চাকা চালু হল। শুধু তাই নয়, এই সব তৈজস-পত্রে নানান নকশাও শুরু হল। ষষ্ঠ পর্যায়ে নানা শিল্পের উদ্ভব হল এবং উদ্ভূত হল শ্রম-বিভাগ। সপ্তম পর্যায়ে শুরু হল তামাব ব্যবহাব। আরম্ভ হল 'তাম্রাশ্ম সভ্যতা'। হরপ্পায়ও সমসাময়িক কালে এসেছিল তাম্রাশ্ম সভ্যতা।

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, এই দুই নদী বেষ্টিত ভূখণ্ড সুমের ছিল কাদামাটির দেশ। সুতরাং এখানে তামা বা ব্রোঞ্জের উদ্ভবের কথা ওঠে না। তাছাড়া, মিশরেব লোকেরা দেশজ হ্যামিটিক ভাষায় কথা বলত, কিন্তু সুমেরের ভাষা ছিল এক অজানা গোষ্ঠীর ভাষা। তাদের কিংবদন্তী অনুযায়ী তারা পূর্বদিকের কোন পার্বত্য দেশ থেকে এসে সুমেরে বসবাস শুরু করেছিল। তার পূর্বে সুমের নবোপলীয় কৃষ্টিবাহী এক গোষ্ঠীর হাতে ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে জগতে যে মহাপ্রলয় বা মহাপ্লাবন ঘটেছিল, তাতে তারা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তখনই সুমেরীয়রা এসে তাদের শূন্যস্থান দখল করেছিল। তারা

একটা পুরো সভ্যতাই তুলে নিয়ে এসেছিল। সে সভ্যতা ছিল ব্রোঞ্জসভ্যতা, চক্রবিশিষ্ট যান ও রথ এবং লিখন প্রণালী। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে স্যার লিওনার্ড উলি [Sir Lionard Woolley] সুমেরের খনন কার্য করেছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওখানকার সমাধিস্থল থেকে তিনখানা যান পেয়েছিলেন। তার মধ্যে দুখানা ছিল চার চাকার মালবাহী যান, আর একখানা দুচাকার রথ। যানগুলো বলদে টানতো। রথখানা ছিল কিছুকাল আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতে প্রচলিত এক্কা গাড়ির মত। পরে সুমেরের যানগুলো গাধায় বা টাট্টু ঘোড়ায় টানতো। পশুবাহিত যান ও রথের প্রবর্তন সুমেরের পরিবহন ও যুদ্ধক্ষেত্রে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।

কাদামাটির দেশ সুমেরে কোনও তামার খনি ছিল না, এখনও নেই। সুমেরের তাম্রাশ্ম সভ্যতাব প্রয়োজনীয় তামা কোথা থেকে আসত এ প্রশ্ন থেকেই যায়। এ প্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন ঃ

"আজ পর্যন্ত আমরা যে সব নিদর্শন পেযেছি তার থেকে আমবা বুঝতে পাবি যে, সুদূব অতীতে পুরুলিযা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান অঞ্চল জুড়ে এক সমৃদ্ধশালী তাম্রাশ্ম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতাব মাত্র সামান্য কিছু আভাস পাই। আজ যদি আমরা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান, প্রভৃতি স্থানের ন্যায় প্রণালীবদ্ধভাবে বীতিমত খনন কার্য চালাই, তাহলে আমবা নিশ্চযই জানতে পারবো যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ বাঙলা দেশেই ঘটেছিল এবং বাঙলাই তাম্রাশ্ম সভ্যতাব জন্মভূমি ছিল।" ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন ঃ "মিশর, ক্রীট, সুমের, এশিয়া, মাইনর, সিন্ধু উপত্যকা ও অন্যত্র যে তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, খুব সম্ভবত সে সভ্যতাব আদি জন্মস্থান পূর্ব ভাবতে ছিল, এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকা দেবীব উপাসনা পৃথিবীব দূবদেশসমূহে নিয়ে গিয়েছিল, কেননা এ বিষযে কোনও সন্দেহ নেই যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোনও জায়গায় ঘটেছিল, যেখানে প্রচুর পরিমাণে তামা পাওযা যেত। ধলভূমে ভারতের অন্যতম বিরাট তাম্রখনির বিদ্যমানতা ও প্রাচীন বাঙলার প্রধান বন্দরের নাম 'তাম্রলিপ্তি' সেই মতবাদকে সমর্থন করে। সম্প্রতি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রেগবি পয়সেলও বলছেন যে, ভারতের তাম্রাশ্মসভ্যতাই জগতের মধ্যে প্রাচীনতম। সুতবাং সুমের নয়, মিশর নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম তাম্রাশ্ম সভ্যতা হল, হরপ্পা সভ্যতা। আর এই তাম্রাশ্ম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল সম্ভবত এই পশ্চিমবঙ্গে। অধিকাংশ তাম্রাশ্ম সভ্যতার প্রয়োজনীয় তামা সরবরাহ করতো এই পশ্চিমবঙ্গই তার প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তর মাধ্যমে। এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে, পাঁচহাজার বছর আগে থেকেই সুমের সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে এই বাণিজ্য খুব সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। এই বাণিজ্যের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল গুজরাটের অন্তর্গত লোথালে। এখানে ছিল প্রাচীন জগতের এই বিরাট পোতাশ্রয়। তামা বিপণন

উপলক্ষে বাঙালী বণিকবা যে লোথালের পোতাশ্রয়ে গিয়ে তাদের পণ্যবাহী নৌযানসমূহ নোঙর করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ লোথাল যে বাঙালী বণিকদের একটা প্রধান ঘাঁটি ছিল, তা পণ্ডিতেবা প্রমাণ করেছেন। মনে হয লোথালের বাঙালী বণিকরা যে-সকল পণ্যসম্ভার নিযে যেত, হরপ্পা মহেঞ্জোদাবো প্রভৃতি নগরীর বণিকবা সে-সকল পণ্যসম্ভার কিনে নিয়ে নিজেবা পশ্চিম জগতের দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরেব পথে বহির্গত হত। বাঙালী বণিকরাও যে লোথাল থেকে অগ্রসব হয়ে ওই পথে নিজেরা ভূমধ্যসাগবীয় দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যেত, তার প্রমাণও আছে। যে সব দেশে বাঙালী বণিকরা বাণিজ্য কবতে যেত, সেই সব দেশে তারা উপনিবেশও স্থাপন করত।

বাঙালী বণিকদের স্থাপন করা ওই সব উপনিবেশের কথা আমরা কিছুটা পরে এক গ্রীক নাবিকেব লেখা 'পেবিপ্লাস' [Periplus of the Erythrean Sea] গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। অজ্ঞাত পবিচয় এই গ্রীক নাবিকটি ছিলেন মিশরবাসী। বোমদেশীয কবি ভেলেবিযাস্ ফ্লাককাস্ [Valerius Flaccus] তাঁব 'আবগনটিকা' [Argonautika] গ্রন্থে লিখে গেছেন যে, গঙ্গাবিডি (গঙ্গারাঢ়) দেশেব বাঙালী বীবেবা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কৃষ্ণ সাগবেব উপকূলে কলচিয়ান ও জেসনেব অনুগামীদেব সঙ্গে বিশেষ বীবত্বেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিল। এরই প্রতিধ্বনি কবে ভার্জিল [Vergil] তাঁব 'জর্জিকাস' [Georgicas] নামক কাব্যে লিখে গেছেন, গঙ্গাবিডির বাঙালী বীরদেব শৌর্যবীর্যেব কথা 'আমি স্বর্ণাক্ষবে লিখে বাখব'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভূমধ্যসাগবীয অঞ্চলে বাঙালীবা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপবিচিত ছিল।

লোথাল থেকে যাত্রা কবে বাঙালী বণিকবা একদিকে পারস্য উপসাগবেব পথে সুমের ও ভূমধ্যসাগবীয় দেশসমূহে যেত, ও অপর পক্ষে লোহিত সাগর দিযে সিনাই উপদ্বীপ পর্যন্ত তাদেব যাতাযাত ছিল। সিনাইতে সম্ভবত প্রাচীনকালে একটা বিশাল হাট বসত এবং সেই হাটেই মিশবীয নৃপতিরা তামা কেনার জন্য তাঁদেব বাজদূত বা বাজকর্মচাবীদেব পাঠাতেন। সেই তামা সিনাইয়ের হাটে নিয়ে যেতেন বাঙালী বণিকেরা। তাঁবা কেবল সিনাইয়েব হাটে নয়, সুমের, ক্রীট ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশ-সমূহেও বেচবাব জন্য তামা নিযে যেতেন। সুতবাং তাম্রাশ্ম সভ্যতার বমরমার কালে সুমের তামা পেতো বাঙালী বণিকদের কাছ থেকে।

মিশরেব মত সুমেব অভেদ্য ও অন্তরীণ দেশ ছিল না। চতুর্দিকে শক্তিশালী অন্য দেশ দ্বাবা বেষ্টিত ছিল। পূর্বদিকে করুন [Karun] নদীব পলিমাটিতে আবৃত ইলামাইটদের [Elamites] দেশ ছিল। উত্তবে সেমিটিক [Semitic] ভাষাভাষী অক্কদবা [Akkadians] ছিল। কৃষি ও সেচের জল সম্পর্কিত ব্যাপারে অক্কদদের সঙ্গে সুমেরীয়দের রাজনৈতিক সমঝোতা ছিল। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষাব মতো সুমেরীয়দের ভাষা সাধাবণ লোকদেব ভাষা ছিল না। সুমেরের সাধারণ লোকরা প্রথম অক্কদীয়দের ভাষায় ও পরে ব্যাবিলনীয়দের ভাষায় কথা বলত। ব্যাবিলনীয়দের কাছ

থেকে সুমেরীয়রা মাত্র ভাষাই গ্রহণ করেনি, তাঁদের কীলকচিহ্নযুক্ত [Cuneiform] বর্ণমালাও গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমে সুমেরীয়রা পরিবৃত ছিল আরব মরুদেশের মেষপালকদের দ্বারা। নিজেরা বণিক ও নাবিক হওয়ার দরুন দক্ষিণে সুমেরীয়রা মেলামেশা করার সুযোগ পেতো নানা দেশের আগন্তুক নাবিক ও বণিকদের সঙ্গে। বেহরীন বা বাহরিন দ্বীপে [Bahrein Island] এরকম হাজার হাজার বিদেশী নাবিক ও বণিকদের সমাধিস্থান অবগুণ্ঠিত বয়ে গিয়েছে। ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকাব মাথায় ব্রোঞ্জসভ্যতার বাহকরা সিরিয়া ও পর্বতসঙ্কুল ভূখণ্ড দখল করে রেখেছিল। এছাড়া ভূমধ্যসাগরে সিপ্রিয়ট [Cypriots] ও ক্রীট [Crete] দেশীয় লোকরাও ছিল। ক্রীট দেশীয় লোকরা ধাতুর ব্যবহাব জানত এবং তাদের মধ্যে লিখনপ্রণালীও প্রচলিত ছিল। এসব দেশের লোকদের সঙ্গে এবং ইবানের গ্রামবাসীদের সঙ্গে সুমেরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল।

সুমেরীয়রা ছিল মূলত বণিকেব জাত। সেজন্য গোড়া থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যেব কারণে সুমেবীয়দেব দু'দিক সামলাতে হত—অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বহিরাগত শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবোধ। সুমেরীয় সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সমাজের শীর্ষে ছিল জঙ্গী অভিজাত সম্প্রদায়, তাদেব মধ্যে থেকে রাজা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নির্বাচিত করা হত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক, কারিগর বা শিল্পীশ্রেণী, দোকানদাব, বিদ্যালযেব শিক্ষকগণ ও বণিকবা। মিশবেব মত শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মন্দিরেব অভ্যন্তরস্থ বাজকীয় কর্মশালাতেই নিজ নিজ কাজ সমাধা করতে হত— তবে শিল্পীরা বেসরকারী কাজেও নিজেদেব নিযুক্ত বাখতে পাবত। তৃতীয় শ্রেণী ছিল পেশাদারী সৈনিকেব দল। তাদের চিরস্থাযী স্বত্বে ভূমিদান কবা হত, তবে শর্ত থাকত যে তাদের বরাবর ভূমিকর্ষণ করতে হবে। উপবে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে তারাও জমির মালিক হতে পাবত।

বণিকদের কোন সঙ্ঘ ছিল না। অবশ্য, সম্ভ্রান্ত বণিক পরিবাবদের নানা জায়গায় শাখা অফিস থাকত। তবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কিছু জটিলতা ছিল। সাধারণ কেনাবেচা যবের বিনিময়ে করা হত। বড় বড় সওদা অবশ্য রূপা ও সোনার মাধ্যমে করা হত। এর জন্য বিনিময় হার ছিল 'শেকেল' (Shekel) নামে রৌপ্য মুদ্রার পবিবর্তে এক স্বর্ণমুদ্রা। 'ক্রেডিট' বা ধারেও কেনাবেচা করা যেত, তবে তার জন্য যবের ওপর ৩৩.৩ শতাংশ ও রূপার ক্ষেত্রে শতকরা ২০ শতাংশ হারে সুদ নেওয়া হত। সরকার মাঝে মাঝে পণ্যদ্রব্য লেনদেনের ঊর্ধ্বতম পরিমাণ বেঁধে দিতেন।

এক কথায় সুমেরীয় সভ্যতা বাণিজ্যিক বাতাবরণের মধ্যেই প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এখানেই মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতাব পার্থক্য ছিল। মিশরের বাণিজ্যিক অভিযানসমূহ বিদেশে পরিচালিত হত বিলাস দ্রব্য বা দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহের জন্য, আর সুমেরীয় সভ্যতা ছিল বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জনের সভ্যতা। এক কথায় সুমেরীয় সভ্যতা অনেকটা বর্তমানের বাণিজ্যমুখী সভ্যতার মত ছিল।

সুমেরীয় সভ্যতা নগরভিত্তিক সভ্যতা ছিল এবং প্রতি নগরের একজন করে দেবী ছিলেন। তিনি বাণিজ্য বিকাশের দেবীও হতেন। তবে সুমেরীয় দেবতারা মিশরের মত পশুমুখী দেবতা ছিল না। সুমেরীয় দেবদেবীদের মানুষ রূপেই কল্পনা করা হত।

আগেই বলেছি, সিন্ধু সভ্যতার বেশ কিছু সীলমোহর ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য সুমেরে পাওয়া গেছে। আবার সুমের সভ্যতারও সীলমোহর ইত্যাদি পাওয়া গেছে হরপ্পা অঞ্চলে। অনেকে বলেন, হবপ্পার পরিণত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল দূরদেশের সঙ্গে যে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে। সুমের সভ্যতার বহু ধর্মীয় বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২১২০ অব্দ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অবধি সুমেরেব লোকেবা দূর দেশের সঙ্গে নিবিড় বাণিজ্য-সম্পর্ক গ'ড়ে তুলেছিল। গবেষণায় জানা গেছে, তারা যে তিনটি বিশেষ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতো সে দেশ তিনটি হচ্ছে ঃ (১) ডিলমুন [Dilmun], (২) মগন [Magan] এবং (৩) মেলুহা [Meluha]। পণ্ডিতদেব মতে 'ডিলমুন' হল বাহবিন [Bahrein] দ্বীপ এবং 'মগন' হল দক্ষিণ-পূর্ব ইরান। পণ্ডিতেবা অনুমান করছেন, 'মেলুহা' হল হবপ্পা সভ্যতা অধ্যুষিত অঞ্চল।

ভারতবর্ষের সঙ্গে সুমেরেব ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। বিশেষ কবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতব। ১৯৩২ সালে সি. জে গাড্ [C. J. Gadd] সুমেবেব উর [Ur] নগবে পাওযা কয়েকটি সীলেব সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত কিছু সীলের সাদৃশ্যেব কথা বলেছিলেন। গাডের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হযেছে। তিনি আবও লিখেছেন ঃ

"Early in 1924, a seal of the same type was purchased by the Louvre and this was said to have been found in the ruins of Lagash, a celebrated site in southern Babylonia. In publishing this acquisition M. Thureau Denign observed that the attribution to Lagash might well be justified in view of the authenticated discovery at Kish and also drew attention to the presence of two more seals of this kind in the collection of the Louvre, which were known to have been found at Lagash and Susa respectively.

"Meantime an imprint of such a seal upon the fragment of a clay label from a bale of cloth had also been published by Father Scheil, and this was said to come from the site of Umma, the neighbour city of Lagash. Since that time another example has been recovered from Lagash in the resumed excavations there, and recently others have come to light at Kish and at Tell Asmer (Ashnunnak). Two unconnected specimens are of very recent

revelation, both having been obtained from dealers, one in possession of Prof. A. B. Cook of Cambridge and a second (No. 18, in this paper), with unusually interesting features, very lately given to the British Museum. Other isolated examples, which have been illustrated—one belonging to Baron von Bissing and one in the Boston Museum of Fine Arts—may belong to the original find which first brought these seals to Europe, three of them into the department of Ethnography in the British Museum.

"At the moment of writing, therefore, there have been seven seals and one imprint of the Indus style identified as coming from Mesopotamian sites (if Susa may be included for convenience) as well as two others mentioned above of undefined origin but almost certainly from Babylonia. A considerable addition to this number is made by the specimens found at various times and places in the excavations of Ur, which I am enabled to present here by the kind permission of the Directors of British Museum and the University-Museum of Pennsylvania. These seals must, of course, be compared with the much more 'native' specimens recently published in so splendid a manner by Sir John Marshall and his collaborators in Mohenjodaro and Indus Civilization."

প্রসঙ্গত বলা যায়, গাড ছাড়াও যে দুজন বিখ্যাত পণ্ডিত মেসোপটেমিয়ায প্রাপ্ত হরপ্পাব সীলমোহরগুলি নিযে গবেষণা কবেছেন তাঁরা হলেন—অধ্যাপক এস ল্যাংডন [Prof. S. Langdon] এবং স্যার মোর্টিমাব হুইলার [Sir Mortimer Wheeler]। এঁদেব মতে মেসোপটেমিযায় প্রাপ্ত হরপ্পাব সীলমোহবগুলি তিনটি সময়েব। কতকগুলি প্রাক-হরপ্পীয় যুগের, কতকগুলি হরপ্পীয় যুগের এবং কয়েকটি উত্তর-হরপ্পীয় কালের। অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার বাণিজ্য-সম্পর্ক বহুকালের এবং বহুকাল ধরে তা চালু ছিল।

এখন বাহবিন, ফাইলাক ও পারস্য উপসাগবীয় আবব উপকূলেব কয়েকটি স্থানে আরও কিছু সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি বেলনাকাব নয়, চতুষ্কোণও নয়, গোলাকার। অর্থাৎ এগুলি সুমেরদের নয়, হরপ্পীয়দেরও নয়। তবে, এ ধরনের গোলাকার সীলমোহর পাওয়া গেছে চানহুদাবোর উত্তর-হরপ্পীয় যুগের স্তরে এবং লোথালের উপরের দিকের স্তরে। এর অর্থ হল, গোলাকার সীল মোহরগুলি সম্ভবত উত্তর-হরপ্পীয় যুগে ব্যবহৃত হত। এগুলি হরপ্পীয়দেরই সীলমোহর। পারস্য উপসাগরের উপকূলে পাওয়া গেছে চানহুদারো ও লোথালের মত মালার গুটি [Beads] ও

মহেঞ্জোদারোর নরম পাথরের [Steatite] পাত্র যার বাইরের দিকের গায় এমন সব জন্তু-জানোয়ারের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে যেগুলি হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন এটা প্রমাণিত সত্য যে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ভারতের সঙ্গে সুমের ইত্যাদি দেশসমূহের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। এই বাণিজ্য স্থলপথে এবং জলপথে — উভয়-ভাবেই সম্পন্ন হত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত এই বাণিজ্য স্থলপথেই সাধিত হত। পরে ওই বাণিজ্য জলপথে পবিচালিত হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে এই বাণিজ্যের কল্যাণে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে বৃহত্তর সিন্ধু-উপত্যকা, বালুচিস্তান, ইরান ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান তথা গভীর মেলবন্ধন ঘটেছিল। যখন স্থলপথে বাণিজ্য চলত তখন সিন্ধু-উপত্যকা, বালুচিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিয়া, মেসোপটেমিয়া ইত্যাদির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহবগুলির পাঠোদ্ধাব না হওযায আমরা ওই সভ্যতার সম্পর্কে যেমন অনেক কিছুই জানতে পারছি না, তেমনি অনেক তথ্যই অজানা বয়ে যাচ্ছে সুমের সভ্যতা সম্পর্কেও। হরপ্পা সভ্যতা যে সুমেব সভ্যতাব সমসাময়িক তা কিছুটা বোঝা যাবে নিচেব সময তালিকা থেকে। প্রায ৪০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে সুমেব সভ্যতাব একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওযা গেছে। এখন থেকে প্রায ৫০০০/৫৫০০ বছব আগেই সুমের সভ্যতার রমবমাব শুরু হয। আব হবপ্পা সভ্যতাব অগ্রগমনের শুরুও ৫০০০/৫৫০০ বছব আগে। হবপ্পা সভ্যতার কয়েকটি স্থানেব প্রত্নুনিদর্শনেব সময়কাল থেকেই এই সভ্যতার অগ্রগমনেব সম্ভাব্য সময পাওয়া যায। নিচেব তালিকা থেকে এটা স্পষ্টই প্রতীযমান যে, সুমেব সভ্যতা হবপ্পা সভ্যতারই সমযসমাযিক।

হবপ্পা সভ্যতার কযেকটি স্থান	MASCA পরিশোধিত প্রত্নতাত্ত্বিক সময়কাল [খ্রীষ্টপূর্বাব্দ]
১] আমবি	৩৬৫০-৩২১০
২] কোটদিজি	৩৩৮০-২৮০০
৩] কালিবঙ্গান	৩১১০-১৬০০
৪] সোমনাথ	৩১৬০-১৬৯০
৫] গুমলা	২৯১০-২৬০০
৬] হটালা	২৮৫০-২৫৮০
৭] লোথাল	২৮০০-১৬৪০
৮] মহেঞ্জোদারো	২৬০০-১৯৬০
৯] রোজডি	২৫৫০-১৯৬০
১০] সুরকোটাডা	২১৯০-১৭৭০
১১] হবপ্পা	৩৩০০-২০০০

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয়ায় নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। শহর গড়ে ওঠে। হরপ্পাতেও প্রায় ওই সময়ে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, হরপ্পীয় নগবসভ্যতাই মেসোপটেমিয়ার নগরসভ্যতার পূর্বসূবি। হরপ্পার লোকজনরাই সুমেব সভ্যতাব গোড়াপত্তন কবেছিল। যাইহোক, এ পর্যন্ত যত প্রাচীন জনবসতি আবিষ্কৃত হযেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জনবসতি হল জেরিকোর [Jericho] প্রাগৈতিহাসিক গ্রাম। এব বয়স নির্ণীত হয়েছে প্রায় ৯০০০ বছব। তখনও এরা মাটির তৈজসপত্র গড়তে শেখেনি। নগরের পত্তন ঘটেছে অনেক পবে। মহেঞ্জোদাবোর সর্ব নিম্ন স্তর অবধি খনন করা সম্ভব হয নি জল ওঠায়। উৎখনিত স্তবের তলদেশে জল প্রকাশ পাওযাব ফলে তলদেশ থেকে মাত্র কিছু অংশ খননেব পর এখানে খনন কার্য বন্ধ কবে দেওয়া হয়। তখন বিশ্বাস কবা হয় যে, এই নগবীব তলদেশে মনুষ্যবসতিব আব কোনও নিদর্শন নেই। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তবাষ্ট্রেব পেনসিলভেনিযা বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক জি এফ. ডেলস লাহোরেব ইণ্ডাস ভ্যালী কনস্ট্রাকশন কোম্পানিব সহাযতায় এখানে টেস্ট বোরিং [Test Boring] চালিযে প্রমাণ কবেছেন যে, প্রকাশমান জলতলেব ৩৯ ফুট নিচেও মনুষ্যবসতি ছিল। এই মনুষ্যবসতিব সমযকাল কত তা নির্ণীত হযনি। নির্ণয কবা হলে হযত দেখা যেত, এই সর্বনিম্ন স্তবেব বযসকাল জেবিকোব আদিম জনবসতির বয়সেব চেযেও অনেকটাই বেশি। সুতবাং পণ্ডিতবা যে অনুমান কবেন মেসোপটেমিযা সভ্যতাব জনক হল হবপ্পীযবা, তা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, হরপ্পা সভ্যতাই পৃথিবীব সব সভ্যতাকে আলো দেখিযেছে।

সুমেব সভ্যতাব লিপিগুলিব পাঠোদ্ধাব হওযায জানা গেছে মেসোপটেমিযাব প্রথম শহবগুলিব নাম ছিল ঃ ইবিডু [Eridu], উরুক [Urük], বাদ-তিবিরা [Bad-tibira], নিপুব [Nipur] এবং কিশ [Kish]। এগুলিব ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হযেছে। সুমেবীযবা হবপ্পীযদেব মত উন্নত নাগবিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তাদেব শহবগুলি হবপ্পীযদেব মত অতো উন্নত শ্রেণীব ছিল না। তবে সুমেরীয়বা সময ধাবণায অনেক উন্নতি কবেছিল।

সুমেবীয়বা জানতো ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, জানতো এক সৌর বৎসব হলো বাবো মাস। সুমেবীযরা দ্বাদশ বাশিচক্রেব হিসাব জানতো। প্রত্যেক রাশিচক্র আকাশে ৩০° অংশ জুড়ে বিরাজমান তাও তাদেব অজানা ছিল না। দিকচক্রবাল হতে একটি রাশিব সম্পূর্ণ উদয হতে মোটামুটি দু'ঘন্টা সময় লাগে। এই সমযেব নাম তাবা দিয়েছিল 'দান্না' [Danna]। তাদেব কাছে একদিন ছিল বারো দান্না বা ২৪ ঘন্টার। এই দান্নাকে ৩০ ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে সুমেরীয়রা বলতো এক 'গেস' [Ges] এক গেস হলো আধুনিক চার মিনিট। সময় ধারণায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে কাজে লাগিযে সুমেরীয়দেব প্রবল অগ্রগতি হযেছিল ওই পাঁচ হাজাব বছর আগেই।

তাদের ৩৬০ গেস নিয়ে ছিল একদিন। চন্দ্রের গতিবিধি ও চান্দ্রমাসের কথাও তাদের অজানা ছিল না। প্রথম প্রথম ওরা বারোটি চান্দ্রমাস নিয়ে এক বছর ধরতো। পরবর্তীকালে তাদের ধাবণায় সৌব-মাস ও সৌব-বৎসব যথাযথভাবে চলে আসে। প্রতিটি চান্দ্রমাস ও সৌরমাসেব পার্থক্যও তাবা অনুধাবন করতে শেখে এবং এও জানে যে, প্রতি তিন বৎসরে একটি কবে চান্দ্রমাস বাড়তি হয়। সুমেরীযরা মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছব গণনা করতো এখনকাব দিনের মতই। পদ্ধতির পার্থক্য ছিল। এই উন্নত সভ্যতাব সময় ধাবণাও অত্যুন্নত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে স্যার আর্থার কীথ্ বলেছেন, 'সুমেবীয় মুখেব আদল প্রাচ্যে আজও দেখা যায়—আফগানিস্তান, বালুচিস্তান থেকে শুরু কবে সিন্ধু সভ্যতাব কূল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ মাইল তফাতেও সে ছাপ স্পষ্ট'। সুমেবীযবা ছিল দ্রাবিড জাতি। সুমেবদেব বিলীফ ছবিতে দ্রাবিড় তথা হরপ্পীয প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সে কথায় পবে আসছি।

এখন থেকে প্রায চাব হাজাব বা তাবও কিছুটা আগে ভাবতীযরা অর্থাৎ হবপ্পীয জ্যোতির্বিজ্ঞানীবা এবং সমসামযিককালে ব্যাবিলোনেব জ্যোতির্বিদরা অনেকটা নিঁখুতভাবেই গ্রহণ সংক্রান্ত নানা আবিষ্কাব কবে ফেলেছিলেন। অতোদিন আগে তাঁরা গ্রহণেব পূর্বাভাস দিতে পারতেন সঠিকভাবেই। ২২৩টি সিনডিক মাসে বা চান্দ্রমাসে বা সৌব ১৮ বছব ১১ ৩ দিনে ভূ-কক্ষ ও চন্দ্র-কক্ষেব সম্পাতদ্বয [Nodes] অর্থাৎ রাহু ও কেতু পৃথিবী বেষ্টন কবে একবাব আবর্তন সম্পূর্ণ কবে। অর্থাৎ বাহু ও কেতু বিন্দু দুটি ১৮ বছব ১১ ৩ দিনে বাবোটি বাশিচক্রেব সবগুলিকে একবাব পবিক্রমা কবে আসে। এই সমযটা ১৮ বছব ১১ ৩ সৌবদিন হয যদি এই সমযেব মধ্যে চাবটি অধিবর্ষ [Leap year] পড়ে। এই সমযটা ১৮ বছব ১০ ৩ সৌবদিন যদি এই সমযটাব মধ্যে পাঁচটি অধিবর্ষ পড়ে। এই সমযটা আসলে ৬,৫৮৫ ৩ সৌব দিন। এই ৬,৫৮৫ ৩ সৌবদিনকে ভাবতীযবা বলতো এক 'চান্দ্রকল্প'। সুমেবীযব: একে বলতো 'স্যাবোস' [Saros]। উভযদেশেব জ্যোতির্বিদরা সঠিকভাবেই বলেছেন, এক চান্দ্রকল্পে বা স্যাবোসে যে সময়ে যে ধরনেব চন্দ্রগ্রহণ ঘটে, পববর্তী চান্দ্রকল্পে ঠিক একই ধবনের চন্দ্রগ্রহণ হয়। কেবল সমযটা একটু বদলে যায়। এক চান্দ্রকল্পে বা এক স্যাবোসে যে ধরনেব গ্রহণ হয়, পরের চান্দ্রকল্পে কিংবা স্যাবোসে তাব পুনবাবর্তন ঘটে। এই ঘটনা তাই 'পুনবাবর্তন নিযম' নামে বিখ্যাত। চান্দ্রকল্পেব অবদান যেমন ভাবতীয় প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের, তেমনি স্যাবোসেব অবদান সুমেবীযদেব তথা ব্যাবিলোনীযদেব।

সুমেরীযবা চান্দ্রকল্প বা স্যাবোসেব সময কতটা হবে তা বিভিন্ন দিক থেকে হিসাব করতে পাবতেন যেমন ঃ

(১) ২২৩টি সিনডিক বা চান্দ্রমাস এক স্যারোস বা এক চান্দ্রকল্প। এভাবে চান্দ্রকল্প বা স্যারোস হল ২২৩ x ২৯.৫৩০৫৯ সৌরদিন = ৬৫৮৫.৩২ সৌরদিন।

(২) ২৪২ টি ড্রেকনিক মাস বা গ্রহণ মাসে এক স্যারোস। এভাবে এক স্যারোস বা চান্দ্রকল্প হল ২৪২ x ২৭.২১২২২ সৌরদিন = ৬৫৮৫.৩৬ সৌরদিন।

(৩) ১৯টি গ্রহণ বর্ষে [Eclipse Year] এক স্যারোস বা চান্দ্রকল্প। এর পরিমাণ হল ১৯ x ৩৪৬.৬২ সৌরদিন = ৬৫৮৫.৭৮ সৌরদিন।

(৪) ২৩৯টি ব্যতিক্রমী মাসে বা অ্যানোম্যালিস্টিক মাসে এক চান্দ্রকল্প বা এক স্যারোস। এই অনুসারে এক স্যারোস হল ২৩৯x২৭.৫৫৪৫৫ সৌরদিন = ৬৫৮৫.৫৪ সৌরদিন।

এইভাবে সুমেরীয়রা তাদের স্যারোসের হিসাব করতো ৪০০০ বছরেরও বহু আগে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারা প্রভূত উন্নতি করেছিল। তাদের এই উন্নতির মূলে ছিল হরপ্পীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবদান। সুমের সভ্যতা যে ভারতের দ্রাবিড় জাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার সপক্ষে বহু পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, হরপ্পা সভ্যতারও প্রতিষ্ঠাতা হল এই দ্রাবিড় জাতি। মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কর্তা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এই দ্রাবিড়দের সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

"দ্রাবিড়জাতি বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ অধিকাব কবিযাছিলেন, তাঁহাদিগের ভাষা অনার্য। বর্তমান সময়ে তাঁহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া থাকেন। দ্রাবিড় বা ডামিলভাষা এক্ষণে তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মলায়ম এই চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত মধ্য ভারতের পার্বত্য উপত্যকাসমূহে ও বালুচিস্থানে, দ্রাবিড়ভাষার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভাবতেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বালুচিস্থানের ব্রুহুইজাতি দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা ব্যবহার কবিয়া থাকে; ইহা হইতে ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনুমান কবেন যে, আর্যোপনিবেশেব পূর্বে দ্রাবিড়গণ আর্যগণের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তেব পার্বত্যপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ কবিযাছিলেন।"

প্রত্নতত্ত্ববিশারদ হল সাহেব [H. R. Hall] তাঁর 'The Ancient History of the Near East' গ্রন্থে কিছুটা অন্যকথা বলেছেন। তাঁর মতে এই দ্রাবিড় জাতি অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের অধিবাসী। এঁরাই খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজর বছর আগে বাবিরুষ বা ব্যাবিলোন [Babylon] অধিকার করে বাবিরুষ ও আসুবের [Assyria] প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই ব্যাবিলোন ও আসুরের অধিবাসীরা ছিলেন সেমেটিক জাতীয়। ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুমেরের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে সুমেরীয়রা তথা এই দ্রাবিড়জাতিই সেখানে নতুন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সুমেরীযরা প্রাচীন কীলকাক্ষরের [Cuneiform Script] সৃষ্টিকর্তা একথা আগেই বলা হয়েছে। ব্যাবিলোনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন সুমের জাতির যে সব প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, তাঁবা সেমেটিক বা আর্যগোষ্ঠিভুক্ত লোক নন। হল সাহেব বলেছেন, সুমেরীয় জাতির অবয়ব ও মুখমণ্ডল বর্তমানকালের দাক্ষিণাত্যবাসী অর্থাৎ দ্রাবিড়জাতীয় হিন্দুগণের মত। তিনি অনুমান করেছেন যে, ভারতবর্ষই দ্রাবিড় জাতির প্রাচীন আবাসভূমি এবং এই ভারতবর্ষ থেকেই প্রাগৈতিহাসিকযুগে দ্রাবিড়জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ পার হয়ে তাঁরা

প্রাচীন ইরান ও ব্যাবিলোন অধিকার করেছিলেন। এই সময় ওই দ্রাবিড়জাতি ধাতব অস্ত্রের ব্যবহার, অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে ভাব প্রকাশ কবা এবং নানাবিধ শিল্পকর্ম শিখে ফেলেছিলেন। এই দ্রাবিড়জাতি হরপ্পা সভ্যতার লোকজনও হতে পারেন।

রাখালদাস অবশ্য তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন ঃ

"আর্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকাব বিস্তাব করিযাছিল, তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড়জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গ বাসিগণেব নাসিকা ও মস্তক পবীক্ষা করিযা সিদ্ধান্ত করিযাছেন যে, তাঁহারা দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্যজাতীয় অথবা আর্যসংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিযা বোধ হয, কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্বিশেষে দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয জাতিব সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।"

সুতবাং সুমেব সভ্যতা ভাবতেব অধিবাসী দ্রাবিড়জাতিবই তৈবি করা এক প্রাচীন সভ্যতা। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযের 'বাঙ্গালাব ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে আবও জানা যায যে, বিংশ শতাব্দীব গোডাব দিকে মধ্যভারতের পার্বত্য উপত্যকাসমূহের একটি জাযগা থেকে একটি ক্ষুদ্র বেলনাকাব প্রস্তর নির্মিত কোনও প্রাচীন সীলমোহব আবিষ্কৃত হযেছিল। তখনও হবপ্পা-মহেঞ্জোদারো কিংবা পাণ্ডুবাজাব ঢিবি আবিষ্কৃত হয় নি। শেযোক্ত জাযগাগুলিতে পবে বহুসংখ্যক সুমেবীয সীলমোহব আবিষ্কৃত হযেছে। বাখালবাবু যখনকাব কথা বলেছেন তখনও তিনি মহেঞ্জোদাবো আবিষ্কার করেন নি। যাইহোক, মধ্যভাবতেব ওই সীলমোহবটিব গাযে কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি ও কতকগুলি অক্ষব আছে। এটি এখন নাগপুরেব চিত্রশালায বা মিউজিযামে আছে। এই সীলমোহবটিব ছবি দেখে ইউবোপীয পণ্ডিত L. K. King বলেন যে, এতে কীলকাক্ষরে একটা খোদিত লিপি আছে এবং এটি ব্যাবিলোনেব বেলনাকায় সীলমোহর [Cylindrical Seal] । প্রাচীন সুমেবে তথা ব্যাবিলোনে এই ধবনের সীলমোহর বহুল প্রচলিত ছিল। বাখালদাস লিখেছেন ঃ

"বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় পণ্ডিত হীবালাল এক বৎসব পূর্বে এই কীলকলিপির আবিষ্কার-বার্তা আমাকে জানাইযাছিলেন। পরে তিনি ইহার একটি প্রতিলিপি ও ছাঁচ [Plaster Cast] আমার নিকট পাঠাইয়া দিযা আমাকে উহা ব্যবহাব করিতে অনুমতি দিযাছেন। যে ইউরোপীয় পণ্ডিত এই কীলকলিপিব পাঠোদ্ধাব করিযাছেন তাঁহাব নাম L. W. King ● Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1914, Vol x, pp. 461-63."

বাবিরুষ বা ব্যাবিলোনে ব্যবহৃত এই সব সীলমোহর বেলনাকাব বা গোলাকার। এগুলিকে নরম মাটির ফলকের উপর গড়িয়ে দিলে চতুষ্কোণ সীলমোহর মুদ্রিত হয়ে যেত। সুমেব সভ্যতায় গ্রন্থ থেকে চিঠিপত্র সবকিছুই লেখাব জন্য ব্যবহার করা হত

নরম মাটির ফলক। লোহার কীলক ছিল লেখার কলম। শরকাঠিও ব্যবহৃত হতো। মাটির ফলকের উপর লেখা শেষ হলে লেখকের নামযুক্ত সীলমোহর মুদ্রিত করা হত। মাটির ফলকগুলি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে ওগুলিতে লেখা এবং মুদ্রিত সীলমোহরের ছাপ চিরস্থায়ী হয়ে যেত। সুমের সভ্যতায় এই ধরনের হাজার হাজার মাটির ফলক পাওয়া গেছে। কীলকাক্ষরে লেখা লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার হওয়ার ফলে জানা গেছে 'গিলগামেশ' মহাকাব্যের (২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কাহিনী, এতান মহাকাব্যের (৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কথা। পেয়েছি 'রাজবংশ অনুযায়ী রাজা এবং তাঁদের রাজত্বকালের তালিকা' এবং অন্যান্য ইতিহাস। হাজার হাজার মাটির ফলকে কীলকাক্ষরে লেখা সুমেরদের পুঁথি থেকে আমরা জানতে পেরেছি তাদের ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি। কিন্তু হরপ্পীয় লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি বলে, তার অনেক কিছুই আজও সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে জানা সম্ভব হয় নি। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের।

মধ্যভারতে পাওয়া সুমেরের ওই সীলমোহরটি সম্পর্কে রাখালদাস লিখেছেন ঃ "নাগপুব চিত্রশালায় যে কীলকটি আছে তাহাতে একদিকে দুইটি বৃহৎ মনুষ্যমূর্তি, চন্দ্রসূর্যের চিহ্ন ও তিনটি ক্ষুদ্র মনুষ্যমূর্তি আছে এবং অপরদিকে দুই পঙ্‌ক্তি কীলকাক্ষব আছে। বৃহদাকার মনুষ্যদ্বয়ের মধ্যে বামদিকের মূর্তিটি রমণীমূর্তি, সম্ভবত কোন দেবী, তিনি কবযোড়ে অপব মূর্তিব সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। অপর মূর্তিটি বাবিকুষীয় পবনদেবতা আদাদের [Adad]। আদাদ প্রাচীনকালে সিরিয়াদেশে আমুরু [Amurru] নামে পূজিত হইতেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাবিরুষরাজ মার্দুক-নাদিন্-আখি, একল্লাতিনগর জয় কবিয়া সেইস্থান হইতে আদাদের মূর্তি বাবিকুষনগবে লইযা গিয়াছিলেন। কীলকাক্ষবে খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা আদাদের সেবক লিবুরবেলীনামক কোন ব্যক্তির মুদ্রা। কীলকলিপির শেষভাগ ক্ষয় হইয়া গিযাছে, আদাদেব নাম ইহাতে পাঠ কবা যায় না, তবে খোদিতলিপি পার্শ্বে আদাদের মূর্তি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এইস্থানে দেবতা আদাদেব নাম ছিল। 'লিবুববেলী' বাবিরুষীয ভাষায় "ঈশ্বব বলবান্ হউন" বুঝায়। এই কীলকলিপি অনুমান দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে খোদিত হইয়াছিল। এই সময় প্রাচীন বাবিরুষে প্রাচীন বাজবংশের অধিকারকাল। মধ্যভাবতে এই কীলকলিপির আবিষ্কার পণ্ডিতপ্রবব হলেব উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতেছে। দাক্ষিণাত্যে পাষাণনির্মিত প্রাচীন সমাধিস্থান খননকালে মৃন্ময শবাধারে মনুষ্যেব শব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয শবাধাব প্রাচীন বাবিরুষেব ধ্বংসাবশেষেব মধ্যেও আবিষ্কৃত হইযাছে।

এই সকল আবিষ্কাব হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন বাবিকুষবাসিগণের সহিত ভারতবাসী দ্রাবিড় বা তামিল জাতির অতি নিকট-সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথেব পশ্চিমপ্রান্তে বালুচিস্থানে ব্রাহুই জাতির অস্তিত্ব ও ভাষা হইতে প্রমাণিত হয যে, এক সময়ে সম্ভবত আর্যজাতিব আক্রমণেব পূর্বে আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়জাতিব

বিস্তৃত অধিকার ছিল। অধ্যাপক হল্ অনুমান করেন যে ভারতবর্ষই দ্রাবিড়জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং তাঁহাবা আর্যাবর্ত হইতে পশ্চিমে প্রয়াণকালে বালুচিস্থানে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক ব্রাহুই জাতি সেই ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। দ্রাবিড়জাতির সহিত প্রাচীন বাবিরুষবাসী সুমেরীয় জাতির যে নিকট সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; তবে ইহাও সম্ভব যে দ্রাবিড়গণ বাবিরুষ অধিকার করিয়া পরে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন আর্যগণের ন্যায় মধ্য-এসিয়া অথবা উত্তর-এসিয়া তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসস্থান ছিল।''

রাখালদাস বাবিরুষ বলতে বুঝিয়েছেন ব্যাবিলোনকে— একথা আগেই বলেছি। বাবিরুষবাসিগণ হলেন সুমের সভ্যতার ধারক ও বাহকগণ। রাখালদাস মন্তব্য করেছেন, 'তবে ইহাও সম্ভব যে দ্রাবিড়গণ বাবিরুষ অধিকার করিযা পরে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন আর্যগণের ন্যায় মধ্য-এসিয়া অথবা উত্তর-এসিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান ছিল। হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের পর তাঁর এই মন্তব্য সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরই আবিষ্কাব প্রমাণ করেছে যে, সভ্যতার আলো পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে গিয়েছে উল্টোটা সত্যি নয়। ভারতেব হরপ্পীয়রা তথা বাংলার দ্রাবিড়রাই সুমের সভ্যতাব জনক। আব দ্রাবিড়বা ভারতেরই আদিম অধিবাসী। ঐতিহাসিকরা এখন একবাক্যে স্বীকাব কবেছেন যে, বর্বর আর্যজাতিই এসেছিল মধ্য-এসিয়া থেকে, দ্রাবিড়রা নয়। হবপ্পীয সভ্যতাব লোকজনদের মধ্যে একটা বিবাট সংখ্যক লোকজন ছিল দ্রাবিড় জাতিব। সুমেব সভ্যতাব লোকজনরাও ছিল মূলতঃ দ্রাবিড়জাতিভুক্ত। আর এই দ্রাবিড়জাতি, পণ্ডিতপ্রবব হল যেমন বলেছেন, বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভাবতেরই অধিবাসী— মধ্য-এসিযা কিংবা উত্তর-এসিয়ার লোক তাঁরা নন।

আবারো বলি, আর্যাবর্তে আর্য অধিকারের পরও বঙ্গ ও মগধ আর্যদেব উপনিবেশ হয়ে উঠে নি। ঐতবেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসিগণের সঙ্গে চেবদেশবাসিগণের অথবা চেরজাতির উল্লেখ দেখে মনে করা হয় যে, আর্যরা যাদের পক্ষিজাতীয় মনুষ্য মনে করতো, তারা একই বংশসম্ভূত জাতি। মধ্যপ্রদেশে এখনও চেরাজাতি আছে। তারা সম্ভবত দ্রাবিড়জাতি। বঙ্গ ও মগধে সে সময় যে জাতির বাস ছিল তারাও দ্রাবিড় জাতি এবং দাক্ষিণাত্যে আজ আমরা যাদের দেখি তাদেব অধিকাংশই দ্রাবিড়জাতিসম্ভূত। এই দ্রাবিড় জাতি সুমের সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা— এটাই এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের অধিকাংশেরই সুচিন্তিত মত বা সিদ্ধান্ত। সময় ধারণায় অত্যন্ত উন্নত সুমের সভ্যতার কথা শেষ করি ওদের 'রাজবংশ অনুযাযী রাজা এবং তাঁদের বাজত্বকালের তালিকা'-র সামান্য বিববণ দিয়ে। প্রসঙ্গতঃ বলে নেওযা হবে 'গিলগামেশ' ও 'এতান' মহাকাব্য দুটিব কথা। পাঁচ হাজার বছবের প্রাচীন এই সভ্যতাব মোটামুটি একটি ধাবাবাহিক ইতিহাস আবিষ্কৃত হযেছে। সে ইতিহাসেব বিস্তৃত আলোচনায় আমরা যাব না।

মাটি খুঁড়ে সুমেবীযদেব যে সব কীলকাক্ষরে লেখা মাটিব ফলক পাওযা গেছে, তার থেকে 'রাজবংশ অনুযাযী বাজা এবং তাঁদের রাজত্বকালেব তালিকা' আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে যে সমযেব হিসাব আছে তা আধুনিক যুগেব প্রত্নতাত্ত্বিকবা ঠিক মেনে

নিতে পারছেন না। এতে বিভিন্ন সুমেরীয় রাজারা কে কত বছর রাজত্ব করেছিল তার যথাযথ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজত্বকালের যে সময়ের কথা বলা হয়েছে



চিত্র ১৪
একটি সুমেরীয় সীলমোহর



চিত্র ১৫
আর একটি অ্যাসিরীয় সীলমোহর। এ ছবিতেও উপরদিকে অঙ্কিত রয়েছে সূর্য, চন্দ্র এবং বৃত্তাকার উড্ডীন বস্তু

তা অবিশ্বাস্য। এই সুদীর্ঘ তালিকা থেকে এটা জানা গেছে যে, মহাপ্রলয়ের আগে যে দশজন রাজা রাজত্ব করেছিল তাদের মোট রাজত্বকালের সময় প্রায় ৪,৫০,০০০ বছর। রাজাদের নামও দেওয়া আছে এই তালিকায়। আমাদের পৌরাণিক রাজাদের

রাজত্বকালের সময়ও অনুরূপভাবে বিশাল সময়ে বিস্তৃত। সুমেরীয় রাজাদের এই দীর্ঘায়িত রাজত্বকালের সঙ্গে আমাদের পৌরাণিক রাজাদের দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের এই অদ্ভুত মিল লক্ষণীয়। এই দীর্ঘায়িত সময়ের ব্যাপারটা কাল-প্রসরণেব [Time Dilation] প্রভাবে হয়ে থাকতেও পারে। বর্তমান আইনস্টাইনীয় ধারণায় এটা আর এখন অসম্ভব বলে মনে হওয়ার কথা নয়। ওই বাজাদের তালিকায় গিলগামেশের নামও আছে যাকে নিয়ে সুমেরীয়রা রচনা করেছিল 'গিলগামেশ মহাকাব্য'। গিলগামেশ অবশ্য উত্তর-প্লাবন যুগের রাজা হিসাবে নির্দিষ্ট। একই রাজার রাজত্বকালের সময় বিভিন্ন মৃৎফলকে ভিন্ন ভিন্ন বলে উল্লিখিত হওয়ায প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেই রাজাদের রাজত্বকালের সময় নির্ধারণ করতে গিযে বিপাকে পড়েছেন। তবে এটাও ঠিক, যে সুমেরীয়রা সময়ের হিসাব এমন নিখুঁতভাবে করতে লিখেছিল তারা রাজবংশ তালিকায় সমযেব হিসাব লিখতে ভুল করবে তা হয় না। তথাকথিত এই ভুলেব পিছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে যা আমাদেব আজও অজানা।

ঐতিহাসিকবা এই রাজবংশ তালিকা ও তাঁদেব ব্যাজত্বকালের সময় নির্দেশ নিযে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন। বেশ কিছু সমযকাল তাঁদেব অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। তাঁবা এই তালিকাকে অসম্পূর্ণ বলেছেন। কারণ এতে লাগাসেব [Lagash] প্রথম বাজবংশেব উল্লেখ নেই। ওঁদেব মতে বাজা উর-নানশে [Ur-Nanshe] থেকে রাজা উরুক অ্যাজিনা [Uruk Agina] অবধি বাজাদেব কথা ওই বাজবংশ তালিকায নেই। ওঁরা বলেছেন : "The picture offered by the literary tradition of Mesopotamia is clearer but not necessarily historically relevant. The Sumerian king list has long been the greatest focus of interest. This is a literary composition, dating from Old Babylonian times, that describes kingship (nam-lugal in Sumerian) in Mesopotamia from primeval times to the end of the 1st dynasty of Isin. According to the theory— or rather the ideology— of this work, there was officially only one kingship in Mesopotamia, which was vested in one particular city at any one time; hence the change in dynasties brought with it the change of the seat of kingship :

Kish-Uruk-Ur-Awan-Kish-Hamazi-Uruk-Ur-
Adab-Mari-Kish-Akshak-Kish-Uruk-Akkad-
Uruk-Gutians-Uruk-Ur-Isin.

This king-list gives as coming in succession several dynasties that now are known to have ruled simultaneously. It is a welcome aid to chronology and histotry, but, so far as the regnal years are concerned, it loses its value for the time before the dynasty of

Akkad, for here the lengths of reign of single rulers are given as more than 100 and sometimes even several hundred years. One group of versıons of the king-list has adopted the traditıon of the Sumerian Flood story, accordig to which Kish was the first seat of kingshıp after the Flood, whereas fıve dynasties of primeval kings ruled before the Flood in Eridu, Bad-tibira, Larak, Sippar, and Shuruppak. These kings all allegedly ruled for multıples of 3,600 years (the maximum being 64,800 or, accordıng to one variant, 72,000 years). The tradition of the Sumerian king-list is still echoed in Berosus.

It ıs also instructıve to observe what the Sumerıan kıng-lıst does not mentıon. The lıst lacks all mentıon of a dynasty as important as the 1st dynasty of Lagash (from King Ur-Nanshe of Uruk-Agına) and appears to retaın no memory of the archaıc florescence of Uruk at the begınnıng of the 3rd mıllennıum BC."

সুমেবীয মহাকাব্য গিলগামেশ-এর রচনাকাল মোটামুটি ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। বাবোটি মাটিব ফলকে কীলকাক্ষবে লেখা হযেছিল এই মহাকাব্য। এব একটি সংস্করণ পাওযা গেছে অ্যাসিবীয বাজা অসুর বানিপালের গ্রন্থাগাবে। আবেকটি সংস্কবণ পাওযা গেছে বাজা হামুরাবির কালেব। সুমেরীয়দের কাছে গিলগামেশ মহাকাব্য কতটা প্রিয় ছিল তা প্রমাণ করে এর বিভিন্ন সংস্করণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রবল উন্নত সুমেরীয়দের এই মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে মহাপ্লাবনের কথা। এই মহাপ্লাবনের কথা যেমন ভাবতীয পুরাণগুলিব অনেক কটিতেই আছে, তেমনি নোয়াকে নিয়ে এই মহাপ্লাবনের কথা বর্ণিত হয়েছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীতে বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্যাবতার। এই মৎস্যাবতারের প্রয়োজনই হয়েছিল মহাপ্লাবনের হাত থেকে সৃষ্টির বীজ রক্ষা করতে। এই একই গল্পের ধারা বয়ে চলেছে সুমেরদের গিলগামেশ মহাকাব্যে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে এবং অন্যান্য দেশের প্রাচীন মহাকাব্যে কিংবা পুরাণ কাহিনীতে।

গিলগামেশ মহাকাব্য সমন্বিত বারোটি মৃৎফলকের প্রথমটিতে লেখা আছে বিজযী বীর গিলগামেশ উরুক নগরের চারিধারে প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন। 'স্বর্গাধিপ' বাস করতেন একটি বিশাল প্রাসাদে। অফুরন্ত শস্য ভাণ্ডার ছিল সে প্রাসাদে। নগর প্রাকারে দণ্ডায়মান থাকতো প্রহরীর দল। গিলগামেশ ছিলেন দেবতা ও মানবের সঙ্কর— তাঁর দু'ভাগ দেবশক্তি এবং একভাগ মানবশক্তি। তীর্থযাত্রীরা উরুকে এসে অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে শঙ্কিত চক্ষে চেয়ে থাকতো। অত রূপ, অমন শৌর্য তারা কেউ

কোনদিন দেখেনি, যা তারা দেখতো গিলগামেশের মধ্যে।

দ্বিতীয় মৃৎফলকে লেখা আছে এঙ্কিডুর [Enkidu] কথা। তাকে সৃষ্টি করেছিলেন স্বর্গের দেবী অরুরু। তার গায় বড় বড় লোম। সে খেতো মাঠের ঘাস। জল খেতো গরুমোষের সঙ্গে এক ডাবায়। আর সে ভালোবাসতো সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় সাঁতার কাটতে। অদ্ভুত এই প্রাণীটিকে পোষ মানাতে উরুকরাজ এক সুন্দরী উপদেবীকে কাজে লাগালেন। এঙ্কিডু ছদিন, ছরাত্রি যাপন করলো সেই সুন্দরীর সহবাসে। এঙ্কিডু অনেকটাই বশীভূত হল।

তৃতীয় ফলকে আছে 'সূর্যদেব' আক্রমণ করলেন এঙ্কিডুকে তাঁর বিশাল পক্ষ ও তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে। এঙ্কিডুর দেহের উপর সূর্যদেব নেমে এলেন ভারী সীসার মত। আকাশ গর্জে উঠলো, মাটি কেঁপে উঠলো। প্রবল লড়াই হল এঙ্কিডুর সঙ্গে। কিন্তু মৃত্যু হল না এঙ্কিডুব।

পঞ্চম ফলকে আছে গিলগামেশ বন্ধু এঙ্কিডুকে নিয়ে চললেন ঈশ্বরের আলযে। অনেক দূর থেকে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন দেবী ইর্নাইসিসের সুউচ্চ অট্টালিকা ঝকমক করছে। রক্ষীদের উপর তাঁরা যে সব বাণ নিক্ষেপ কবলেন সেগুলি সব প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। অট্টালিকার দ্বারদেশে আসতেই একটা কণ্ঠস্বর গর্জে উঠলো। 'ফিবে যাও। দেবতারা যেখানে থাকেন সে পবিত্র পর্বতে মানুষের আসা নিষেধ। দেবতাদেব মুখ যে দেখবে, মৃত্যু তাব সুনিশ্চিত।'

সপ্তম ফলকে আছে এঙ্কিডুব দেওয়া আকাশ ভ্রমণেব চাক্ষুষ বিববণ। একটি ঈগলেব ধাতব নখবে ধৃত এঙ্কিডু প্রথমে চাব ঘণ্টা আকাশে উড়ল। ''তিনি বলিলেন, 'মাটিব পানে চাহিয়া দেখ, কী দেখিতেছ? সমুদ্রকে দেখিয়া কেমন মনে হইতেছে?' এঙ্কিডুব মাটিকে মনে হইল পর্বত আর সমুদ্রকে হ্রদ। আবো চারঘণ্টা উডিবাব পর তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'মাটিব পানে চাহিয়া দেখ, কেমন দেখিতেছ? সমুদ্রকে দেখ, কী মনে হইতেছে?' মনে হইল, মাটি যেন উদ্যান, আর সমুদ্র যেন উদ্যান-পরিখা। পুনবায় চাব ঘণ্টা উড়িবার পব আরও অনেকটা উঁচুতে উঠিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'মাটি ও সমুদ্রকে আবাব দেখ, কী মনে হইতেছে, কেমন মনে হইতেছে?' মনে হইল মাটি যেন এক বাটি জাউ [Porridge] আর সমুদ্র যেন একটি জলকুণ্ড।'' এই বর্ণনা থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে, কোনও মানুষ নিশ্চয়ই একদিন বহু উর্ধ্বাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখেছিল। পৃথিবীর আকার কেমন তা যদি জানা না থাকে তবে কেমন কবে বলা যাবে দূর আকাশ থেকে পৃথিবীব মাটিকে দেখায় খানিকটা জাউয়ের মত ফাটা ফাটা আব সমুদ্রকে চৌবাচ্চার মত? এঙ্কিডুর বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। অনুরূপ বর্ণনা আমরা পাই মহাভারতেও। পাশুপত অস্ত্রলাভের পর অর্জুন যখন মাতলি-চালিত ইন্দ্র-রথে চড়ে দেবলোকে যাচ্ছিলেন তখনও তিনি পৃথিবীকে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে দেখেছিলেন এবং পৃথিরী একসময় তাঁর দৃষ্টিপথেব বাইরে চলে গিয়েছিল।



চিত্র ১৬
মেসোপটেমিয়ার সোনার হার

অষ্টম ফলকে লেখা আছে, যে এঙ্কিডু দূর আকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখেছিল, সেই এঙ্কিডু মারা গেল এক অজানা অদ্ভুত রোগে। গিলগামেশ মনে করেছেন কোনও স্বর্গীয় পশুর বিষাক্ত নিঃশ্বাসই এঙ্কিডুর মৃত্যুর কারণ। নবম ফলকে দেখা যায়, বন্ধু এঙ্কিডুর মৃত্যুতে গিলগামেশ মহা-শোকসন্তপ্ত। তিনি স্থির করলেন যে, দেবতাদের দরবারে তিনি যাবেন, তা সে যত দূরের পাড়ি হোক না কেন। তারও মনে তখন ধরণা জন্মেছে, যে রোগে এঙ্কিডুর মৃত্যু হয়েছে সেই রোগে তাঁরও মৃত্যু হবে। গিলগামেশ মৃত্যু জয়ের আশায় চললেন দেবতাদের দরবারে। তিনি পৌছালেন সেই পর্বত সমীপে যার শিখবে রয়েছে স্বর্গ আর মাঝখানে 'সূর্যতোরণ'। তোরণ রক্ষী দুটি ভীষণাকার দানব। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর তিনি প্রবেশেব অনুমতি পেলেন যেহেতু তাঁর শরীরের দুই-তৃতীয়াংশ দেবশক্তিতে গড়া। অবশেষে তিনি দেখতে পেলেন দেব-উদ্যান। তার বিপরীত পারে বিস্তৃত বিশাল বারিধি। গিলগামেশ আরও এগিয়ে চললেন। ইতিমধ্যে দেবতারা দু'বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'কোথা যাও গিলগামেশ, এত ত্বরা করি? যে জীবনের অন্বেষণে তোমার আগমন, তা তুমি পাবে না। মানুষ সৃষ্টি করেছেন দেবতা এবং তার জন্য ধার্য করা হয়েছে মৃত্যু এবং দেবতারা

জীবনকে রেখেছেন নিজের প্রয়োজনে।' গিলগামেশ সে সব সাবধান বাণী কানে তুললেন না। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানব-স্রষ্টা উৎনাপিশ্‌তিমের কাছে যেতে। কিন্তু উৎনাপিশ্‌তিম থাকেন বিশাল বারিধিব ওপাবে। তবু সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে গিলগামেশ হাজির হলেন উৎনাপিশ্‌তিমেব কাছে। তারপব তাঁর বাগ্‌-বিতণ্ডা শুরু হল মানব-স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের অমবত্ব নিযে। গিলগামেশ দেখলেন উৎনাপিশ্‌তিমের অবয়ব একেবারে তাঁরই মত—যেন তাঁবা পিতাপুত্র। উৎনাপিশ্‌তিম গিলগামেশকে শোনালেন তাঁর অতীতের কথা। এখানেও এসেছে সেই মহাপ্লাবনেব কথা, যে মহাপ্লাবনের কথা আমরা পাই আমাদের মৎস্যপুরাণে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে। গিলগামেশ বলছেন, দেবতাবা প্লাবনেব ব্যাপাবে তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, একটা নৌকা তৈবি করতে আব তাতে মেযে-পুরুষ, আত্মীয়-স্বজন এবং সব রকম কারিগরদের তুলে নিতে। মহাপ্লাবনেব ব্যাপাবটায মৎস্যপুবাণ কিংবা অন্যান্য পৌরাণিক বর্ণনা নোযাব কাহিনী এবং গিলগামেশেব বর্ণনা প্রায একই।

গিলগামেশ মহাকাব্যে এক নাটকীয যুদ্ধেব বর্ণনা আছে, গিলগামেশ ও এঙ্কিডুব সঙ্গে দানব চুভাভাব। দেবালয পাহাবা দিত সেই দানব একাই। একাই যে লড়েছিল। এই দুজনের সঙ্গে। এঙ্কিডুর ও গিলগামেশেব নিক্ষিপ্ত গদা, বর্শাগুলো ঠিকরে পড়তে লাগলো দানবটাব ঝকঝকে দেহে আঘাত লেগে। একটি আঁচড়ও কাটতে পাবলেন না পবাক্রমী গিলগামেশ ও তাঁব বন্ধু এঙ্কিডু। চুভাভাব পেছনেব একটা গবাক্ষ দিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্ববে সাবধান বাণী উচ্চাবিত হচ্ছিল গিলগামেশেব উদ্দেশে। এঙ্কিডু অবশ্য চুভাভাব দুর্বল জাযগায আঘাত কবে, তাকে কাবু কবে ফেলে। গিলগামেশ মহাকাব্য বলছে, ''যতক্ষণ না ওই মানুষ্যকে বধ কবতে পাবি, জানি না, সে 'মনুষ্য' কি 'দেবতা'। যদি দেবতাও হয, যতক্ষণ না ওই দেবতাকে নিহত করতে পারি ততক্ষণ নগরাভিমুখে যেতে পাববো না। মহাবাজা [গিলগামেশের প্রতি] আপনি ওকে দেখেন নি, সেই জন্য আপনি ভীত নন, আমি ওই 'মনুষ্য'-কে দেখেছি, সেই জন্য আমি ভীতিবিহ্বল। ওব দংস্ট্রা ড্রাগন দংস্ট্রাব মত এবং ওব মুখাবযব সিংহেব মুখের মত।' গিলগামেশে এও আছে, ''দেবী ইনান্নাব সঙ্গে যাবা এল, সে জীবগণ আহাব করে না, জলও পান কবে না। খাদ্য ছড়িযে দিলে তা স্পর্শও কবে না, জল দিলেও তা পান করে না ...।'' গিলগামেশের ওই সব অদ্ভুত জীবগুলি 'বোবট' কিনা তা ভাববার বিষয়।

সুমেরীয়দের 'এতান মহাকাব্য' গিলগামেশের চেয়ে কিছুটা আধুনিকতব। এটি লেখা হয় অ্যাসিবীয বাজা আঁসুব বানিপালেব [৬৯৯-৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] বাজত্বকালে এবং পাওয়া গেছে তাঁবই গ্রন্থাগারে। এখন এই মহাকাব্যের মৃৎফলকগুলি রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এতানের কোনও কোনও অংশ গিলগামেশের [২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] চেয়েও পুরাতন। এতান মহাকাব্যেও আছে মহাকাশ থেকে পৃথিবী দেখার বিববণ। এতানেব কাহিনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগে আছে ঃ

"এতান সমস্ দেবকে অনুরোধ করছে অমরত্বের ওষধির ব্যবস্থা করতে। সমস্ তাকে পাঠালেন 'ঈগল'-এর কাছে। ঈগল যখন জানতে চাইলো, এতান কী চায়, এতান বললো, 'আমাকে অমরত্বের ওষধি দিন'। সে কথা শুনে ঈগল তাকে নিয়ে চললো স্থির তারার স্বর্গে। উড়তে উড়তে ঈগল তার দৃষ্টি পৃথিবীর পানে ফিরিয়েছে ছয়বার, দেখিয়েছে পৃথিবী কেমন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে তাদেরই চোখের সামনে।

"খানিকক্ষণ ওপর পানে বয়ে নিয়ে যাবার পর ঈগল এতানকে বললে, চেয়ে দেখ বন্ধু, মাটি কেমন বদলে গেছে, সমুদ্র দেখ, পর্থিব পর্বতের গায়ের দিকে তাকাও। ওখানকার মাটিকে দেখাচ্ছে পাহাড়ের মত তার সমুদ্র যেন একটা স্রোতবহা'।"

"আরো খানিকটা উপরে যাবার পর ঈগল এতানকে বললে, চেয়ে দেখ বন্ধু, মাটি এখন কেমন বদলে গেছে। পৃথিবীকে যেন গাছপালার বাগানের মত দেখাচ্ছে।"

ঈগল আরো অনেক উপরে উড়িয়ে নিয়ে গেল মানব-সন্তান এতানকে এবং সে বাবেবারে তাকে বলেছে নিচের পৃথিবীব দিকে চেযে দেখতে। শেষকালে এক সময এতান দেখেছে পৃথিবী একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর আব বিশাল উত্তাল সমুদ্র যেন তাবই ছোট্ট উঠান। এতান মহাকাব্যে বলা হয়েছে ঃ

"নিচের পানে চেয়ে দেখ বন্ধু, মাটি কেমন বদলে গেছে।' 'মাটি যেন বান্নাঘর আব বিশাল বাবিধি যেন রুটিব একটা চুপড়ি'। 'দেখ বন্ধু, পৃথিবী কেমন অদৃশ্য হযে গেল'। 'দেখেছি তো পৃথিবী কেমন হাবিযে গেল, সমুদ্র দর্শনেব তৃপ্তিও গেল মুছে।' 'আমি স্বর্গে আর যেতে চাই না বন্ধু, আমাকে ফিবিয়ে নিযে চল আমার মাটিব পৃথিবীতে'।"

নিনেভের একটি মৃৎফলকে 'পৃথিবীব সূচনা' সম্পর্কেও একটা কাহিনী পাওযা গেছে। সেখানে রয়েছে জগৎসৃষ্টিব আদিপর্বেব আশ্চর্যজনক কথা ও কাহিনী।

"স্বর্গেব যখন নামকবণ হয নি
যখন পৃথিবীও ছিল নামহীন, গোত্রহীন,
আদি প্রবর্তক, তথা জনক
মহাসমুদ্র এবং তার বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস
যখন জন্ম দিল সকল বস্তুর,
যখন ক্ষেত্র ছিল কর্ষণবিহীন,
কোন মানুষের যখন ঘটেনি আবির্ভাব,
কোন দেবতারও যখন ছিল না অস্তিত্ব,
গড়ে ওঠেনি কোন নাম, নিয়তিও হয় নি সুস্থির,
তখনি সৃষ্টি হল দেবতাকুলের,
জন্ম হল লুহম আর লাহামুর,
কত যুগ বয়ে গেল কালেব অনন্ত লক্ষ্য পানে।"

এই সৃষ্টিতত্ত্ব ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সেই অতি বিখ্যাত 'নাসদীয় সূক্ত'-টির কথা

মনে করিয়ে দেয়। সুমের সভ্যতার তৃতীয় অ্যাসিরীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সারগন [২৩৩৪-২২৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] ছিলেন বেশ প্রগতিশীল মানুষ। নানা জাতের লেখা নিয়ে তিনি এক বিশাল গ্রন্থাগার নির্মাণ করেছিলেন। সে গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে ওই মহাপ্লাবনের কাহিনী আর বাইবেলের চেয়েও পুরাতন এক সৃষ্টিতত্ত্ব। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে আছে একত্রিশটি পরিচ্ছেদ, কিন্তু তার চেয়ে অনেক প্রাচীন সুমেরীয়দের সৃষ্টিতত্ত্ব লিখিত হয়েছে সাতটি মৃৎফলকেব দু'পিঠ জুড়ে প্রায় হাজারখানেক লাইনে।

আগেই বলেছি, হরপ্পা সংস্কৃতিতে লেখার রীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। শীলমোহরগুলিতে এইসব লিপি উৎকীর্ণ। মৃৎপাত্রের উপবও কিছু কিছু লেখা পাওয়া গেছে। এই বর্ণমালা এতোই প্রাচীন যে অন্যান্য প্রাচীন বর্ণমালাব সঙ্গে এই লিপির কোন সাদৃশ্য নেই। মোটামুটি জানা গেছে, প্রায় ২৫০ রকমের অক্ষর ব্যবহৃত হতো। এগুলি আজও অপঠিত থাকায় সিন্ধু সভ্যতাব অনেক কিছুই আজও অজানা। অনেকে মনে করেন, এই লিপিগুলি বর্তমান তামিল লিপিব প্রাচীনতম ৰূপ। তবে এ নিযে সঠিক সিদ্ধান্ত আজও হযনি। এই সময যে সব বাটখাবা চালু ছিল তাদেব ওজন নিঁখুতভাবে সমান রাখা হতো। পণ্য কেনাবেচার জন্য বড়মাপেব বাটখাবা আবার অলঙ্কার ও পুঁথি কেনাবেচাব জন্য ছোটমাপের বাটখাবার প্রচলন ছিল। পুঁথিব দোকানে বাটখারা পাওযা যাওযায পণ্ডিতেরা মনে কবেন পুঁথিও ওজন কবে কেনাবেচা হতো। সুমেব সভ্যতায় এ ধবণের কোনও বাটখাবা পাওয়া যায নি।

হবপ্পা সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে দৈর্ঘ্য মাপতে যে দু'ধবনেব মাপকাঠি পাওযা গেছে তার একটি মহেঞ্জোদারোতে, অন্যটি হরপ্পায়। মহেঞ্জোদারোতে পাওযা মাপকাঠিব দৈর্ঘ্য ১৩.২ ইঞ্চি, আব হরপ্পায় পাওয়া মাপকাঠিব দৈর্ঘ্য ২০ ৬২ ইঞ্চি। হরপ্পার এই কাঠিটি ব্রোঞ্জ নির্মিত। সুমেরদেরও দৈর্ঘ্য মাপ করার এই রকম দণ্ড ছিল। তাদেব সময়-পবিমাপ ব্যবস্থাও ছিল যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু হরপ্পায সময পবিমাপের কোনও ব্যবস্থার কথা জানা যাযনি। প্রায় এক হাজার বছর টিকে থাকা এই অত্যুন্নত সভ্যতায় সময মাপার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এটা হতে পারে না। প্রত্নতাত্ত্বিকেবা কোনও নিদর্শন না পেলেও এটা অনুমান করতে বাধা নেই যে, সিন্ধুসভ্যতায় সময়ের ধারণাও উন্নতমানেব ছিল এবং সমযেব পরিমাপ করাবও উন্নত বন্দোবস্ত এই সভ্যতা কবেছিল। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা প্রাচীনতম। সুমেব সভ্যতা ছিল এর দোসব এবং এদেরই সমসাময়িক বা কিছুটা নবীনতর আরেকটি সভ্যতা হলো 'মিশরীয় সভ্যতা'।

এবার আসি বিখ্যাত প্রাচীন সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার কথায়। এই সভ্যতাটিও হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক। মিশরীয় সূর্যদেবতা 'রা'-এর প্রশস্তিতে কীলকাক্ষরে [Cuneiform] লেখা একটি পুঁথি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে মিশরের কথা শুরু থাক।



চিত্র ১৭

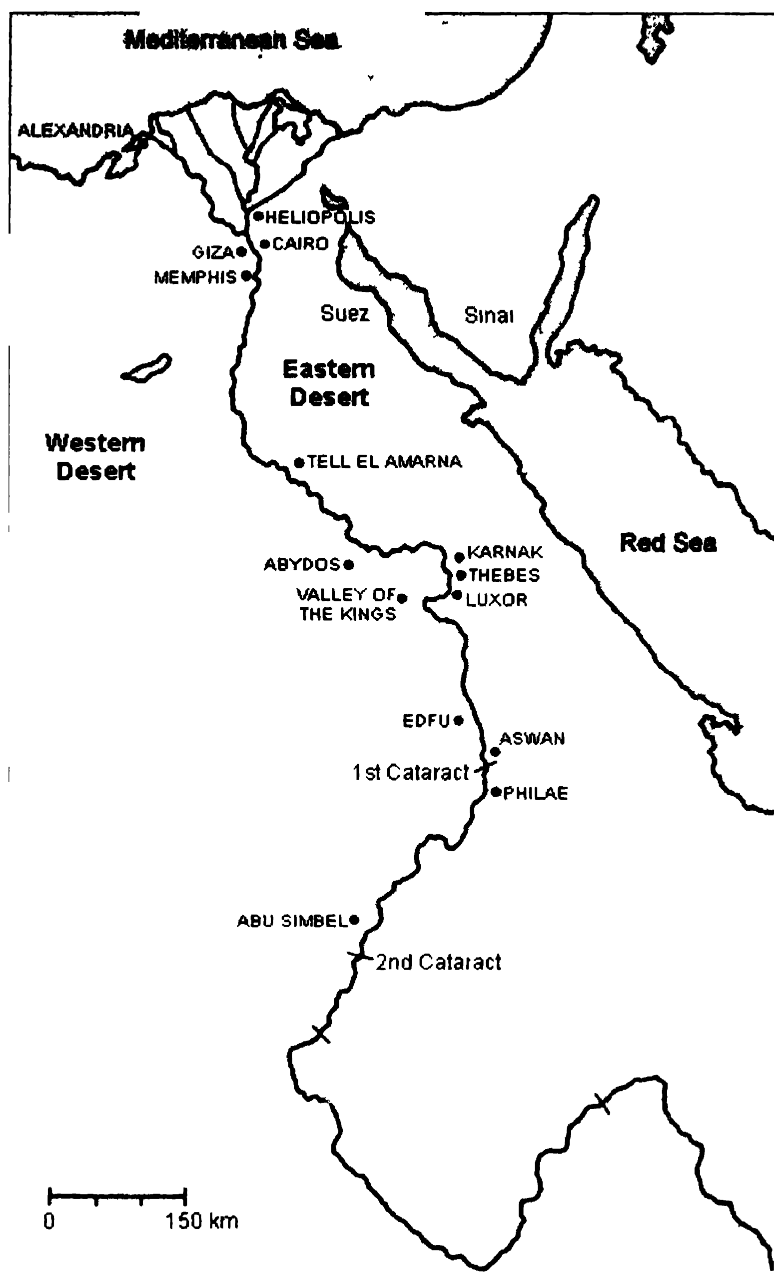
মেসোপটেমিয়ার ৪০০০ বছরের পুরাতন প্রস্তর নির্মিত নারীমূর্তি। পোষাকটা কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে একালের।

"তোমাব মিলন চন্দ্রে তারায়।
তুমি আতনের রথ টেনে চল স্বর্গে, ধরায়,
অক্লান্ত ঘূর্ণমান নক্ষত্ররাজির মত,
উত্তব মেরুব সদা জাগ্রত তারকারাজির মত।"

নীলনদের উপত্যকায় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর বা তারও কিছু আগে এক অত্যুন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতাকে আমরা বলি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা। এই সভ্যতাবই বিস্ময়কর অবদান হলো বিশাল বিশাল পিরামিড। মৃতদেহ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় এবা ছিল পটু। 'মমি' কবাব আশ্চর্য পদ্ধতি এদেরই আবিষ্কার। পিরামিড তৈবিব আশ্চর্য কলাকৌশল যেমন আধুনিক প্রযুক্তিবিদদেব বিস্ময উৎপাদন করে, তেমনি 'মমি' কবে মৃতদেহকে হাজাব-হাজার বছর অক্ষত অবিকৃত বাখাব ব্যবস্থাপনাও এ যুগেব বিজ্ঞানীদেব সমীহ আদায় করে। মিশরীয়দের ব্যবহৃত চিত্রলিপি, যার নাম 'হাইয়াবোগ্লিফিকস্' [Hieroglyphics], পাঠ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে মিশরীয সভ্যতাব অনেক কিছুই আজ আমবা জানতে পেবেছি। এদেব জীবনযাত্রা, ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, এমনকি সময়-ধারণা সম্পর্কেও আমবা বহু তথ্য পেয়েছি। ফলে, প্রাচীন সভ্যতাগুলিব মধ্যে সবচেযে উন্নত ও বিস্ময়কব প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্রাচীন মিশবীয সভ্যতাব বহু কথাই আজ আমাদের জানা।

কৃষিসমস্যা সমাধানেব জন্যই নাকি মানুষ প্রথম পঞ্জিকা আবিষ্কাব কবে, পণ্ডিতেবা একথা বলেন। প্রাচীন মিশবের এই সমস্যা ছিল। ফলে মিশরীযবা পঞ্জিকা আবিষ্কাব কবেছিল কৃষিসমস্যা সমাধানেব জন্য। সেখানে প্রতি বছব দক্ষিণেব আবিসিনিযাব পাহাড় অঞ্চলে যে বর্ষা নামতো তাই উত্তবে এসে মিশবেব নীল নদীর দুপাশে প্রবল প্লাবন সৃষ্টি কবতো। এই প্লাবনই মিশবেব কৃষিকার্যেব সহায হতো। কৃষিকার্যেব জন্য প্রস্তুতি দবকাব। তাই প্লাবন কখন আসবে জানা থাকলে কৃষিকার্যেব প্রস্তুতি ঠিক ঠিক ভাবে নেওয়া সম্ভব হতো। এই প্লাবনেব সময জানতে গিয়েই মিশবীযবা পঞ্জিকা আবিষ্কাব কবে। তাবা দেখলো, নীল নদীতে যখন বন্যা আসে তখন আকাশে সূর্যোদযেব ঠিক পূর্বে যে তাবা দেখা যায় তা হলো 'লুব্ধক' [Sirius]। কযেক বছব ধবে তাবা হিসাব কষলো। দেখা গেল, এই লুব্ধক নক্ষত্র আকাশেব শেষ দৃশ্যমান তাবা হিসাবে দেখা দেয ৩৬৫ দিন পবে পবে। এইভাবে তারা আবিষ্কার কবলো ৩৬৫ দিনে এক বছর। এই পঞ্জিকা আবিষ্কৃত হযেছিল প্রায ২৭৭৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। আবার কেউ কেউ বলেন এই সময়টা হবে ৪২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। দুটো সমযেব মধ্যে ফাবাক বড্ড বেশি। আবার পশ্চিম আফ্রিকাব ডোগান উপজাতির প্রাচীন পুঁথি থেকে জানা গেছে যে, এই অর্ধসভ্য উপজাতির প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা লুব্ধক নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে বিস্ময়কর সব তথ্য জানতেন।

১৮৩৪ সালে বেসেল [১৭৮৪-১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ] পৃথিবী হতে ৮.৫ আলোকবর্ষ দূরের লুব্ধক নক্ষত্রেব গতি অনিমিযত এটা আবিষ্কার করেন। ঢেউ খেলানো তার গতিপথ। তিনি বললেন, লুব্ধকেব কক্ষপথের ওপর 'আব একটা কিছু'র প্রভাব পড়ছে। জ্যোতির্বিদ বেসেল সেই 'আরেকটা কিছুর' নাম দিলেন 'লুব্ধক-খ'। গত শতাব্দীতে লুব্ধক-খকে ভালো করে দেখবাব মতো দূরবীন তৈরিই হয়নি। বেসেলের কাছে যে সব দূরবীন ছিল তাব সবচেয়ে ভালোটি দিযেও তিনি লুব্ধক-খকে দেখতে পাননি।



চিত্র ১৮
প্রাচীন মিশর-সভ্যতা অধ্যুষিত অঞ্চল

কিন্তু তার অবস্থান বের করলেন অঙ্ক কষে। ১৮৬২ সালে আলভান ক্লার্ক [১৮০৪-১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ] ৪৭ সেন্টিমিটার ব্যাসের দূরবীন দিয়ে লুব্ধক-খ দেখতে পেলেন ঠিক বেসেল নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু তাঁর দূরবীনটিও তারাটির ঔজ্জ্বল্য স্থির করতে পারলো না, অতি উজ্জ্বল তারা লুব্ধক কাছে থাকায়। তবে তিনি বললেন, লুব্ধক একটা স্বাভাবিক নক্ষত্র, কিন্তু তার সঙ্গী লুব্ধক-খ একটি 'শ্বেত বামন' [White Dwarf] তারা, তাব ঘনত্ব অত্যধিক। বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা জানি, লুব্ধক ও লুব্ধক-খ -এর ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত, ১০,০০০ ঃ ১, ভরের অনুপাত ৪ ঃ ১, ব্যাসার্ধের অনুপাত ১.৮ ঃ ০.০৩৪ এবং ঘনত্বের অনুপাত ০.৪২ : ২৭০০০। লুব্ধক-খ-র কক্ষপথ পরিক্রমণেব সময হলো ৫০.০৪ ± ০.০৯ বছব। ডোগানদের প্রাচীন পুঁথিতে লুব্ধক-খয়ের নাম 'পো-তোলোই'। তাদেব পঞ্চাশ বছব অন্তব একবাব করে যে 'সিগুই-ভোজ'-এব ব্যবস্থা হয় তা নির্দেশ করে এই নক্ষত্র 'পো-তোলোই'। এই ভোজ উৎসবেব উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে নতুন কবাব ইচ্ছাকে ফলবতী কবা। ডোগানদের শস্য 'পো' থেকে এসেছে 'পো-তোলোই' নাম। 'পো'-ব বৈজ্ঞানিক নাম 'ডিজিটারিযা একসিলিস'। ফলে লুব্ধক-খ-ব আধুনিক নাম দেওয়া হলো 'ডিজিটারিয়া'। ডোগান পুবাণ বলছে, ডিজিটাবিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধককে পঞ্চাশ বছরে একবাব প্রদিক্ষণ কবে, কিন্তু ডিজিটাবিযা নিজে অদৃশ্য। ডোগানবা বলে, ওই ডিজিটারিয়া লুব্ধকের অবস্থান নির্দিষ্ট কবে। লুব্ধক ও তাব সঙ্গী নক্ষত্র সম্পর্কে প্রাচীন ডোগানদেব এই জ্ঞান রীতিমত বিস্ময়জনক।

যাইহোক, নীলনদেব বন্যাব খবব জানতে গিয়েই মিশরীযবা জানলো ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায এক সৌব বৎসর হয। নক্ষত্রেব গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তারা বাত্রিকে মোট বারো ভাগে এবং পবে পবে দিনকেও মোট বারো ভাগে ভাগ করে ফেলল। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ২৪টি সমান ভাগ কবা হলো দিনরাত্রিব মোট সমযকে। এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টার দিনরাত্রির আবিষ্কাব কবলো মিশরীয়রা। সময ধারণার আধুনিক যুগের সেই শুরু বলা যেতে পাবে। এটা প্রায পাঁচ-ছয় হাজাব বছর আগেকাব কথা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য এই 'ঘণ্টা' [Hour] ব্যবহৃত হতো। পুরোহিতবা ঘণ্টা হিসাব কবে পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদির সময় নির্ধাবণ কবতেন। ঘণ্টাকে তাই বলা হতো 'পুরোহিত কর্তব্য' [Preistly Duty], অর্থাৎ কোন্ ঘণ্টায পুবোহিত কী করবেন তাও তারা নির্দিষ্ট করেছিল। পুরোহিতদেব তাবা 'ঘণ্টা-পর্যবেক্ষক' [Hour Watcher] বা 'নক্ষত্র পর্যবেক্ষক' [Star Watcher] নামেও অভিহিত কবতো। মিশরীযবা সময মাপতে 'ছাযা-ঘড়ি' [Star Clock] ব্যবহার কবত। এই ছাযা-ঘডি আমাদের পরিচিত সূর্যঘড়ির অনুরূপ। প্রায় তিন হাজাব বছবেব পুরানো মিশরীয ছায়া-ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং প্রাচীন মিশব-সভ্যতা তাব অন্যান্য উন্নত কলা-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে সময ধাবণাবও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিযেছে। সময ধাবণাব উন্নতি ঘটে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মিশব সভ্যতায তাব ব্যতিক্রম ঘটেনি।

একটু আগেই বলেছি, প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপির নাম 'হাইয়ারোগ্লিফিকস্'। প্রাচীন মিশরের এই চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। ফলে, প্রাচীন মিশরের যাবতীয় ইতিহাস আমাদের আজ ভালোভাবেই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু, হরপ্পার লিপিগুলি অপঠিত থাকায় হরপ্পায় পরিপূর্ণ ইতিহাস আজও জানা সম্ভব হয় নি।

মিশব সভ্যতার বিস্ময হল এর পিরামিডগুলি। পিরামিডগুলিতে রক্ষিত হয়ে আছে রাজা রাজড়াদের 'মমি' করা মৃতদেহ হাজার হাজাব বছব ধরে অবিকৃতভাবেই। এই মমিব অনেকগুলিই এখন বের করে আনা হয়েছে, রাখা হয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে। সেই মমিগুলি কিন্তু আধুনিক মিউজিযামেব উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সত্ত্বেও ক্ষয়ে যাচ্ছে। অথচ সেগুলি কয়েক হাজাব বছব ধরে পিবামিডেব মধ্যে অবিকৃতই ছিল। পিরামিডের সব রহস্য আজও অজানা। তাই বিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পিরামিডগুলির বিভিন্ন বহস্য সমাধানে তাঁরা পিরামিডেব ভিতবে বিভিন্ন জাযগায় বোবোট [Robot] পাঠাবেন। পিবামিডেব মধ্যে যে কক্ষে মমি সংবক্ষিত হত সেখানে পাওযা গেছে হাইযাবোগ্লিফিকসে লেখা 'মৃতেব পুঁথি' [Book of the Dead], সবচেযে পুবনো যে মৃতেব পুঁথিটি মিশবে পাওযা গেছে তাব বযস ৩৫৮৮ বছর [২০০২ খ্রীষ্টাব্দে]। তবে এর চেয়ে পুরানো পুঁথি হল পিবামিডেব অভ্যন্তবেব দেওয়ালগুলিতে খোদাই কবা বা লেখা অনুৰূপ মন্ত্রগুলি যাতে একই ধবনেব চিত্রলিপি ব্যবহৃত হযেছে। প্যাপিবাস বা চামড়াব ব্যবহাবেব আগে, প্রাচীন মিশরীযবা মৃতেব পুঁথিব বক্তব্য দেওযালেই খোদাই কবত বা লিখত। দেওয়ালে খোদাই কবা বা লেখা ওই সব মন্ত্র সমষ্টিকে আমবা বলি 'পিবামিড পুঁথি' [Pyramid Text]। এই পুঁথিব সবচেয়ে প্রাচীন যেটি তাব বযসও নয নয করে ৪৩৬৫ বছর। এগুলিতে লিপি হিসাবে হাইযারোগ্লিফই ব্যবহৃত। মিশবে হাইযাবোগ্লিফ ব্যবহার শুরু হযেছে প্রায় ৫০০০ বছর আগে। তবে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাবোব সীলমোহরগুলির উপর খোদাই করা লিপিগুলি আজও অপঠিত। লিপি হিসাবে ওইগুলিই সম্ভবত পৃথিবীব প্রাচীনতম লিপি। পৃথিবীব সবচেযে পুবানো লিপি ওই হরপ্পা সভ্যতারই অবদান।

মৃতের পুঁথিতে বলা হয়েছে, মৃত ফাবাও-এব [Pharaoh] কথা। বলা হয়েছে, মৃত ফারাও আবার বেঁচে উঠবেন। আর বেঁচে উঠবে তাঁব কিছু মৃত প্রজা ও পাত্র-মিত্র যাদেব তিনি পরবর্তীকালে শাসন করবেন। পিবামিড পুঁথির হাইযারাটিক লিপি বলছে, মৃত ফাবাওয়ের যে সব আত্মীয়-স্বজন ও সভাসদ এবং মহিষী ফাবাওযের সঙ্গে সমাধিস্থ হলেন তাঁরাও পরবর্তীকালে নতুন জগতের নতুন রাজত্বে একই রকম পদলাভ কববেন এবং আরও সুখে জীবন কাটাবেন। বেশির ভাগ মৃতের পুঁথির লিপি হলো হাইয়ারোগ্লিফের পরিবর্তিত হাইয়ারাটিক লিপি। ওই সব পুঁথিতে যে সব প্রার্থনা, স্তোত্র কিংবা মন্ত্র আছে, সেগুলি কাব্যগুণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

যেমন ঃ

"আমি সেই মহান ঈশ্বর
স্বয়ম্ভূ আমি।
আমার নামের নিগূঢ় শক্তি
সৃষ্টি করে স্বর্গীয় দেববিধান।
দেবতারা আমার কাজে
বাধা দান করতে পারে না।
আমি অতীত।
অনাগত আমার পরিচিতি।
দেবতাবা যে ভীষণ যুদ্ধে
লিপ্ত হয়
সে আমাবই ইচ্ছায়।"

মৃতেব পুঁথিতে ব্যবহাবিক জীবনের উপর অনেকগুলি উপদেশ আছে। তাদের একটি হলো ঃ "জীবনে যদি সফল হতে চাও তবে বিবাহ কব, তা হলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি সন্তান লাভ করতে পারবে। যদি তুমি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পুত্র লাভ কবো, তবে সে তোমার আদেশ কিংবা আজ্ঞা মেনে চলবে। তোমার গৃহস্থালীর উপযুক্ত দেখাশোনা কবে সে তার নিজের অবস্থার উন্নতি কববে। তার জন্য কোনও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাব সন্ধানে থাকবে কারণ সে তোমারই আত্মজ। তাব প্রতি হৃদয়হীন হয়ো না, কারণ তাতে কলহই বৃদ্ধি পাবে। যদি সে বিপথে যায়, তোমার ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা ভঙ্গ কবে, তোমার আদেশ অমান্য করে, তোমাব সংসারে যৎপরোনাস্তি দুঃখ-দুর্দশার কাবণ হযে ওঠে এবং তুমি যাই বল তাবই প্রবল বিরোধিতা কবে, সর্বদাই অশ্লীল গালাগালি করে ও বোঝে না যে, সে কোনও কিছুরই মালিক নয কিংবা তাব নিজের বলে কিছু নেই, তবে তাকে তাড়িয়ে দাও। সে তোমার পুত্র নয় মনে কব, তোমাব থেকেই তাব জন্ম হয়েছে এটা মিথ্যা অর্থাৎ তুমি তাব জন্ম দাও নি।"

মৃতের পুঁথিব একটি বিখ্যাত প্রার্থনা তার অর্থের উজ্জ্বলতায় হীরক-দীপ্তি সম্পন্ন। এই প্রার্থনাটি যেন পৃথিবীবাসীর যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে। প্রার্থনাটি হল ঃ

"শোনো হে ব্রহ্মাণ্ড,
আমি লক্ষ লক্ষ বছবের হোবাস।
আমি রাজা আমি শাসক।
পাপ-মুক্ত আমি
পার হয়ে চলেছি
অসীম অনন্ত দেশকাল।"

আরো বহু উপদেশ আছে মৃতের পুঁথিগুলিতে। এগুলি মিশরের সেকালের সমাজ জীবনের কথা বলে। আবেকটি মূল্যবান উপদেশ হল ঃ "ছোট ভাইকে সব ধন

সম্পত্তি দিয়ে দিও না, তা হলে সে বড় ভাইকে অবজ্ঞা করবে, অমর্যাদা করবে সন্তানদের মধ্যে বিশেষ কাউকে বেশি স্নেহ বা আদর যত্ন করো না, কারণ তুমি জানো না বড় হয়ে কোনটি তোমার দেখা-শোনা করবে। স্ত্রীকে তার প্রেমিকের প্রতি আসক্ত দেখলে পরিবর্তে নতুন বিবাহ কর।"

হাইয়ারোগ্লিফেব আবও একটি অমূল্য উপদেশ ঃ "তুমি কিছু জানো বলেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করো না, ভেবো না তুমি জ্ঞানী। মূর্খ কিংবা জ্ঞানী সকলের কাছেই উপদেশ নাও। জ্ঞানের শেষ সীমার নাগাল পাওয়া যায় না এবং এমন কোনও শিল্পী নেই যে তার সমস্ত নৈপুণ্য নিয়েই জন্মেছে।"

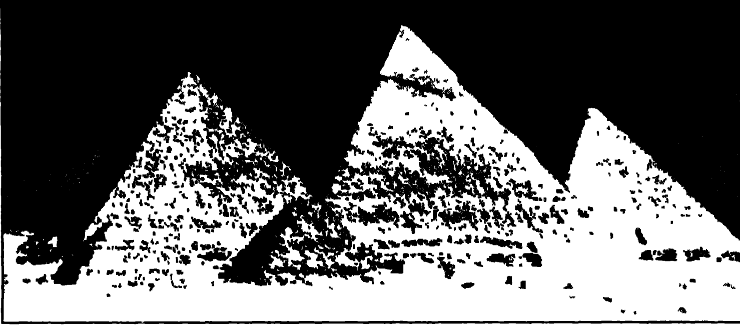
মিশরীয় পবিত্রলিপি বা হাইয়ারোগ্লিফের সমসাময়িক কিংবা তার একটু আগের কোনও লিপিব নাম কবতে হলে সুমের লিপির কথাই বলতে হয়। অর্থাৎ কীলকাক্ষর লিপির ব্যবহাব শুক হয হাইয়াবোগ্লিফের আগেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার কিছুটা প্রভাব হাইয়াবোগ্লিফেব উপর পড়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। মিশবীয পবিত্র লিপি মিশ্রবীতিতে লেখা। যদি এর উৎপত্তির মূল কোনও ধাব করা লিপি বা বর্ণমালা না হয় তবে এব উৎপত্তি হয়ে থাকবে চিত্রলিপি এবং ভাব-চিত্রলিপি থেকে। মিশরে এরকম কোনও প্রাচীন চিত্রলিপি বা ভাব-চিত্রলিপি আজও পাওয়া যায় নি, যা হাইয়াবোগ্লিফেব মূল উপাদান বলে চিহ্নিত হতে পাবে। মিশরে প্রথম থেকেই যা পাওযা গেছে তা ওই হাইয়ারোগ্লিফিক, যা একাধারে চিত্রলিপি, ভাব-চিত্রলিপি এবং ধ্বন্যাত্মক লিপিব সংমিশ্রণ। সুতরাং ধার কবা লিপি থেকেই হাইয়ারোগ্লিফেব উৎপত্তি এটা এখন সবাই মেনে নিয়েছেন। মিশবীয়দেব ধাব করা লিপির তত্ত্ব না মানলে ধবে নিতে হয় তাবা প্রথমে চিত্ররীতি অনুসরণ করতো এবং সবশেষে তাবা হাইযাবোগ্লিফ ব্যবহার কবতো। মিশরে কিন্তু এরকম স্তরে স্তরে লিপির বিবর্তনেব কোন নজিব আজও পাওয়া যায নি। প্রকৃতপক্ষে, তারা একই সঙ্গে চিত্রলিপি, ভাব-চিত্রলিপি ও ধ্বন্যাত্মক লিপি শুরু থেকেই ব্যবহার করেছে। লিপির এই মিশ্রণ এবং বিবর্তন ঘটেছে মিশবের বাইরে অন্য কোথাও, অন্য কোন দেশে। তারপব মিশরীযদের হাতে এর নানা বিবর্তন ঘটে। সুতবাং মিশর তার হাইয়ারোগ্লিফ সৃষ্টির জন্য কোনও বাইরেব দেশের লিপি ধার করেছিলো। কিন্তু তারা সুমেরীয় লিপি ধাব করে নি, এটা সুনিশ্চিত, কাবণ হাইয়ারোগ্লিফের লেখনভঙ্গি সুমেরীয লিপির বা কীলকাক্ষবেব লেখনভঙ্গিব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং মিশরীয়রা ধার কবেছিল তাদের লিপি অন্য কোন দেশের অন্য কোন লিপি থেকে। আব সে দেশ সম্ভবত ভারতবর্ষ এবং সে লিপিও সম্ভবত হরপ্পার লিপি, যা আজও অপঠিত।

মিশরতত্ত্ববিদরা যা বলছেন তা মেনে নিলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন মিশব কোন পরিবৃত্তি ছাড়াই একটা তৈরি সভ্যতা হাতে নিয়েই যেন উদিত হয়েছে। বিরাট বিরাট নগর, বিশাল বিশাল মন্দির, প্রকাণ্ড সব মূর্তি বিশাল বিশাল রহস্যময় পিরামিড, চমৎকার পথ শ্রেণী, নিখুঁত সব ভাস্কর্য ইত্যাদি নিয়ে যেন অনেকটা অলৌকিকভাবেই

গড়ে উঠেছে মিশরীয় সভ্যতা। আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদরা মনে করেন, পিরামিড নির্মাণকালে মিশরের লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি। ওই রকম একটা লোকসংখ্যা না থাকলে মিশরের পিরামিডগুলো বানানো সম্ভব হত না। অথচ হিসাব মতো ৫০০০ বছর আগে সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দু'কোটি। সুতরাং মিশরে পাঁচ কোটি লোক থাকার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া ওই দু'কোটি লোকের বেশির ভাগটাই ছিল হরপ্পা সভ্যতার লোকজন। সুতরাং ওই সময় মিশরের লোকসংখ্যা ছিল নগণ্য। আর তাদের দিয়ে পিরামিড ইত্যাদি তৈরি করাটা ছিল প্রায় অসম্ভব। অথচ এই সব প্রকাণ্ড সৌধ তৈরি হয়েছে প্রাচীন মিশর সভ্যতার কালে। এখন থেকে ৪৫০০/৫০০০ বছর আগে। আবার মিশর বেশ কয়েক হাজার বছর ধবে একই ধরনের স্থাপত্যবিদ্যারই অনুশীলন কবেছে। ষষ্ঠ রাজবংশের 'টেটি'-ব সমাধিতে আর প্রথম রামেসিসের সমাধিতে নির্মাণ কৌশলেব কোন তফাৎ নেই, অথচ তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য এক হাজাব বছবেবও বেশি।

এক শিঅপ্সেব পিবামিড নিয়েই পণ্ডিতবা শ'খানেক প্রশ্ন তুলেছেন। পিবামিডেব বহু বহস্য আজও অনির্ণীত। তাই পণ্ডিতরা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিরামিডের অভ্যন্তবে তাঁরা গবেষণাব জন্য 'বোবোট' পাঠাবেন। বিশেষ ধরনের এই বোবোট পিবামিডেব অনেক বহস্যেব সমাধান করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিঅপ্সেব পিবামিডেব কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল ঃ (১) শিঅপ্সের পিবামিডেব উচ্চতাকে যদি একশ' কোটি দিয়ে গুণ কবা হয়, তা হলে তা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বেব সমান, অর্থাৎ ৯,৩০,০০,০০০ মাইল হবে. (২) পিবামিডটির মাঝখান দিয়ে যদি একটা মধ্য বেখা [Meridian] টানা হয়, তা হলে তা মহাদেশ ও মহাসাগরগুলিকে সমান দু'ভাগে ভাগ কববে; (৩) এব ভূমিব ক্ষেত্রফলকে উচ্চতার দ্বিগুণ দিয়ে ভাগ কবলে পাওয়া যাবে সেই বিখ্যাত সংখ্যা π, অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত যাব মান ৩১৪১৫৯, (৪) যে পাথুরে জমির উপর এই পিরামিড স্থাপিত তাকে পুবোপুবি অনুভূমিক কবা হযেছিল (৫) পিবামিডটা যে শুধু মহাদেশ আর মহাসাগরগুলোকেই সমান দু'ভাগে ভাগ কবেছে, তাই নয়, সেটা আবার মহাদেশ গুলোর ভাব-কেন্দ্রে [Centre of Gravity] স্থাপিত, (৬) প্রায় ২৬ লক্ষ পাথবেব চাঙড়, যাদেব অধিকাংশেবই ওজন বাবো টন বা তারও বেশি, ব্যবহৃত হয়েছে শিঅপ্সেব ওই বিখ্যাত পিবামিডে, (৭) পিরামিডটিব উচ্চতা ৪৯০ ফুট এবং মোট ওজন ৩,১২,০০,০০০ টন।

মিশবে আবও অনেকগুলি এমনিতর পিরামিড আছে। তবে শিঅপ্সের পিরামিডটাই সেগুলিব মধ্যে আযতনে সবচেয়ে বড়। ফারাও খুফুর আমলেই এটা নির্মিত হয়েছিল বলে বলা হয়। সময়টা হল ২৫৭৫-২৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ওই সময় মিশরের চতুর্থ বাজবংশ [4th Dynasty] বাজত্ব করেছিল। এই রাজবংশের প্রথম রাজা স্নেফরু [Snefru]। তাঁব পুত্র ছিলেন খুফু [Khufu], যিনি শিঅপ্স [Cheops]



চিত্র ১৯

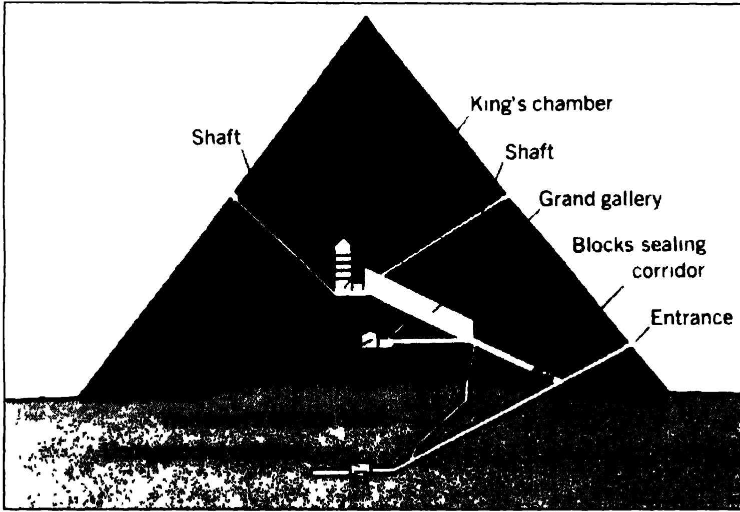
গিজাব তিনটি পিবামিড। বামদিকে বাজা মেংকাউবের [Menkaure] পিবামিড,মাঝে বাজা খাফ্রের [Khafre] পিবামিড এবং ডানদিকে দূবে খুফুব বা শিঅপ্‌সেব [Cheops] পিবামিড

নামেও পরিচিত ছিলেন। এই খুফুই বানিযেছিলেন ওই বিখ্যাত বিশাল পিরামিড। মিশরে এখন ৮০ টি পিরামিড বয়েছে। এদের বযস ৩০০০ বছর থেকে ৫০০০ বছর। শিঅপ্‌সের পিরামিড এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আয়তনে এবং রহস্যময়তায়ও। গিজাব পিরামিডগুলির মধ্যস্থলে দাঁড়িযে আছে খুফুর পুত্র খাফ্রের [Khafre] বা শেফ্রেনের [Chephren] পিবামিড। এটি শিঅপ্‌সেব পিরামিডেব চেযে সামান্য ছোট। তবে এর গঠন শৈলী আজও শিঅপ্‌সেব পিবামিডেব তুলনায অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

মিশর সভ্যতার অন্যান্য অবদানেব কথা বাদ দিলেও তার দুটি অবদান বিস্ময়কর। এই বিশাল বিশাল আয়তনের প্রস্তর নির্মিত পিবামিডগুলি সেকালের মিশর কেমন করে বানালো তা আজও বিস্ময়েব। সে সময যান্ত্রিক কলাকৌশল এ যুগের মত এতো উন্নত ছিল না। লোকজনও ছিল অনেক কম। তা সত্ত্বেও ওই সব বিশাল বিশাল পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। আজও মিশরে দাঁড়িযে আছে ৮০টি বিস্ময়কর সৃষ্টি—৮০টি পিরামিড। এছাড়াও আছে অতি বিখ্যাত ভাস্কর্য নারী-সিংহী বা স্ফিংসের [Sphinx] মূর্তি, আছে উত্তর মিশরেব আবু সিম্বিলে রাজা দ্বিতীয় রামেসিসের [খ্রীষ্টপূর্ব ১২৯০-১২৪০ অব্দ] নির্মিত মূর্তিগুলি এবং অন্যান্য ভাস্কর্য। 'মমি'গুলি হলো সংরক্ষিত মৃতদেহ। এগুলি হাজাব হাজাব বছর ধরে সংরক্ষিত হয়ে আছে পিরামিডগুলির মধ্যে অবিকৃতভাবেই। কিছু মমি অবশ্য একালে পিরামিড থেকে বের করে এনে পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সংরক্ষণ পদ্ধতি ওদের যথাযথ সংরক্ষণ করতে পারছে না। অথচ মমিগুলি পিরামিডের অভ্যন্তরে চার-পাঁচ হাজার বছর অবিকৃত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন পিরামিডের অভ্যন্তরে বহু রহস্য রয়েছে যার সমাধান আজও সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিদরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সে সব রহস্য সমাধানে। কিন্তু সফল হননি। সম্প্রতি তাই

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পিরামিডের অভ্যন্তরে রোবোট পাঠিয়ে তার ভিতরের রহস্যগুলির সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

মার্কিন সাহায্য নিয়ে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিকিরণ সন্ধানী অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরি করে তাকে একটা কম্প্যুটারের সঙ্গে যুক্ত করে বসিয়ে দিয়েছিলেন শেফ্রেনের পিরামিডের অভ্যন্তরে। সন্ধানী যন্ত্রের কাজ ছিল, মহাজাগতিক কণার (Cosmic Particles) হিসেব রাখা, আর কম্প্যুটারের কাজ ছিল সে হিসেবকে নথিভুক্ত করা। যে কণাগুলোকে পাথরের গাঁথুনি ভেদ করতে হয়, তাদের চেয়ে দ্রুততর বেগে ছোটে, ফাঁকা জায়গায় যে কণাগুলো দৌড়চ্ছে। কম্প্যুটার যে তথ্য প্রকাশ করল, তা ভুল। ১৯৭২ সালে আবার পরীক্ষা চালানো হল, কিন্তু সে পরীক্ষাও ব্যর্থ হল। যাঁর ওপর সে-পরীক্ষার ভার ছিল, সেই ডাঃ অম্‌ব্‌ গোহেদ্‌ টাইম্‌স্‌ পত্রিকার প্রতিনিধিকে বললেন



চিত্র ২০

শিঅপসের পিবামিডের অভ্যান্তব দৃশ্য। নিচেব Underground Chamber সম্ভবত বানানো হয়েছিল চোবদের ধোঁকা দেওযাব জন্য। কিন্তু Kings Chamber থেকে যে সুড়ঙ্গ পথ দুটি দু'দিকে উপরে উঠে গেছে, ওগুলি কেন বানানো হয়েছিল তাব কারণ আজও অজানা।

"বিজ্ঞানের সাহায্যে একাজ অসম্ভব। পিরামিডের ভেতরে যা ঘটে, তা আমাদের জানা পদার্থবিদ্যা এবং ইলেক্‌ট্রনিকবিদ্যার সমস্ত নিয়মবিরুদ্ধ!" এখন অবশ্য অনেক বেশি উন্নতমানের রোবট এবং তার সঙ্গে উন্নততর কম্পিউটার পাঠানো হচ্ছে পিরামিডের অভ্যন্তরে তার রহস্যগুলি সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়ে। দেখা যাক কী হয়।

খুফুর বা শিঅপসের পিরামিড তৈরি হয় প্রায় ৪৫০০ বছর আগে। এর প্রতিটি বাহু

৭৫৫ ফুট [২৩০ মিটার] এবং উচ্চতা ছিল ৪৯০ ফুট। এখন এর উচ্চতা ৪৬০ ফুট অবশিষ্ট আছে। প্রায় ২৬ লক্ষ বিশাল বিশাল অতিমসৃণ করা চৌকোণা পাথরের খণ্ড দিয়ে তৈরি হয়েছে এই বিশাল সমাধি সৌধ। প্রস্তর খণ্ডগুলির গড় ওজন ২১/২ টন বলা হলেও, এর অর্ধেকের বেশি সংখ্যক পাথরের প্রত্যেকটির ওজন ১২ টন কিংবা তারও বেশি।

"It is now thought that 100,000 men working only during the season of the Nile's flood could have completed the entire task in 20 years. The figures of 100,000 men and 20 years were first cited by Herodotus, the Greek historian who wrote about the pyramid more than 2,000 years after it was completed. His figures seem excessive unless much of the country's agricultural labour force was employed at this task only while their fields were in flood. Slave labour does not seem to have been a factor, but it is uncertain whether the main impetus for the workmen was service to their divine king or the chance of gainful employment in their off-season"

ঐতিহাসিকরা একথা বললেও একালের প্রযুক্তিবিদরা এ তত্ত্ব একেবারে মানেন না। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নাই। একালের প্রযুক্তিবিদরা মনে কবেন, শিঅপ্‌সের পিরামিডের এমন সব কারিগরী নৈপুণ্য প্রয়োগ করা হয়েছিল যাব ব্যাখ্যা আজও দেওযা সম্ভব নয়। সাবা পৃথিবীর অতি আধুনিক প্রয়োগ কৌশল হাতে নিযেও কোনও স্থপতি ওই পিরামিডের একটা দুর্বল নকলও আজ খাড়া করতে পারবে না, সে কথা হলফ করে বলা যায়। ছাব্বিশ লাখ পাথরের বিশাল বিশাল চাঙড় খনি থেকে কেটে তোলা, তাকে ছেঁচে ছুলে পরিষ্কার করা, সেখান থেকে বয়ে আনা, তারপর তাদের জোড়া দেওয়া এক ইঞ্চির হাজার ভাগের একভাগ বেধেব পলেস্তাবা দিযে— সব মিলিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ। এর উপর আছে মাটির নিচের অর্থাৎ পিরামিডের অভ্যন্তবের দরদালানে রং করা, ছবি আঁকা, মৃতের পুঁথি লেখা ইত্যাদি। সেই সব অতি পরিশ্রমী মজুরের দল যদি দৈনিক দশটি করে পাথবের চাঙড় পিবামিডের গায় লাগিযে থাকে তবে শিঅপ্‌সের পিরামিড শেষ কবতে তাদেব লেগে ছিল, ২,৬০,০০০ দিন অর্থাৎ প্রায ৭১২ বছর। সুতরাং পিবামিড কেমন কবে তৈবি হল তা আজও অব্যাখ্যাত — অন্ততঃ একালের প্রযুক্তিবিদদের কাছে।

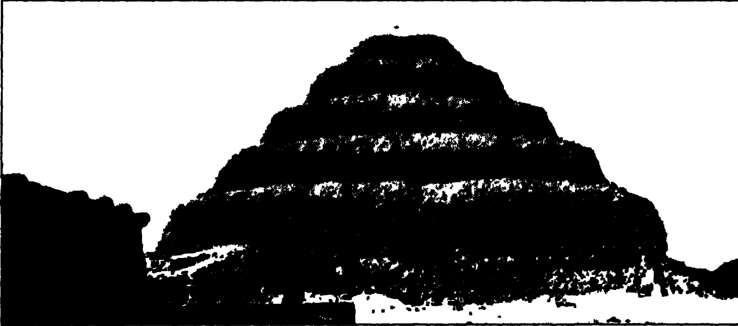
একদল প্রতুতত্ত্ববিদ আবার বলেছেন, শিঅপ্‌সের পিরামিড নাকি তৈরি হয়েছিল মহাপ্লাবনের আগে। তাঁরা বলছেন, "অক্‌স্‌ফোর্ডের বোডলেয়ান গ্রন্থাগাবে একখানা পুঁথি আছে। তার প্রণেতা, প্রাচীন মিশরী খ্রীষ্টান, মাস্‌-উদী লিখেছেন, 'মহান পিরামিড তৈরি করিয়েছিলেন মিশরের রাজা সুরিদ।' বলা হয়, বাজা সুরিদ মিশরে রাজত্ব

করেছিলেন মহাপ্লাবনের পূর্বে! সেই জ্ঞানী রাজা তাঁর পুরোহিতদের আদেশ দিয়েছিলেন, সমগ্র জ্ঞান ভাণ্ডার লিপিবদ্ধ করে পিরামিডের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে। অতএব, মাস্-উদীর পুঁথি অনুযায়ী এই পিরামিডটি তৈরি হয়েছিল প্লাবন-পূর্বকালে।

হেরোডোটাসও তাঁর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে এই রকম কথাই বলেছেন। থীবিসের পুরোহিতরা ৩৪১টা বিশাল বিশাল মূর্তি তাঁকে দেখিয়েছিলেন। ১১৩৪০ বছরের প্রাচীন প্রধান-পুরোহিত বংশের প্রত্যেক প্রধান পুরোহিত নিজের নিজের মূর্তি গড়িয়েছিলেন তাঁদের জীবদ্দশায়। হেরোডোটাস বলেছেন, পুরোহিতেরা তাঁকে সে সব মূর্তি দেখিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, পুত্রেরা পিতার ধারাই অনুসরণ করেছেন। হেরোডোটাসকে তাঁরা আরো বলেছিলেন, তাঁদের কথা মিথ্যা নয়, যেহেতু এই তিনশ' একচল্লিশজন পুরোহিতই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের ইতিকথা। আর তার পূর্বে 'দেবতারা' ছিলেন, মানুষেবই সঙ্গে। পুরোহিত বংশ শুরু হওয়ার পরে অবশ্য আর কোন 'দেবতা' মনুষ্যমূর্তিতে তাঁদের কাছে আসেন নি।'' যাইহোক, মাস্-উদীব পুঁথি, কিংবা হেরোডোটাসেব বিবরণ কতটা ঐতিহাসিকভাবে গ্রাহ্য তা বিতর্কেব বিষয়। পিরামিড কিংবা মমি নিযে বিতর্ক আজও চলছে। এ বিতর্কেব অবসান কবে হবে বলা মুশকিল। জানিনা, একবিংশ শতাব্দীর প্রস্তাবিত রোবট অন্বেষণ এই সব বিতর্কেব সমাধান করতে পারবে কি না।

রাজা দ্বিতীয় রামেসিস্ (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ১২৯০-১২৪০) দুটো মন্দির গড়িযেছিলেন, নীল নদের তীবে, উত্তব মিশরের আবু সিম্বিলে। বড়টাতে আছে রাজাব চাবটে মূর্তি, লম্বায় এক একটা ষাট ফুট। আসোয়ান বাঁধ তৈরি করার সময়ে নীলের জলধারার স্ফীতিব হাত থেকে মন্দিব দুটোকে বাঁচাবাব প্রশ্ন ওঠে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার ফলে 'উনেস্কো'র তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ ও শিল্পীসমূহের মিলিত চেষ্টায় মন্দির দুটোকে ঠাঁই-নাড়া করে ১৮০ ফুট ওপরে বসানো হয়। ঠাঁই নাড়ার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। তাবও আগে কয়েক বছর ধরে মাপ-জোখ, হিসেব-নিকেশ, আকা-জোখা তো ছিলই, তার ওপব ছিল নানা প্রাযুক্তিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন। অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি এলো, কিন্তু পরিবহনেব নানা যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও বিশাল সেই প্রস্তর দানবদের বযে নিয়ে যাবার জন্যই শুধু তৈরি করতে হল আরো অনেকগুলো। মূর্তিগুলোকে কেটে ফেলতে হল টুকরো টুকরো করে, কেন না, পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রেনেরও সাধ্য ছিল না সে দানবদের নড়াবার, ১৮০ ফুট ওপরে টেনে তোলা তো দূরের কথা। যাইহোক, কাটা টুকরোগুলোকে নম্বর দিয়ে তাদের নতুন জায়গায নিয়ে গিয়ে আবার জোড়া লাগানো হল। সে সময আধুনিক যন্ত্রপাতির বিরাট সমাবেশ যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা অবাক মনে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ছাড়াই সেই প্রাচীন মিশরীরা প্রকাণ্ড এই মূর্তিগুলি কেমন করে খাড়া করেছিল?' না হয় মানা গেল, এ মূর্তিগুলো তৈরি হয়েছিল আবু সিম্বিলের কাছেই গ্র্যানাইট কেটে, কিন্তু থীবিসের কাছে ৬০০ টন ওজনের মেম্ননের মূর্তিগুলো কেমন করে বয়ে আনা হয়েছিল তা আজও অজানা। এগুলি মিশরের প্রাচীন সভ্যতার বিস্ময়কর সৃষ্টি তথা অতুলনীয় অবদান।

মিশরের তৃতীয় রাজবংশের [২৬৫০-২৫৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] এক রাজা শিঅপ্‌সেরও আগে পিরামিড বানিয়েছিলেন। এই বংশের রাজা জোসের [King Djoser] ধাপ-পিরামিড [Step Pyramid] বানান। এই ধাপ পিরামিডই পরবর্তীকালে খাড়া পিরামিডে রূপান্তরিত হয়। প্রায় ৪৬৫০ বছর আগে নির্মিত এই ধাপ পিরামিড আজও সাক্করায় অটুট রয়েছে। শিঅপ্‌স পিরামিড ও সাক্কারার এই ধাপ পিরামিড সম্পর্কে প্রাচীন মিশরীয় খ্রীষ্টান লেখক আবুল হাসান মাস্‌-উদি তাঁর পুঁথি 'আকবরজ্জমান পাণ্ডুলিপি'-তে লিখেছেন ঃ "প্রাক-প্লাবন যুগের এক নৃপতি, নাম সুরিদ, দুটি পিরামিড নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর পুরোহিতকুলকে তিনি আদেশ করেছিলেন, তৎকালীন সমস্ত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উক্ত পিরামিড দুটিতে রক্ষা করতে। বৃহৎ পিরামিডের অভ্যন্তরে তাঁরা স্বর্গীয় গোলক, নক্ষত্র এবং গ্রহপুঞ্জের চিত্র, তাদের অবস্থান এবং আবর্তন এবং তৎসহ অঙ্কশাস্ত্র এবং জ্যামিতি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিহিত করলেন। এর উদ্দেশ্য, সে সব তথ্য যেন চিবকালের জন্য নিরাপদে রক্ষিত হয় এবং বুদ্ধিমান উত্তরপুরুষ তাদেব অর্থ সম্যক উপলব্ধি করে।" এই বিবরণ সত্য হলে ওই পিরামিড



চিত্র ২১
মিশরের সাক্কারায় ফারাও জোসের নির্মিত ধাপ-পিরামিড (Step Pyramid)
(২৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

দুটির নির্মাণকাল ১১,০০০ বছবেবও বেশি। কারণ, মহাপ্লাবনের কাল মোটামুটিভাবে ১১,০০০ বছরের সামান্য বেশি বলেই মনে করা হযে থাকে। এই সময়কাল নিযে ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট বিতর্ক বিদ্যমান। আবার এই সময়কাল সত্যি হলে মিশর সভ্যতার বয়স পিছিযে যায় আরও ৬,০০০ বছর।

খুফুর বা শিঅপ্‌সের পিরামিডের ১২,০০০ ফুট দক্ষিণ-পূর্বে একটা পাহাড় কুঁদে বানানো হয়েছে মিশরের বিশ্ব-বিখ্যাত স্ফিংসের [Sphinx] মূর্তি। স্ফিংস কথাটা গ্রীকভাষা থেকে নেওয়া। এর অর্থ হল এমন একটা প্রতিমূর্তি যার মুখটা মানুষের মত, কিন্তু শরীরটা পুরোপুরি সিংহের মত। স্ফিংস নামটা দেওয়া হয়েছে অনেক পরবর্তীকালে, মিশরে গ্রীক শাসনের আমলে। মিশরীয় সভ্যতার অতিবিখ্যাত স্ফিংসটি নির্মিত হয়েছিল ফারাও খুফুর পুত্র ফারাও খাফ্রের [Khafre] আমলে। এর নির্মাণকাল

৪৫০০ বছর আগের কোন সময়। এর মস্তকমণ্ডল ফারাও খাফ্রের, কিন্তু এর দেহাবয়ব পুরোপুরি সিংহের। খুফু তথা খাফ্রের পিরামিডের কাছেই এই স্ফিংসের অবস্থান। সম্ভবত এখানের বহু পাথর ব্যবহৃত হয়েছে পিরামিডে। অবশিষ্ট পাহাড়টা কুঁদে বানানো হয়েছে স্ফিংসের ওই বিশাল মূর্তি।

স্ফিংসের এই বিখ্যাত মূর্তিটির উচ্চতা ৫৬ ফুট [২১ মিটার] এবং এটি ২৪০ ফুট [৭৪ মিটার] লম্বা। এর নাকটাই ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি [১.৭ মিটার]। এর মুখ ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি [২.৩ মিটার] এবং বদনমণ্ডল ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি [৪.২ মিটার] চওড়া। পুরো মূর্তিটাই একসময় সুন্দর প্রলেপ দিয়ে ঢাকা ছিল। এখনও সে প্রলেপের কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া যায় স্ফিংসের গায়ে। ফারাও খাফ্রে তাঁব মূর্তিকে স্ফিংসের মাধ্যমে অমব করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি না কে ছিলেন সেই মহান ভাস্কর যিনি ফারাও খাফ্রের ইচ্ছার রূপাযণ ঘটিয়েছিলেন এমন অনন্য শৈল্পিক ভাবনায়, অনবদ্য শৈল্পিক বিকাশে। ফারাও খাফ্রে ওই শিল্পীর দৌলতে সত্যিই আজ অমব হয়ে গেছেন। এই আদি স্ফিংসেব অনুকরণে পরবর্তীকালে সারা মিশবে এবং গ্রীসে ও এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনেব স্ফিংসের মূর্তি নির্মিত হয়। মিশব সভ্যতার স্ফিংস ছড়িয়ে পড়ে সাবা পৃথিবীতে।

প্রাচীন মিশরে চাষবাস শুরু হয়েছিল প্রায ৭০০০ বছব আগে। সভ্যতাব বিকাশের তখনই শুরু। তবে 'মিশরীয় সভ্যতা' বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রকৃত শুরু ২৯২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ ৪৯২৫ বছব আগে। প্রায ৫০০০ বছব আগে শুরু হযেছিল মিশরীয় সভ্যতা। হবপ্পা সভ্যতার শুরু তার ২০০/৩০০ বছর আগে। হবপ্পা সভ্যতাব সামান্য পরে এসেছিল মিশরীয় সভ্যতা। সুমেব সভ্যতাও মিশর সভ্যতার সমসাময়িক। মিশরে প্রথম রাজবংশের [1st Dynasty] শুরু ২৯২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এব রাজত্বকাল চলে ২৭৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অবধি। এইভাবে মিশরে ৩০টি রাজবংশ রাজত্ব কবে ৩৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অবধি। অর্থাৎ প্রায় ২৬০০ বছর ধরে ৩০টি বাজবংশ রাজত্ব করেছিল প্রাচীন মিশরে। এই রাজবংশগুলি মিশব সভ্যতাব প্রবল উন্নতি ঘটিয়েছিল। যখন হরপ্পা সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কিংবা অন্য সভ্যতার সঙ্গে মিশে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, তখনও কিন্তু মিশরীয় সভ্যতা তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা কেমন করে ধ্বংস হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। হরপ্পা সভ্যতা অনেকাংশে ধ্বংস হয় বর্বর আর্যদের আক্রমণে। হরপ্পা সভ্যতা ও আর্যদের বর্বর সভ্যতার মিশ্রণে সৃষ্টি হয় 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা'। মিশরের সভ্যতা কিন্তু ২৫০০ বছরের বেশি টিকেছিল তার মহান প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে।

মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন মিনিস [Menes]। তিনি রাজা হন ২৯২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। আব ৩০তম রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন নেকটানেবো (২য়) [Nectanebo-II]। এঁর রাজত্বকাল ছিল ৩৬০-৩৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ৩৩৫ খ্রীষ্ট-

পূর্বাব্দ থেকে মিশর পারস্য শাসনের আওতায় আসে। এরপর গ্রীক এবং রোমকদেব শাসনাধীন হয় মহান মিশর সাম্রাজ্য।

প্রাচীন মিশরে বাজাই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজারা ছিলেন দেবতাদেব প্রতিভূ। তাছাড়া এক সময় পুরোহিততন্ত্রও খুব প্রাধান্য পেযেছিল। তবে মিশরের নগর সভ্যতা কিন্তু মেসোপটেমিয়া কিংবা হরপ্পার মত হঠাৎই গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা নগর সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়। প্রথম দিকে বাজতন্ত্রেব প্রবল প্রভাব থাকলেও, পরবর্তীকালে পুরোহিততন্ত্রের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। পুরোহিত ও রাজা মিলেই



চিত্র ২২
মিশরীয় ফারাওয়ের প্রস্তর মূর্তি

দেশ শাসন করতো। শুধু রাজাই নয় রাজার পাত্রমিত্ররাও বেশ ধনসম্পত্তি ভোগ করত। প্রজাদের অবস্থাও তেমন অসচ্ছল ছিল না। নীলনদের কল্যাণে মিশরে শস্য উৎপাদন যেমন বেশ ভালো হত, তেমনি বহির্বাণিজ্যেব কল্যাণেও মিশরে প্রচুব ধনসম্পদের আমদানি হত। মিশর প্রায় ২৫০০ বছব ধরে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল --কী অর্থনৈতিক দিক থেকে, কী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে।

মিশরীয় রাজবংশে রক্ত সম্বন্ধীয়দের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বাজবংশে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ চালু থাকলেও সাধারণ সমাজ জীবনে তা চালু ছিল না, বরং নিষিদ্ধই ছিল বলা যায়। ঐতিহাসিকরা বলছেন ঃ

"In urban and elite contexts the Egyptian ideal was nuclear family, but on the land and outside the central ruling group there is evidence for extended families. Egyptians were monogamous, and the choice of partners in marriage, for which no formal ceremony or legal sanction is known, did not follow a set pattern. Consanguineous marriage was not practiced during the Dynastic Period, except for the occasional marriage of a brother and sister within the royal family, and the practice may have been open only to kings or heirs to the throne. Divorce was in theory easy, but it was very costly. Women had a legal status only marginally inferior to that of men. They could own and dispose of property in their own right, and they hardly ever held administrative office but increasingly were involved in religious cults as priestesses or 'chantresses.' Elite married women held the title "Mistress of the House," the precise significance of which is unknown. Lower down the social scale they probably worked on the land as well as in the house.

The uneven distribution of wealth, labour, and technology was related to the only partly urban character of society, especially in the 3rd millennium BC. The country's resources were not fed into numerous provincial towns but instead were concentrated to great effect around the capital—itself a dispersed string of settlements rather than a city — and focused on the central figure in society, the king. In the 3rd and early 2nd millennia the elite ideal, expressed in the decoration of private tombs, was manorial and rural. Not until much later did Egyptians have pronouncedly urban values."

সুতরাং মিশরীয় সমাজে নারীদের স্থান ছিল বেশ উঁচুতেই। মিশরীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যে উন্নত মানের ছিল তা প্রাচীন মিশরের সামাজিক জীবনে নারীর স্থান থেকেই প্রমাণিত হয়।

মিশরের অষ্টাদশতম রাজবংশের [18th Dynasty] কালে এই সভ্যতার চরম উন্নতি ঘটে। এই সময় মিশরে ব্রোঞ্জ সভ্যতার বিকাশ ঘটে। ফারাও আহমোজ [Ahmose] মিশরের অষ্টাদশতম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে ঐতিহাসিকরা বলছেন। তাঁব রাজত্বকাল ১৫৩৯-১৫১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তিনি বিবাহ করেছিলেন নিজের বোন আহমোজ নোফ্রেটারীকে [Ahmose-Nofretari]। মহিষী হিসাবে তিনি যে শুধু বাজ্য শাসনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাই নয়, পরবর্তী ফারাও তাঁকে এতো সম্মানের চোখে দেখতেন যে তিনি নোফ্রেটারীর মূর্তি গড়িয়ে তাঁর পূজা করতেন। আহমোজ মিশর রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান প্যালেস্তাইন অবধি। হাইক্সোসদেব [Hyksos] তিনি মিশর থেকে তাড়িয়ে দেন। তাঁরই কৃতিত্বে গড়ে ওঠে এক বিশাল 'মিশব সাম্রাজ্য'। আহমোজেব পরে মিশরেব রাজা হন তাঁর পুত্র আমেন হোটেপ [১ম]। তাঁর রাজত্বকাল ১৫১৪-১৪৯৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই সময উত্তর সিরিয়ায় মিতান্নি [Mitanni] রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। আমেনহোটেপ (১ম)-এর সময় থেকে মিশবে 'আমন-রা' [Amon-Re] দেবতার পূজা-উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করে।

প্রথম আমেনহোটেপেব কোনও সন্তান না থাকায মিশরেব সিংহাসনে বসেন তাঁবই এক সেনাপতি থুতমোস [প্রথম] [Thutmose-1]। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৪৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তিনিও তাঁব নিজের বোন আহমোজকে [Ahmose] বিবাহ কবেন। এঁব সময় মিশব সাম্রাজ্যেব আযতন আরও বৃদ্ধি পায় এবং সর্বকালীন বৃহত্তম আকাব লাভ করে। এরপর থুতমোস [দ্বিতীয়] রাজত্ব করেন ১৪৮২ থেকে ১৪৭৯-খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। থুতমোস [দ্বিতীয়] যখন মারা যান তখন তাঁর বোন তথা স্ত্রীর একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল। রাণী হাতশেপসুত [Hatshepsut]-এর এই কন্যাটি তখন একেবারেই নাবালিকা শিশু। ফলে, দ্বিতীয় থুতমোসের উপপত্নীর সন্তান, যিনি আমনের মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে কাজ করছিলেন, তাঁকে করা হল মিশরের ফারাও। তিনি হলেন থুতমোস [তৃতীয়]। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৭৯ থেকে ১৪২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। অবশ্য এই ৫৩ বছরের মধ্যে রাণী হাতশেপসুত অন্ততঃ দুবার রাজ্যশাসন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। এ নিয়ে অবশ্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এই রাণীকে ঐতিহাসিকরা 'King's Great Wife' বলে বর্ণনা কবেছেন। অনেকে আবার বলেছেন, হাতশেপসুত হলেন 'Queen' এবং তৃতীয় থুতমোস হলেন 'King'। ফলে, হাতশেপসুত ও তৃতীয় থুতমোসের রাজারাণী হওয়ার ব্যাপারটায় বেশ কিছুটা গোলমাল রয়েছে। যাইহোক না কেন, তৃতীয় থুতমোসের সময় মিশরের নানাদিক থেকে প্রবল শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। থুতমোস [তৃতীয়] বহুবার এসিয়া আক্রমণ করেন। কাদেশ [Kadesh] জয় করেন। কিন্তু তিনি মিতান্নিদের পরাজিত করতে পারেন নি। তবে



চিত্র ২৩
আমেনহোটেপ (৪র্থ) বা আখেনাতনের প্রস্তর মূর্তি
(১৩৫৩-১৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)

ব্যাবিলোনীয়রা এবং অ্যাসিরীয়রা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি মিশরে সম্রাটের উপযোগী দৃঢ় শাসনব্যবস্থার প্রচলন করেন। মিশর সমৃদ্ধতর হয়। মিশরের বহু মন্দির তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

আমেনহোটেপ [২য়] [Amenhotep-II] থুতমোস [তৃতীয়]-এর পুত্র। মৃত্যুর দু'বছর আগে আমেনহোটেপকে রাজ সিংহাসনে অভিষেক করেন পিতা তৃতীয় থুতমোস। দ্বিতীয় আমেনহোটেপেব বয়স তখন সবেমাত্র ১৮ বছর। তাঁর রাজত্বকাল ১৪২৬-১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তিনি মিতান্নিদের পরাস্ত করেন। তাঁর পুত্র চতুর্থ থুতমোস [১৪০০-১৩৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] মিতান্নিদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখার চুক্তি করতে সমর্থ হন। চতুর্থ থুতমোসের পুত্র তৃতীয় আমেনহোটেপ [১৩৯০-১৩৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] মাত্র বারো বছর বয়সে রাজ সিংহাসনে বসেন। প্রথমে তিনি বিবাহ করেন যুদ্ধরথ বিভাগের সেনাপতির কন্যা 'তিয়' [Tiy]-কে। পরে মিতান্নি রাজকন্যা 'গিলুখেপা' [Gılukhepa]-র সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ৩১৭ জন মহিলা ফারাওয়র হারেমে আসে মিতান্নি রাজকন্যার সঙ্গে। ফলে, মিতান্নিদের সঙ্গে মিশরের শত্রুতা দূর হয়। এবপর মিতান্নিদের আরো একজন রাজকন্যা তৃতীয় আমেনহোটেপের হারেমে আসে। মিতান্নিদের সঙ্গে মিশবীযদেব বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়। আমেনহোটেপ [তৃতীয] তাঁব রাজত্বকালে মিশরের আযতন অনেক বাড়িযেছিলেন, মিশরের বহু সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। বিশাল বিশাল ভাস্কর্য, অট্টালিকাসমূহ তাঁব সমযেই নির্মিত হয়েছিল। বিখ্যাত মেমননের [Memnon] বিশাল মূর্তি তাঁর সময়েই নির্মিত হয়। তৃতীয আমেনহোটেপেব পুত্র চতুর্থ আমেনহোটেপ [১৩৫৩-১৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] বাজা হয়েছিলেন পিতাব মৃত্যুব পবেই। তিনি ছিলেন সূর্যদেব অ্যাটনেব [Aton] একনিষ্ঠ উপাসক। তাঁব পত্নী নেফাবতিতি [Nefertıtı]। তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তবিত করেছিলেন মিশব সাম্রাজ্যেব মাঝামাঝি স্থান আমাবনা-তে [Amarna]। ওখানে তিনি স্থাপন করেছিলেন এক বিশাল পবিকল্পিত নগরী। এঁব সময় ভাস্কর্যেব তথা বাস্ রিলিফের [Bas-Relıef] প্রবল উন্নতি হয। এঁব অন্য নাম ছিল 'আখেনাতন' [Ankhenaton]

নেফারতিতির ছয় মেযে। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। আখেনাতনের অন্য এক পত্নী কিযাব [Kıya] ছিল একটি কিংবা দুটি পুত্র সন্তান। অনেকে মনে করেন, আখেনাতনের কন্যা ম্যাকেতাতন [Maketaton] এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে মারা যান। আমারনা রাজ-সমাধিতে ম্যাকেতাতনের এই পুত্রেব সমাধিও আছে। ফলে, চতুর্থ আমেনহোটেপ বা আখেনাতনের উত্তরাধিকার পেল তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরিতাতন [Merıtaton]। এই বাজকন্যা কিংবা পববর্তীকালে তুতানখামেনেব [Tutankhamen] বিধবা স্ত্রী হিটাইটদেব [Hıttıte] বাজা 'সুপ্পিলুলিউমাস' [Suppilulıumas]-কে অনুরোধ পাঠান তাঁদের এক রাজপুত্রকে মিশবে পাঠাতে যাঁকে তিনি স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। মিশববাসীবা কিন্তু কোনদিনই বাইরের পুরুষ বা রাজপুত্রকে এনে তাদের রাণী কিংবা বাজকন্যার সঙ্গে বাজনৈতিক বিবাহ মেনে নিতে পারে নি। ফলে হিটাইটদের পাঠানো বাজপুত্রকে খুন কবা হয়।

আখেনাতনের পুত্র স্মেংখকাবে [Smenkhkare] রাজা হন ১৩৩৫ থেকে ১৩৩২

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অবধি। এরপর মাত্র নয় বছর বয়সে রাজা হন আখেনাতনের অপরপুত্র বিখ্যাত তুতানখামেন। রাজা হয়েই তিনি ওই বয়সেই বিবাহ করেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড় নেফারতিতির তৃতীয় কন্যা আংখেসেনপাতেনকে [Ankhesenpaaten]। রাজা হযে তিনি নিজেব পুরানো নাম 'তুতানখাতেন' কে বদলে রাখলেন 'তুতানখামেন' । রানীর নামও তিনি আংখেসেনপাতেন থেকে বদলিয়ে করেন 'আংখেসেনামেন' [Ankhesenamen]। তুতানখামেন মারা যান মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অর্থাৎ তাঁব রাজত্বকাল ছিল ১৩৩২-১৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। তাঁব পিরামিডে তাঁর মমি কবা মৃতদেশের সঙ্গে যে পরিমাণ সোনা-দানা, মণি-মাণিক্য পাওয়া গেছে, তার তুলনা নেই। আর এই অগাধ ঐশ্বর্যের সঙ্গে এই কিশোর বাজার সমাহিত হওযাব ঘটনাই তুতানখামেনকে একালে বিশ্ববিখ্যাত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, মিশবেব আব কোনও ফারাওযেব সমাধিক্ষেত্র থেকে এমন বিপুল ঐশ্বর্য আব কখনও পাওযা যায নি। ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদরা তুতানখামেনেব পিবামিডের অভ্যন্তবেব ঐশ্বর্যের পবিমাণ দেখে বিস্মিতই হয়েছেন। এই বিশাল ধন-সম্পদের সঙ্গে তুতানখামেনেব সমাহিত হওযাব ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায যে, তিনি যখন মাবা যান তখন মিশব অত্যন্ত সম্পদশালী ছিল। তাঁর শবাধাব নির্মিত হয়েছিল নিবেট সোনায়। তাঁব সমাধি কক্ষেব তৈজসপত্র সবই ছিল স্বর্ণনির্মিত এবং মণিমুক্তাখচিত। একেবাবে আধুনিক কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বলছেন যে, তুতানখামেনকে হত্যা কবা হযেছিল। আব তাঁকে হত্যা কবেন তাঁরই অনুচর 'আই' [Ay], যিনি মিশরেব পববর্তী ফারাও হন।

তুতানখামেনের মৃত্যুব পব মিশবেব বাজা হন 'আই' [Ay]। তাঁব রাজত্বকাল ১৩২৩-১৩১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এরপব মিশবেব ফাবাও হন 'হোরেমহেব' [Horemheb] তিনি ফারাও ছিলেন ১৩১৯ থেকে ১২৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ১২৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের অষ্টাদশতম রাজবংশ শেষ হয। এবপব শুরু হয মিশরেব ১৯-তম রাজবংশ। এই বাজবংশেব প্রথম ফাবাও ছিলেন বামসিস (প্রথম) [Ramses-']। তাঁব রাজত্বকাল ছিল ১২৯২ থেকে ১২৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—মাত্র দু'বছর। আগেই বলেছি, মিশরের চরম উন্নতি ঘটেছিল অষ্টাদশ বাজবংশেব রাজত্বকালে। এই রাজবংশের শাসন শুরু হয়েছিল ১৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং অষ্টাদশ বাজবংশেব শাসন শেষ হয়েছিল ১২৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। অর্থাৎ অষ্টাদশ বাজবংশেব বাজত্বকাল ছিল প্রায় ২৪৭ বছব। এই সময় সমগ্র মিশরের বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি এক বিশাল রূপ নেয়।

আগেই বলেছি, মিশরেব ইতিহাস শুরু হয খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে যখন মিশরীয় নৃপতি মিনিস [Menes] উত্তর ও দক্ষিণ মিশরকে একত্রিত করে এক যুক্ত-রাজ্য স্থাপন করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা [First Dynasty]। মিশরে তখন নবোপলীয় কৃষ্টিরই প্রাদুর্ভাব ছিল। এই নবোপলীয় সংস্কৃতি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৩৯ অব্দ অবধি অর্থাৎ অষ্টাদশ রাজবংশের প্রথম নৃপতি আহমোজ [Ahmose] বা

আইমোজ [Aimose]-এর সময় পর্যন্ত বজায় থাকে। যদিও খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের তামার কিছু কিছু প্রত্নদ্রব্য মিশরে পাওয়া গিয়েছে, তবুও প্রথম থেকে অষ্টাদশ রাজবংশ পর্যন্ত মিশরে উপলীয় সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। অষ্টাদশ রাজবংশ থেকেই মিশরে ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহার শুরু হয়।

মিশরে নবোপলীয় সভ্যতার সূচনা কীভাবে হয়েছিল তাব একটা আভাস পাওযা যায়, মিশরীয় পুবাণেব দেবতা অসিরিসের [Osiris] কাহিনী থেকে। সেই কাহিনী বলছে যে, মিশরের ওই নবোপলীয় সভ্যতা দেশজ সভ্যতা ছিল না। এটা ছিল আগন্তুক সভ্যতা। অন্য কোন দেশ থেকে মিশরে এসেছিল এই নবোপলীয় সভ্যতা। কেননা ওই কাহিনীতে বলা হয়েছে, দেবতা অসিবিসই মিশরে ভূমিকর্ষণ, পশুপালন ও কারিগরী শিল্পসমূহের প্রবর্তন করেন এবং সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হলে পুনবায় নিজের দেশে ফিবে যান। সেই কাহিনী আবও বলছে যে, অসিরিস যে দেশ থেকে এসেছিলেন সে দেশ মিশবেব পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল না, ছিল উত্তব দিকে। উত্তবদিকে এমন দেশ থেকে তিনি এসেছিলেন, যে দেশ কুযাশাচ্ছন্ন থাকতো এবং যে দেশ পর্বতমালাব দ্বাবা পবিবেষ্টিত ছিল। সেখানে একটা বড় হ্রদ ছিল এবং বহুসংখ্যক নদী ও সেচেব জন্য বহু নালা ছিল। পর্বতমালাব সীমানাব বাইবে একটি মরুভূমি ছিল। সে দেশে বহু কনিফার [Conifer] জাতীয় গাছ ছিল এবং একটি নল-খাগড়ায নির্মিত হলঘবে পরলোকেব দেবতা উপবিষ্ট থাকতেন। এই দেশ অবশ্য কোথায ছিল তা আজও নির্ণয কবা যায নি। সে দেশকে সনাক্ত করাও কঠিন। তবে প্রাচীন মিশবীযদের মধ্যে প্রচলিত নাগপূজা, প্রাচীন ভাবতেব তক্ষশিলাব সঙ্গে মিশবীযদেব সম্পর্ক সূচিত করে। কেননা ভাবতেব নাগদেবতাগণেব হাতে 'গজ' নামে যে দণ্ড থাকে তা ঠিক প্রাচীন মিশরীয দেবতা অসিবিসের হাতেব দণ্ডের মত ছিল।

উপলীয় সংস্কৃতিতে মিশব তার নৈপুণ্যের পবাকাষ্ঠা দেখিযেছে। প্রায ৪৭০০ বছব আগে ফাবাও জোসের [Djoser] বানিয়েছিলেন পাথবেব ধাপ-পিবামিড [Step Pyramid]। আবাব তাঁর পুত্র খুফু বা শিঅপ্‌স বানিযেছিলেন তাঁব বিশাল পিবামিড ২৬২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। মিশরে ব্রোঞ্জের প্রবর্তন হয প্রায ৩৫৫০ বছব আগে। অষ্টাদশ বাজবংশের প্রারম্ভে মিশরে ব্রোঞ্জের প্রবর্তন ঘটে জোবদারভাবেই। ব্রোঞ্জ তামা ও টিনেব সংকর ধাতু। মিশরের নিজের কোনও তামাব খনি ছিল না। তাই মিশরের ফারাওবা তামা কেনার জন্য সিনাই উপদ্বীপে [Sinai Peninsula] বাজকীয় অভিযানে পাঠাতেন তাঁদেব রাজপুরুষদের। আবারো বলি, ৩৫৫০ বছব আগেব মিশরে তামাব কিংবা ব্রোঞ্জের ব্যবহার খুবই সীমিত ছিল। মিশরের অষ্টাদশ বাজবংশের শুরু থেকে ব্রোঞ্জের ব্যবহার খুবই বেড়ে যায়। ফলে, মিশরে তামার চাহিদাও খুব বৃদ্ধি পায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আমাদের এই পশ্চিম বাঙলায় যে এক বিশাল তাম্রাশ্ম সভ্যতাব অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা আমরা খণ্ড খণ্ড আবিষ্কাবের ফলে জানতে পারি। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার অন্তর্গত আগাইবানিতে ৪০

ফুট গভীর মাটির তলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল তামার একখানা সম্পূর্ণ পরশু, এগারো খানা তামার বালা এবং খানকতক ক্ষুদ্রকায় তামার চ্যাঙারি। পুরাতত্ত্ববিদ দেবকুমার চক্রবর্তীর মতে এগুলি হরপ্পার পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক মানবগোষ্ঠীর। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বিনপুর থানার অন্তর্গত তামাজুড়ি গ্রামে (নামটা লক্ষণীয়) তাম্র-প্রস্তর যুগের অনুরূপ নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ওই জেলারই এগরা থানার চাতলা গ্রামে আরও ওই ধরনের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্শ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার কুলগড়া থানার হাড়া গ্রামেও কিছু কিছু ওই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার পাণ্ডিগাঁয়ে পাওয়া গিয়েছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল আগাইবানির ধরনের ৪৭টি তামার বালা ও পরশু। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতার পরিযান (Migration) পূর্ব-দিক থেকে পশ্চিম-দিকে ঘটেছিল।

এ সব নিদর্শন থেকে আমরা বুঝতে পাবি যে, সুদূব অতীতে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীবভূম-মেদিনীপুব অঞ্চল জুড়ে এক সমৃদ্ধিশালী তাম্রাশ্ম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। খণ্ড খণ্ড আবিষ্কারের ফলে আমরা সেই লুপ্ত সভ্যতাব মাত্র সামান্য কিছু আভাস পাই। আজ যদি আমরা, হরপ্পা, মহেঞ্জোদাবো, লোথাল, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানেব ন্যায় প্রণালীবদ্ধভাবে রীতিমত খননকার্য চালাই, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পাবব যে, তাম্রাশ্ম সভ্যতাব উন্মেষ বাঙলা দেশেই ঘটেছিল। সম্প্রতি আমেবিকাব পেনিসিলভেনিযা বিশ্ববিদ্যালযের পুবাতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর গ্রেগরী পযসেলও বলেছেন যে, ভাবতেব তাম্রাশ্ম সভ্যতাই জগতেব মধ্যে প্রাচীনতম।

সুদূব অতীতে বাঙালীরাই পারস্য উপসাগবের পথে সুমেব ও ভূমধ্যসাগবীয় দেশ-সমূহে যেত তামার পশরা নিযে। তারা লোহিত সাগরেব [Red Sea] পথে সিনাই উপদ্বীপের আন্তর্জাতিক হাটে নিযে যেত বাঙলার তামা। সিনাইয়ের এই হাট থেকেই মিশরীযরা বাঙালীদের কাছ থেকে তামা কিনতো। এমনিভাবে বাঙালীরা তামা বিক্রি কবতো সুমেবীযদেরও। সে কথা আগেই বলা হযেছে। সুতবাং মিশব এবং সুমেরের তাম্রাশ্ম সভ্যতাব প্রয়োজনীয তামা সরবরাহ করতো পশ্চিমবঙ্গের বীর বাঙালীরা।

মানবসভ্যতার প্রায় উন্মেষকাল থেকেই সোনা এবং তামা এই দুটি ধাতু ব্যবহৃত হচ্ছে। এব কারণ এই দুটিই নরম ধাতু। সেজন্য তামার ব্যবহার যখন প্রথম শুরু হয় তখন তামাকে হাতুড়ি দিয়ে পেটাই করে যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হত। পবে দেখা গেল তামার গলনাঙ্ক বেশ কম। মাত্র ৬৫০° সেলসিয়াস [১২০০° ফাবেনহাইট]। মিশবে মোটামুটি ৪৬০০ বছর আগে কিছু কিছু তামার ব্যবহার দেখা গেলেও ব্যাপকভাবে ব্রোঞ্জের ব্যবহার এখানে শুরু হয অষ্টাদশ রাজবংশের শুরু থেকে অর্থাৎ ৩৫৫০ বছর আগে। এরপর ১৫০০ বছর ধরে মিশর প্রায় ১০,০০০ টন তামা ব্যবহার করে। আগেই বলেছি, মিশর তার প্রয়োজনীয় তামা সংগ্রহ করত সিনাইযেব আন্তর্জাতিক বাজারে বাঙালী বণিকদের কাছ থেকে। তামাকে চুল্লীতে গলিয়ে মিশর নানা রকম তৈজসপত্র বানাতো গলানো তামাকে নানা ছাঁচে ফেলে।

প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে তামা ছিল এক অতি দুষ্প্রাপ্য বস্তু। মিশরে কোনও তামার খনি ছিল না। সে কারণে মিশরের ফারাওরা রাজকীয় অভিযান পাঠাতেন সিনাই উপদ্বীপে তামা সংগ্রহের জন্য। সংগৃহীত তামা রাখা হত রাজভাণ্ডারে। সেখান থেকেই তামা পরিবেশন করা হত শিল্পীদের মধ্যে। শিল্পীরা তাদের কাজকর্ম করতো রাজকীয় তত্ত্বাবধানে। রাজা যে কেবল শাসক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন প্রধান পুরোহিতও। শিল্পীরা বাজকীয় তত্ত্বাবধানে তামার বা ব্রোঞ্জের শিল্পকর্ম করতো মন্দিরের অভ্যান্তরস্থ চত্বরে। প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য রাজভাণ্ডারেই চলে যেত। সেখান থেকে সেগুলি বিতরিত হত রাজার অনুগ্রহভাজনদের মধ্যে। তবে সোনার জিনিস একমাত্র রাজা ও রাজ-পবিবারই ব্যবহাব কবত। তামা-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি বাজকীয় কাজেই ব্যবহৃত হত। বাজধানী মেম্‌ফিসের [Memphis] অভিজাত সম্প্রদায় সেগুলি ব্যবহার করতো। গ্রামেব লোকদের কিংবা সাধাবণ মানুষদের অধিকাংশই সেগুলো পেতো না। গ্রামেব লোকবা কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকতো। তাদের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি ছিল নবোপলীয যুগের মত কাঠের তৈরি। উৎপন্ন ফসলও রাজকীয় ভাণ্ডাবে চলে যেত। পবে সেগুলি বাজা প্রজাদেব মধ্যে প্রয়োজনমত বিলি করতেন। এই পবিবেশন প্রণালী একালের রেশনিং ব্যবস্থাব মতই ছিল।

আগেই বলেছি, মিশব ছিল নদী-বিধৌত দেশ। মিশবে একটাই নদী সেটা নীলনদ। মধ্য-আফ্রিকাব অভ্যন্তবস্থ কোন স্থান থেকে উদ্ভূত হয়ে পূর্বদিকে খানিকটা এসে নীলনদ সিধে উত্তবে প্রবাহিত হযে, প্রায দশ হাজাব কিলোমিটার পথ অতিক্রম কবে পোর্ট সৈযদ [Port Said] বন্দবেব কাছে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়ত। নীলনদেব বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এটা ছিল বৃষ্টিপুষ্ট নদী। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বব মাস পর্যন্ত বন্যাব জল এব উভযতীরস্থ ভূখণ্ডকে প্লাবিত কবত। বন্যামুক্ত হবার পরই চাষবাস শুরু হত। সেজন্য চাযেব জমি কবে বন্যামুক্ত হবে, সেটা ছিল মিশবীয় কৃষকদেব কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। নিবক্ষর ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়কে সেজন্য মন্দিবেব পুরোহিতদেব ওপব নির্ভব করতে হত। তারাই পঞ্জিকা তৈরি করত। আর পঞ্জিকা তৈরির জন্য তাদের জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে পারঙ্গম হতে হত। এটা জানার জন্য লিখনপ্রণালীর প্রচলন ছিল। তাদের ভাষা ছিল হ্যামিটিক (Hamitic)। লেখনী ছিল খাগের, আর যার ওপর লেখা হত, তা ছিল গাছের পাতা। তার নাম ছিল প্যাপিরাস (Papyrus)। এই Papyrus শব্দ থেকেই আমাদের Paper শব্দ উদ্ভূত হয়েছে।

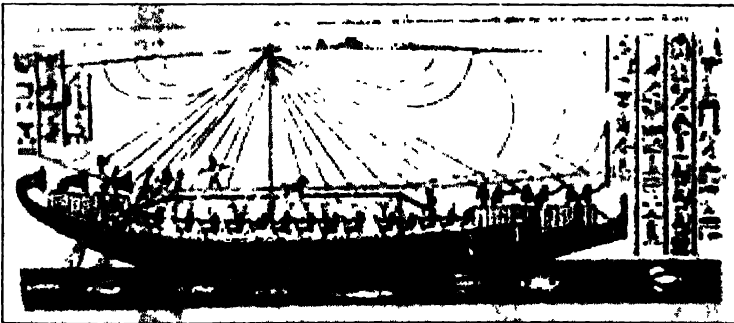
সৈন্যবাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া, প্রাচীন মিশরে তামা দিয়ে যে-সব যন্ত্রপাতি তৈরি করা হত, তার মধ্যে ছিল সূত্রধর ও স্বর্ণকার কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্র। আগে সূত্রধর ও স্বর্ণকাররা পাথরের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। তামার তৈরি যন্ত্রপাতি পাবার পর তাদের দক্ষতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পিরামিডসমূহের (Pyramids) মধ্য থেকে যে সব আসবাবপত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গেছে, তা থেকে প্রাচীন মিশরীয শিল্পীদের অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ধাতুনির্মিত

এই সব দ্রব্যের জন্য ওজন-পাল্লারও প্রচলন ছিল।

আবারো বলি, প্রায় ৩৫৫০ বছর আগে মিশরে ব্রোঞ্জযুগের সূচনা হয়। ব্রোঞ্জনির্মিত দ্রব্যসম্ভার মিশরীয় সভ্যতাকে নতুন গতি দিল। এই যুগে সোনার ব্যবহারও প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যায়। তুতানখামেনের [১৩৩২-১৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ] সমস্ত শবাধারটিই সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি নয় বৎসর বয়সে রাজা হন এবং মারা যান ১৮ বছরের সামান্য কিছুটা বেশি বয়সে। মিশবেব সেনাবাহিনী ব্রোঞ্জনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করার ফলে অনেক বেশি শক্তিশালী হযে ওঠে। শক্তিশালী মিশর তাদের সাম্রাজ্যের সীমানা সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করে।

হরপ্পা সভ্যতা ব্রোঞ্জের ব্যবহাব মিশবীযদের অনেকটা আগেই শুরু করলেও বর্বর আর্যদের আক্রমণ তারা প্রতিহত করতে পারে নি। আসলে হবপ্পাব লোকেরা ব্যবসাটা ভালো বুঝলেও সম্ভবত যুদ্ধবিদ্যাটা ভালো বুঝতো না। তাছাড়া বিশাল বিস্তৃত হবপ্পা সভ্যতায কোনও কেন্দ্রীয শাসন সম্ভবত ছিল না, ছিল না কোনও জোবদাব বাজতন্ত্র। ফলে, আর্যদেব হাতে খুব সহজেই পবাজিত হয় হরপ্পীযবা। কিন্তু মিশবে এক সুদৃঢ় রাজতন্ত্র থাকায় ব্রোঞ্জযুগে তাদেব বাজ্যবিস্তাবই ঘটেছে। প্রায ২৬০০ বছর ধবে মিশর তার আধিপত্য বজায বেখেছে। বহিঃশত্রু আক্রমণে তাদেব কোনও ক্ষতি হয় নি। উপবন্তু মাঝে মাঝেই মিশব সাম্রাজ্যেব আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সে যাইহোক, খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫০ অব্দেব পব মিশরে যখন ব্রোঞ্জ-সভ্যতার অভ্যুদয ঘটল সে সভ্যতা বাজা ও বাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র কবেই পল্লবিত হল। ব্রোঞ্জ-যুগে বাজাই সর্বেসর্বা ছিলেন এবং যেহেতু বাজাই ছিলেন প্রধান পুবোহিত ও ইহজগতে ঈশ্ববেব প্রতিভূ, সেই হেতু তাঁব দেহ ও গতিবিধি সবই পবিত্রতাব এক অসামান্য আভবণে মণ্ডিত ছিল।



চিত্র ২৪
প্রাচীন মিশরের রাজকীয় নৌ-বহর
(প্যাপিরাস চিত্র)

দূরদেশে যাবার জন্য রাজাব রত্নখচিত বিশেষ নৌকা ছিল। আর স্থলপথে কাছাকাছি কোন জায়গায় যাবার জন্য বাজা বারো-জন বাহক বাহিত এক জাঁকজমকপূর্ণ শিবিকা

ব্যবহার করতেন। চক্রযুক্ত যান তখন মিশরে আবিষ্কৃত হয়নি। সেজন্য চক্রযুক্ত যানের অভাবে শিবিকাই ছিল সে-যুগের দ্রুতগামী পরিবহন মাধ্যম। এইরূপ শিবিকায় চেপেই রাজা তাঁর করণীয় কৃষিকর্ম সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক কার্যাদি কৃষিক্ষেত্রে পালন করতে যেতেন।

আমরা আগেই লিখন-পদ্ধতির কথা বলেছি। মন্দির চত্বরের মধ্যেই লেখকদের জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে বসেই লেখকরা রাজকীয় সনদ ইত্যাদির লিখন সম্পাদনা করত। তবে আর এক জায়গাতেও লিখনের কাজ চলত। সে হচ্ছে রাজপ্রাসাদের মধ্যে। রাজপ্রাসাদের মধ্যে ছিল এক বিদ্যালয়। রাজপ্রাসাদের এবং অভিজাত সম্প্রদায়েব ছেলেরা সেখানেই লেখপড়া করত। সেখানে শিক্ষা দেওয়া হত লিখন, পঠন, পাটিগণিত ও জ্যামিতি। ব্যায়াম সম্বন্ধেও অনুশীলনের প্রথা ছিল। তা ছাড়া, ছাত্রদের পুরানো পুরাণ-কাহিনীসমূহও মুখস্থ করানো হত।

ধর্মের বিষয়ে মিশরীয়দের প্রায় দুই শত দেবদেবী ছিল। প্রতি দেবদেবীব সঙ্গে কোন না কোন জন্তু সংশ্লিষ্ট ছিল এবং প্রতিমা গঠনে দেবতাদের মুখ সেই সেই জন্তুর অনুকরণে তৈরি করা হত। একেবারে শুভ্রবর্ণ জন্তুই অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হত। তবে তাদের খাদ্যের অন্যতম উপকরণ ছিল গরু ও হাঁসের মাংস।

যদিও ব্রোঞ্জ যুগে মিশরেব রাজধানী থীবিস (Thebes) ও অন্যান্য শহরে এক অতি আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসময জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে উঠেছিল, গ্রামের লোকদেব জীবনচর্যা নবোপলীয় যুগের মানদণ্ডেব ঊর্ধ্বে ছিল না। তবে ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন ঘটছিল।

মিশর তার পিরামিড ও মমিগুলি নিযে এক বিস্ময়কর সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু তার সমৃদ্ধিতে অবদান যুগিযেছিল সমসাময়িক হরপ্পা সভ্যতা। অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে হরপ্পা সভ্যতা যে প্রভূত উন্নতি কবেছিল তার অনেকটাই সে দিয়েছিল সুমের ও মিশর সভ্যতার লোকজনদেব। আর নগর সভ্যতার কলাকৌশল সে অনেকাংশে শিখিয়েছিল ব্যাবিলোনীয় এবং মিশরীয়দের। তবে এটা ঠিক মিশরের পিরামিড এবং মমিগুলি আজও বিশ্বের বিস্ময। এগুলির রহস্য আজও সমাধান করা সম্ভব হয় নি। তবে চেষ্টা চলছে। হরপ্পা সভ্যতার সব কথা আমরা আজও জানিনা। জানলে হয়ত আমরা আরও ভালো করে বলতে পারবো মিশর সভ্যতায় হরপ্পা সভ্যতার অবদানের কথা।

মিশরের কথা শেষ করি একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে। ঐতিহাসিকরা বলছেন ঃ

"After the introduction of cultivated cereal crop, meat was eaten mainly by the wealthy. Domesticated animals lost much of their significance for nutrition, but they retained great cultural importance and practical value. Cattle may have been domesticated in northeastern Africa. The Egyptians kept many

as draft animals and for their various products, showing some of the interest in breeds and individuals that is found to this day in the Sudan and eastern Africa. The donkey, which was the principal transport animal (the camel did not become common until Roman times), was probably domesticated in the region. The native Egyptian breed of sheep became extinct in the 2nd millennium BC and was replaced by an Asiatic breed. Wool was rarely used, so that sheep were primarily a source of meat. Goats were more numerous than sheep and were commonly depicted browsing on tree foliage. Pigs, although subject to some sort of taboo, were raised and eaten. Ducks and geese were kept for food, and many of the vast numbers of wild and migratory birds found in Egypt were hunted and trapped. Desert game, principally various species of antelope and ibex, were hunted by the elite, it was a royal privilege to hunt lions and wild cattle. Pets included dogs. which were also used for hunting; cats (domesticated in Egypt), and monkeys. In addition, the Egyptians had a great interest in, and knowledge of, most species of mammals, birds, reptiles, and fish in their environment.

Most Egyptians were probably descended from settlers who came to the Nile Valley in prehistoric times, with increase coming through natural fertility. In various periods there were immigrants from Nubia, Libya. and especially the Near East. They were historically significant and may have contributed to population increase, but their numbers are unknown. Most people lived in villages and towns in the Nile Valley and Delta Dwellings were normally built of mud brick and have long since disappeared beneath the rising water table, thereby obliterating evidence for settlement patterns. In antiquity, as now, the most favoured location of settlements was on slightly raised ground near the riverbank, where transport and water were easily available and flooding was unlikely. Until the 1st millennium B.C. Egypt was not urbanized to the same extent as Mesopotamia. Instead, a few centres, notably Memphis and Thebes, attracted population and

particularly the elite, while the rest of the people were relatively evenly spread over the land. The size of the population has been estimated as rising from between 10,00,000 and 15,00,000 in the 3rd millennium B.C. to perhaps twice as many in the late 2nd millennium and 1st millennium B.C.

আগেই বলেছি, মিশরীয় সভ্যতা ধার করেছিল চাষবাস, ভাষা, লিপি, ধাতুর ব্যবহার, নাগবিক সভ্যতা, কিছু দেব-দেবী এবং সেচব্যবস্থা। এই সবের জন্য সে ঋণী মেসোপটেমিয়া কিংবা হরপ্পা সভ্যতার কাছে। কিন্তু পিরামিড ও মমি মিশর সভ্যতার অনন্য অতুলনীয় অবদান। এ কথা ঠিক যে, মায়া ও ইঙ্কাসভ্যতার লোকজনেরা কিছু ধাপ-পিরামিড বানিয়েছে, কিছু মৃতদেহ মমি করেও রেখেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কৃতিত্বের সিংহভাগই দাবী করতে পারে মিশর। পিরামিড ও মমিতে মিশর সভ্যতা সমসামযিক সভ্যতাগুলিব মধ্যে উন্নততম এবং অনন্য।

হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক আরেক সভ্যতা হল 'মায়া সভ্যতা' [Maya Civilization]। এই সভ্যতার আরম্ভকাল ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এর প্রাথমিক পর্যায় হল ২৬০০-৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অবধি। মধ্যপর্যায় হল ৯০০—৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং এর শেষ পর্যায় হল ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। এই সভ্যতাও সুমেব, মিশব ও হবপ্পার মত প্রাচীন এবং উন্নত সভ্যতা। তবে এই সভ্যতা হরপ্পার চেয়ে কিছুটা নবীনতব। হবপ্পা সভ্যতা যখন তার উন্নতিব চরমে উঠেছে প্রায় ৪৬০০ বছব আগে, সেই রকম একটা সময়ে গোড়াপত্তন হয়েছে মায়া সভ্যতাব।

মধ্য-আমেবিকার মেক্সিকো (দক্ষিণ অঞ্চল), গুয়াতেমালা, বেলাইজ, এল-সালভাদর এবং হন্ডুরাস জুড়ে এক প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যার নাম 'মায়া-সভ্যতা' (Maya Civilization)। মোটামুটিভাবে এই সভ্যতা ৪৫০০ বছর বা তারও বেশি পুরানো। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়দের আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। মায়াদের সভ্যতা ছিল উন্নত নগরভিত্তিক সভ্যতা। বিশাল বিশাল সৌধ নির্মাণে তারা ছিল যথেষ্ট পটু। তাদের কোন কোনও সৌধের উচ্চতা ২১০ ফুটেরও বেশি। এরা পিরামিড তৈরি করেছে মিশরীয়দের মত, চিত্রলিপিও এদের ছিল। নানা ধাতুপাত্র ও মৃৎপাত্র আশ্চর্য সব নকশা-খোদাই করে বানাতে এরা ওস্তাদ ছিল। তাছাড়া বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি বা প্রস্তর ফলকে সুন্দর সুন্দর রিলিফের কাজ এদের উন্নত সভ্যতার পবিচযই বহন করে। কিন্তু এই মায়ারা কোথা হতে এসেছিল তা অজানা। কিভাবে এই অত্যুন্নত সভ্যতার গোড়াপত্তন হলো তাও জানা যায়নি। অনেকে বিশ্বাস করেন, হিন্দু পুরাণের ময়দানবই এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। ময়দানব বহু পুরী নির্মাণ করার কৃতিত্বের অধিকারী। আর 'মায়া' কথাটার সঙ্গে 'ময়' কথাটার বেশ মিল। তবে এই বিশ্বাসের কোনও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি।

যাই হোক, মায়ারা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত

জাতি। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়রা যুকটান জয় করাব পর মায়াদের প্রাচীন পুঁথিপত্র সব তারা পুড়িয়ে দেয়। পাদ্রী দিয়েগো দ্য লান্দা [Bishop Diego de Landa] ১৫৭২ সালে লিখেছিলেন ঃ

'লিপি ও অঙ্কন সমন্বিত বহু পুঁথি আমরা পেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে কুসংস্কার, মিথ্যা ও পাপ ব্যাতীত অন্য কিছু ছিল না। সেইজন্য সেইসব গ্রন্থ আগুনে নিক্ষেপ করেছিলাম। কিন্তু মায়াগণ তাতে নিরতিশয় দুঃখ পেয়েছিল এবং ভীষণ মর্মাহত হয়েছিল।'' পাদ্রীসাহেব দয়া করে তিনটি মাত্র পুঁথিকে রেহাই দিয়েছিলেন। সেগুলি ভাঁজ করা ভূর্জপত্রে লেখা। তার বেশির ভাগই এখনও অপঠিত। যেটুকু জানা গেছে তাতে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। বিশেষ করে সময় সম্পর্কে মায়াদের ধারণা ছিল অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের। মায়াদের পঞ্জিকা ছিল অত্যন্ত নিঁখুত। তারা জানতো শুক্র গ্রহেব বছর হয় ৫৮৪ দিনে। পার্থিব বছর হলো ৩৬৫.২৪২০ দিনের। পঞ্জিকায় ওবা যা হিসাব রেখে গেছে তা ৬৪২ কোটি বছর অবধি চলবে। এমন কি ৪০ কোটি বছব অবধি এই পঞ্জিকা চালু থাকতে পারে বলে অনেকের অভিমত। তাদের মতে ৎস্‌লকিনের (Tzolkin) বছব ২৬০ দিনে, ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর আর শুক্রেব ৫৮৪ দিনে। মায়াবা বলে ৩৭,৯৬০ দিনে দেবতারা আসবেন পরম বিশ্রাম স্থলে। মায়াদের পঞ্জিকার শুরু নাকি ৩১১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এটা মায়া পুরাণের দাবী। সে পঞ্জিকাব আবর্তনকাল নাকি ৩,৭৪,০০০ বছর। মায়াদেব অট্টালিকাগুলি তৈবি হয়েছে এই পঞ্জিকা অনুসাবে। মাসেব প্রতিটি দিনেব জন্য তারা গড়েছে একটি কবে সিঁড়ি, প্রতিটি মাসের জন্য একটি বড় ধাপ, আব তাদের শীর্ষদেশের ধাপটি ৩৬৫তম দিনেব দ্যোতক, যেখানে তৈবি হয়েছে আসল মন্দির।

পঞ্জিকার নির্দেশেই যেন এই সব মন্দির তারা গড়ে তুলেছিল। চিচেন-ইৎসার নিবিড় অরণ্যে আছে মায়াদেব তৈবি মানমন্দির। দুটো প্রকাণ্ড চাতালেব উপর গোলাকার সেই অট্টালিকা উঠেছে জঙ্গলের মাথা ছাড়িযে। মায়া জ্যোতির্বিদবা চাঁদের কক্ষপথের হিসাব করেছিল চার দশমিক স্থান পর্যন্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা নকশা ও তথ্য আছে পূর্বোক্ত তিনটি উদ্ধার-প্রাপ্ত পুঁথিত্রে, যেগুলির অধিকাংশ আজও অপঠিত বা অব্যাখ্যাত।

আরও বড় কথা, যে সব মায়ারা এই অত্যুন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তারা নাকি খ্রীষ্টীয় ৮০০ অব্দ নাগাদ এই সব শহর ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যায় কেউ জানে না। স্পেনীয়রা যাদেব যোড়শ শতাব্দীতে ওখানে পেয়েছিল তারা সেই উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশিষ্ট মায়ারা নয়। এতো কষ্ট করে, এমন দৃঢ় করে, এতো সুন্দর করে মন্দির, চারুকলা মণ্ডিত পিরামিড, এমন সুন্দর সুন্দর মূর্তি দিয়ে ঘেরা নগরোদ্যান, এমন চমৎকার ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ ইত্যাদি দিয়ে এতো সুন্দর শহর যারা বানিয়েছিল, তাবা সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হঠাৎ কোথায় চলে গেল তার হদিস প্রত্নতত্ত্ববিদরা আজও দিতে পারেন নি। তবে এটা ঠিক মায়ারা তাদের এই সভ্যতা-

সংস্কৃতির অত্যুন্নত নিদর্শন, এই নগর ছেড়ে সবাই প্রায় ১,২০০ বছর আগে উধাও হয়ে যায় এবং তাদের একজনও আর ফিরে আসেনি। তারা যেন অনেকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়!

আগেই বলা হয়েছে, মায়া পঞ্জিকার শুরু হলো ৩১১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এটা মায়াপুরাণের দাবী। এটা সত্যি হলে মাযাসভ্যতা মোটামুটি ৫,০০০ বছরের পুরানো। এই সভ্যতা মিশর, হরপ্পার সমসাময়িক। মাযারা তখনই জেনেছিল ইউবেনাস ও নেপচুন গ্রহ দুটির কথা। মায়া পঞ্জিকা কত নিঁখুত তার একটু উদাহরণ দেওয়া যাক।

মায়াদের ব্যবহৃত সময় তালিকা এই রকম ঃ

২০ কিন = ১ উইনাল বা ২০ দিন

১৮ উইনাল = ৩৬০ দিন বা ১ টুন

২০ টুন = ৭২০০ দিন বা ১ কাটুন

২০ কাটুন = ১,৪৪,০০০ দিন বা ১ বাকটুন

২০ বাকটুন = ২৮,৮০,০০০ দিন বা ১ পিকটুন

২০ পিকটুন = ৫,৭৬,০০,০০০ দিন বা ১ কালাবটুন

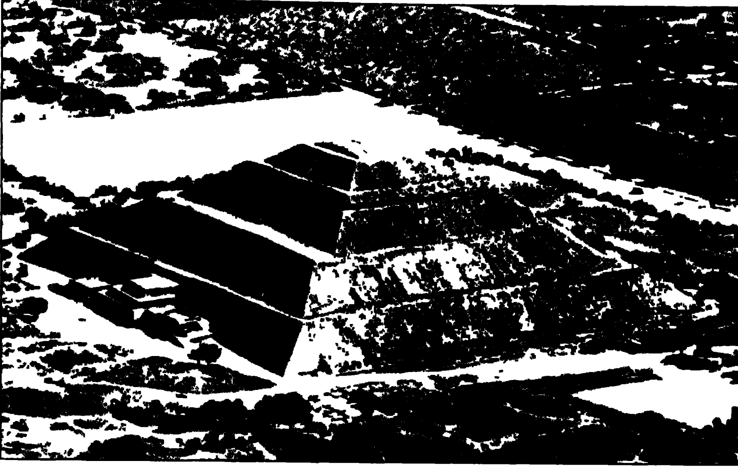
২০ কালাবটুন = ১১৫,২০০০,০০০ দিন বা ১ কিনচিলটুন

২০ কিনচিলটুন = ২,৩০৪,০০০০,০০০ দিন বা ১ আটাউটুন।

মায়ারা বিশাল সমযেব পবিমাপ যেমন জানতো তেমনি ক্ষুদ্র সমযেব পবিমাপও করতো অবিশ্বাস্য নিপুণতায। সৌর বৎসব এবং শুক্রেব বৎসব চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয কবেছিল প্রাচীন মাযাবা। তাবা চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্যগ্রহণেব সময় সঠিকভাবে নির্ধাবণ করতে পারতো। কোন বছব কটি সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে তা তাবা আগেই হিসাব করে বলতে পারতো। মাযা সভ্যতার সময়-ধাবণা হযতো আরও উন্নত ছিল এবং তা অনেকাংশে আধুনিক ধারণাব সমকক্ষও হযতো ছিল, কিন্তু মায়া পুঁথি সব পুড়িযে দেওযার ফলে এবং যে তিনটি উদ্ধাব পেয়েছে তারও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হওয়ার ফলে মায়াদের এই অত্যুন্নত সময় জ্ঞান সম্পর্কে আর কোনও তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

এতো গেল মায়াদের সময় ধাবণাব সমান্য নমুনা। সময় ধারণায় তারা অশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। বিশাল বিশাল সৌধ নির্মাণেও তারা কারোর চেয়ে কম ছিল না। একটু আগেই বলেছি তারা মিশবীযদের মত পিরামিডও বানাতো। তবে তাদেব পিরামিডগুলি ছিল মূলতঃ ধাপ-পিরামিড [Step Pyramid]। প্রায় তিন হাজার বছর আগে লা ভেন্তার [La Venta] ওলমেকে [Olmec] তারা নির্মাণ করে পিরামিড আকৃতির স্তূপ যার দৈর্ঘ্য ৩৯৪ ফুট [১২০ মিটার], প্রস্থ ২৩০ ফুট [৭০ মিটার] এবং উচ্চতা ১০৫ ফুট [৩২ মিটার]। মেক্সিকো শহরের কাছে তাদের বানানো গোলাকার পিরামিড আজও বিদ্যমান যার ব্যাস ৪৪৩ ফুট [১৩৫ মিটার] এবং উচ্চতা ৬৬ ফুট [২০ মিটার]। হুয়াকা দ্যেল সোল [Huaca del Sol] বলে পেরুর একটা

জায়গায় রয়েছে এদের তৈরি এক পিরামিড যেটি লম্বায় ৭৪৮ ফুট [২২৮ মিটার], চওড়া ৪৪৬ ফুট [১৩৬ মিটার] এবং এর উচ্চতা ১৩৫ ফুট [৪১ মিটার]। এইসব বিশাল বিশাল সৌধ তথা পিবামিড বানিয়েছিলো প্রাচীন মাযারা। তিওতিহুয়াকান জায়গাটা হল মধ্য-মেক্সিকো অঞ্চলে। সেখানে সূর্যমন্দিরের ভিত্তিভূমি হিসাবে মায়াবা



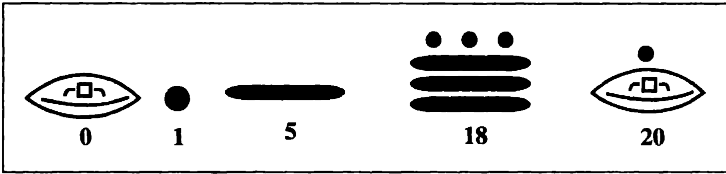
চিত্র ২৫

মেক্সিকোব তিওতিহুযাকানের [Teotihuacan] ধাপ-পিবামিড [Step Pyramid], যেটি ছিল মাযাদেব সূর্য-মন্দিবেব ভিত্তিভূমি

যে ধাপ-পিবামিড বানায তার আয়তনও বিশাল। এটি লম্বায ও চওড়ায় ৭০০ ফুট [২১৩ মিটাব] এবং উচ্চতায ২১০ ফুট [৬৪ মিটার]। তবে এই ভিত্তির উপর নির্মিত সূর্য মন্দিরটির অস্তিত্ব এখন নেই। চোলুলায [Cholula] একটা ভগ্ন পিরামিড আবিষ্কৃত হযেছে। এটিও মাযাদের দ্বাবা নির্মিত। এব মোট ওজন মিশবের শিঅপসেব পিরামিডের চেয়েও নাকি বেশি। অর্থাৎ এর ওজন ৩,১২,০০,০০০ টনেরও বেশি। এই সব বিশাল বিশাল পিবামিড ও অন্যান্য নানা সৌধ বানানোব কৃতিত্ব ওই মায়াদেরই।

ঐতিহাসিকরা না মানলেও, মাযাদের একটা পুবাণ কিন্তু বলে ১০,০০০ বছর আগে এদের একটা খুব উচ্চ পর্যায়েব সভ্যতা ছিল। প্রত্নবিৎসমাজ অবশ্য এই তারিখ নির্দেশ বিশ্বাস করেন না, বিদগ্ধজন কিন্তু তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন, কারণ আজো পর্যন্ত কেউ বলতে পারেন্নি, মাযারা কোথা থেকে এসেছিল, আর গেলই বা কোথায়? এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, মায়া-শহবগুলো যুদ্ধেও ধ্বংস হয়নি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও না, সেগুলো স্রেফ পরিত্যক্ত হয়েছিল। মায়ারা যেন উবে গিযেছিল। অমন 'চিরস্থায়ী' করে পাথর দিয়ে গড়া চমৎকার শহরগুলোকে কেন তারা ছেড়ে চলে গেল? এ কথাও প্রমাণিত সত্য যে, তথাকথিত প্রাক-ক্ল্যাসিকাল যুগের অস্তিত্ব ছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ পর্যন্ত, কিন্তু তার আগেকার আমল, প্রাচীন যুগ সম্পর্কে পণ্ডিতদেরও

যে কোন জ্ঞান নেই, একথা তাঁরা মানেন। যে সব ঐতিহাসিক তথ্য আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, খুব সম্ভব সে সব তথ্য ছিল দিয়েগো দ্য লান্দার পুড়িয়ে ফেলো পুঁথিসমূহেব ভেতবেই। পাদ্রীসায়েব দয়া করে তিনটি মাত্র পুঁথিকে রেহাই দিযেছিলেন। সেগুলো ভাঁজকরা ভূর্জপত্রে লেখা। পুঁথি তিনটে যেখানে যেখানে আছে, সেই সব জায়গার নামেই আজ তারা অভিহিত। একটার নাম ড্রেস্‌দেন-পুঁথি, দ্বিতীয়টির নাম প্যারী-পুঁথি আর তৃতীয়টির নাম মাদ্রিদ-পুঁথি। শেষোক্ত পুঁথিটির দ্বিতীয় নাম, 'ত্রো-কর্তেসিয়ানাস্'। বয়েসের কারণে লেখাগুলো হলদে হয়ে গেছে কিন্তু আজো তাদের বেশির ভাগই অপঠিত। পড়া গেছে শুধু তাদের সরল, সুন্দর অঙ্ক লেখার পদ্ধতিটুকু। সে লেখা হত, ফোঁটা আর দাঁড়ি দিয়ে। এক লিখতে ব্যবহার ব্যবহার করেছে একটা ফোঁটা আর ৩ লিখতে তিনটে। ৫ লিখতে ব্যবহার কবা হয়েছে একটি দাঁড়ি, ৭



চিত্র ২৬
মায়ারা যেভাবে সংখ্যা লিখতো

লেখা হয়েছে, একটা দাঁড়িব ওপবে দুটো ফোঁটা দিযে। তারা ১৮ লিখেছে, তিনটে দাঁড়িব ওপবে তিনটি ফোঁটা দিযে। মায়ারা আপেক্ষিক মান এবং শূন্যেব কথাও জানতো। 'ভাইজেসিম্যাল' পদ্ধতিও তারা ব্যবহার করতো। ভাইজেসিম্যাল পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখা হয় কুড়ির ভিত্তিতে। ২৩ লিখতে হলে এককেব জাযগায় লিখতো তিনটে ফোঁটা আর কুড়ির জায়গা একটা দাঁড়ি। ৫-এর দাঁড়ি আব ২০-ব দাঁড়ি চেনা শক্ত নয়। বেশি মানের দাঁড়ি লেখা হয় ৫-এব দাঁড়ির অনেকখানি ওপরে।

মায়াদেব পঞ্জিকা অবিশ্বাস্য রকম উচ্চ পর্যায়ের। সে পঞ্জিকার শুরু ৩১১৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দেব কোন একটি দিন থেকে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাপারে পণ্ডিতেরা বলেন, মায়াদেব আসল ইতিহাসের সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব এই রহস্যময় ৩১১৩ সালটির কোন সম্পর্ক নেই, ওটা নেহাতই প্রতীকমূলক, ইহুদিরা যেমন বলে 'পৃথিবী সৃষ্টির কাল থেকে' সেইরকম। ও কথারও যেমন কোন বিশেষ অর্থ নেই, এরও তেমনি, তেমন কোন অর্থ নেই। কোথা থেকে মায়ারা এলো, গেলই বা কোথায়, তাই যখন জানা নেই, তখন এমন ধরনের কথা কী করে নিশ্চয়ই করে তাঁরা বলেন? মায়া-পঞ্জিকা সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে। এটা ঘটনা যে, সে পঞ্জিকার আবর্তন-কাল সম্ভবত ছিল ৩,৭৪,০০০ বছর। আগেই বলা হয়েছে, মায়া-অট্টালিকাসমূহ তৈরি হয়েছে ওই পঞ্জিকা অনুসারেই। মাসের প্রতিটি দিনের জন্য তারা গড়েছে একটি কবে সিঁড়ি, প্রতিটি মাসের জন্য একটি বড় ধাপ, আর তাদের শীর্ষে, ৩৬৫ দিনের দিন তৈরি হয়েছে আসল

মন্দির। যেন মনে হয়, ধর্মপ্রেরণার খাতিরে তারা মন্দির গড়েনি, গড়েছিল, পঞ্জিকার নির্দেশ ছিল বলে। চিচেন্-ইৎসার নিবিড় অরণ্যে আছে জ্যোতির্বিদদের মানমন্দির। দুটো প্রকাণ্ড চাতালের ওপর গোলাকাব সে বাড়ি উঠে গেছে জঙ্গলেব মাথা ছাড়িয়ে। মায়া জ্যোতির্বিদরা চাঁদের কক্ষপথের হিসেব করেছিল চার দশমিক স্থান পর্যন্ত। তাদের পুবাণ বলে, তাদের দেবতারা আসতেন তাবা থেকে, ফিবেও যেতেন নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্রলোকেব সঙ্গে সেই দেবতারা যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

বিশপ দ্য লান্দার হাত থেকে যে তিনটি মায়া পুঁথি বক্ষা পেয়েছিল, যাব কথা একটু আগেই বলা হয়েছে, সে তিনটি সম্পর্কে এরিক ফন দানিকেন তাঁর 'আমার পৃথিবী' বইটিতে যা বলেছেন তা হল ঃ

"তিনটি মায়াপুঁথির মোট পত্রসংখ্যা আজো ২০৮। তাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিহ্ন-প্রতীকাদি দেখে এবং সে সবের নানাতরো সংযোগ-বিনাস দেখে বুঝি, তাদের বেশির ভাগই যে আজো অপঠিত, সে এমন কিছু আশ্চর্যেব কথা নয। পুঁথিব পাতাগুলোকে বক্ষা করা হয়েছে, কাচের জোড়া পাতের মাঝখানে বেখে। দ্রেস্‌দেন পুঁথিতে পাতা আছে ৭৪টা। জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানা হিসেব আছে তাতে, আর আছে চন্দ্র এবং শুক্রের গতির তালিকা। সংখ্যার পাশে পাশে প্রায়ই একটা সাপ আঁকা আছে আকাশে। সে-সাপ যুক্ত রয়েছে চাঁদের সঙ্গে আর সে জল ছিটোচ্ছে পৃথিবীতে। মানুযেব যে সব ছবি আছে, তাদের মাথায় জটিল শিবস্ত্রাণ আর মুখোশ, আর প্রায ক্ষেত্রেই পবনে তাদের ডুবুরীর পোষাকের মত পোযাক। ওবা কি মায়া-পুবোহিত, জন্তু-জানোয়ারের ওপর পরীক্ষা করছে? অবর্ণনীয় কত মূর্তি বয়েছে, আর হাতে তাদেব কত রকমের যন্ত্র। প্যারী-পুঁথিটি কিনেছেন, বিব্‌লিওত্যাক্ নাসিওনাল একজনেব ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে। সে পুঁথিটিও লেখা ভূর্জপত্রে। তাতে আছে ২২টি মাত্র অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পাতা। গত শতাব্দীতে সেটা এমনি অযত্নবক্ষিত ছিল যে এখন তার দুটি মাত্র পাতা রাখা আছে কাচের আধারে, সর্বসাধারণের দেখবার জন্য। সুখের বিষয় এইটুকু যে, ১৮৮৭ সালে সে-পুঁথির নকল করা হয়েছিল। প্যারী-পুঁথিতে আছে প্রধানত পঞ্জিকার ভবিষ্যদ্বাণী। মাদ্রিদ-পুঁথিটি আছে ম্যুজিও দ্য আমেরিকায়। তার ১১২টা পাতা জুড়ে আঁকা আছে বহু দেবমূর্তি নানা আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে। ছবিগুলি মনোমুগ্ধকর। হেন জিনিস নেই, যা সে সব পুঁথিতে নেই। ধূমপানরত দেবতার ছবি, ভোজনপাত্রের সামনে দেবতার ছবি, জিব ফুটো করে শাস্তি দেবার ছবি, চরকাব সামনে সর্পমুণ্ডবিশিষ্টা দেবীমূর্ত্তির ছবি, এমনি আরো কত ছবি।"

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গবেষণা করার সময় প্রত্নতাত্ত্বিক আলবের্তো রুথ ল্যুইয়ের মেক্সিকোর নিকটবর্তী পালেঙ্কে [Palenque]-এর 'অন্তর্লেখ মন্দির'-এ একটি সমাধিকক্ষ আবিষ্কার করেন। ধাপ-পিরামিডের সর্বোচ্চ ধাপের ওপর নির্মিত মন্দিরের একটি পার্শ্বকক্ষ থেকে স্যাঁতস্যাঁতে, পিচ্ছিল একসার সিঁড়ি নেবে গেছে ৭৫ ফুট নিচে—মাটিরও ছয় ফুট নিচে। সেই সিঁড়িগুলি এমনভাবে লুকানো ছিল

যে, মনে হয় গোপনকরার উদ্দেশ্য নিয়েই ওগুলি বানানো। তিন বছর ধরে সিঁড়ি পরিষ্কার কবার পব প্রত্নতত্ত্ববিদরা সিঁড়ির শেষে পেলেন ১৪ ফুট লম্বা এবং ৭ ফুট চওড়া একটি ঘর যার মেঝেটা একটি মাত্র পাথর দিয়ে তৈরি। এই ৯৮ বর্গ ফুট



চিত্র ২৭
মায়া সভ্যতার বিস্তৃতি

পাথরের পুরোটা জুড়ে রয়েছে একটা অপূর্ব বাস্ রিলীফ [Bas-Relief] ছবি পাথরে খোদাই করা। এর ব্যাখ্যায় প্রত্নবিদরা বলছেন, চিত্রে এক ইণ্ডীয় বসে আছে যজ্ঞবেদীর উপর, পবন দেবের কেশগুচ্ছ খোদিত রয়েছে আসনের পেছনে। ওঁদের মতে মায়া শহরগুলোতে এ ধরনেব ছবি প্রায়ই দেখা যায়। দানিকেন কিন্তু যথাযথভাবে এই বাস্ রিলীফের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, ওটা মহাকাশযান চালনবত এক নভশ্চরের ছবি। বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিতর্কিত।

আগেই বলেছি, মধ্য আমেরিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল মায়া সভ্যতা। এই মায়াদের পঞ্জিকার কথা আগেই বলেছি, পৃথিবী- মধ্যে সবচেয়ে নিঁখুত সে পাঁজি। তেমনি নিখুঁত মায়াদের আবিষ্কৃত শুক্রগ্রহ সম্ব-য় সূত্র। আজ প্রমাণিত হয়েছে, চিচেন-ইৎসা, টিকল, কোপান আর পালেঙ্কের প্রত্যেকটা অট্টালিকা তৈরি হয়েছিল বিরাট মায়া-পঞ্জিকা অনুসারেই।

প্রয়োজনের তাগিদে তারা পিরামিড গড়েনি, মন্দিরও গড়েনি প্রয়োজনের তাড়নায, গড়েছিল পঞ্জিকার নির্দেশ ছিল বলে। নির্দেশ ছিল, প্রতি বাহান্ন বছরে একটি অট্টালিকাব বিশেষ সংখ্যক সোপান গড়তে হবে। সেখানকার প্রতিটি পাথরের সম্পর্ক আছে সে পঞ্জিকাব সঙ্গে। প্রত্যেকটি অট্টালিকা তৈবি হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন না কোন সূত্রের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে।

কিন্তু একটা একান্ত অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাত। এত কষ্ট করে, এমন দৃঢ় করে তৈবি শহব, এত সুন্দব মন্দির, এমন চারু-শিল্পমণ্ডিত পিরামিড, এমন সুন্দর সুন্দর মূর্তি দিযে ঘেরা নগবোদ্যান, এমন চমৎকার ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ, সব ত্যাগ করে মাযারা চলে গেল হঠাৎ, যেন অকারণেই। তাবপর অরণ্য এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেললো সমস্ত। অট্টালিকা, মন্দির, পিরামিড, সব পবিণত হল বিশাল ধ্বংসক্ষেত্রে। একজনও আর ফিবে এলো না।

ধরা যাক, এই ঘটনা, সমস্ত জাতিজুড়ে এই গণ-অভিপ্রয়াণ, প্রাচীন মিশরেও ঘটেছিল। বংশ বংশ ধরে লোক গড়লো শহর, গড়লো মাঠ-মন্দির পিরামিড, গড়লো পথ-ঘাট, পঞ্জিকার নির্দেশে, তিথি-নক্ষত্র মেনে। খোদাই করলো অপূর্ব ভাস্কর্য অনেক পরিশ্রমে, তার আদিম ছেনি-হাতুড়ি দিযে। স্থাপন করলো জমকালো সব অট্টালিকা। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে করা কাজ যেদিন শেষ হল, সেদিন তারা সমস্ত নিঃশেষে ত্যাগ কবে চলে গেল বন্ধ্যা উত্তরে। এমনতরো ঘটনা আমাদের পরিচিত ইতিহাসের সঙ্গে মিললেও ব্যাপারটা এমনই হাস্যকর যে বিশ্বাসের একান্ত অযোগ্য। ঘটনা যত দুর্বোধ্য, তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও তত বেশি, আর বিকৃত ব্যাখ্যার সংখ্যাও ততোধিক। আগে বলা হত, মায়াবা বোধ হয় বিতাড়িত হয়েছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণে। কিন্তু যে-মায়ারা বসেছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির শীর্ষে, কে তাদের পরাজিত করবে? যুদ্ধ-বিগ্রহের চিহ্নও তো নেই কোনখানে। বরং যখন শোনা যায়, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণেই তাদের অভিপ্রয়াণ, তখন মনে হয়, যুক্তিটা ভেবে দেখবার মত। কিন্তু এ

যুক্তির স্বপক্ষেও কোন নজির চোখে পড়ে না। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য মায়ারা সবাই চলে গেল, কিন্তু ৩৫০ কিলোমিটার দূবের ইঙ্কারা যথাস্থানে রযে গেল। অথচ আবহাওয়ার উৎপাত এড়াতে এ দূবত্ব নেহাতই সামান্য। প্রচণ্ড মহামারীর কোপে পড়েই মায়ারা পালিয়েছিল, এ ব্যাখ্যাও কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তা ভেবে দেখতে হবে।

এ যুক্তি বহু যুক্তির একটা, এছাড়া এর আর কোন দাম নেই, কারণ এর স্বপক্ষে সামান্যতম প্রমাণও কোথাও নেই। আরও একটা ব্যাখ্যা শোনা যায়, ওদের নাকি এক পুরুষেব সঙ্গে আর এক পুরুষের যুদ্ধ হয়েছিল, ছোটরা বড়দের বিরুদ্ধে করেছিল বিদ্রোহ ঘোষণা। একথা সত্যি হলে, ধরে নেওয়া যায় জনসংখ্যাব একটা অংশ, অর্থাৎ পরাজিত যারা, তাবাই শুধু শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বিজয়ীদের সম্পর্কে তো সে কথা খাটে না, তাদের তো পুরোন জায়গাতেই জেঁকে বসে থাকবার কথা। কিন্তু,



চিত্র ২৮

বৃত্তাকার মায়াপঞ্জিকা। কার কাছ থেকে মায়ারা শিখেছিল জ্যোতির্বিদ্যা? অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানই বা তারা পেলো কোথা থেকে? পঞ্জিকাটিব বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার আকৃতির কি কোন সম্পর্ক আছে?

সারা অঞ্চলটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে, একটি লোকেরও পাত্তা মেলেনি। সমস্ত জাতটা অকস্মাৎ চলে গেল, না বলে, না কয়ে। তাদের পুণ্যভূমিকে অরক্ষিত ফেলে গেল অরণ্যের অন্ধকাবে। মোদ্দা কথা, মাযাবা শহবগুলি ছেড়ে সদলবলে কোথায় চলে গেল, কেন চলে গেল, তা আজও অজানা, অব্যাখ্যাত। তারা যেন হঠাৎই উবে গেল। ছেড়ে দিয়ে চলে গেল তাদেব এতো শ্রমে গ'ড়ে তোলা অট্টালিকাময়, মন্দিরময বিশাল বিশাল নগবী। মায়াদেব এই হঠাৎ হাওয়া হয়ে যাওযার কোনও ব্যাখ্যাই দিতে পারছেন না প্রত্নতত্ত্ববিদবা, ঐতিহাসিকরা এবং বিদগ্ধজনেরা।

চিচেনের মানমন্দির মায়াদের প্রথমতম এবং প্রাচীনতম গোল বাড়ি। সে বাড়ি মেবামত করার পরেও তাকে মানমন্দিব বলেই মনে হচ্ছে। গোল ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে সর্বোচ্চ পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ পর্যন্ত। গম্বুজে আছে নানাতবো ফাঁক-ফোকর, সোজা আকাশের তাবার দিকে খোলা। তাদেব ভেতব দিযে বাতের আকাশের একটা চমৎকার ছবি ফুটে ওঠে। বাইবেব দেযালে বরুণদেবেব মুখেব বিলিফ—আব একটা ছবি মানুষের, কিন্তু পিঠে তাব ডানা।

মায়াদের পঞ্জিকাব শুরু ৩১১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে। এমনও হতে পারে ওই সময থেকে মায়া সভ্যতার শুরু। হবপ্পা সভ্যতাবও শুরু ৫৩০০ বছব আগে। মিশর সভ্যতার শুরুও প্রায় ৫০০০ বছর আগে। আব সুমেব সভ্যতাব বযসও ৫০০০ বছবের সামান্য বেশি। সে বিচাবে হবপ্পা, সুমেব, মিশব ও মাযা সভ্যতাসমূহ সমসাময়িক।

উন্নত মাযা সভ্যতায পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে দানিকেন কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন, যেগুলিব উত্তর পণ্ডিতদেব আজও অজানা। প্রশ্নগুলি হল ঃ

''—মাযাবা ইউরেনাস আব নেপচুনেব কথা জানলো কেমন কবে? চিচেনেব মানমন্দিরেব পর্যবেক্ষণ-মঞ্চ আকাশেব উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলোব দিকে ফেবানো নয কেন? পালেঙ্কেব বকেট চালক 'দেবতা' কী বলতে চায? মায়াদেব পাঁজিতে যে চার কোটি বছরের হিসেব বয়েছে, তাবই বা কী উদ্দেশ্য? সৌব এবং শুক্র বৎসরের চাব দশমিক স্থান অবধি হিসেব কবতে কাব কাছে শিখেছিল তারা? কে তাদেব দিলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অমন বিরাট অকল্পনীয জ্ঞান? এ সবই কি মায়া-মগজের উদ্ভট খেযাল? নাকি, তাদেব প্রতিটি বস্তু, অথবা তাদের সব কিছু এক সঙ্গে দূর কোন ভবিষ্যের জন্য বৈপ্লবিক কোন বাণী রেখেছে লুকিয়ে, যে-ভবিষ্যের কাল নির্দেশ করছে তাদের ওই পঞ্জিকা?''

আগেই বলেছি জ্যোতির্বিজ্ঞানে মাযাবা প্রবল ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। মায়াদের ক্যালেণ্ডার বা পঞ্জিকা তাই জটিল, সূক্ষ্ম, সুদূরপ্রসাবী এবং অত্যন্ত সঠিক। বলা হচ্ছে "It is extremely accurate and the calculation of Maya priests wére so precise that their claculator correction is 10,000th of a day more exact than the standard calendar the world uses today.

Of all the ancient calender systems, the Maya and other

Mesoamerican systems are the most complex and intricate. They used 20-day month, and had two calender years : the 260-day Scared Round, or *Tzolkin*, and the 365-day Vague Year, or *haab*, These two calendars coincided every 52 years. The 52-years period of time was called a '*bundle*' and meant the same to the Maya as our century does to us.

The Sacred Round of 260 days is composed of two smaller cycles : the numbers 1 through 13, coupled with 20 different day names. Each of the day names is represented by a god who carries time across the sky, thus marking the passage of night and day. The day names are Imix, Ik, Akbal, Kan, Chicchan, Cimi, Manik, Lamat, Muluc, Oc, Chuen, Eb, Ben, Ix, Men, Cib, Caban, Eiznab, Cauac, and Ahau. Some of these are animal gods, such as Chuen (the dog), and Ahau (the eagle), and archaeologists have pointed out that the Maya sequence of animals can be matched in similar sequence to the lunar zodiacs of many East and Southeast Asian civilizations."

এসিয়ার আদি সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা। তার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভাব মায়াদের ওপর কোনওভাবে পড়তেও পারে। তবে হরপ্পার লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া অবধি এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল।

মায়ারা ২৬০ দিনের পঞ্জিকা ব্যবহার করতো দেবতাদের পূজাপার্বণের জন্য, ভবিষ্যৎ গণনার জন্য, পবিত্র দিন গণনার জন্য, যুদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজনে। ৩৬৫ দিনের বৎসর মায়ারা ব্যবহার করতো আমরা একালে যেমন ভাবে আমাদের সৌর ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করি অনেকটা তেমনভাবেই। ৩৬৫ দিনে থাকতো ২০ দিনের ১৮টি মাস এবং অতিরিক্ত পাঁচটি দিন। এই পাঁচটি দিন ছিল দুর্ভাগা। একে মায়ারা বলতো 'উয়ায়েব' [Uayeb]। ৩৬৫ দিনের বছরকে ওরা বলত 'Haab'।

"The Vauge Year or *haab* of 365 days is similar to our modern calendar, consisting of 18 months of 20 days each, with an unlucky five-day period at the end. The secular calender of 365 days had to do primarily with the seasons and agriculture, and was based on the solar cycle. The 18 Maya months are known, in order, as : Pop. Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xuc, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, Maun, Pax, Kayab, and Cumku. The unlucky five-day period was known as *uayeb*, and was considered an

ominous time which could precipitate danger, death and bad luck."

মায়া পঞ্জিকার শুরু ৩১১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। ওদের মতে একটা সৃষ্টি-চক্র ৫২০০ বছরের। সে অনুসারে মায়াদেব পরবর্তী সৃষ্টি চক্র শুরু হবে ২০৮৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। আবার মায়াদের কিছু সৌধ আছে যেগুলি ৯ কোটি বছরের পুরানো কোনও ঘটনার কথা বলে। তেমনি মায়াদের পঞ্জিকা ৩০০০ বছর ভবিষ্যতের কথাও বলে। মায়ারা জ্যোতিষেও বিশ্বাস করতো। তারা পঞ্জিকাগুলি বানিয়েছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষবিদ্যার নিযম মেনেই।

"The Calender also predicted the future, as our astrological zodiac does. For example, the Maya believed that a person's birthday or day-sign determined their fate through life. The newborn child was thus connected with a particular god, and remained under that god's influence. Some gods were more auspicious than others, and a child born under a well-wishing god was considered lucky. A child born under a less kind deity had to ensure throughout his or her life that the god was propitiated—especially during vulnerable periods like the unlucky *uayeb* of the solar year."

মাযাদেব পঞ্জিকাই বলে দেয় মায়ারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রবল ব্যুৎপত্তি অর্জন কবেছিল। মাযাদেব নগর, মন্দিব, ধর্মীয় সৌধ ইত্যাদি বানানো হয়েছিল কম্পাসের দিক-নির্দেশ মেনেই। মন্দিরগুলি এমনভাবে বানানো হযেছিল যে, বাসন্তী বিষুবে [Vernal Equinox] এবং শারদ বিষুবে [Autumnal Equinox] সূর্যেব অবস্থানকালে সূর্যালোক মন্দিরের দেবতার মুখের উপর এসে পড়তো।

"In Maya cities, ceremonial buildings were precisely aligned with compass directions. At the spring and fall equinoxes, for example, the Sun might be made to cast its rays through small opening in a Maya observatory, lighting up the observatory's interior walls.

Other alignments might relate to the exteriors of temples and palaces. The Most famous example of this kind of alignment can be observed at Chichen Itza, the principal Maya city of the Yucatan Peninsula. People still gather there each year, as they have for centuries, to observe the sun illuminate the stairs of a pyramid dedicated to Quetzalcoatl, the Feathered Serpent god. At the Vernal and Autumnal equinoxes, the Sun gradually illuminates the Pyramid stairs and the serpent head at its base, creating the image of a snake slithering down the sacred mountain to Earth."

মায়ারা তাদের প্রত্যেকটি শহরে একটি করে মানমন্দির নির্মাণ করেছিল গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য। মায়ারা কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং শুক্রগ্রহের নানান পর্যবেক্ষণ করেছিল। আগেই বলেছি, তারা শুক্রের বছর যে ৫৮৪ দিনে তা নির্ণয় করেছিল। শুধু তাই নয়, তারা সৌর এবং শুক্রের বৎসরের চার দশমিক স্থান পর্যন্ত হিসাব করতেও শিখেছিল। তারা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেরও পর্যবেক্ষণ করতো। তবে কেন জানিনা, তাবা কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং শুক্রগ্রহের পর্যবেক্ষণের উপর অনেকটা বেশি জোর দিয়েছিল। মায়াদের এই শুক্রগ্রহ প্রীতি সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন ঃ

"The planet Venus was particularly significant to the Maya; the important god Quetzalcoatl for example, is identified with Venus, The Dresden Codex, one of four surviving Maya chronicles contains an extensive tabulation of the appearances of Venus, and was used to predict the future. The Maya also went to war by the sky, again triggered by the planet Venus, Venus war regalia is seen on stelae and other carvings, and raids and captures were timed by appearances of Venus, particularly as an evening 'star' Warfare related to the movements of Venus was, in fact, well established throughout Mesoamerica."

মায়াবা গ্রহণেব কাল নির্ণয কবতে পাবতো। চান্দ্রকল্প বা স্যারোস [Saros] সম্পর্কেও মায়াদের সঠিক ধারণা ছিল। গ্রহগুলিব গতিবিধিও মায়াদেব ভালোভাবেই জানা ছিল। তাবা অবশ্য এই গতিবিধি দেবতাদের অবদান বলেই মনে কবতো। জগতের যান্ত্রিকতাব কোনও ধারণাই তাদের ছিল না। দেবতারাই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের নিযন্ত্রণকাবী।

"The Maya believed that the gods guided the Sun and Moon across the sky Even in the darkness of night, the Maya believed that the Sun and Moon continued to journey through the Underworld, threatened all the way by evil gods who wanted to stop their progress. For this reason, the Maya believed that the heavenly bodies needed human help, which was provided through sacred rituals such as self-mutilation, torture, and human sacrifice. To the Maya, offering this help was simply the price to be paid for the continued survival of the universe. Death from such rituals was a privilege, and conferred immortality on those who died, or who offered themselves as victims."

মায়ারা দশমিক পদ্ধতির হিসাব জানতো। তবে তারা 'Decimal' পদ্ধতির ব্যবহার

না করে 'Vigesimal' পদ্ধতি ব্যবহার করতো। অর্থাৎ ১,১০,১০০, ১০০০, ১০,০০০ ইত্যাদির ব্যবহার না করে তারা ১, ২০, ৪০০, ৮০০০, ১,৬০,০০০ ইত্যাদি ব্যবহার করতো। ২০-র এই গুণিতক যে পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় তার নাম Vigesimal System। মায়ারা এই পদ্ধতিই ব্যবহাব করতো। ২০ সংখ্যাটাকে মায়ারা সবচেয়ে পবিত্র সংখ্যা বলে মনে করতো। মায়াদের কাছে অন্যান্য পবিত্র সংখ্যা হল, ১৩, ৫২, ৪০০।

আগেই বলেছি, মায়া সভ্যতাব বিকাশ ঘটেছিল মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, বেলাইজ, হণ্ডুরাস এবং এল সালভাদবেব বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। অনুমান করা হয়, মায়ারা সম্ভবত উত্তর আমেরিকা থেকে গুযাতেমালাব উঁচু জাযগাতে এসে বসতি স্থাপন কবেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০ অব্দে। ওলমেক [Olmec] সভ্যতার উত্তরসূরী বলে মনে করা হয মায়াদেব। কিন্তু ৪৬০০ বছব আগে এই অত্যুন্নত সভ্যতার গোড়াপত্তন কী ভাবে হযেছিল তা অজানা। আবাব ১২০০ বছব আগে মায়াবা কোথায় চলে গেল তাও অজানা। সবই কেমন যেন বিস্ময়েব।

মায়াদেব বাজ্যের আয়তন ছিল প্রায ১,২০,০০০ বর্গ মাইল বা ৩,১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার। তাদেব রাজ্যে অনেকগুলি নগব যেমন ছিল, তেমনি ছিল বহু গ্রাম, পাহাড-জঙ্গল। প্রত্নতাত্ত্বিকবা আগে মনে কবতেন মায়া সভ্যতায় কোনও শহব ছিল না। এটি একটি কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা। এখন নানা প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণায জানা গেছে মাযা সভ্যতা ছিল উন্নত নগর-ভিত্তিক সভ্যতা। গুযাতেমালাব টিকাল [Tikal] এবং অন্যান্য স্থানে উৎখনন চালিযে মায়া সভ্যতার বেশ কিছু নগর আবিষ্কৃত হযেছে। প্রসঙ্গতঃ টিকালেব কথাই ধরা যাক। পেনসিলভেনিযা বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক উইলিয়াম কোযেব [William R. Coe] নেতৃত্বে একদল প্রত্নবিদ গবেষক টিকালে উৎখনন চালিযে এবং নানা পবীক্ষা নিবীক্ষা কবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন যে, টিকাল এক উন্নত নগব। মাযাদেব এই নগবের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অন্ততঃ ৩০০ টি বিশাল সৌধ এবং কম করে ৩০টি ভাস্কর্যমণ্ডিত শেন্দ্রস্তম্ভ [Stelae]। টিকালেব এক এবং দু'নম্বব মন্দির দুটি ছিল একেবারে নগবের কেন্দ্রস্থলে। প্রথম মন্দিরটির উচ্চতা ১৪৪ ফুট [৪৪ মিটাব] এবং দ্বিতীযটিব ১২৫ ফুট [৩৯ মিটাব]। কেন্দ্রস্থলের কিছুটা দূবে চতুর্থ মন্দিব। তাব উচ্চতা ২১০ ফুট। [৬৪ মিটার]। টিকাল শহরের আযতন ছিল ৬ বর্গ মাইল [১৬ বর্গ কিলোমিটার] । এর জনসংখ্যা ছিল প্রায ১০,০০০। শহরেব চাবিদিকে গ্রামাঞ্চল ছিল প্রায় ২৪ বর্গ মাইল। [৬৩ বর্গ কিলোমিটার] । আব সেখানে বাস কবতো প্রায ৪০,০০০ লোক। কৃষকেরা তাদেব চাষজমির কাছেই বাস কবতো। তারা ছিল নগর সভ্যতার ধারক। মায়া সভ্যতা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা হিসাবে শুরু হলেও পরে তা নগর-ভিত্তিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়। হরপ্পার মতই মাযা সভ্যতাতেও কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে নগর ভিত্তিক সভ্যতায রূপান্তরণের ধারাবাহিকতা স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। যাইহোক, মায়া সভ্যতাও

একসময় নগরভিত্তিক সভ্যতা হয়ে ওঠে এবং হরপ্পা সভ্যতার মতই তারাও একসময় নাগরিক সভ্যতায় রপ্ত হয়ে পড়ে। মায়াদের নাগরিক সভ্যতার সময়কাল ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ কিংবা তার কিছুটা আগে।

মায়া সভ্যতা যে সব অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তার ভৌগোলিক বিবরণ হল ঃ

- The tropical rain forest of the lowlands, stretching from northwestern Honduras, through the Peten region of Guatemala and into Belize and the Chiapas. This became the heart of classic Maya civilization and included cities such as Copan, Yaxchilan, Tikal, and Palenque.
- The Gautemala highlands and the Pacific Coasts, where Aztec influence in the early classic period caused some differences in cultural development from the Central, or Lowlands Maya
- The northern Yucatan peninsula, whose sites include Labna, Chichen Itza and Uxmal, is characterized by scrub vegetation, thin soil, and little surface water. After the lowlands city-states collapsed, ending the classic period, there was increased migration into the Yucatan and Maya culture continued to thrive there until the arrival of the militaristic Toltecs.

বলা হয়, মায়ারা প্রায় ১১০০০ বছব আগে ওই সব অঞ্চলে আসে। তখন তারা ছিল যাযাবর অসভ্য জাতি। প্রায় ৪৫০০ বছর আগে তারা ভুট্টা [Maize] চাষ করতে শেখে এবং যাযাবর জীবন পারিত্যাগ করে। মায়াবা ভুট্টা ছাড়াও বীন [Beans], স্কোয়াশ [Squash] এবং তামাকের চাষবাসও করতো। মায়াদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের কাজের জায়গা একেবারে নির্দিষ্ট করা ছিল। পুরুষেরা ঘর-বাড়ী নির্মাণ, বাসগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, চাষবাস করতো। মেয়েরা খাবার বানাতো, জামা-কাপড় বানাতো এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতো। সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত বংশগতির ধারায়, উত্তরাধিকার সূত্র মেনে নিয়ে। সমাজে রাজা, পাত্রমিত্র, শিক্ষক, যোদ্ধা, শিল্পী, শাসক, ভাস্কর, বণিক, শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী সব শ্রেণীর মানুষই ছিল। উন্নত নাগরিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় প্রায় সব ব্যবস্থাই মায়ারা গ্রহণ করেছিল।

স্পেনীয়রা য়ুকাটান জয় করার পর মায়াদের সব পুঁথি পুড়িয়ে দেওয়ায় মায়াদের সম্বন্ধে বহু তথ্যই অজানা থেকে গেছে। যে তিনটি পুঁথি ওদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল, যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে, সেগুলির থেকে মায়াদের সম্পর্কে জানা গেছে বিস্ময়কর সব তথ্য। মায়া ভাস্কর্যগুলি এক অতুলনীয় বিস্ময়। এগুলির ব্যাখ্যা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করলে চলবে না, করতে হবে একবিংশ শতাব্দীর

বিজ্ঞানের আলোকে। তবেই হয়তো পালেঙ্কের সমাধি ফলকের বাস-রিলীফ কিংবা মায়াদের অন্যান্য জটিল ভাস্কর্যের একটা সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

মায়াদের অন্ততঃ ১৬৬ টি দেবতা ছিল বিভিন্ন নামের। আরও কিছু নাম না জানা দেবতা থাকলেও থাকতে পারে। আবার মায়া পুরাণ একেশ্বরবাদও প্রচার করেছে। তাদের সেই এক এবং অদ্বিতীয় দেবতা হলেন 'ইৎজাম্মা' [Itzamma]। ইনিই নাকি মায়াদের লিখন-প্রণালী শিখিয়েছিলেন। কারুকলা ও বিজ্ঞানের ইনিই জনক। এঁর



চিত্র ২৫

সেইবালের [Seibal] জঙ্গলে পাওযা মায়াদের প্রস্তর ভাস্কর্য। এটি কি সত্যিই ধর্মীয় উৎসবের পুরো-পোষাক পরা কোনও পুরোহিত বা রাজার ভাস্কর্য না অন্য কিছু?

পত্নী হলেন 'ইক্‌স চেল্' [Ix Chel]। ইনি বয়ন, ঔষধপত্র এবং শিশুজন্মের দেবী। এঁকে চন্দ্রের প্রাচীন দেবীও বলা হয়। মায়ারা পূজা-পার্বণের জন্য ২৬০ দিনের পঞ্জিকা অনুসরণ করতো। পূজার সময় যৌনজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পরিহার করা হত। নিজের রক্ত দিয়ে পূজার দ্রব্যাদি লেপন করা হত। রাজার পত্নীরাও পূজা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো। নরবলিও চালু ছিল বলে মনে করা হয। পাখী, মোরগ, কুকুর, ইগুয়ানা ইত্যাদি নানা প্রাণী বলি দেওয়া হত দেবতাদেব উদ্দেশে। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা

বলেছেন, উন্নত মায়া সভ্যতার লোকজনরা নাকি নরবলি দিত দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। তাঁবা বলেছেন ঃ

"All Maya ritual acts were dictated by the 260-day Sacred Round calender, and all performances had symbolic meaning, Sexual abstinence was rigidly observed before and during such events, and self-mutilation was encourged in order to furnish blood with which to anoint religious articles. The elites were obsessed with blood both their own and that of their captives and ritual bloodletting was a major part of any important calendar event. Bloodletting was also carried out to nourish and propitiate the gods, and when Maya civilization began to fall, rulers with large territories are recorded as having rushed from one city to the other, performing bloodletting rites in order to maintain their disintegrating kingdoms.

Human sacrifice was perpetrated on prisoners, slaves, and particularly children, with orphans and illegitimate children specially pruchased for the occasion. Before the Toltec era, however, animal sacrifice may have been far more common than human — turkeys, dogs, squirrels, quails and iguanas being among the species considered suitable offerings to Maya gods."

কোনও মানুষের মৃত্যু হলে মায়ারা তাকে তাব ঘবের মেঝেতেই সমাধিস্থ করতো। তার মুখে ভরে দেওয়া হত কিছু খাবাব এবং একটা 'জেড' [Jade] পাথবেব টুকবো। তার সমাধিতে রাখা হত ধর্মীয় কিছু তৈজসপত্র। পুবোহিতদের সমাধিব মধ্যে এগুলি ছাড়াও রাখা হত তাঁর পুঁথিগুলি।

মাযাদের শহবগুলি খুব একটা পরিকল্পিত শহব ছিল না। হবপ্পাব সমস্ত নগবই কিন্তু ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং একেবাবে আধুনিক শহবের সঙ্গে তুলনীয়। মায়াদের শহরগুলিকে প্রাচীব দিয়ে ঘিরে রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন কোন শহরের চারিদিক পবিখা দিয়ে ঘেরা থাকতো। ইদানীং অবশ্য কিছু প্রাচীন শহবেব ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে যেগুলি সম্ভবত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। তবে এগুলি বযসে নবীনতর। ঐতিহাসিকবা বলছেন ঃ

"Maya cities were rarely laid out in neat grids, and appear to have developed in an unplanned fashion, with temples and palaces torn down and rebuilt over and over through the centuries. Because of this seemingly erratic pattern of settlement, the boundaries of Maya cities are often hard to determine. Some cities were

sourrounded by a moat, and some had defensive earthworks around them; however, this was unusual. City walls are rare at Maya sites, with the exception of some recently discovered cities dating from the collapse of Maya civilization, when protective walls were suddenly thrown up around cities under siege from outside enemies."

এখন মায়াদের লিপি পাঠ করা সম্ভব হয়েছে। মায়াদের প্রায় সব পুঁথি স্পেনীযরা পুড়িয়ে দিলেও যেটুকু উদ্ধার পেয়েছে তার প্রায় সবটাই পড়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এ কাজ এখন আরও সহজ হয়েছে কম্পিউটারের কল্যাণে। মায়াদের সমস্ত সংখ্যা ও লিপি এখন মোটামুটি নির্ভুলভাবে পাঠ কবা গেছে। তবে মায়াপুঁথিগুলিব জটিল চিত্রসমূহের আজও সঠিক ব্যাখা করা সম্ভব হয় নি। আশা করা হচ্ছে, কম্পিউটারের সাহায্যে এগুলির ব্যাখ্যা খুব শিগগিরই সম্ভব হবে।

মায়াদের মাদ্রিদ, দ্রেসডেন এবং প্যারী পুঁথি তিনটির কথা বাদ দিলেও মায়াদেব আবও যে সব পুঁথি পাওয়া গেছে সেগুলি হল ঃ (১) মহাকাব্য পোপোল ভূ [Popol Vuh] ; (২) 'চিলম বালাম' নামের সংগীত সংকলন; (৩) কাকচিকুয়েলেব [Cakchiquel] বিজয় কাহিনী ইত্যাদি। পাদ্রী দিয়েগো দ্য লান্দা অবশ্য মায়াদের নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন — "An Account of Things in the Yucatan'। এই বইয়েই দ্য লান্দা মায়াদের পুঁথির বহ্ন্যুৎসবেব বিবরণ বেখে গেছেন — সেকথা আগেই বলেছি। এছাড়াও প্রায় ৯৩টি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পুঁথি পাওযা গেছে বিভিন্ন সময়ের উৎখননে। মায়াদের লেখা এই পুঁথিগুলিতে বযেছে উদ্ভিদকুল, প্রাণীকুল এবং অধিবাসীদের কথা। মায়াদের সংস্কৃতিরও কিছু পরিচয় পাওযা যয এই সব বইয়ে। তবে মায়াদের ওই মাদ্রিদ-পুঁথি, দ্রেসডেন-পুঁথি এবং প্যাবী-পুঁথিব মধ্যে অনেক রহস্য আজও অব্যাখ্যাত রয়েছে। বিশেষ করে এগুলিব মধ্যে যে সব চিত্র রয়েছে সেগুলির সঠিক ব্যাখ্যাব আজ একান্তই প্রায়োজন।

১৯৬২ সাল থেকে মাযা-লিপি ও তাদের অঙ্কন নিয়ে পঠন-পাঠন শুরু হযেছে বেশ কিছুটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে। ১৯৮০ সাল থেকে মায়া-লিপির পাঠোদ্ধার অনেকটাই এগিয়েছে। পাঠ করা হযেছে পালেঙ্কে, টিকালে ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া মায়া-লিপি। তবু মায়া সভ্যতার বহু রহস্য আজও অজানা রয়ে গেছে। আশা কবা হচ্ছে, এই সব রহস্যের সমাধান খুব শিগগিব হবে। আর সব রহস্যেব সমাধান করবে একালেব অতি বুদ্ধিমান কম্পিউটার।

"In 1982, the Maya hieroglyphs were first catalogued. Since 1980, a great deal of progress has been made in deciphering new glyphs found at Palenque, Tikal and other sites, Because the writing was often intended as propaganda, care must be taken in its interpretation. However, the ongoing work of decoding the glyphs

holds promise that many of the mysteries surrounding the Maya may one day be solved."

মায়া সভ্যতার ভাস্কর্য অনন্য এবং ব্যতিক্রমী এদের রিলিফের কাজ সমসাময়িক কালের মধ্যে সেরা। এরা মেসোপটেমিয়া কিংবা হরপ্পার মত শীলমোহর বানায় নি। কিন্তু মিশরের মত বিশাল বিশাল বহু সৌধ নির্মাণ করেছে। তাদের গঠনশৈলী, তাদের ভাস্কর্য কোনভাবেই মিশরীয়দের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল না। মাযাদের শিল্পকলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ

"That art of the Maya has been called the richest of the New World. It has a great complexity of motifs and iconography and uses wide variety of media for its expression. Maya buildings were painted and adorned with features such as carved friezes, facades, and roof combs in stone or stucco. The interior walls of certain structures were painted with colourful murals. Intricately carved monuments (or stelae) are found in many Classic sites in numbers varying from one to dozens. Some carvings were executed in low relief on a single flat face or on both sides of a flat slab, while at the sites of Copan and Quirigua the carving was done in the round..Most often, one or more human figures appear on the stelae in full ceremonial regalia including headdresses, earplugs, necklaces, bracelets, and other accountrements. These figures, often important male or female members of the elite ruling families, have accompanying hieroglyphic texts. It should be pointed out that these achievements in building with and carving on stone were all the more remarkable because they were undertaken with stone tools. Metal was not used in the Maya area until Postclassic times, and even then only for ceremonial purposes."

তবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, পাথরের ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে মায়ারা অমন বিশাল বিশাল অবিশ্বাস্য আয়তনের সৌধসমূহ বানিয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল অমন কারুকাজ, পাথরের উপর অমন সূক্ষ্ম ও নিঁখুত বাস-রিলীফ [Bas-Relief]। মিশরের পিরামিড তৈরির প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যেমন একালের নিরীখে অচল, তেমনি অচল মায়াদেব এই সব বিশাল সৌধ নির্মাণের ঐতিহাসিক কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। পাথরের ছেনি হাতুড়ি দিয়ে এগুলি বানানোর কথা রূপকথার কল্প-গল্প মাত্র। বরং বলা যায ৪৫০০ বছর আগে ওইগুলি কেমন করে নির্মিত হল তা অজানা। যেমন অজানা মিশরের পিরামিড তৈরির সঠিক তথ্য কিংবা মমি বানানোর কায়দা কসরৎ। ধাতুর ব্যবহার

মায়ারা খ্রীষ্টের জন্মের কিছুকাল আগে শিখেছিল, এ তথ্যও তেমন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

মায়া সভ্যতাব উন্নতিব মূলে আছে ব্যবসাবাণিজ্য। মাযা সাম্রাজ্যের উচ্চভূমিতে



চিত্র ৩০
অপূর্ব মায়া ভাস্কর্য

যে সব পণ্য উৎপাদিত হত সেগুলি চলে যেত নিম্নভূমি অঞ্চলে, যেখানে নিপুণ শ্রমিক তথা কাবিগরদেব দ্বাবা পণ্য সামগ্রী রূপান্তবিত হত ভোগ্যবস্তুতে। এইভাবে নিম্নাঞ্চল পণ্যসামগ্রী আমদানি কবে তাব থেকে বানাতো ভোগ্যদ্রব্য এবং সেগুলি আবার রপ্তানি করতো উচ্চভূমি অঞ্চলে এবং বিভিন্ন নগবে। মাযা সভ্যতাব শহবগুলিতে তখন চলতো ব্যবসা-বাণিজ্যেব বমবমা। তবে মাযাদেব বহির্বাণিজ্যেব কথা তেমন কিছু জানা যায় নি। মায়াদেব শহবগুলি ছিল অন্তর্বাণিজ্যের আকর্ষণীয় কেন্দ্রস্থল। এই ব্যবসা-বাণিজ্যই মায়া সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়।

প্রাচীন মায়াদের ২৫টি ভাষা ছিল। এই ২৫টি ভাষার অন্তত একটি ভাষাতে কথা বলছে আধুনিক মায়ারা। এদেব সংখ্যা এখন প্রায় ২০ লক্ষ। তবে আধুনিক মায়ারা

সত্যিকারের মায়া কিনা এ নিয়ে নৃতত্ত্ববিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কাবণ, আগেই বলেছি, প্রায় ১২০০ বছর আগে মায়া সভ্যতার সৃষ্টিকাবী আসল মাযাবা তাদেব দেশ, রাজ্য, নগর সব ছেড়ে যেন কোথায় চলে যায়, তার হদিশ আজও মেলে নি। নবম শতাব্দী থেকে মায়াদের পরিত্যক্ত নগরগুলিতে যারা বাস করছে তারা আসল মায়া নয়। স্পেনীয়রা যে মায়াদের পবাজিত করেছিল তারা মোটেই আসল মায়া নয়। আসল মায়াদের সব ছেড়েছুড়ে পলায়নের কারণ আজও অজানা, অব্যাখ্যাত। তারা কোথায় গেল তাও কেউ জানে না। এই বহস্যেব সমাধান আজও হয় নি। সুতরাং এখন আমরা যে ২০ লক্ষ লোককে আধুনিক মায়া বলছি তাবা কিন্তু আসল মায়া নয়। বহু ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতত্ত্ববিদ আজও এটা বিশ্বাস করেন। এই রহস্যের সমাধান হয়তো একালেব কম্পিউটাবে একদিন কবা সম্ভব হবে। অতি বুদ্ধিমান কোন কম্পিউটার বলে দিতে পাববে ১২০০ বছব আগে আসল মায়াদেব অন্তর্ধানেব কারণ।

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বিশেষ কবে ডঃ অতুল সুব দেখিয়েছেন যে, হবপ্পার লিপিগুলিব সঙ্গে ইস্টার দ্বীপে প্রাপ্ত লিপিসমূহেব যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ মিল কেমন কবে হল তা অব্যাখ্যাত: হরপ্পা থেকে হাজাব হাজাব মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায অজানা একটা দ্বীপে পাওয়া লিপিব সঙ্গে হরপ্পাব লিপির লক্ষণীয সাদৃশ্য কেমন কবে সম্ভব হল তা অজানা। আবার ইঙ্কা সভ্যতাব স্বর্ণফলকে লেখা হয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে, তাও এখন প্রমাণিত সত্য। কিন্তু মাযাদেব লেখন-প্রণালীতে হবপ্পা-লিপিব কোনও প্রভাব পবেছে কিনা তা আজও আজানা। প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি যদি ইঙ্কাদের লিপি হতে পারে, তবে মায়া লিপিতে হরপ্পার লিপিব প্রভাব নেই—এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এ নিয়ে কোনও গবেষণা হযেছে কিনা তা অজানা। মায়া লিপিতে হরপ্পীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হলে আমরা হযতো দাবী করতে পারবো, ভারতীয় পৌরাণিক দানব-শিল্পী 'ময' গোড়াপত্তন কবেছিলেন বিখ্যাত এই মাযা সভ্যতার। মহাভারতের মযদানব যুধিষ্ঠিবের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যে সচিবালয় বানিযে দিয়েছিলেন তাতে আট হাজার লোক কাজ করতে পাবতো এবং সে সচিবালয় আকাশে ভাসমান ছিল।

আগেই বলেছি, হরপ্পা সংস্কৃতিতে লেখাব বীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। শীলমোহরগুলিতে এইসব লিপি উৎকীর্ণ। মৃৎপাত্রেব উপবও কিছু কিছু লেখা পাওয়া গেছে। এই বর্ণমালা এতোই প্রাচীন যে অন্যান্য প্রাচীন বর্ণমালার সঙ্গে এই লিপির কোন সাদৃশ্য নেই। মোটামুটি জানা গেছে, প্রায় ২৫০ বকমেব অক্ষর ব্যবহৃত হতো। এগুলি আজও অপঠিত থাকায় সিন্ধু সভ্যতার অনেক কিছুই আজও অজানা। অনেকে মনে করেন, এই লিপিগুলি বর্তমান তামিল লিপির প্রাচীনতম রূপ। এই লিপির কোন প্রভাব মায়া-লিপিতে আছে কিনা তা অজানা। হবপ্পায় এই সময় যে সব বাটখারা চালু ছিল তাদের ওজন নিঁখুতভাবে সমান রাখা হতো। পণ্য কেনাবেচার জন্য বড়মাপের বাটখারা

আবার অলঙ্কার ও পুঁথি কেনাবেচার জন্য ছোটমাপের বাটখাবার প্রচলন ছিল। পুঁথির দোকানে বাটখারা পাওয়া যাওয়ায় পণ্ডিতেবা মনে কবেন পুঁথিও ওজন করে কেনাবেচা হতো। মায়াদের এই ধরনেব বাটখাবাব কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

আগেই বলা হয়েছে, হবপ্পা সভ্যতায দৈর্ঘ্য মাপতে যে দু'ধরনের মাপকাঠি পাওয়া গেছে তার একটি মহেঞ্জোদারোতে, অন্যটি হরপ্পায। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া মাপকাঠিব দৈর্ঘ্য ১৩.২ ইঞ্চি, আর হরপ্পায় পাওযা মাপকাঠিব দৈর্ঘ্য ২০ ৬২ ইঞ্চি। হবপ্পার এই কাঠিটি ব্রোঞ্জ নির্মিত। কিন্তু সময পবিমাপেব কোনও ব্যবস্থাব কথা জানা যায়নি। প্রায় এক হাজার বছর টিকে থাকা এই অত্যুন্নত সভ্যতায় সময় মাপার কোন ব্যবস্থা ছিল না এটা হতে পাবে না। অথচ মাযাদেব সময ধারণা ছিল অত্যন্ত উন্নত মানেব। প্রত্নতাত্ত্বিকেবা কোনও নিদর্শন না পেলেও এটা অনুমান করতে বাধা নেই যে, সিন্ধুসভ্যতায় সময়েব ধাবণাও উন্নতমানেব ছিল এবং সমযেব পবিমাপ কবাবও উন্নত বন্দোবস্ত এই সভ্যতা কবেছিল। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতাগুলিব মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা বা হবপ্পাসভ্যতাই প্রাচীনতম।

মাযা সভ্যতায হরপ্পীয প্রভাব আজও গবেষণাব বিযয। মাযা সভ্যতাব দেবদেবীব বাহুল্য কিন্তু অনেকটা হবপ্পা সভ্যতাব মতই। মাযাদেব দেবদেবীব সংখ্যা অসংখ্য। আগেই বলেছি, মাযা সভ্যতায অন্ততঃ ১৬৬ জন দেবদেবীব নাম পাওযা গেছে। আবাবও বলি ঃ

"Maya cosmology and mythology were extremely complex. The numerous gods and goddesses had many forms and facets. For example. ঃ Ix Chel was goddess of the moon and goddess of childbirth, among other things. Moreover, as goddess of the moon only, she might be depicted in several different guises Many Maya deities and ancient Mesoamerican deities in general—were related to natural features such as the Sun, Moon, and Rain. In addition, the Maya calendar and Maya religion were inseparable ; each unit of time (day, month, and larger units) was represented by a god. The gods also were involved in all the myths about creation, the movements of the heavenly bodies and the coming of the seasons."

হবপ্পা, মিশব, মেসোপটেমিয়া এবং মাযা—এই চারটি সভ্যতা সমসাময়িক হলেও এদেব মধ্যে প্রাচীনতমটি হল হবপ্পা সভ্যতা। তারপব এসেছে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, যা নাকি হরপ্পীয়দেবই সৃষ্টি বলে অনেকে মনে কবেন। এবপব এসেছে মিশর সভ্যতা এবং তার সামান্য পরে উদ্ভূত হয়েছে মাযা সভ্যতা। আপাত দৃষ্টিতে মধ্য আমেবিকার মাযা সভ্যতা হরপ্পা, সুমেব ও মিশর সভ্যতাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র সভ্যতা

মনে হলেও, মায়া সভ্যতায় হরপ্পীয় সভ্যতার প্রভাব একেবারেই নেই একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই প্রভাব কেমন করে, কী ভাবে কোথা দিযে এলো তার যথেষ্ট ব্যাখ্যা এখন আমাদেব হাতে নেই। ইঙ্কা সভ্যতার স্বর্ণফলকে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিতে ঋগ্বেদের সূক্ত লেখা হওযাব ঘটনা যেমন অব্যাখ্যাত, মায়া সভ্যতায় হরপ্পীয় প্রভাবও তেমনি আজো অব্যাখ্যাতই বয়ে গেছে।

হবপ্পাব সমসাময়িক তিনটি সভ্যতার কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া হল। তুলনামূলকভাবে দেখানো হল পৃথিবীর ইতিহাসে হরপ্পাই প্রাচীনতম এবং উন্নততম সভ্যতা। আব এই সভ্যতার প্রভাব কোন না কোনওভাবে পড়েছিল অপর তিন সভ্যতার উপব। হবপ্পাব অনার্য সভ্যতা পৃথিবীকে সভ্যতার আলো দেখিয়েছে। সারা ইউরোপ সে সময গাছ থেকে মাটিতে নামে নি। সেখানকার মানুষজন তখনও গাছেই বাস কবছে। অনার্য হবপ্পীয়রা তখন শতাধিক শহব বানিয়ে ফেলেছে—একেবাবে একালেব আধুনিক শহব। চর্চা কবছে জ্যোতির্বিজ্ঞানেব, হিসাব কবছে দশমিকে, লিখছে সুগঠিত লিপিতে। ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িযে পড়ছে তাদের সভ্যতা—অনার্যদের মহান গৌববময় সভ্যাতা, যাব নাম হবপ্পা সভ্যতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরপ্পার অবদান

সুমেবীয় কিংবদন্তী অনুসারে ওই সভ্যতা ছিল বহিরাগত সভ্যতা। মিশরের পৌরাণিক কাহিনী বলে মিশরীয় সভ্যতা বাইরের কোন দেশ থেকে এসেছিল। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা ভারতবর্ষে কোন আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। এটা ছিল দেশজ সভ্যতা। সে সময়েব ভাবতবর্ষ বলতে এখনকাব ভাবতবর্ষ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ মিলিয়ে যা হয় সেই বিস্তীর্ণ দেশকেই বোঝাত। আফগানিস্তান প্রাচীন ভারতে গান্ধার নামে পবিচিত ছিল। গান্ধার সে সময ছিল ভাবতের অঙ্গরাজ্য। মহাভারতের গান্ধাবী, রামায়ণেব কৈকেয়ী—এঁরা ছিলেন গান্ধারেবই বাজকন্যা। এই গান্ধারেব বাজধানী ছিল তক্ষশিলা। আব সেকালে তক্ষশিলা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ নগরী। কাবণ এখানেই ছিল প্রাচীন ভাবতেব শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন—তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয। ঋগ্বেদেব প্রথম মণ্ডলেব ১২৬তম সূক্তেব সপ্তম ঋকে গান্ধাব দেশেব উল্লেখ আছে। বৈদিক আমলে তো বটেই হবপ্পীয়দের আমলেও গান্ধার তথা একালের আফগানিস্তান, পেশোয়াব ভারতেবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাবুল প্রদেশেব কথা সবাসরি বলা হয়েছে ঋগ্বেদেব অষ্টম মণ্ডলের ২৪তম সূক্তেব ৩০তম ঋকে এবং দশম মণ্ডলের ৭৫তম সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে। সুতরাং সে সময়ে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত ছিল বর্তমানের আফগানিস্তানের পশ্চিম সীমানা। আবার ঋগ্বেদে 'বৈলস্থানক' নামের একটা জায়গার উল্লেখ আছে, যার 'মহাবৈলস্থানক' নামক একটা নগরকে বর্বর আর্যরা ধ্বংস করেছিল। পণ্ডিতেরা বলছেন, ওই বৈলস্থানক হল একালের বালুচিস্তান। সুতরাং বৈদিক আমলের অনেকটা আগেই হরপ্পা সভ্যতার আমলে ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানের পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরাও ছিল হরপ্পা সভ্যতার অঙ্গীভূত—তার ধারক এবং বাহক।

আগেই বলেছি, প্রাচীন ভারতের তাম্রাশ্ম সভ্যতাকে 'সিন্ধু সভ্যতা', 'হরপ্পা সভ্যতা' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আধুনিক আফগানিস্তানের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা। 'হরপ্পা সভ্যতা' কিংবা 'সিন্ধু সভ্যতা' নামটি কিন্তু এই ব্যাপক বিস্তৃত অত্যুন্নত সভ্যতার যথাযথ নামকরণ হওয়া উচিত নয়। কারণ এই সভ্যতার বিশাল ব্যাপ্তি সিন্ধু উপত্যকা কিংবা হরপ্পা অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত। তাই এর যথাযথ নামকরণ হওয়া উচিত 'প্রাগার্য সভ্যতা' (Pre-Aryan Civilization)। ঐতিহাসিকরা এখন একে 'হরপ্পা সভ্যতা' নামেই মেনে

নিয়েছেন। তাই আমরাও এই সভ্যতাকে 'হরপ্পা সভ্যতা'-ই বলব।



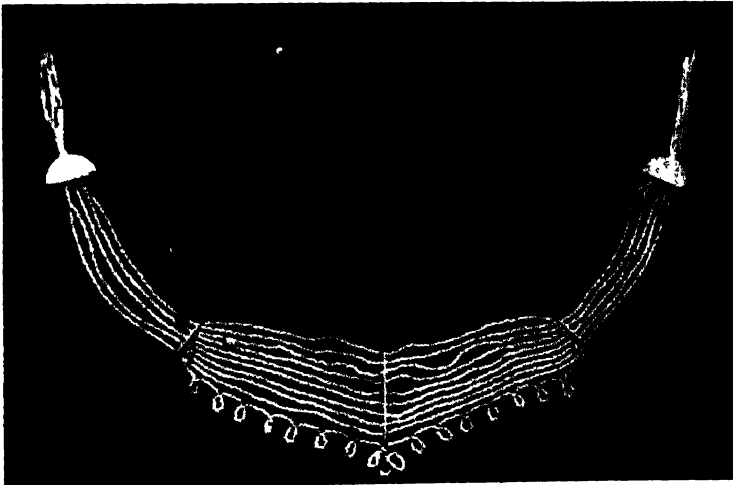
চিত্র ৩১
হরপ্পার মৃৎপাত্র

এই বিশাল সভ্যতাব মহান অবদানের কথা সংক্ষেপে বলা সহজ কাজ নয। এখনও পর্যন্ত যতটা জানা গেছে হবপ্পা সভ্যতাই বিস্তৃত হযেছিল আফগানিস্তানেব 'মুণ্ডিগাক' অবধি। সম্ভবত এটাই ছিল ওই সভ্যতাব পশ্চিম সীমানা। আব পূর্বদিকে এই সভ্যতা বিস্তৃত হযেছিল 'পাণ্ডুবাজাব ঢিবি' পর্যন্ত। এই সভ্যতার বৈশিষ্টমূলক পবিচয হচ্ছে, এটা ছিল নগবভিত্তিক সভ্যতা। এব আবও পরিচয হচ্ছে— এটা ছিল বাণিজ্যিক ও শিক্ষিত সমাজেব সভ্যতা। নগবেব চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহেব জনগণই বৈষয়িক ধনোৎপাদনে নিযুক্ত থাকত এবং গ্রামেব লোকরা তাদেব উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নগবে পাঠাত, নগবেব বাণিজ্যে সাহায্য কববার জন্য। নগবেব চেহাবাব সঙ্গে গ্রামেব চেহাবাব প্রভেদ ছিল। তবে নগবই হউক, আব গ্রামই হউক, উভয়স্থলেই পাথরেব যন্ত্রপাতিব সঙ্গে তামা বা ব্রোঞ্জেব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত। সেজন্য তাম্রাশ্ম সভ্যতাব এমন সব কেন্দ্রও আবিষ্কৃত হযেছে, যেখানে নগব নেই, কেবল গ্রামেবই পবিচয পাওযা যায।

সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী সভ্যতাব যে সব লক্ষণ থাকে, তাব সবই আমবা এই সভ্যতাব নগবসমূহে লক্ষ্য কবি। আগেই বলা হযেছে, আমেরিকার পেনসিলভ্যানিযা বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক গ্রেগবি পসেল (Gregory Possehl) বলেছেন যে, চীন, সুমেব ও মিশরেব প্রাচীন সভ্যসমূহেব তুলনায হবপ্পা সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা এই সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহেই আমবা জগতের প্রাচীনতম ইষ্টকনির্মিত পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয আবিষ্কাব কবেছি। এই সভ্যতাব নিদর্শন এক বিস্তৃত অঞ্চলে দেড় শতাধিক স্থানে পাওযা গিয়েছে এবং এটা ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এই সভ্যতার প্রধান নগবসমূহ হচ্ছে পাকিস্তানে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো ও হবপ্পা এবং ভাবতে অবস্থিত কালিবঙ্গান ও লোথাল। এই সকল নগরের রাস্তাঘাট বেশ সুপবিকল্পিত ছিল। ঘববাড়ি দগ্ধ ও অদগ্ধ ইট ও পাথর দিয়ে

তৈরি করা হত। প্রত্যেক বাড়িতে কূপ থাকত এবং বাড়ির দূষিত জল রাস্তার বাঁধানো পাকা পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। সমস্ত পয়ঃপ্রণালীই ঢাকা দেওয়া থাকতো। তাছাড়া, নগরেব মধ্যে ছিল সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাকারবিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগার, মন্দির ও সমাধিস্থান। এক কথায় সুসংবদ্ধভাবে নাগরিক জীবনযাপনের সমস্ত লক্ষণই এই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল। শৃঙ্খলাযুক্ত শাসনব্যবস্থাও ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহসামগ্রী নির্মাণে তামা এবং ব্রোঞ্জের বহুল ব্যবহার ছিল। পরিবহনেব জন্য চক্রবিশিষ্ট যান ছিল। ভাষাব রূপদানেব জন্য লিখন-প্রণালীবও ব্যাপক ব্যবহাব ছিল। তাব মানে সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল ও তার জন্য শিক্ষাযতনও ছিল। খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, গম, ধান্য, তিল, মটব, রাই প্রভৃতি শস্য, মেষ, শূকর, কুক্কুট, কচ্ছপ প্রভৃতিব মাংস, সমুদ্রের শামুক এবং শুঁটকি মাছ ইত্যাদি। পোশাক-আসাকেব মধ্যে ছিল কার্পাস সুতাব বস্ত্র ও চাদর। অঙ্গসাজেব জন্য ছিল— সোনা, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথবেব নানারূপ অলঙ্কাব, অস্থি ও গজদন্তেব চিরুনি, দর্পণ, ক্ষুব, বঁড়শি, সুচ এবং মেয়েদেব মাথাব কাঁটা, খেলাব জন্য পাশা ও ঘুঁটি ইত্যাদি। সংলগ্ন পুষ্কবিণীব সঙ্গে এদেব দেবস্থানও ছিল। এবা ঊর্ধ্বলিঙ্গ পশুপতি শিব ও মাতৃকাদেবীব পূজা করত। এ সব নগবেব লোকবা বাইরেব জগতেব সঙ্গেও ব্যবসা কবত, কেননা অনুরূপ সভ্যতাব নিদর্শনসমূহ সুমেবে ও পাবস্য উপসাগবে অবস্থিত বেহবিং দ্বীপেও পাওযা গিয়েছে।

মহেঞ্জোদাবো, হবপ্পা এবং কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানে নগবনির্মাণ বীতি ও বিন্যাসেব ঐক্য দেখে মনে হয় যে, এদেব বাস্তু বা স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে কোন সাধাবণ শাস্ত্র ছিল, যাব নির্দেশ অনুযায়ীই এরা নগর নির্মাণ কবত। তাছাড়া, গণিত, ভাস্কর্য, জ্যোতিষ ও ধাতুবিদ্যাতে এবা পাবঙ্গম ছিল।



চিত্র ৭২ হরপ্পার সোনার হার

এই সভ্যতার নগরগুলির আয়তন, গৃহসংখ্যা ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন, সে পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় হরপ্পা নগর ও তার আশপাশে প্রায় ৫০,০০০ লোক বাস কবতো। সুতরাং সে কালের তুলনায় হরপ্পা ছিল এক বিশাল নগরী। মহেঞ্জোদারোর লোকসংখ্যাও ছিল ৪১,২৫০ জন। তবে ওই তালিকায় নগরগুলি যে আয়তন উল্লেখ করা হযেছে, সেগুলি সম্ভবত পুবো নগরটির আয়তন নয়, কেবল মাত্র উৎখনিত অঞ্চলের আযতন।

পণ্ডিতেরা বলছেন যে, হরপ্পার এই সভ্যতা কোন বহিরাগত সভ্যতা ছিল না। এ সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশ দুই-ই ঘটেছিল এই ভারতের মাটিতেই। মূলতঃ হবপ্পা সভ্যতা ছিল তাম্রাশ্ম সভ্যতা। প্রস্তব যুগেব অন্তিম দশায় অর্থাৎ নবোপলীয় যুগেব শেষ পর্যাযে এসে এই সভ্যতাব ধাবকদেব মধ্যে তামাব ব্যবহাব প্রচলিত হয়েছিল। অবিচ্ছিন্ন ধাবাবাহিকতায প্রস্তব-যুগ থেকে তাম্রাশ্ম-যুগ পর্যন্ত স্তব বিন্যাস শাওযা গেছে হবপ্পায, মহেঞ্জোদাবোতে, কোটদিজিতে, কালিবঙ্গানে, আমবিতে, সান্ধনওযালে, নাগওয়াড়ায় এবং অন্যান্য স্থানে। সে জন্য বলা হচ্ছে যে, প্রাক-হবপ্পীয সভ্যতাব ধাবাবাহিক বিবর্তনেব ফলেই হবপ্পাব নগব সভ্যতাব উদ্ভব ঘটেছিল। পরবর্তীকালেব আর্যসভ্যতার ন্যায হরপ্পার সভ্যতা কোন আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। দেশজ সভ্যতাব বিবর্তনেই উদ্ভূত হয়েছিল হবপ্পা সভ্যতা।

তবু একটা 'কিন্তু' বয়েছে পণ্ডিতমহলের চিন্তায়। একথা ঠিক যে, সিন্ধুনদেব বন্যাপ্লাবিত পলিজ অঞ্চলে বা যেখানে স্থায়ী জলের উৎস ছিল সেই সব অঞ্চলে আদি ও পরিণত হরপ্পা সভ্যতাব বিদ্যমানতা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয সহস্রকের এমন এক পরিবেশের ইঙ্গিত দেয- –যে পরিবেশ জমির পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা এক বৃহৎ জনতার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা কিভাবে পরিণত নাগরিক সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল তার উত্তর এ থেকে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে একাধিক প্রশ্ন থেকে গেছে।

প্রশ্ন করা হয়েছে, এটা কি বালুচিস্তানের লোকদের অভিগমনের ফলে ঘটেছিল? তা হলে ধরে নিতে হয় যে সিন্ধু উপত্যকার নাগরিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ পশ্চিম দিক থেকে ঘটেছিল। এ সম্বন্ধে সি. সি. কারলোৎস্কা বলেছেন যে, এটা বাণিজ্যঘটিত আদান-প্রদানের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ঘটেছিল। এর সপক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হরপ্পার প্রাক-নাগরিক যুগের লোকেরা যে দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বা বিনিময়ে নিযুক্ত ছিল সেটা ল্যাপিস্ ল্যাজুলির (Lapis-lazuli) উপস্থিতি থেকেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু একটা গ্রামীণ সভ্যতা কীভাবে এক বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী নাগরিক সভ্যতায় বিবর্তিত হয়েছিল, তা প্রমাণ করবার জন্য আরো প্রত্নতাত্ত্বিক ও পরিবেশঘটিত প্রমাণের প্রয়োজন। সেরূপ কোন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এখনও পর্যন্ত এইটুকুই বলা হয়েছে যে, হরপ্পা সভ্যতা যেন হঠাৎই রাতারাতি এক পরিণত নাগরিক-সভ্যতায় বিকশিত হয়েছিল। আর হরপ্পা সভ্যতার বিকাশ পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়েছিল—পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে নয়।

প্রকৃতপক্ষে, পরিণত হরপ্পা সভ্যতার আবির্ভাব এবং তার কেন্দ্রসমূহের পতন, এই দুটিই এতো আকস্মিকভাবে ঘটে যে হরপ্পা সভ্যতার উত্থান ও পতন নিয়ে পণ্ডিতমহলে বহু প্রশ্নই আজও রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে। সদুত্তর পাওয়া যায় নি।

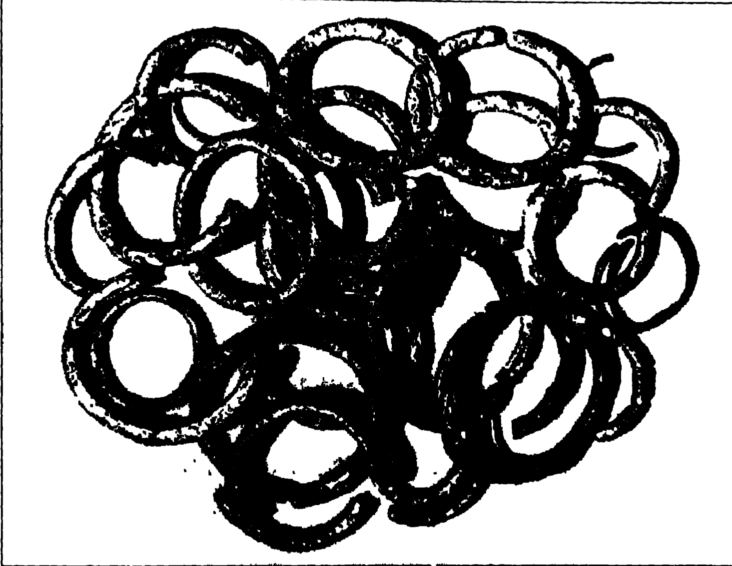
এখানে উল্লেখনীয় যে, অনেক প্রাক্-হরপ্পীয় কেন্দ্রসমূহে কোথাও কোথাও পরিণত হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নদ্রব্যও পাওয়া গেছে। আবার কোথাও কোথাও তার অভাবও লক্ষিত হয়। তা থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, হরপ্পা, কালিবঙ্গান, গুমলা, কোটদিজি ও আমরি প্রভৃতি স্থানে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার বাহকরাই পরবর্তীকালে এসে বাস করেছিল, এবং জলিলপুব, সরাইখেদা প্রভৃতি স্থান তারা পরিত্যাগ করেছিল। এ সম্পর্কে লক্ষণীয় যে, বৃহত্তব সিন্ধু উপত্যকাব পূর্বকালীন কোটদিজি কৃষ্টিব কেন্দ্রসমূহের আঞ্চলিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও মৃৎপাত্রসমূহের নির্মাণ-রীতির মধ্যে একটা ঐক্য ছিল। তাছাড়া, ওই সব কেন্দ্রের কোনও কোনও স্থানে যেমন, কালিবঙ্গান, কোটদিজি, আমরি, কোটরাশ, বুথি পোখরান প্রভৃতি স্থানে আমরা ওই যুগেই দুর্গ-নির্মাণের অভ্যুত্থান লক্ষ্য কবি। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, ওই সব জায়গায় একটা আর্থ-সামাজিক পবিবর্তনেব সূচনা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ঘরবাড়ি নির্মাণ সম্পর্কিত স্থাপত্য বীতিরও আমবা একটা স্থায়িত্ব লক্ষ্য করি। একই জায়গায় বসবাস ও বহুকক্ষবিশিষ্ট বাসস্থানের ক্রমিক বিবর্তন দ্বারা এটা সূচিত হয়। বলদ, পোড়ামাটিব স্ত্রীমূর্তি, ছেলেদের খেলনার গাড়ি, এবং চক্রের ব্যবহার, বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগযোগের বিদ্যমানতা ও পারস্পরিক কৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সূচিত কবে। সরাইখেদা, জলিলপুব ও পাণ্ডি ওয়াহি ইত্যাদি স্থানে উত্তর আফগানিস্তানে লভ্য ল্যাপিস ল্যাজুলির (Lapis Lazuli) উপস্থিতি দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য বা বিনিময়ের ইঙ্গিত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হরপ্পা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের বহু পূর্ব থেকে বিভিন্ন স্থানে ঐক্যবদ্ধ এমন একটা কৃষ্টি ছিল, যার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানসমূহ বর্তমান ছিল। সেই সকল উপাদান নিয়েই খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে হরপ্পার নগর-সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে প্রাক্-হরপ্পীয় গ্রামীণ সভ্যতা নগব-সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়াটা এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। কেননা, প্রাক্-হরপ্পা যুগের যেসব কৃষ্টিকেন্দ্র আমরা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, সেসব কেন্দ্রে হরপ্পা-সমাজের দুটি জিনিসেব অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, বৃহদাকার নগরবিন্যাস এবং দ্বিতীয়, শিল্পক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতার অনুপস্থিতি, যেমন, সীলমোহরের ওপর অঙ্কন, লিখন, ভাস্কর্য, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি। প্রাক্-হরপ্পীয় যুগের এই অভাবগুলি আকস্মিকভাবে হরপ্পীয় যুগে কীভাবে পরিপূর্ণ হয়ে এলো তা সঠিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। যাইহোক, অত্যুন্নত প্রাচীনতম এই সভ্যতাব অর্থাৎ



চিত্র ৩৩
হরপ্পা সভ্যতার অলঙ্কৃত পাত্র

হরপ্পা সভ্যতার একটা নিজস্ব লিপি ছিল। সুগঠিত এই লিপি সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি। এই লিপি খোদিত রয়েছে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া এই সভ্যতার সীলমোহরগুলিতে। গত আশি বছর ধরে এই লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে,

কিন্তু লিপিগুলি আজও অপঠিতই থেকে গেছে। লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে আমরা আবও বহু তথ্য জানতে পারতাম। মোদ্দা কথা হল, সিন্ধু-সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহবগুলিব ওপব খোদিত লিপির পাঠোদ্ধারের কাজ এখনও চলছে। আগেই বলেছি, সিন্ধুলিপিতে আনুমানিক ৩০০ চিহ্ন আছে। তার মধ্যে ২৫০টি মৌল চিহ্ন। বাকীগুলি আনুযঙ্গিক চিহ্ন মাত্র এবং সেগুলি মৌলচিহ্নের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলি সম্পর্কে বলা হযেছে যে, এগুলি হয় স্বরবর্ণ, আব নয়তো বর্ণনাকার চিহ্ন বা যতি চিহ্ন। তবে এসব অনুমান মাত্র। আগেই বলা হযেছে, এ সম্বন্ধে কিছুদিন



চিত্র ৩৪
হরপ্পার তামা ও ব্রোঞ্জের বালা

আগে একখানা মূল্যবান সহাযক পুস্তক প্রকাশিত হযেছে। বইখানা হচ্ছে ইরাবথম মহাদেবন (Iravatham Mahadevan) সংকলিত সিন্ধুলিপির সূচী (Concordance)। অবশ্য, এব আগে ফিনল্যান্ডের ড আসকো পারপোলাও (Dr. Asko Parpola) একখানা সূচীগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া, সোভিয়েট বাশিয়ার লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়েব সহকাবী অধ্যাপক ড নিকিটা গুবোব (Nikita Gurov) কম্পিউটারেব সাহায্যে সিন্ধুলিপিব সমস্ত চিহ্নগুলিব বীপ্সামূলক সংঘটন (Frequency Distribution) বিশ্লেষণ কবেছেন।

এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সিন্ধুলিপিব পাঠ নিয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। সেগুলি আর একবার বলে নিই। সাম্প্রতিককালে অনেক অনুশীলনের ফলে সোভিয়েট বাশিয়ার পণ্ডিতমহল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে সকল সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির ওপব যে লিপি খোদিত

আছে, তা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত। হরপ্পা সভ্যতার এই লিপিগুলির 'ভাষা'র প্রশ্নই গোড়া থেকে পণ্ডিতমহলকে বিব্রত করে তুলেছে। এ সম্বন্ধে দুটি মত গড়ে উঠেছে। একটি হচ্ছে লিপিগুলি আর্য ভাষায় রচিত। সাম্প্রতিককালে এ মতের পোষক হচ্ছেন এস. আর. রাও (S. R. Rao) ও বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতগণ। আর অন্য মত হচ্ছে, এগুলি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত। এ মতেব পোষক হচ্ছেন তামিলনাড়ুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ড. আর. নাগস্বামী, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিকিটা গুরোব, অধ্যাপক ড. জ্ঞরোজোব (Knorozov) ও ফিনল্যান্ডের পণ্ডিত ড. আস্কো পারপোলা। রুশ পণ্ডিতগণ তাঁদের অনুশীলনের ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হচ্ছে (১) লিপিগুলি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষায় রচিত, (২) লিপিগুলি ধর্মমূলক (Hierographic), (৩) কিছু লিপি জ্যোতিষিক, (৪) লিপিগুলিতে গুণবাচক শব্দগুলি বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে, (৫) পরিবর্তনশীল (Variable) চিহ্নগুলি যুগ্মমূল্যবিশিষ্ট। দু-একটা উদাহরণ দিয়ে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন ক্ষেত্রে এরূপ যুগ্ম চিহ্নের অর্থ হচ্ছে কৃত্তিকা নক্ষত্র, আবার কোন ক্ষেত্রে মৃগশিরা নক্ষত্র। (৬) লিপিগুলিতে বহুবচনের পরিবর্তে বিশেষ্যের সঙ্গে সংখ্যাবাচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সীলমোহরগুলির ওপর যে সকল প্রাণী বা অন্য কোনরূপ প্রতীক চিত্র আছে, তার অর্থও তাঁরা ভারতীয় পুরাণসমূহে বিবৃত কাহিনীর সাহায্যে বের করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে কবেন যে, যম শিব, স্কন্দ প্রভৃতি হিন্দু দেবতাগণ প্রাক-বৈদিক দেবতা। তাঁবা আরও বলতে চেয়েছেন যে, ঔপনিষদিক যুগেই বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতির একটা সংশ্লেষণ ঘটেছিল, এবং তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে 'হিন্দু সংস্কৃতি'। ডঃ অতুল সুর ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন করে, স্বাধীনভাবে তিনি ওই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংশ্লেষণের কথা খাটলেও হরপ্পা সভ্যতার লিপিগুলি সম্পর্কে এই মত খাটে না। হরপ্পা সভ্যতার ভাষাটা যে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য রুশদেশীয় পণ্ডিতগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেটা সংক্ষেপে এখানে বলা প্রয়োজন। কম্পিউটারের সাহায্য তাঁরা প্রথমে চিহ্নগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তারপর তাঁরা ওর বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সংস্কৃত, সুমেরীয়, ব্রাহুই, দ্রাবিড়, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য তুলনা করেছেন। এর ফলেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন যে, ওই ভাষার গঠন ব্যাপারে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাসমূহেরই সবচেয়ে বেশি মিল আছে। দ্রাবিড়রাই সিন্ধুসভ্যতার প্রধান নায়ক। এই সভ্যতা মূলতঃ দ্রাবিড়দেরই অবদান। এ নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। মিশর, সুমের, চীন প্রভৃতি দেশের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির চেয়ে হরপ্পা সভ্যতা পুরাতন। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলি

তাই কোন না কোনওভাবে হরপ্পা সভ্যতার কাছে ঋণী। হরপ্পা, কোটদিজি, কালিবঙ্গান ইত্যাদি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়ে দেখা গেছে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতাব নিচের তলার স্তরে প্রাক-হরপ্পীয সভ্যতাব বহু নিদর্শন রয়েছে। পণ্ডিতেরা নানাভাবে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হবপ্পা সভ্যতা ভারতবর্ষে কোনও আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। পরবর্তীকালে 'ভাবতীয় আর্য সভ্যতা'ব (Indo-Aryan Civilization) মত হবপ্পা সভ্যতা কোন বহিরাগত বা আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। এই সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণ দেশজ সভ্যতা। দেশজ-সভ্যতার বিবর্তনেব পবিণতিতেই হবপ্পা সভ্যতাব সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই দেশজ সভ্যতা পশ্চিমে আফগানিস্তান, বালুচিস্তান থেকে পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছি, হরপ্পীয সভ্যতাকে মোট পাঁচটি পর্বে ভাগ কবা হযেছে। তাব মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব ছিল গ্রামীণ সভ্যতা। চতুর্থ পর্বেই হরপ্পা সভ্যতা নাগরিক ৰূপ ধাবণ করে। এটাই হবপ্পা সভ্যতাব পবিণত (Mature) পর্বেব সভ্যতা। এই পর্বেই হবপ্পা সভ্যতাব চরম বিকাশ ঘটে। পঞ্চম পর্ব ছিল হবপ্পা সভ্যতাব অবনতি বা পতনেব পর্ব। বলা বাহুল্য, হবপ্পা সভ্যতাব প্রথম তিন গ্রামীণ পর্বেব সভ্যতাকেই আমরা 'প্রাক-হরপ্পীয়' সভ্যতা বলি। আব চতুর্থ পর্বে যখন এ সভ্যতা নাগরিক ৰূপ ধাবণ কবেছিল এবং এব চবম বিকাশ ঘটেছিল, সেটাই প্রকৃত হবপ্পা সভ্যতা। আব পঞ্চম পর্বেব সভ্যতাকে বলা হয উত্তবকালীন হবপ্পা সভ্যতা। প্রাক-হবপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিযেছে পাকিস্তানেব হবপ্পা, মহেঞ্জোদারো, আমবি ও কোটদিজিতে, ভাবতেব কালিবঙ্গান, সান্ধনওযাল ও নাগওযাড়াতে আফগানিস্তানেব মুণ্ডিগাকে ও বালুচিস্তানেব পেবিযানো ঘুণ্ডাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব্-সাদাত, রানা ঘুণ্ডাই, আঞ্জিবা, পাণ্ডি ওয়াহি, শাহ ডামব্ কুল্লি ইত্যাদি স্থানে।

পূর্ব ও দক্ষিণ বালুচিস্তান ও দক্ষিণ আফগানিস্তানে যে সভ্যতাব প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা ভাবত-পাকিস্তান উপমহাদেশের প্রাক্-হরপ্পীয গ্রামীণ সভ্যতাব এক আঞ্চলিক সংস্কবণ মাত্র। এখানে প্রাদুর্ভূত প্রাক-হরপ্পীয সভ্যতার প্রথম দশার লোকদের বৃত্তি ছিল পশুপালন ও সীমিত পরিমাণ ভূমিকর্ষণ। এই দশাব লোকবা গরু, মেষ ও ছাগল পালন করত ও সীমিত পরিমাণে দানাশস্য উৎপাদন কবত। তারা পাথরের তৈরি ছুবির ফলা, বাটালি ও বাণমুখ তৈরি করত। হাড়েব তৈবি সূচও তৈবি কবত। এছাড়া তারা হাতে-তৈরি মৃৎপাত্র ও মেঝেব ওপব পাতবাব জন্য চাটাই তৈরি করত। অদগ্ধ, রোদে শুকানো ইট দিয়ে তাবা ঘরবাড়ি তৈবি করত এবং বান্নাব জন্য ঘবের ভিতরে উনুন তৈরি করত। এই দশার বয়স নির্ণীত হয়েছে ৩৭০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। এই দশার কৃষ্টির নিদর্শন আমরা পাই দক্ষিণ আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাকে ও উত্তর বালুচিস্তানের কিলিগুল মহম্মদে, রানা ঘুণ্ডাইয়ে, সুরজঙ্গল ও ডাবর কোটে, ঝোব উপত্যকার পেরিয়ানো ঘুণ্ডাইয়ে এবং আঞ্জিরায়। বর্তমান ভারতের বহু জায়গায় এই ধরনের প্রাক হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

হরপ্পীয় সভ্যতার এই পাঁচটি দশা নিয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঁচটি দশাব প্রথম তিনটি দশা হল প্রাক্-হরপ্পীয় পর্ব। আর চতুর্থ ও পঞ্চম দশা দুটি হরপ্পীয়-পর্ব। আবারো বলি, চতুর্থ দশায় আমরা প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতাকে নাগরিক রূপ গ্রহণ করতে দেখি। ভারতের মধ্যে কালিবঙ্গানের যে স্তরে হরপ্পীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, ঠিক তার নিচের স্তরেই আমরা প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র ছাড়া হরপ্পা সভ্যতার অন্যান্য যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হল ঃ মূল্যবান পাথরের তৈবি ছুরির ফলা (কোনও কোনটি করাতের মত দাঁতবিশিষ্ট), পুঁতির গুটিকা, নরম পাথবেব চাকতি, পোড়ামাটির ও মূল্যবান পাথরেব অন্যান্য দ্রব্য, তামার ও পোড়ামাটিব তৈরি হাতের চুড়ি ও বালা, শাঁখা ও কলি, ছেলেদের খেলনার গাড়ি, বলদ, অস্থিনির্মিত ফুটো কববাব যন্ত্র (Point) ও একটি তাম্র-নির্মিত বিচিত্র কুঠাব।

কোটদিজি, আমবি ও কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থানের উৎখননে আবিষ্কৃত প্রাক্-হবপ্পীয সভ্যতাব নিদর্শনসমূহ থেকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত কবেছেন যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলেব সভ্যতাব একই ধবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল, যদিও তাদেব মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল। এইসব প্রাক-হরপ্পীয সভ্যতাব কৃষ্টিকেন্দ্রগুলি ছিল এই বকম ঃ

১। আফগানিস্তানে—মুণ্ডিগাক।

২। বালুচিস্তানে—পেবিয়ানো ঘুণ্ডাই, কিলিগুল মহম্মদ, ডামব সাদাত, বানা ঘুণ্ডাই,. টোগাউ, শাহ ডামব, আঞ্জিবা, নাল, নুনদাবা, কুল্লি, গাজি শাহ, কোটবাশ, পাণ্ডি ওয়াহি।

৩। পাকিস্তানে—হরপ্পা, আমরি ও থমাজ্ঞো বুথি থাররো, কোটদিজি, ঘগ্‌গর-হাকরার শুষ্ক খাত।

৪। ভাবতে—কালিবঙ্গান, সান্ধনওয়াল, রাজস্থানের মরু-অঞ্চল, গুজবাটেব নাগওয়াড়া। কিন্তু লোথালে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওযা যাযনি।

মুণ্ডিগাকের প্রত্ন নিদর্শন থেকে জানা গেছে এখানের সভ্যতা কমপক্ষে ৫২০০ বছরেব পুরানো। আর কিলিগুল মহম্মদের প্রাচীন সভ্যতার বয়স ৫৭০০ বছব কিংবা তার কিছুটা বেশি। প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা মূলত গ্রামীণ সভ্যতা। অনেকে বলছেন, এই সমযেব লোকেরা দূরদেশেব সঙ্গে বাণিজ্যে বা বিনিময়ে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু একটা গ্রামীণ সভ্যতা কেমন করে এক বৃহৎ ও প্রবল সমৃদ্ধিশালী নাগবিক সভ্যতায় বিবর্তিত হয়েছিল, তা প্রমাণ করবার জন্য যে ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক ও পরিবেশঘটিত নিদর্শন বা প্রমাণের প্রয়োজন হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্রে সেগুলি আজও অনাবিষ্কৃত। কিলিগুল মহম্মদে ব্যাপক উৎখননের ফলে এবং বালুচিস্তানের অন্যান্য স্থানে খননের ফলে জানা গেছে এখানকার বিভিন্ন স্থানের কৃষ্টির মধ্যে ঐক্য ছিল। আবাব আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাকের খননকার্য থেকে পাওয়া গেছে কিলিগুল মহম্মদের

অনুরূপ কৃষ্টিসমূহ। অনেকে অনুমান করেন যে, দক্ষিণ আফগানিস্তান ও কান্দাহারের সমতলভূমির মাঝখান দিয়ে যে প্রাচীন বাণিজ্য পথ ছিল, সেই পথ দিয়ে এই কৃষ্টি পশ্চিম থেকে আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এমন অনুমান কেবল অনুমান মাত্র। এই সভ্যতা ওখানে গিয়েছিল পূর্বদিক থেকেই।

আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাকের নিচের থেকে তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের নিদর্শন। পাওয়া গেছে মাটির তৈরি ভারতীয় ককুদবিশিষ্ট বলদ ও ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তি। এগুলি এই সভ্যতার ভারতীয় চরিত্রই ইঙ্গিত করে। মুণ্ডিগাকের চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ নিচ থেকে তিনটি স্তরের উপরের স্তরে দেখা যাচ্ছে যে, এই যুগের লোক সুরক্ষিত প্রাকারবেষ্টিত নগরে বাস করছে এবং উঁচু টিবির উপর রৌদ্রদগ্ধ ইটের মন্দির নির্মাণ করেছে। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নগরটি দুবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং দুবারই নগরটিকে পুনর্নির্মিত করা হয়েছিল। এরা মৃৎপাত্রের ওপর লাল প্রলেপ দিয়ে, তার ওপর নানারকম স্বভাবজাত অলঙ্করণ করত। মৃৎপাত্রের ওপর এই সব অলঙ্করণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়—পাখি, বন্যহাঁস, বলদ ও অশ্বত্থ পাতা। ক্ষুদ্রকায়া মৃন্ময়ী মূর্তিও বহু পাওয়া গিয়েছে। এ সবের ভিত্তিতে মুণ্ডিগাকের এই চরম যুগকে হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক বলে ধরা হয়েছে, তবে এ সম্বন্ধে কোন রেডিয়ো-কার্বন-১৪ পরীক্ষা করা হয়নি। সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তই এখন গৃহীত হয়েছে যে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল ভারতেই। তা পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছিল। মুণ্ডিগাকই ছিল সেই বিস্তারের পশ্চিম সীমানা।

আগেই বলা হয়েছে আফগানিস্তান অঞ্চলেই সম্ভবত নবোপলীয় যুগেই সর্ব প্রথম গম ও যবের চাষ হয়। তারও বেশ কিছুটা আগেই বাংলায় ধানের চাষ শুরু হয়েছিল এবং সেই চাষ চীনদেশে যায়। তবে প্রথম গম ও যব চাষের কৃতিত্ব আফগানিস্তানেরই প্রাপ্য। হিন্দুকুশ পর্বতের এই অঞ্চলেই এক সময় কৃষিকার্যের প্রবল বিকাশ ঘটেছিল। সেই বহু পুরাতন কৃষি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতেই সম্ভবত একালের অনুন্নত আফগানিস্তানে প্রায় সত্তর রকমের গম পাওয়া যায়। আফগানিস্তান অঞ্চলে অন্তত ছয় হাজার বছর আগে যে কৃষি বিপ্লব ঘটেছিল তারই অবশেষ রয়েছে ওই সত্তর রকমের গমের মধ্যে।

আবারও বলি, ভারতে নবোপলীয় যুগের কৃষ্টি স্বাধীনভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল এবং তা কালের বিবর্তনে পরিণতি লাভ করেছিল তাম্রাশ্ম সভ্যতায়। এইসব সভ্যতায় ভারতের সঙ্গে সামিল ছিল বর্তমানের আফগানিস্তান, বালুচিস্তান ইত্যাদি। ভারতবর্ষ তখন কেবল সিন্ধু উপত্যকা অবধি বিস্তৃত ছিল না। পশ্চিমে তার বিস্তার ছিল সিন্ধু উপত্যকা, বালুচিস্তান পেরিয়ে কাবুল উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত অবধি। অনেকে আবার এও মনে করেন যে, বর্তমানের ইরাক-ইরানে এককালে যে অতিবিখ্যাত প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল তাও সম্ভবত ভারতবর্ষের এই প্রাচীন সভ্যতার অবদান।

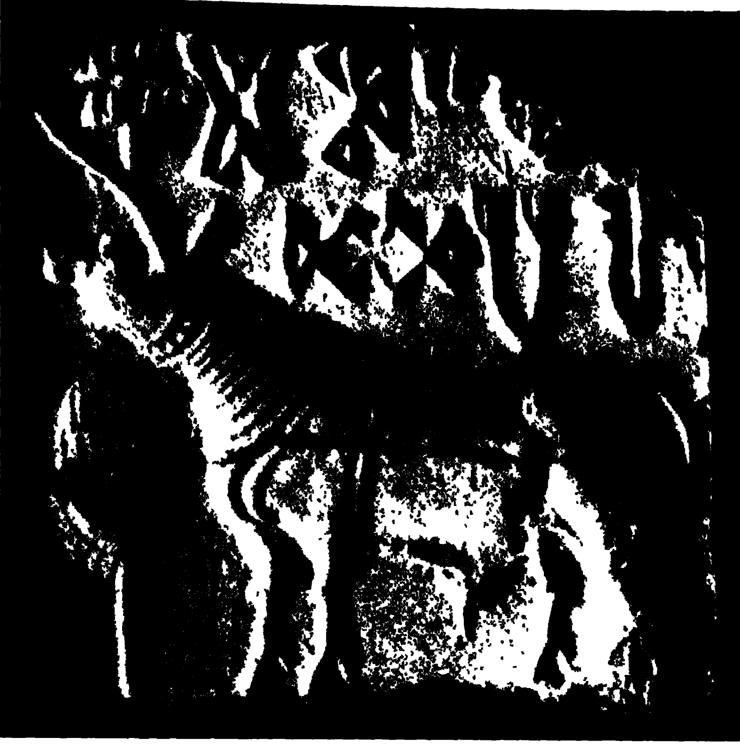
হরপ্পা সভ্যতার পর ভারতবর্ষে যে সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল তা হল 'ভারতীয়-আর্য সভ্যতা' (Indo-Aryan Culture)। এই আর্য সভ্যতা এবং হরপ্পা সভ্যতা কোনমতেই এক নয়। নানা কাবণে পণ্ডিতেরা একমত হয়েছেন যে, হরপ্পা সভ্যতা আর্য সভ্যতা নয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা হবে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে অনেক অলংকারও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতায় সোনার গহনা, পুঁতি এবং নানা মূল্যবান পাথবের অলংকার ব্যবহার করা হত। সবুজ বর্ণের পাথর (Jade) এবং নীলকান্তমণির (Lapis-lazuli) অলংকার ব্যবহৃত হত। সোনার ফলক (Plaque), সোনার আর্মলেট (Armlet), সোনার শঙ্কু (Conical ornament), কানের মাকড়ি, গলার হাব, কোমবের মেখলা—এইসব শ্রেণীর নানা অলংকার আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই সভ্যতায় তামার বা তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতু দিয়ে গড়া ধাতুব অস্ত্র প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। অস্ত্রগুলি নির্মিত হত দুই রীতিতে—ঢালাই কবে (Casting) এবং পিটিয়ে (Forging)। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে কুঠাব ও বর্শাব ফলক, বঁড়শি, আয়না ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এই সমস্তই হরপ্পার অবদান। নবোপলীয সভ্যতাকে তাম্রাশ্ম সভ্যতায উন্নীত কবাব সমস্ত কৃতিত্বই হবপ্পা সভ্যতাব। উন্নত নগর সভ্যতা হরপ্পীয়দেরই অবদান।

এই অত্যুন্নত সভ্যতা যে মানুষেবা গড়েছিল তাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই উচ্চমানের সংস্কৃতি যাবা গড়ে তুলেছিল তারা কোন্ গোষ্ঠীব মানুষ ছিল সে বিষয়ে পিগোট বলেন, যে সমস্ত কঙ্কাল পাওযা গেছে তাদেব খুলির হাড় দেখে অনুমান করা যায যে তাবা প্রধানত আদি অস্ট্রেলীয (Proto-Australoid) শ্রেণীর ছিল। এদের ললাট অনুন্নত এবং নাসিকা অনতিপ্রশস্ত। আর এক শ্রেণীর করোটি পাওয়া গেছে যা বর্তমান ভারতেব আদিম অধিবাসীদের অনুরূপ মানুষের পরিচয় দেয়। অপর এক শ্রেণীর কঙ্কাল পাওযা যায, যা ইঙ্গিত করে এদের মস্তক লম্বা ছিল, নাসিকা অপ্রশস্ত। ফ্রিডরিকস (Friedericks) ও মুলার (Muller)-এর ধাবণায় তারা আদি আর্মেনীয় (Armenoid)। মনে হয়, হবপ্পার বেশির ভাগ অধিবাসীই ছিল আদি-অস্ট্রেলীয় এবং দ্রাবিড়ীয় শ্রেণীর।

হরপ্পা সভ্যতার এই মানুষগুলি প্রায় ১৫০০ বছর তাদের উচ্চ সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বসবাস করছিল। এরপর প্রায় ৪০০০ বছর আগে পশ্চিম দিক হতে এক নতুন যাযাবর-জাতি এসে তাদের পর্যুদস্ত কবেছিল। তারা প্রথমে এসেছিল আফগানিস্তান অঞ্চলে। তারপর বালুচিস্তান পার হয়ে তারা চলে আসে সিন্ধু উপত্যকায়। ঐতিহাসিকরা বলছেন, এরা পরবর্তীকালের বৈদিক সংস্কৃতির বাহক আর্যজাতি। এরা ছিল যাযাবর এবং গান্ধার তথা আফগানিস্তানে প্রবেশকালে ঘোরতব বর্বর। এই বর্বর যোদ্ধার জাত আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার বহু নগর ধ্বংস করে। অল্প সময়ের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে শুরু করে প্রয়াগ বা এলাহাবাদ



চিত্র ৩৫
হরপ্পার সীলমোহর

অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে। বিজয়ী বর্বর আর্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের হরপ্পীয় সভ্যতার মিশ্রণ ঘটে। সৃষ্টি হয় ভারতীয়-আর্য সভ্যতা (Indo-Aryan Civilization) বা ভারতীয়-আর্য সংস্কৃতি (Indo-Aryan Culture)। পরবর্তীকালে আমরা যাকে হিন্দু সভ্যতা বলি তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হল হরপ্পা-সংস্কৃতি এবং মাত্র পঁচিশ ভাগ হল এই বর্বর আর্যদের সংস্কৃতি।

এখন প্রশ্ন হল, এই বর্বর, আদিম আর্য জাতির বাসভূমি কোথায় ছিল। আগেই বলেছি, এ নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক আছে। জার্মান পণ্ডিত কোসিনা (Kosinna) প্রতিপাদিত করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তাদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তর ইউরোপীয় উপত্যকায়। ভারতীয় গবেষক মনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রাচীন আর্য জাতির বাস ছিল ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দের কোন সময়ে উত্তর মেরু অঞ্চলে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি তৃতীয় মত গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক জে এল. মায়র্স (J.L Myers), হ্যারল্ড পীক (Harold

Peake) এবং গর্ডন চাইল্ড (V. Gordon Childe) এই মতটির সমর্থক। তাঁদের ধারণায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এদের নিবাস ছিল দক্ষিণ রুশিয়াতে এবং তার পূর্বাঞ্চল কাস্পিয়ান সাগরের তীরে। এরা খানিকটা যাযাবর ছিল তবে সামান্য কৃষিকার্য করত এবং স্থায়ী বসতিও স্থাপন করত। এরা মেষ, গরু, অশ্ব পালন করতে শিখেছিল। এরা মৃতদের সমাধিস্থ করত।

পিগোটের ধারণায় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ শতাব্দীর পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারত একাধিক জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। ভারত-



চিত্র ৩৬
হরপ্পার মৃৎপাত্রের গায়ে খোদিত কাক ও ধূর্ত শেয়ালের গল্প

ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষও তাদেব অন্যতম ছিল। এই সময পাবস্যেব সীমানায় কাসাইট (Kasite) এবং মিটানিযানদেব (Mittanian) স্থাপিত রাজ্য গড়ে ওঠে। তারা ভাবত-ইউবোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হুইলাব-এর ধাবণা এই সমযই ঋগ্বেদে বর্ণিত প্রাচীন আর্যজাতি উত্তব-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ কবে এবং হবপ্পা সংস্কৃতির ধাবক যে মনুষ্য-গোষ্ঠী ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয। এই সংঘর্ষে যাবা অধিনাযকেব ভূমিকা গ্রহণ কবে তাদেব আদর্শেই ঋগ্বেদের দেবতা ইন্দ্রের চবিত্রটি কল্পিত হযেছে। তিনি বলেন, ঋগ্বেদে 'পুবন্দব' কথাটি ইন্দ্রের উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত। ইন্দ্র সিন্ধুনদের অববাহিকায যে সভ্য প্রাচীন জাতিদেব শহব ছিল সেইগুলি ধ্বংস কবেন বলেই তাঁব নাম 'পুবন্দব'। সিন্ধুব অববাহিকাবাসীবা প্রস্তবেব এবং মৃত্তিকাব দুর্গ নির্মাণ কবত। তাদেব বেশ কয়েকটিব ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদবা এই অঞ্চলে সম্প্রতি আবিষ্কাব কবেছেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র এই ধবনেব বহু দুর্গ ধ্বংস কবেছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে তা এই সকল দুর্গকেই সূচিত কবে।

বৈদিক সাহিত্যে যে জাতিব সঙ্গে আর্যবা সংঘর্ষে লিপ্ত হযেছিল তাদেব দস্যু বা দাস বলে বর্ণনা কবা হযেছে। তাদেব আকৃতি সম্পর্কে বলা হযেছে, তাবা কৃষ্ণকায এবং 'অনাস' অর্থাৎ তাদেব নাক চ্যাপ্টা ছিল। আমবা পূর্বেই বলেছি, এই প্রাচীনতব জাতিব মানুযেব অধিকাংশ ছিল আদি অস্ট্রেলীয গোষ্ঠীভুক্ত। তাবা কৃষ্ণকায ছিল এবং তাদেব নাক চ্যাপ্টা ছিল। আব আর্যবা ছিল ককাসযেড (Caucasoid) মহাজাতিব নর্ডিক (Nordic) গোষ্ঠীব লোক।

উন্নত হবপ্পা সভ্যতাব মানুযদেব সঙ্গে বর্বব আর্যজাতিব যে প্রবল সংঘর্ষ হয়েছিল তাব বহুল প্রমাণ মেলে ঋগ্বেদেব বহু সূক্তে। আর্যবা যে এক বর্বব ও যাযাবব জাতি ছিল, তা এখন অধিকাংশ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও নৃতাত্ত্বিক স্বীকাব কবেন। পুনবাবৃত্তি হবে জেনেও এই প্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুব তাঁব 'মানব সভ্যতাব নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইটিতে যা বলেছেন তা তুলে ধবছি ঃ

"হবপ্পা সভ্যতা যে আর্যসভ্যতা নয়, সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। হবপ্পা সভ্যতাব লোকবা এক উন্নত বৈষযিক সভ্যতাব ধাবক ছিল। অপব পক্ষে আর্যরা ছিল এক বর্বর জাতি। বস্তুত আর্যরা যে এক বর্বর জাতি ছিল, তা গত ষাট-সত্তব বছবেব প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কাব ও বৈদিক অনুশীলনের ফলে জানা গিযেছে। এ সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য প্রকাশ কবেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি গর্ডন চাইল্ড (V Gordon Childe)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁব সুপ্রসিদ্ধ 'দি আবিযানস্' (The Aryans) গ্রন্থে বলেছিলেন যে, আর্যদেব বর্বরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের কার্যকলাপে। জগতেব যেখানেই গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিল সেখানেই তারা সেখানকার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। চাইল্ড-এর এই মন্তব্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতাসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, পণ্ডিতসমাজ আজ একবাক্যে

স্বীকার কবে নিয়েছেন। এখন আর্যদেব সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়, তখনই তাদের বর্বর জাতি বলে অভিহিত কবা হয়। সর্বত্রই তারা উন্নতমানের প্রাগার্যসভ্যতাকে ধ্বংস কবে, নিজেদের হীন ও বর্বব সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে বর্তমান লেখকই প্রথম প্রমাণ করেন যে, মাত্র এক জাযগাতেই তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হচ্ছে ভাবতবর্ষ। ভারতবর্ষে এসে তারা যে উন্নতমানেব সভ্যতার সম্মুখীন হযেছিল এবং যাদের বাহকদের বিরুদ্ধে তারা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই আর্যদেব মাথা অবনত করতে হযেছিল। কেননা হরপ্পা সভ্যতাব মধ্যেই আমরা দেখি পরবর্তীকালেব উন্নত হিন্দু সভ্যতাব মূল উপাদনসমূহ।"

হরপ্পীয়দের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে আর্যরা বিজয়ী হয়। আব বিজিত হরপ্পীয় তথা প্রাগার্য বা অনার্য লোকরা পববর্তীকালে বৈদিক তথা ভাবতীয় আর্য-সভ্যতাব সমাজে একটি নিকৃষ্ট স্থান অধিকাব কবে। নতুন আগন্তুক জাতিরা নিজেদেব আর্য বলত এবং যাদেব জয় কবে তাবা এ দেশে বসতি স্থাপন কবেছিল তাদের বলত 'দাস বা দস্যু'। এবাই সম্ভবত পবে শূদ্র জাতিতে পরিণত হয। ঋগ্বেদে আমাদেব এই প্রতিপাদ্যেব সমর্থনে বহু প্রমাণ রয়েছে এব সূক্তগুলিতে।

আবারো বলি, দাস জাতিকে পবাজিত কবে তাদেব নিকৃষ্ট স্থানে স্থাপিত কবায যে দেবতা প্রধান ভূমিকা নিযেছিলেন তিনি হলেন ইন্দ্র। বৃত্রকে দমন কবা ছাড়া এটি তাঁব অন্যতম প্রধান ভূমিকা। একে ঐতিহাসিক ভূমিকাও বলা যেতে পাবে। সম্ভবত ইন্দ্র একজন ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন এবং বর্বব আর্যদের বিজয় অভিযানে তিনিই মূল ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁকে দেবত্বের পদে উন্নীত কবা হযেছিল। আর্য ও অনার্য নিয়ে বিশদ আলোচনা পববর্তী পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

এখানে শুধু এইটুকু বলে নিই যে, হরপ্পা সভ্যতার বহু নগব বর্বর আর্যরা ধ্বংস করেছিল সেচের জন্য নির্মিত নদী-বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে নদীর জল নগবেব মধ্যে প্রবেশ কবিয়ে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি কবে। এ সম্পর্কে এক দল ঐতিহাসিক লিখেছেন ঃ

"Signs of flooding were discovered in the Indus cities, mainly in the form of silt deposits. It was thus considered that this flooding explanation could explain the fall of the indus cities and was considered as the most viable alternative to the idea of an Aryan invasion. It was subsequently discovered, however, that flooding had been pointed out as a consequence several decades before the actual discovery of flooding. It is now accepted that flooding was caused by the Aryans' destructiuon of the Indus dams and irrigation systems and it was another merely aspect of the genocide. In sanskrit 'Vritra' is an obstacle, and denotes a barrage

or blockage. It is thus a word for dam. Dams now called Gebr-band are found on many water-courses of the western parts of the Indus region. Aryans shattered the dam system of the Indus, leading to silt deposits in Mahenjodaro Aryan settlements occur atop the destroyed cities towards the end of the civilization. Those are premitive brick structures made of materials taken from the ruins of the preceding town [Harappan cities]। এই সব নিয়ে কিছুটা আলোচনা কবা হয়েছে পববর্তী পরিচ্ছেদে। বর্বর আর্যদেব কথা ছেড়ে হরপ্পার সভ্য অনার্য তথা প্রাগার্যদেব কথায় ফিবে আসি।

হরপ্পা সভ্যতা যেমন এক অনন্য সভ্যতা, যা ভাবতের গৌরবময উজ্জ্বল অতীতকে পৃথিবীব সামনে মেলে ধবে, তেমনি প্রচাব কবে ভাবতেব প্রাগার্য বা অনার্য গরিমা। বর্বর আর্যদেব তুলনায হবপ্পাব ওই অনার্যরা যে কত শতগুণ উন্নত ছিল তা বলে বোঝানো মুশকিল। হবপ্পা সভ্যতার যে সব অবদানেব কথা কিছুক্ষণ কথা কিছুক্ষণ আগে বলা হযেছে সেগুলিব শ্রেণীবদ্ধ আলোচনা করলেই বোঝা যাবে মানবসভ্যতার ইতিহাসে হরপ্পার অনার্যদেব দান অসীম এবং তুলনাহীন। পৃথিবীকে সভ্যতাব আলো দেখিযেছে হবপ্পা। হরপ্পার অনার্যদেব অনবদ্য অবদান ভারতবর্ষকে করেছে সব সভ্যতাব আদি জননী। বিখ্যাত ঐতিহাসিক V. Gordon Childe-এর সেই পুবাতন উদ্ধৃতিব পুনবাবৃত্তি কবে শুরু কবা যাক ঃ

" India confronts Egypt and Babylonia by the 3rd millennium with a thoroughly individual and independent civilization of her own, technically the peer of the rest And plainly it is deeply rooted in Indian soil. The Indus civilization represents a very perfect adjustment of human life to a specific environment. And it has endured, it is already specifically Indian and forms the basis of modern Indian culture. [New Light on the most Ancient East, 4th Edition, 1952]"

এই সভ্যতা মিশর, সুমের এবং মায়া সভ্যতার চেযে প্রাচীন একথা আগেই বলেছি। এই সভ্যতার গোড়াপত্তন হয ৫৩০০ বছব আগে। এর চরম উন্নতির কাল ২৬০০ থেকে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। আব এই সভাতা টিকেছিল ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অবধি। তারপর বিজয়ী আর্যদের বর্বব সংস্কৃতিব সঙ্গে এর মিশ্রণ ঘটে এবং উদ্ভূত হয় ভাবতীয়-আর্য-সংস্কৃতি [Indo-Aryan Culture]। এ সব কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। প্রায় ১৫০০ বছর ধরে টিকে থাকা হরপ্পার এই নগব সভ্যতা মানব সভ্যতাকে কী কী দিয়েছে সে কথায় আসি।

হরপ্পা সভ্যতা প্রাথমিকভাবে ৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে

এই সভ্যতা ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আফগানিস্তানের 'মুণ্ডিগাক' থেকে পশ্চিমবঙ্গের 'পাণ্ডুরাজাব ঢিবি' এবং গুজরাটের লোথাল থেকে উত্তবে হিমালয়েব পাদদেশে শিবালিক পাহাড অবধি এই বিস্তীর্ণ এলাকায কমপক্ষে ১৭০টি জাযগায আবিষ্কৃত হয়েছে হবপ্পা সভ্যতার কেন্দ্র। কোন কোন কেন্দ্রে সময় ভিত্তিক সাত-আটটি পর্যন্ত স্তব পাওযা গেছে। আবাব বহু কেন্দ্রেব নিচেব দিকের স্তবে আবিষ্কৃত হযেছে প্রাক-হবপ্পীয় যুগেব বহু নিদর্শন। এই প্রাক-হবপ্পীয সভ্যতাই রূপান্তরিত হয় হবপ্পাব নাগবিক সভ্যতায। হবপ্পাব সবচেয়ে বড অবদান হল এব উন্নত এবং পবিকল্পিত নগবসমূহ। জগতেব প্রাচীনতম ইষ্টকনির্মিত পযঃপ্রণালীযুক্ত নগবগুলিব স্রষ্টা হল এই হবপ্পা সভ্যতা। এব বহু নগবীব পবিকল্পনা এতোই উন্নত ছিল যে, একবিংশ শতাব্দীব বহু আধুনিক শহবও এগুলিব কাছে লজ্জা পাবে। সুসভ্য এবং সমৃদ্ধিশালী সভ্যতাব যে সব লক্ষণ থাকে তাব সবগুলিই পবিপূর্ণভাবে আমবা দেখতে পাই হবপ্পা সভ্যতাব নগবসমূহে।

এই সভ্যতাব নগবসমূহেব পবিকল্পনা প্রায একই বকম। এব প্রধান নগবসমূহেব মধ্যে প্রধান চাবটি নগব হল—মহেঞ্জোদাবো, হবপ্পা, কালিবঙ্গান এবং লোথাল। সব নগবেব বাস্তাঘাট ছিল অত্যন্ত সুপবিকল্পিত। নগবেব বড বাস্তাগুলি ছিল ৩০ ফুট থেকে ৩৩ ফুট চওড়া। কতকগুলি বাস্তা ছিল ২৮ ফুট চওড়া। গলিগুলিও ছিল ৭ ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট চওড়া। বড কথা হল বাস্তাগুলি ছিল একদম নাক বরাবর সোজা। একটা বাস্তা আবেকটাকে লম্বভাবে ছেদ কবেছে। আর বাস্তাগুলিও যেন তৈরি কবা হযেছিল কম্পাসেব সাহায্যে। প্রতিটি বাস্তায প্রস্থেব হেবফের কোথাও দু-তিন ইঞ্চির বেশি নেই। ৩০ ফুটে এই তিন ইঞ্চিব পার্থক্য দেখে সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন যে, রাস্তা নির্মাণেব কাজে হবপ্পীযবা নিশ্চযই কম্পাস ব্যবহাব কবতো। বাস্তা-ঘাট, অলি-গলি সব ছিল একদম সবলবেখাব মত সোজা। এবং এগুলি নির্মিত হযেছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই।

নগবেব ঘরবাড়ী দগ্ধ ও অদগ্ধ ইট ও পাথব দিয়ে নির্মিত হত। প্রত্যেক বাড়ীতে কূপ থাকতো। দেওযালেব ভিতব লুকানো [Concealed] পাইপ দিয়ে বাড়ির দূষিত জল বাস্তায বাঁধানো পাকা পযঃপ্রণালীতে পডতো। রাস্তাব সে পযঃপ্রণালী সুন্দবভাবে ঢাকা থাকতো। সে পয়ঃপ্রণালী বাস্তাব দু'ধারে থাকতো। এমন কি রাস্তাব মাঝখান দিযেও পয়ঃপ্রণালী নিয়ে যাওয়া হতো বাস্তাকে ঠিকঠাক বেখেই। দোতলা বাড়ীতে আধুনিককালেব মত পায়খানা, স্নানাগাবও রাখা হত দোতলায এবং তার নোংরা জল ইত্যাদি দেওয়ালের অভ্যন্তরের পাইপেব মধ্য দিযে বাস্তার ওই পয়ঃপ্রণালীতে চলে যেত। হরপ্পীয়রা ৪৫০০/৫০০০ বছব আগে তাদের নগরগুলি যতটা উন্নত এবং আধুনিক করে বানাতে পেরেছিল, তেমনটা কবতে পাবছে না একবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত সভ্য মানুষেরা। এখনও পৃথিবীব নব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশ শহরে ঢাকা পয়ঃপ্রণালী নেই, নেই হরপ্পার নগরগুলিব মত ময়লা জল নিষ্কাশনের উন্নত

ব্যবস্থা। হবপ্পাব এই অবদান আজও তথাকথিত আধুনিক মানুষেব কাছে আদর্শস্থানীয় এবং অবশ্য অনুসবণযোগ্য।

ঐতিহাসিকবা বলছেন, "The city planning includes the alignment of the roads, streets, lanes, bye-lanes, the drainage system and water supply . ... The streets of Mohenjodaro, so far excavated, were sufficiently broad for traffic in that age Though they were unpaved, in the main, and ran East to West and North to South cutting each other at right angles, First Street was paved for some distsnce From what was excavated, it appeared that the town was divided into square and rectangular plots by the streets

The drains were placed ususlly by the sides of the streets, but sometimes they were also carried through the middle of a lane or bye-lane They were well paved and scrupulously covered In bigger drains the cover was built of corbelled arch

The water supply of the town Mahenjodaro, was very elaborate Besides perennial water supply of the River Indus in Mohenjodaro and the river Ravi in Harrappa, there was the provision of drinking water by sinking wells Most of the houses had at least one, the bigger houses two and the exceptionally big houses had three wells "

নগবগুলিতে জল সববরাহেব ব্যবস্থাও ছিল একেবারে আধুনিক। পবিকল্পিত নগবীব যা যা প্রযোজন তাব সব কটিই ছিল হবপ্পা সভ্যতাব নগবগুলিতে।

" As a planned city, the thoroughfares were laid with precision to compass. The deviation is so small that, that may be due to the want of a modern compass, In short distance the deviation is negligible.

"This very mode of the careful laying of the streets and lanes indicates that people came to live in Mahenjodaro from an earlier planned and well built city-emporium Most probably they had to leave the ealy settlement, as it become unproductive to their enterprise.

"In the case of Mohenjodaro, it stood alone in its time. In the planning of the city, Mohenjodaro was more modern than some of the most modern towns of the world. She anticipated the modern art of town planning and laying out of thoroughfares."

নগরগুলির মধ্যে ছিল সুদৃঢ় ও উচ্চ প্রাকারবিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগার, স্নানাগার, মন্দির ও সমাধিস্থান। সংঘবদ্ধ নাগরিক জীবনযাপনের সব লক্ষণ এই সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত ছিল। ছিল শৃঙ্খলা-যুক্ত একটা শাসন-ব্যবস্থাও। শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হলেও তা ছিল বেশ শক্তপোক্ত। শক্তপোক্ত ছিল বলেই একেবারে কাঁটায় কাঁটায় পরিকল্পনামাফিক শহর বানাতে পেরেছিল হরপ্পীয়রা। এই শৃঙ্খলাপরায়ণ শাসন ব্যবস্থাও হরপ্পা সভ্যতার আরেকটি মহান অবদান। এ যুগেও এমন শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন পরিকল্পিত নগর নির্মাণের প্রয়োজনে।

হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলিতে সমস্ত পয়ঃপ্রণালী ছিল ঢাকা। ঢাকা পয়ঃপ্রণালী পৃথিবীর কাছে হরপ্পা সভ্যতার অবদান। প্রত্যেক নগরে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত হত বেশ কিছু দোতলা বাড়ী। সেই সব বাড়ীর দোতলাতেও পায়খানা এবং বাথরুম থাকতো। হরপ্পার নগরগুলিতে রাস্তার ধারে সাধারণের জন্যও শৌচাগার থাকতো। সভ্যতার ইতিহাসে হরপ্পাই প্রথম ব্যবস্থা করেছে সাধারণের শৌচাগার। "All the buildings of Mohenjodaro were built by the side of a street or a lane, so that the people could avail the nearest drain for draining their houses. The kitchens were placed generally by the side of the street which did away with the necessity of long drains within the house."

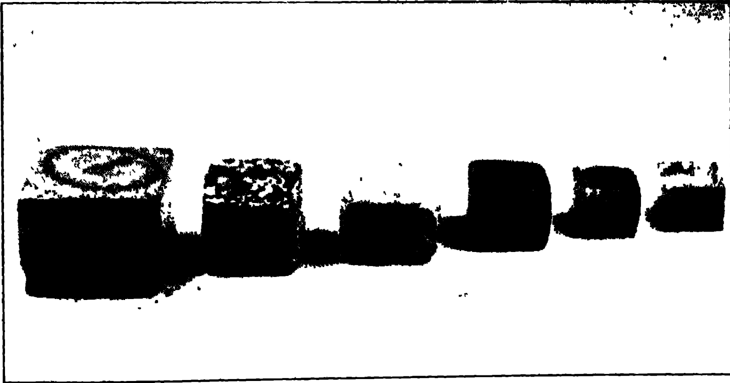
হরপ্পা সভ্যতার আরেকটি অবদান হল মৃৎপাত্র পোড়ানোর জন্য অত্যাধুনিক ভাঁটি (Kiln)-র ব্যবহার। এ ধরনের উন্নত ভাঁটি সুমেরীয়দেরও ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে হরপ্পা এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। হরপ্পার পাঁউরুটি তৈরির চুল্লীগুলিও ছিল একালের মত আধুনিক। কোটি কোটি পোড়া ইট ব্যবহৃত হয়েছে হরপ্পার নগরগুলিতে। এই সব ইট পোড়ানোর জন্য যে সব ভাঁটি ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলিও ছিল যথেষ্ট আধুনিক। হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলিতে সৌধগুলি দোতলা থেকে নয়তলা অবধি উঁচু ছিল। আর এগুলির নির্মাণে ইট এবং পাথর দুই-ই ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে পোড়া ইটই ব্যবহৃত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, ঘরের দেওয়াল প্রভৃতিতে পোড়ানো ইটই বেশি পরিমাণে লাগানো হয়েছে, পাথরের ব্যবহার এগুলিতে অনেক কম।

হরপ্পা সভ্যতা মানুষকে প্রথম দশমিকের হিসাব শিখিয়েছে। এই সভ্যতা ব্যাপকভাবে গণিত চর্চা করেছে, চর্চা করেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও। আবার স্থাপত্য বিদ্যাতেও গণিতের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং গণিতবিদ্যার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতা গভীরভাবে পরিচিত ছিল। জ্যামিতির জ্ঞানও তাদের কম ছিল না। তারা π-এর কথা জানতো, পিথাগোরাসের উপপাদ্যও তাদের অজানা ছিল না। হরপ্পা সভ্যতা পৃথিবীকে দিয়েছে গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং সর্বোপরি দশমিকের হিসাব। এই দশমিকের হিসাব আমরা ৫০০০ বছর পরেও ব্যবহার করে চলেছি আমাদের

সব হিসাব-নিকাশে এবং অঙ্কশাস্ত্রে।

সিন্ধুসভ্যতা যে, বাণিজিক সভ্যতা, এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত। এটা সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার যে, হরপ্পীয় হিসাববক্ষণেব জন্য সংখ্যার ব্যবহার নিশ্চযই ছিল। পাটিগণিত, দশমিক গণন ও জ্যামিতির যে তাদের বিশেষ রকম জ্ঞান ছিল, তার বহুল নিদর্শন আমবা পেযেছি। দৈর্ঘ্য মাপবাব জন্য তাবা যে দশমিক প্রথা ব্যবহার করত, তার প্রমাণ আমবা পেযেছি সরু shell -এব ওপর ১ ৩২ ইঞ্চি অন্তর দাগ-দেওয়া একটা মাপকাঠি থেকে। সিন্ধুসভ্যতাব বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত ইটসমূহের মাপেব ঐক্য থেকেও বুঝতে পারা যায় যে, ওই সভ্যতার ধাবকবা গণিতবিদ্যার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। এছাড়া, পাশাখেলাব ঘুঁটিব ওপবও আমবা এক থেকে ছয পর্যন্ত সংখ্যা-বাচক দাগ দেখি।

ওজন নির্ণযেব জন্য পাথবেব বাটখাবাবও প্রচলন ছিল। হরপ্পায দু'বকম বাটখারা পাওয়া গেছে, Cube আকাবেব ও গোলাকাব। Cube আকাবেব বাটখারাব সবচেয়ে ভাবী ওজন হচ্ছে ২৭৪ ৯ গ্রাম, আব গোলাকৃতি বাটখাবাব সবচেযে ভাবী ওজন হচ্ছে ১১ কিলোগ্রাম। ওজন প্রথা ০ ৮৫৬৫ গ্রাম ওজনেব এককেব (Unit) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এই ভিত্তিতেই ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০, ১২৮০০, গুণিতকে বাটখাবাগুলি তৈবি হত। ওজন-পাল্লাব যে নমুনা পাওযা গেছে, তা আজকালকাব মতই। একটা ব্রোঞ্জ-নির্মিত



চিত্র ৩৭
হরপ্পার বাটখারা

দাঁড়ের দুদিকে তামার পাত্র ঝুলানো থাকত হবপ্পার দাঁড়ি-পাল্লায।

রাস্তাঘাট নির্মাণের সমান্তরলতা ও কোণ (Angle), নগরগুলির দুই সমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভূজ আকারে গঠন প্রভৃতি থেকেও প্রমাণিত হয় যে তাদের রীতিমত জ্যামিতিক জ্ঞান ছিল। মৃৎপাত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যেব ওপর অঙ্কিত নকশাসমূহ থেকেও তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় পাই। অস্ত্রশস্ত্র ও কুঠার প্রভৃতির অক্ষবর্তী

সামঞ্জস্যও তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। বৃত্তাঙ্কন যন্ত্রও (Compass) ব্যবহার করতো হরপ্পা সভ্যতার লোকজনেরা। অনেক বস্তুর ওপর সমান্তরাল বৃত্তাকার রেখাসমূহ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই সব বৃত্ত বা বৃত্তাকার রেখা অঙ্কনের জন্য হরপ্পীয়রা কম্পাস ব্যবহার করতো।

হরপ্পায় ব্যবহৃত বাটখারা নিয়ে সব প্রত্নতত্ত্ববিদই একবাক্যে বলেছেন :

"A targe number of very carefully cut cubes of banded grey chart, graded extremely accurately in a localised system and most scrupulously observed than was the ordinary practice elsewhere, is the Indus Valley System of Weight. The Weights have been found to contain a ratio of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320, 640 and can be recognised as a system in which the unit was ratio 16, equivalent to 13.64 grammes binary in the lower weights and the decimal in the higher. In the modern Bengal before the introduction of the decimal coinage, 2, 4, 16 are related to the rupee and general counting......

In decimal system, the village folks use 5 as the lowest number from the five fingers and count the fruits by fives, increasing gradually to 25 which is called a ' Pai' (পাই) or one fourth of 100. Three pais will give the number 75 and so on upto 100. So both the Indus Valley System of counting existed in the later Indian Society."

১৯৫৭ সালে দশমিক প্রথা চালু হওয়ার আগে বাঙলায় চালু ছিল সংখ্যাবাচক কড়া-গণ্ডার হিসাব। কোন জিনিষের চারটি হল এক 'গণ্ডা'। আর ২০ গণ্ডায় বা ৮০টায় এক 'পণ' এবং ১৬ পণে বা ১২৮০ টিতে গণনা করা হত এক 'কাহন'।

মহেঞ্জোদারোতে যে মাপকাঠি পাওয়া গেছে তার দৈর্ঘ্য ১৩.২ ইঞ্চি। তাতে ১.৩২ ইঞ্চি পরে পরে দাগ কাটা। অর্থাৎ স্কেলটিতে দশটি সমান ভাগ। এটি দশমিক (Decimal) স্কেল। হরপ্পায় আরেকটা ব্রোঞ্জনির্মিত মাপকাঠি পাওয়া গেছে যাতে ০.৩৬৭৬ ইঞ্চি অন্তর দাগ কাটা এবং যার দৈর্ঘ্য ২০.৬২ ইঞ্চি। এটি সম্ভবত 'এক হাত'। এই ২০.৬২ ইঞ্চির হাত এককটি সারা প্রাচীন পৃথিবীতে বহুল ব্যবহৃত। মিশর অবশ্য ১৩.২ ইঞ্চির মাপকাঠিই ব্যবহার করতো। ২০.৬২ ইঞ্চির 'হাত' পরবর্তীকালে ইউরোপে ও এসিয়ায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

"Two systems of mensuration were discovered one from Mohenjodaro and the second from Harappa. (i) Mohenjodaro : From Mohenjodaro was discovered a broken shell scale of which nine

accurately divided intervals remained. It indicates a decimal scale of 1.32 inches, rising probably to a foot of 13.2 inches (ii) Harappa : M.S. Vat has discovered a bronze rod at Harappa marked off in unit of 0.3676 inch, which can be related to a scale based on a cubit (হাত) of 20.62 inches, a unit frequently used in ancient world.

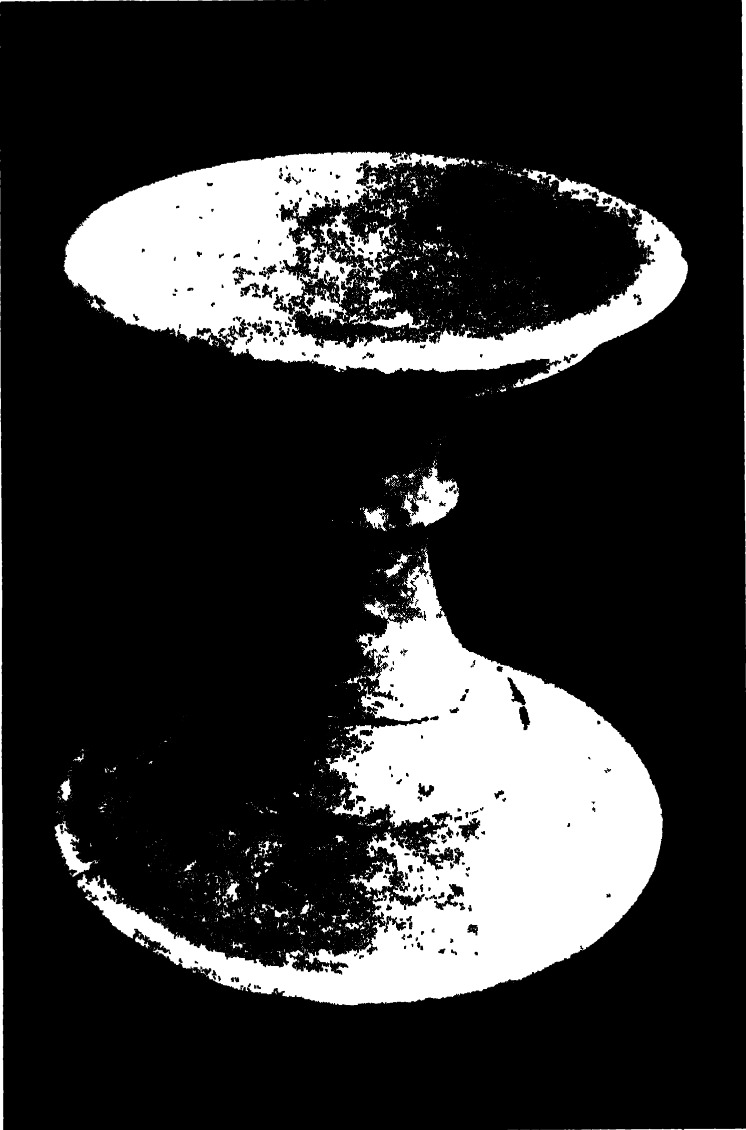
These two scales were tested at Harappa and Mohenjodaro by a check series of over 150 measurements of Architectural details, with the result that the concurrent use of two units of measurements, a cubit of between 20.3 and 20.8 inches and a foot of between 13.01 and 13.2 inches was proved. Measurements resolved themselves into simple multiples of one or other of these standard units. For instance, the great Bath of Mohenjodaro is 36 by 21 units of a foot of 13.1 inches and the circular working platform in the workman's quarter at Harappa had a diameter of 10 feet of 13.2 inches per foot,"

হরপ্পা সভ্যতার একটা বড় অবদান হল তার শিল্প ও স্থাপত্য। হরপ্পীয়রাই ভারতীয় শিল্পকলার জনক। বর্বর আর্যরা প্রথম যখন সিন্ধুনদের অঞ্চলে এসে হাজির হয় তখন তাদেব সঙ্গে হরপ্পীয়দের প্রথম সংঘর্ষ হয়। কিন্তু তারা যত পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিল, ততই বিপরীত নীতি অবলম্বন করেছিল। তারা তখন এদেশের মেয়েদের বিবাহ করতে আরম্ভ করেছিল, এবং তার ফলে এক সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক অনুরূপ সংশ্লেষণ ঘটেছিল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পাঞ্জাবেই আর্য-প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহের অবস্থান পর্যালোচনা করলে যে বিচিত্র ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে পাঞ্জাব থেকে আমরা যতই দূরে যাই, ততই শিল্প ও ভাস্কর্য নিদর্শনের সংখ্যা বেশি পরিমাণে দেখি। ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য যে আর্য-চিন্তাধারা বা তাদের শৈল্পিক প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত নয় এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর কারণ ঋগ্বৈদিক আর্যদের মধ্যে প্রতিমা-পূজা ও মন্দির নির্মাণ রীতি ছিল না।

অংলকরণের মনোহারিত্বের জন্য ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের যে খ্যাতি আছে, তা উত্তর ভারতেই সবচেয়ে দুর্বল ও দক্ষিণ ভারতে সবচেয়ে সবল। এটা আমরা দক্ষিণের অমরাবতীর ভাস্কর্যসমূহের ছন্দময় মাধুর্য থেকেই বুঝতে পারি। বস্তুতঃ তক্ষশিলায় খননকার্যের ফলে আমরা জেনেছি যে গ্রীকরা আসার আগে তক্ষশিলা অঞ্চলে কোন শিল্প বা ভাস্কর্যের ধারা ছিল না। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতায় আমরা বহু

শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন পেয়েছি। ব্রোঞ্জের নানা মূর্তি, সোনা-রূপা ও পুঁতির অলংকার, পোড়ামাটির নানা খেলনা ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া গেছে হরপ্পা সভ্যতার উৎকৃষ্ট শিল্প-নমুনা। হরপ্পা সভ্যতাব লোকরা মন্দির নির্মাণ করতো, বানাতো মূর্তিও। দুটোতেই তারা উন্নত ভাস্কর্যের প্রমাণ রেখে গেছে। আমাদের একালের হিন্দু মন্দিরের



চিত্র ৩৮
হরপ্পার বিশেষ ধরনের ডিশ (Dish)

সঙ্গে সাধারণত একটা পুষ্করিণী দেখা যায়। এই ধারা আমরা বজায় রেখেছি হরপ্পা সভ্যতার আমল থেকে। হবপ্পা-মহেঞ্জোদারোতেও মন্দির সংলগ্ন পবিত্র পুষ্করিণী খননেব প্রথা ছিল। সেই প্রথা আজও অনুসৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষে শিল্প-ভাস্কর্যের আদি জনক হল হরপ্পীয়বা। ভারতের শিল্প-ভাস্কর্য হরপ্পা সভ্যতাবই অবদান। বর্বর আর্যদের এ বিষয়ে আমাদেব দেবাব মত কিছুই ছিল না।

হরপ্পা সভ্যতাব অবদান কেবলমাত্র স্থাপত্যে, গণিতে, ভাস্কর্যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এবং ধাতু-বিদ্যাতে ছিল না, তাব আবেকটি অবদান হল লিপিব আবিষ্কার। হরপ্পা সভ্যতা লিপির আবিষ্কার করেছিল প্রায ৫০০০ বছর আগে। এই লিপির নিদর্শন পাওযা গেছে হবপ্পায সভ্যতাব বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে পাওযা সীলমোহবগুলি থেকে। হরপ্পার লোকবা মিশর এবং সুমেবদেব অনেকটা আগেই লিখতে শিখেছিল। মানব সভ্যতায হবপ্পীয়দের অনন্য অবদান হলো তাদেব লিপি।

এ পর্যন্ত হবপ্পা সভ্যতাব প্রায ২৫০০ সীলমোহব আমবা পেযেছি। লোথাল, হবপ্পা, চানহুদারো ও মহেঞ্জোদাবো থেকে পাওযা বিভিন্ন আকৃতিব সীলমোহরের মোট সংখ্যা ১৬৫১ টি। এ ছাড়া হবপ্পায পাওযা গেছে সীলমোহবেব মত দেখতে ৩৭৬টি তামার পাত। এ ছাড়া আবও কযেকশো নানা আকৃতিব সীলমোহর পাওয়া গেছে। এই সব সীলমোহব ও তামাব পাতেব উপব পাওয়া গেছে হবপ্পা লিপি। এই লিপিতে প্রত্যেকটি সীলমোহব ও তামাব পাতেব উপব কিছু না কিছু লেখা আছে। গত ৮০ বছব ধবে পৃথিবীব বিদগ্ধজনেবা নানা চেষ্টা কবেও এই লিপিব পাঠোদ্ধাব কবতে পাবেন নি। শুধু জানা গেছে, এই লিপি ব্রাহ্মীলিপিব জনক। এই লিপিগুলি দ্রাবিড়দেব প্রাচীনলিপি। এই লিপিগুলি লিখেছে প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা।

পূর্বেই বলা হযেছে, হবপ্পালিপি বা সিন্ধু লিপিতে প্রায ৩০০ চিহ্ন আছে। এদের মধ্যে ২৫০টি চিহ্ন মৌলিক। বাকিগুলি আনুষঙ্গিক চিহ্নমাত্র। সেগুলি মৌলিক চিহ্নগুলিব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সিন্ধুলিপি পাওযা গেছে দু'ধবনের প্রত্নবস্তুর উপর —(১) নরম পাথবেব তৈবি সীলমোহবেব ওপব, যেগুলির শীর্ষদেশে আছে একছত্র লিপি এবং তাব নিচে কোনও জন্তুব প্রতিকৃতি, (২) আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্নবস্তু হল কতগুলি তামার পাত। এগুলির সাইজ প্রায় ২.৩ সেন্টিমিটার এবং এগুলি বর্গাকার। পাতগুলি সামান্য মোটা। এছাড়াও কিছু পাত আছে যাদের মাপ ৩ x ১৩ বর্গসেন্টিমিটার থেকে ৩৮ x ২৫ বর্গসেন্টিমিটাব। এই তামাব পাতগুলি পাতলা, সরু ও লম্বা। এগুলিব দু'পিঠেই অঙ্কন আছে। সামনের দিকে লিপি এবং পিছন পিঠে কোনও জন্তুর প্রতিকৃতি। নরম পাথরের সীলমোহরগুলিতে কিন্তু এক পিঠেই লিখন ও অঙ্কন আছে। দু'পিঠে লিপি ও অঙ্কন সমন্বিত তামার এই পাতগুলিকে অনেকে 'তাবিজ' বলে অনুমান কবেছেন। তাঁবা বলছেন, গ্রহশান্তির জন্য হরপ্পার লোকেরা এই পাত তাবিজ হিসাবে ধারণ করতো।

সিন্ধুলিপির কথায় ডঃ অতুল সুর লিখেছেন ঃ "সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে যে লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা সীলমোহরসমূহ থেকে পেয়েছি। বর্তমান ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ লিখন-প্রণালীই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। এখন পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে ব্রাহ্মী লিপি সিন্ধুসভ্যতার লিখন-প্রণালী থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। ব্যাস যখন মহাভারত রচনা করেছিলেন, তখন তিনি গণেশ বা বিনায়ককে লিপিকর নিযুক্ত করেছিলেন। এরই মধ্যে কি ভারতের লিখন প্রণালীর দেশজ উদ্ভবের আভাস নেই? কেননা, আমরা জানি যে গণেশ বা বিনায়ক দেশজ দেবতামণ্ডলী থেকে গৃহীত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবতামণ্ডলীতে গণেশের উদ্ভব অর্বাচীন। রামায়ণ এবং অনেক পুরাণে গণেশের উল্লেখ নেই। আদি মহাভারতেও গণেশের নাম নেই। তার নাম আমরা প্রথম পাই যাজ্ঞবল্ক্যে—তাও দেবতা হিসাবে নয়, রাক্ষস বা অসুব হিসাবে এবং মানুষের সকল কর্মের সিদ্ধিনাশক হিসাবে। বিনায়ক নামে এক শ্রেণীর রাক্ষসের নামও আমরা প্রাচীন সাহিত্যে পাই। মনে হয়, আর্যদেব মধ্যে কোনরূপ লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল না, এবং সেই হেতু যখন তাঁদের একজন লিপিকরের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তাঁরা বিনায়ক নামধারী এক দেশজ জাতিব কাছ থেকেই এক লিপিকরের সাহায্য নিয়েছিল। লিপিকর হিসাবে তিনি আর্যদের যে প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন, তার জন্যই ব্রাহ্মণ্য দেবতামণ্ডলীতে তাঁকে দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছিল। তখন যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধিনাশক বাক্ষস, সিদ্ধিদাতা দেবতা হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন।

এছাড়া, এ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন বরাবরই আমাদের মনে জেগেছে। সেটা হচ্ছে, তথাকথিত আর্যসমাজে বড় বড় পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও বেদ সঙ্কলন বা পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ একজন অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের ওপর ন্যস্ত হযেছিল কেন? এই কিংবদন্তীর মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির এক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

বস্তুত ভারতীয় সভ্যতা তথা হিন্দুসভ্যতার সূচনা হয়েছিল আদি মহাভারতীয় যুগে। আদি মহাভারতীয় যুগের সভ্যতা যে প্রাক-বৈদিক ও সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন তার সপক্ষে যুক্তিসমূহ আমি আমর 'মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা' গ্রন্থে দিয়েছি। জিজ্ঞাসু পাঠক সে বইখানা পড়ে নিতে পারেন। এখানে মাত্র বলা যেতে পারে যে, যুধিষ্ঠির যে সিন্ধুসভ্যতাব লিপিযুক্ত সীলগুলি দেখেছিলেন তার উল্লেখ মহাভারতে আছে।

ডঃ সুর তাঁর ১৯৩২ সালের একটা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, সিন্ধু লিপির সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপপুঞ্জের লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। ইস্টার দ্বীপের এই লিপির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। হরপ্পা লিপির তথা সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। রাশিয়ার পণ্ডিতরা কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে নানা বিশ্লেষণের পর দেখিয়েছেন যে, সিন্ধুলিপি দ্রাবিড়লিপি। এর ভাষাও সম্ভবত আদি দ্রাবিড় ভাষা। তবে তা এখনও অনির্ণীত এবং এ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়েই গবেষণা চলছে। এ

নিয়ে বিশদ আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে। অনার্য সভ্যতা হল হরপ্পা সভ্যতা, অনার্য সংস্কৃতি হল হরপ্পার সংস্কৃতি। আর্যরা ছিল বর্বর, যাযাবর জাতি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মান ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। বিজয়ী জাত হিসাবে তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটলো হরপ্পার প্রাচীন এবং অত্যুন্নত সংস্কৃতির। এর থেকে উদ্ভূত হল 'হিন্দু সংস্কৃতি' যার উপাদানের পঁচাত্তর শতাংশ হরপ্পা সংস্কৃতি এবং বাকী পঁচিশ শতাংশ নিকৃষ্টতর আর্য-সংস্কৃতি থেকে নেওয়া। হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সংস্কৃতি বলতে একালে আমরা যা বুঝি, তার ৭৫% হল প্রাচীন হরপ্পীয় সংস্কৃতি এবং ২৫৲ বর্বর আর্যদের সংস্কৃতি। সুতরাং হিন্দু সংস্কৃতিতে হরপ্পা সভ্যতার অবদান অনন্য এবং অতুলনীয়। সুমের সভ্যতায় এই সংস্কৃতির অবদানও কম নয়—বিশেষ করে মাতৃদেবী পূজার অনুশীলনে।

মাতৃদেবী পূজায় হরপ্পার সংস্কৃতির অবদান নিয়ে ডঃ অতুল সুর বহুকাল আগে যা লিখেছিলেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ কবে, হরপ্পার মাতৃদেবীর পূজা যে সুমের দেশে নীত হযেছিল—একথা তিনি প্রমাণ করেছেন ৬০/৬৫ বছব আগে। তাঁর লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি হিন্দু সংস্কৃতি তথা হিন্দু সভ্যতা গঠনে প্রাগার্য অর্থাৎ হরপ্পীয়দের অবদান বোঝাতে।

"সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা সেজন্য মাতৃদেবীই ছিল এই সভ্যতার প্রধান দেবতা। হরপ্পায় প্রাপ্ত এক সীলের ওপর উৎকীর্ণ এক নাবীমূর্তি যার যোনিমুখ থেকে লতা-গুল্মাদি নির্গত হচ্ছে তা থেকে এটা আমরা বুঝতে পাবি। পৌরাণিক যুগে মাতৃদেবীর অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী ইত্যাদি নাম ও দুর্গাপূজায় প্রতিমার পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপনও তাই ইঙ্গিত করে। সুমেরের প্রধান দেবতা এ-নান্না নামের সঙ্গে অন্নপূর্ণা নামের সাদৃশ্যও তাই সূচিত করে। বস্তুতঃ সুমের এবং ভারতের মাতৃদেবীর মধ্যে কতকগুলি মূলগত সাদৃশ্য দেখে কোন সন্দেহই থাকে না যে, এই উভয়দেশের মাতৃপূজা একই সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই সাদৃশ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (ক) উভয় দেশেই মাতৃদেবী 'কুমাবী' হিসাবে কল্পিত হয়েছিলেন, অথচ তাঁদের ভর্তা ছিল; (খ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীব বাহন সিংহ ও তাঁর ভর্তার বাহন বলীর্বদ; (গ) উভয় দেশেই মাতৃদেবীর নারীসুলভ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরুষোচিত কর্ম, যেমন যুদ্ধ, করতে পারতেন। (ঘ) সুমেরের লিপিসমূহে তাঁকে বারম্বার 'সৈন্যবাহিনীর নেত্রী' বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্য' বিভাগেও বলা হয়েছে যে দেবতারা যখন অসুরগণ কর্তৃক পরাহত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা মহিষাসুরকে বধ করবার জন্য দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। (ঙ) সুমেরের মাতৃদেবী পর্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য তাঁকে 'পর্বতের দেবী' বলা হত; ভাবতের মাতৃদেবীর পার্বতী, হৈমবতী; বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি নাম তাই সূচিত করে। (চ) সুমেরে দেবীর নাম ছিল 'নানা'; সে নাম হিংলাজে নানাদেবীর

নামে এখনও বর্তমান। (ছ) যাঁরা বলেন যে সুমেরীয়দের পরিধেয় বসন 'কৌনক' তালপাতা দিয়ে তৈরি করা হত, তাঁরা প্রাচীন ভারতে দেশজ লোকদের পাতা ও বল্কল পরিধান ও পর্ণশববীর কথা স্মরণ করবেন। (জ) দু'দেশেই ধর্মীয় গণিকাবৃত্তি (বা সাময়িকভাবে সতীত্বের বিসর্জন দেওয়া) প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম



চিত্র ৩৯
হরপ্পার ছিদ্রযুক্ত চোঙাকৃতি মৃৎপাত্র

এসিয়ায় এটাব উদ্ভব হয়েছিল ঐন্দ্রজালিক (Mimetic বা Homoeopathic Magic) পদ্ধতি থেকে। সধবা ও অনূঢ়া উভয়শ্রেণীর মেয়েরাই দেবীর প্রসন্নতা লাভ করবাব জন্য সাময়িকভাবে তাদেব সতীত্বের বিসর্জন দিত। বলা বাহুল্য, ভাবতে এটা বামাচাবী তন্ত্রধর্মেব বৈশিষ্ট্য। সব তন্ত্রেই বলা হয়েছে যে 'মৈথুন' ছাড়া 'কুলপূজা' (তন্ত্র অনুযায়ী দেবীব পূজা) হয না। যেমন 'গুপ্তসংহিতা'য় বলা হয়েছে "কুলশক্তিম্ বিনা দেবী যো জপেত স তু পামর।" আবার 'নিরুত্তবতন্ত্র'-তে বলা হয়েছে ঃ "বিবাহিতা পতি ত্যাগে দুষণম্ ন কুলার্চনে।" তাব মানে কুলপূজার জন্য সধবা স্ত্রীলোক যদি তার স্বামী পরিত্যাগ করে, তবে তাব কোন দোষ হয় না। (ঝ) উভয়দেশেই দেবীপূজার সঙ্গে নরবলি প্রচলিত ছিল।

মহেঞ্জোদাবো, হবপ্পা প্রভৃতি নগবে দেবীপূজাব যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা মৃন্ময়ী মাতৃকাদেবীব মূর্তিসমূহ থেকে প্রকাশ পায। পুরুষ দেবগণ কর্তৃক অধিকৃত ঋগ্বেদেব দেবতামণ্ডলীতে, মাতৃদেবীব কোন স্থান ছিল না। পববর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয ঘটেছিল, তখনই প্রাগার্য দেবীসমূহেব হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন, বৈদিক যুগেব অন্তিমে আমবা কালী, করালী প্রভৃতি দেবীব নাম পাই। কিন্তু তখনও তাঁবা তাঁদেব মৌলিক স্বরূপ বা স্বতন্ত্রতা বজায় বেখে অনুপ্রবেশ কবতে পাবেন নি। তাঁবা বৈদিক অগ্নি উপাসনাবই অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হযেছিলেন। কিন্তু আর্যবা যতই পূর্বদিকে অগ্রসব হতে লাগলেন, তাঁদেব ধর্মীয গোঁড়ামী ততই হ্রাস পেতে লাগল। তখন এইসব অনার্যদেবতা বেশ রীতিমত হানা দিযে হিন্দুধর্মগুলিতে তাঁদেব আসন কবে নিলেন। পুবাণাদি গ্রন্থে আমবা বিন্ধ্যবাসিনী, পর্ণশবরী প্রভৃতি দেবীকে হিন্দুদেবীব স্বরূপেই পাই। তাবপর প্রাগার্য তন্ত্রধর্মও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রভাবান্বিত করে।

বর্তমানে হিন্দুধর্মে গ্রাম-দেবীসমূহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকাব কবে। এটা সহজেই অনুমেয যে প্রাগার্য যুগেও তাঁদের অনুরূপ আধিপত্য ছিল। বর্তমান ভাবতেব প্রত্যেক গ্রাম বা শহবে আমবা কোন না কোন দেবীব 'থান' বা প্রতীক দেখতে পাই। এসব প্রাগার্য দেবীসমূহ এখন ব্রাহ্মণ্যধর্মেব প্রভাব দ্বাবা মণ্ডিত হয়েছেন।

যদিও বৈদিক ধর্মে মাতৃপূজাব কোন স্থান ছিল না, তথাপি মাতৃপূজার উদ্ভব প্রাচ্য ভাবতেব প্রাগার্য জাতিসমূহেব মধ্যে যে হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কোন কোন গৃহ্যসূত্রে আমরা সাধাবণ লোকগণ কর্তৃক পূজিত যে দুটো-একটা দেবীব উল্লেখ পাই তাঁদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় 'বাসিনী', যাঁকে আমবা বিন্ধ্যবাসিনী নামেব মধ্যে পাই। এঁরা পূজিত হতেন সন্তান-সন্ততি ও আয়ু-লাভের জন্য। এঁরা যে সকলেই প্রাগার্য দেবীসমূহেরই উত্তরস্বরূপা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ভারতের আর এক লোকাযত দেবী ছিলেন 'শ্রী'। 'শতপথব্রাহ্মণ'-এ, আমরা তাঁব প্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে তাঁকে প্রণয় ও উর্বরতার দেবী বলা হয়েছে, এবং খুব অর্থবহভাবে তাঁব উদ্দেশে নৈবেদ্য শয্যার মাথার দিকে রাখা হত। বৈদিক যুগের

একেবারে অন্তিমকালের পূর্ব পর্যন্ত কোথাও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উল্লেখ নেই। 'সিরি কালকন্নিজাতক' অনুযায়ী 'সিরি দেবী' হচ্ছেন চারজন লোকপালেব অন্যতম 'ধৃতরাষ্ট্র'-র কন্যা। সেখানে 'সিরি দেবী'কে আমরা বলতে দেখি ঃ "মানব জাতির ওপর আধিপত্য দেবার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমি; আমি জ্ঞান, সম্পদ ও সৌন্দর্যেব দেবী।" মহাভারত অনুযাযী শ্রীদেবী প্রথমে দানবদের সঙ্গে বাস করতেন, পবে দেবগণের ও ইন্দ্রের সঙ্গে। মনে হয়, এরই মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে তিনি গোড়ায় প্রাগার্যগণ কর্তৃক পূজিত হতেন, এবং পরে ব্রাহ্মণ্য দেবতামণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন।

পৌরাণিক দেবতামণ্ডলী গঠিত হবার সময় এইসকল লোকায়ত দেবীগণ একে একে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে স্থান পেয়ে শিবজায়া মহাদেবী শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ হিসাবে পরিগণিত হলেন।"

হরপ্পা সভ্যতার লোকজনেরা যে শুধু মাতৃদেবীব পূজা কবতেন তা নয়, তাঁরা সৃজন শক্তির আধাব হিসাবে এক পুরুষ দেবতাবও উপাসনা করতেন। সেই দেবতা হলেন আদি দেবতা শিব। প্রাচীন এসিয়ার অধিবাসিগণও হবপ্পার লোকদেব মতই সেই আদি দেবতা শিবের পূজা কবতেন। মহেঞ্জোদাবোর একটা সীলমোহরে তিনমুখ বিশিষ্ট এক দেবতাব মূর্তি পাওয়া গেছে। তিনি সিংহাসনের ওপর আসীন, তাঁব বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তক উন্নত। তাঁর এক পা অপর পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, তাঁব দুটি হাত বিস্তৃত অবস্থায হাঁটুব ওপর অবস্থিত। তিনি পর্যঙ্কআসনে উপবিষ্ট হযে, ধ্যানস্থ ও ঊর্ধ্বলিঙ্গ। তাঁব উভয় পার্শ্বে চার প্রধান দিক-নির্দেশক হিসাবে হাতি, বাঘ, গণ্ডাব ও মহিষের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। তাঁর সিংহাসনের নিচে দুটি মৃগকে পশ্চাদ্‌দিকে মুখ করে দাঁড়িযে থাকতে দেখা যায়।

সীলমোহরের ওই মূর্তি যে আদি শিবের সে বিষয়ে কোন সন্দেহে নেই। বস্তুতঃ পববর্তী কালের শিবের তিনটি মূলগত ধারণা আমরা এখানে দেখতে পাই—তিনি (১) যোগীশ্বর বা মহাযোগী, (২) পশুপতি ও (৩) ত্রিনেত্র। আদিশিব কিন্তু এক সময সারা এসিয়া জুড়ে পূজা পেতেন। বৈদিক আনলে আদি দেবতা শিবেব পূজা কমে যায়। ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি সূক্তে 'রুদ্র' দেবতার কথা আছে। ঋগ্বেদের এই রুদ্রকেই পণ্ডিতরা আদি শিবের রূপান্তর হিসাবে সনাক্ত করেছেন। উল্লেখযোগ্য হল, সংস্কৃত 'রুদ্র' শব্দের অর্থ হল রক্তবর্ণ, আবার দ্রাবিড় ভাষাতে 'শিব' শব্দেব অর্থও হয় রক্তবর্ণ। আর্য আমলের প্রথম দিকটা 'শিব' শব্দের কিংবা রুদ্রের প্রাধান্য বহুলাংশে হ্রাস পায়। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষে আবার শিব ফিরে আসেন স্ব-মহিমায। পরবর্তীকালে শিবেব মধ্যে আমরা কৃষি সম্পর্কিত অনেক ধ্যানধারণা লক্ষ্য কবি, এবং তার ফলে যে শিবের লিঙ্গপূজা ঋগ্বেদে নিন্দিত হয়েছে, সেই লিঙ্গপূজা হিন্দুদের মধ্যে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভারতের আদিবাসিগণের মধ্যেও শিবের লিঙ্গপূজা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে যায়। হিন্দু সংস্কৃতিতে শিবের পূজা এসেছে হরপ্পা সংস্কৃতি থেকেই। হিন্দুদেব শিব উপাসনা হরপ্পা সভ্যতারই অবদান।

হিন্দুধর্মে শিব ও শক্তি কেবলমাত্র নরাকারে পূজিত হন, তা নয়, লিঙ্গ ও যোনি —এই প্রতীক চিহ্ন হিসাবেও পূজিত হন। সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন অধিবাসীরাও যে লিঙ্গ-যোনি উপাসক ছিলেন, তা সেখানে প্রাপ্ত মণ্ডলকাবে গঠিত প্রস্তর প্রতীকসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। এছাড়া, আমবা সেখানে প্রস্তবনির্মিত পুরুষ-লিঙ্গের এক বাস্তবানুগ প্রতিরূপও পেযেছি। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরাই যে ঋগ্বেদে বর্ণিত সমৃদ্ধশালী নগরসমূহেব 'শিশ্নোপাসক' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

আর্যরা ভারতের আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে যে শুধু লিঙ্গ উপাসনাই গ্রহণ করেছিল, তা নয়, 'লিঙ্গ' শব্দটাও গ্রহণ কবেছিল। লিঙ্গ উপাসনা যে প্রাগার্য সভ্যতার অবদান, তা ঋগ্বেদে লিঙ্গ-উপাসকদেব প্রতি ঘৃণা প্রকাশ ও কটূক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

মহাকাব্যের যুগেই লিঙ্গ-উপাসনা ব্রাহ্মণ্যধর্মেব মধ্যে প্রবেশ লাভ কবেছিল। সাহিত্যে আমরা এব সবচেয়ে প্রাচীন উল্লেখ পাই বামায়ণে, সেখানে আমরা দেখি যে বাবণ সদাসর্বদা একটা স্বর্ণলিঙ্গ বহন করতেন। মহাভারতেব অনুশাসন ও দ্রোণপর্বেও শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে। এখনও বাঙালী মেয়েবা শিবকে লিঙ্গরূপে পূজা করে। শিব চতুর্দশীব দিন শিবলিঙ্গের মাথায জল ঢালে।

মনে হয়, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেব মধ্যেই লিঙ্গপূজা হিন্দুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হযে গিয়েছিল। দক্ষিণ ভাবতেব বাণীগুণটা থেকে ছয মাইল দূবে গুডিমল্লম গ্রামে প্রাপ্ত একটি শিবলিঙ্গ থেকে এটা প্রমাণ হয। এটা লিঙ্গেবই অত্যন্ত বাস্তবানুগ প্রতিরূপ এবং এব গায়ে শিবের একটি সুন্দব প্রতিমূর্তি আঁকা আছে। পববর্তীকালে শক্তিধর্মেব অভ্যুত্থানের পব লিঙ্গপূজাব বিশেযভাবে বিকাশ ঘটে। তন্ত্রগ্রন্থসমূহের সর্বত্রই বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হযেছে যে সমস্ত ধর্মীয় পুণ্যই বৃথা যাবে, যদি না লিঙ্গ পূজা করা হয়। হিন্দু সংস্কৃতিতে শিবেব লিঙ্গপূজা হরপ্পা সংস্কৃতিরই অবদান।

হরপ্পীযদের সূর্যপূজা বৈদিক সভ্যতাতেও চলে আসে। চাষবাসের উপর সৌরশক্তির প্রভাব মানুষ ববাববই দেখেছে। এ কারণেই কৃষির প্রাচীন কেন্দ্রসমূহে মাতৃদেবীর পূজাব সঙ্গে সূর্যপূজাও চালু হয়। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কয়েকটি সীলমোহরের ওপর আমবা চক্র ও স্বস্তি চিহ্ন লক্ষ্য করি। এগুলি সূর্যেরই প্রতীক চিহ্ন। কেননা, প্রাচীনকালে সূর্য নবাকারে পূজিত হতেন না, তাঁর চিহ্ন দ্বারাই উপাসিত হতেন। চক্র ও স্বস্তিক ছাড়া, সূর্যেব অপব যা প্রতীক চিহ্ন ছিল, তা হচ্ছে মণ্ডলাকার চাকতি ও বলদ। সিন্ধু উপত্যকা ছাড়া, সূর্যের এসব প্রতীক চিহ্ন আমরা পেযেছি মধ্য প্রদেশের বালাঘাট মহকুমাব গুঙ্গেবিয়া নামক স্থান। এখানে তামার তৈরি কুঠারের সঙ্গে আমবা রূপার চাকতি ও বলদেব মাথারূপে কল্পিত চাকতি পেয়েছি। এই সব বস্তুগুলির সঙ্গে সূর্যপূজা সম্পর্কিত। হরপ্পার আমলে সূর্যপূজা প্রতীকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু আর্যদের আমলে সূর্য মানুযেব আকারে পূজিত হন। হিন্দুদের লোকায়ত ধর্মের মধ্যে সূর্যপূজা আজ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। বিহারের

ছটপূজা, বাঙলার ইতুপূজা ও রালদুর্গাব ব্রত সূর্যপূজারই নামান্তব মাত্র। এগুলি হিন্দু সংস্কৃতিতে হরপ্পা সভ্যতার অবদান।

পশুপূজা হিন্দু সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। এই পশুপূজা পুবোপুবি হবপ্পা সংস্কৃতিব অবদান। ভারতেব প্রাগার্য জাতিসমূহের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মধ্যে পশুপূজার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদাবো প্রভৃতি নগবে যে সব সীলমোহর পাওয়া গেছে, তার ওপব একাধিক পশুব চিত্র খোদিত আছে। এই সকল সীলমোহবেব ওপর লিপিও আছে, কিন্তু এই লিপিসমূহেব পাঠোদ্ধাব চূড়ান্তভাবে না হওয়ায়, চিত্রিত পশুর সঙ্গে সীলমোহরগুলিব সম্পর্ক এখনও অজ্ঞাত আছে।

এই সকল লিপির ঠিক তলদেশে ককুদবিশিষ্ট বৃষ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, বানব, হাতি প্রভৃতি জন্তুর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। প্রত্যেকটি সীলমোহরেব পিছনে একটা কবে হাতল হিসাবে ব্যবহাব কববাব যোগ্য মুণ্ডিও আছে। সুতবাং সীলমোহবগুলি যে ছাপ মারবাব জন্য ব্যবহৃত হত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয়, লিপিব দ্বাবা মালিকেব নাম ও জন্তু বিশেষেব প্রতিকৃতি দ্বাবা সে কোন্ 'টোটেম' ভুক্ত ছিল, তাই বোঝাত। 'টোটেম'-এর প্রচলন যে সিন্ধুসভ্যতাব ধাবকদেব মধ্যে ছিল, তাব প্রমাণ পাওযা যায দু-একটা অলীক জন্তুব চিত্র থেকে। প্রাগার্য ভাবতীযদেব ধর্মে টোটেমেব যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা বর্তমান ভাবতেব আদিবাসীদেব মধ্যে টোটেমের প্রচলন থেকেই বুঝতে পাবা যায। বর্তমান আদিবাসীদেব মধ্যে প্রচলিত অনেক টোটেমই হরপ্পা, মহেঞ্জোদাবো প্রভৃতি নগব থেকে প্রাপ্ত সীলমোহবেব ওপব খোদিত প্রাণিসমূহের সঙ্গে অভিন্ন। এই টোটেম প্রথা থেকেই পববর্তী কালেব হিন্দুধর্মে পশুপূজাব উদ্ভব হযেছিল।

ঋগ্বেদের ধর্মীয ধ্যান-ধাবণাব মধ্যে টোটেমেব কোনো স্থান ছিল না। ইন্দো-ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যেও এব অভাব পবিলক্ষিত হয। পশুপূজার প্রবর্তন আর্যসমাজে অথর্ববেদেব যুগে ঘটেছিল এবং এই পশুপূজা থেকেই পববর্তী কালে হিন্দু দেবদেবীর 'বাহন'-এর উদ্ভব ঘটেছিল। ডঃ অতুল সুর এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর Dynamics of Synthesis in Hindu Culture গ্রন্থে।

পশ্চিম এসিয়ার দেবতাগণ প্রায়ই বৃষরূপে কল্পিত হতেন, এবং সেখানকার প্রাচীন সীলমোহরসমূহে নরাকার দেবতাগণকে বৃষ-শৃঙ্গের কিবীট ধাবণ করতে দেখা যায। সুমেরীযবা তাদের সর্বোচ্চ দেবতাকে 'স্বর্গেব বৃষ' বলে অভিহিত করত। সুমেবেব প্রাচীন সীলমোহরেব ওপর তাঁকে বৃষ-শৃঙ্গেব কিবীট-পবা অবস্থায় দেখা যায়। অসুব জাতির সর্বোচ্চ দেবতা 'অসুর'-ও বৃষরূপে কল্পিত হত। মনে হয়, বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের বৃষরূপের কল্পনা আর্যরা এই সকল প্রাগার্য জাতির কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিল। কেননা, মহেঞ্জোদারোয় আমরা আদি শিবের যে মূর্তি পেয়েছি, সেখানে আদি শিবকে আমবা বৃষ-শঙ্গের কিরীট পরিহিত অবস্থাতেই দেখি।

প্রাগার্য পশুপূজা থেকেই পববর্তীকালে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনের উদ্ভব হয়েছে। পণ্ডিতেবা বলছেন, অনুরূপভাবে 'টোটেম' থেকে এসেছে হিন্দুর দশাবতার তত্ত্ব। ডঃ অতুল সুব লিখেছেন ঃ "প্রাগার্য পশুপূজা থেকেই যদি হিন্দু দেবতাগণের 'বাহন'-এব উদ্ভব হয়ে থাকে, তা হলে টোটেম-প্রথা থেকেই হিন্দুর দশাবতাবের কল্পনা বিকশিত হয়েছিল। সম্ভবত হিন্দুব অবতারসমূহ, এদেশেব ধর্ম ও সংস্কৃতির নাযক বা 'হিরো' ছাড়া আব কিছুই নয। অন্ততঃ তিনজনকে যথা, বাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে আমরা সে ভাবেই জানি। অন্যান্য অবতারসমূহ যথা মীন, কূর্ম, ববাহ, নৃসিংহ, ওইরূপ সাংস্কৃতিক নায়কদেব টোটেম-এব নাম থেকে যে উদ্ভূত এটা অসম্ভব নয়। কেননা, সুমেরীয় ট্র্যাডিশন অনুযাযী সুমেরীয় সংস্কৃতিব নাযক 'নব-মীন' রূপ ধাবণ কবে পাবস্য উপসাগর সন্তরণ দ্বারা অতিক্রম কবে সুমেবেব এবিডু নগবে উপস্থিত হযেছিল। ভারত থেকেও তিনি যেতে পারেন, এবং তিনি হিন্দুব মৎস্যাবতাবেবই এক বিকল্প সংস্করণ কিনা, তাও বিবেচ্য। এখানে কুঠারধাবী মিশবীয দেবতা 'বামন'-এব সঙ্গে পবশুরামকেও তুলনা করা যেতে পাবে।"

হিন্দু সংস্কৃতিব দশাবতাব তত্ত্ব প্রাগার্য হবপ্পা সভ্যতাবই অবদান। ঋগ্বেদীয ধর্মে দশাবতাব নেই। হিন্দু সংস্কৃতিতে এটা এসেছে হবপ্পা সংস্কৃতি থেকে। সিন্ধু সভ্যতা যে অবৈদিক, তা এদের নাগ-পূজা থেকেই প্রমাণিত হয। ঋগ্বেদে নাগপূজাব কোন উল্লেখ নেই। যজুর্বেদেই আমবা এব প্রথম উল্লেখ পাই। অথর্ববেদেও মার্গশীর্ষেব পূর্ণিমাব দিন সর্পকে প্রশমিত কববাব জন্য নানাবকম ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিযাব কথা আছে। শেযেব দিকের বৈদিক সাহিত্যে গন্ধর্বদেব সঙ্গে নাগদেব দেব-যোনি বিশেয বলা হযেছে, যাদের আবাসস্থল পৃথিবীতেও নয়, স্বর্গেও নয। সূত্র গ্রন্থসমূহেই আমবা প্রথম মানবরূপী নাগদেব উল্লেখ দেখি। বোধ হয় সর্প তাদেব টোটেম ছিল। পববর্তীকালেব হিন্দুধর্মে নাগপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। যেহেতু ঋগ্বেদে এব উল্লেখ নেই এবং ভাবতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এব ব্যাপক প্রচলন আছে, সেহেতু আমবা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত কবতে পারি যে, হিন্দুরা নাগপূজা প্রাগার্য যুগ থেকেই পেযেছে। হিন্দু সংস্কৃতির নাগপূজার মূল উৎস হরপ্পা সংস্কৃতি। অর্থাৎ হবপ্পা সভ্যতাব আবেক অবদান হল নাগপূজা। দেবী মনসা সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই মনসা পূজাও এসেছে প্রাগার্য সভ্যতা তথা হরপ্পা সভ্যতাব সংস্কৃতি থেকে। মনসা বৈদিক দেবী নন, হবপ্পীয দেবী— প্রাগার্য দেবী। নাগপূজা তথা মনসা পূজা এসেছে হবপ্পা সভ্যতা থেকে। এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে—হিন্দু সংস্কৃতিব সঙ্গে।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা নাগপূজা নিযে অনেক গবেষণা কবেছেন। নাগজাতি এবং হরপ্পীয়দের নাগপূজা নিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত হল ঃ "প্রাগার্য ভারতেব ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছে একটা উজ্জ্বল রঙের প্রলেপ-বিশিষ্ট মৃৎ-অলঙ্করণ ফলক যার উপর চিত্রিত করা হয়েছে দুপাশে দুজন সর্পেব ফণাধাবী ভক্তবিশিষ্ট এক আড়াআড়িভাবে পা রেখে-বসা দেবতা, ঠিক যেভাবে তিন হাজার বছব পরে আমরা ভাস্কর্যে বুদ্ধদেবকে

অনুরূপভাবে ভক্তদের দ্বারা পূজিত হতে দেখি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সিন্ধু সভ্যতার এই নাগ-কিরীটধারী ভক্তগণ, পরবর্তী কালের ইতিহাসে ও উপকথায় উল্লেখিত নাগজাতির লোক ব্যতীত আর কেউই নন। নাগজাতি সম্পর্কে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা হয়ে গেছে। বর্তমানে নাগজাতির লোকেরা কাশ্মীরের সীমান্তে চেনাব ও ইবাবতী নদীব মধ্যস্থ ভূখণ্ডে বাস করে। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, নাগরা একসময় পাঞ্জাবের খুব প্রভাবশালী জাতি ছিল। তারা সাপের ফণার চন্দ্রাতপের তলায় অবস্থিত এক নরাকাব দেবতার পূজা করে। এই দেবতা বহু নামে পরিচিত যথা, নাগ, বাসুকী, বাসদেও, বাসকনাগ, তক্ষস, তখত নাগ, ইন্দ্রনাগ, নহুষ ইত্যাদি। তাঁরা ভয়াবহ সরীসৃপ বা কোন প্রতীক হিসাবে পূজিত হন না। তাঁরা পূজিত হন এক প্রাচীন জাতির দেবতুল্য রাজা হিসাবে, যাদের টোটেম বা প্রতীক ছিল নাগ বা সর্প। এদের প্রধান দেবতা ছিল সূর্য, কেননা, সমস্ত নাগ-ধর্মস্থানেই সূর্যেব প্রতীক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এইসকল দেবতুল্য রাজাবা সূর্যেরই বংশধর বলে পবিগণিত হন। এই জাতির নাম কিন্তু 'নাগ' জাতি নয়, তাবা 'তক্ষস ' নামে পরিচিত—যেটা নাগ বা সর্পেবই প্রতিশব্দ 'তক্ষক'-এর একটা রূপ। এক সময়ে তারা পাঞ্জাবে খুব শক্তিশালী জাতি ছিল, এবং তাদের নগর বা রাজধানী তক্ষশিলা নামে পরিচিত ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিলেন, তখন তক্ষশিলার রাজা Taxıles তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। Taxıles নামটি খুবই অর্থবহ। পুরু জাতিব রাজাকে গ্রীকবা যেমন Porus নামে অভিহিত করেছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই 'তক্ষস' জাতির বাজাকে তাঁরা Taxıles বলেছেন। তক্ষসদেব একজন দেবতুল্য নায়কের নাম হচ্ছে তক্ষকনাগ। তক্ষকনাগের কীর্তিকলাপ আমরা মহাভারত পাঠে জানতে পারি। তক্ষসবা খুব প্রাচীন জাতি ছিল, কেননা, নাগপূজার পদ্ধতি প্রাচীন মিশরীয়দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সূচিত করে। যেমন, হিন্দুদের নাগদেবতার হাতে 'গজ' নামের যে দণ্ড থাকে, তা ঠিক প্রাচীন মিশরীয় দেবতা 'অসিরিস' (খনম)-এর হাতের দণ্ডের মত।" হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীতে বহু জায়গায় নাগ জাতির কথা আছে। মহাভারতের তক্ষকের কাহিনী আমরা সবাই জানি। নাগজাতি ভারতের প্রাগার্য জাতি। এদের 'টোটেম' ছিল নাগ বা সর্প। নাগপূজাও প্রাগার্যপূজা—হরপ্পা সভ্যতার পূজা।

হিন্দু-সংস্কৃতিতে বৃক্ষপূজার ঐতিহ্য হরপ্পা সভ্যতারই অবদান। বৃক্ষকে দেবতা হিসাবে পূজা করতো হরপ্পার লোকজনেরা। বৈদিক আমলের শুরুতে সে পূজা বন্ধ করে দেওয়া হলেও পরে আবার হরপ্পা সংস্কৃতির বৃক্ষপূজা হিন্দু সংস্কৃতিতে ফিরে আসে। হরপ্পা সংস্কৃতিতে অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

ঋগবৈদিক ধর্মকর্ম ও উপকথার মধ্যে বৃক্ষপূজার কোন স্থান নেই। অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা অথর্ববেদেই প্রথম লক্ষ্য করি। তৈত্তিরীয়সংহিতায় বল হয়েছে যে, অশ্বত্থ, ন্যাগ্রোধ, উদুম্বর ও প্লক্ষবৃক্ষসমূহ অপ্সরা ও গন্ধর্বদের আবাসস্থল। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহেও বৃক্ষকে মৃতের আত্মার ও ভূতপ্রেতের আবাসস্থান বলা হয়েছে।

বর্তমানকালেও হিন্দুরা অশ্বত্থ বৃক্ষকে মৃতের আত্মার ও উর্বরাশক্তিদায়িনী নানা দেবীর আবাসস্থান বলে বিশ্বাস করে ও মেয়েরা সন্তান কামনায় অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় নানাবকম কামনামূলক পদার্থ বেঁধে দেয়।



চিত্র ৪০
মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ

সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহ থেকে আমবা জানতে পারি যে প্রাগার্যবা অশ্বত্থ বৃক্ষেব বিশেষ আরাধনা করত। সারা ভাবতের প্রাগার্যবা ও হিন্দুগণ এখনও অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। তাদেব সকলেবই ধাবণা যে মৃতেব আত্মাসমূহ অশ্বত্থ বৃক্ষে বাস করে। সে যাইহোক, হিন্দু ধর্মে তথা হিন্দু-সংস্কৃতিতে বৃক্ষপূজা হরপ্পা সভ্যতারই মহান অবদান। আজকের বৃক্ষবন্দনা, বৃক্ষপূজা, বৃক্ষ-সংবক্ষণের সংস্কৃতি ৫০০০ বছবেব পুবানো হবপ্পীয় তথা ভারতীয় ঐতিহ্য।

আমাদেব একটা ভুল ধারণা আছে যে, মৃতদেহকে দাহ করাটা আমরা শিখেছিলাম আর্যদেব কাছ থেকে উত্তবাধিকার সূত্রে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। প্রাগার্য যুগ থেকেই এদেশে মৃতদেহ দাহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। হরপ্পা সভ্যতাই আমাদের মৃতদেহ দাহ করতে শিখিযেছে আর্যবা নয়।

মৃতের সৎকার সম্বন্ধে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে দাহ ও সমাধি—এই উভয় প্রথাবই প্রচলন দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, যেসব জাতির লোক হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরসমূহে বাস করত, তাদের মধ্যে মৃতের সৎকার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন ছিল। হরপ্পা সভ্যতাব যে সব নবগোষ্ঠীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় হরপ্পার নগরসমূহে যারা বাস করতো তারা হল— (১) মেডিটেরেনিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয়, (২) প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা আদি অস্ট্রেলীয়, (৩) মংগোলয়েড এবং ৪) আলপীয়। হরপ্পা সভ্যতা যেহেতু বণিকদের সভ্যতা তাই বাণিজ্য উপলক্ষ্যে অনেক বিদেশীযও এই সভ্যতার নগরগুলিতে বসবাস করতো। তাই

লোথাল বন্দরে, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান এবং রূপার প্রভৃতি শহরে পাওয়া গেছে এই চার শ্রেণীর মানুষের কঙ্কাল। এদের মধ্যে আদি অস্ট্রেলীয়দেব কঙ্কাল সংখ্যাই বেশি। তাই বলা হয়, হরপ্পা সভ্যতা প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদেবই সভ্যতা। প্রসঙ্গত বলা যায়, হবপ্পা সভ্যতার নগরগুলিতে, যেগুলির বয়স ৪০০০ বছর বা তারও বেশি সেগুলিতে, কোথাও ককাসয়েড মহাজাতিব অন্তর্ভূত নর্ডিক (Nordic) গোষ্ঠীব লোকজনদের কঙ্কাল পাওযা যায় নি। এই নবগোষ্ঠী 'আর্য' নামে খ্যাত। বর্বর এই জাতিটি এদেশে আসে ৩৭০০/৩৮০০ বছর আগে এবং হরপ্পা সভ্যতাব অধিকাংশ নগরগুলিকে ধ্বংস করে। যাইহোক, হরপ্পার নগরগুলি ছিল বহুজাতিক নগব (Cosmopolitan City)। ফলে, এগুলিতে মৃতদেহ সংকাবেব প্রথাও বিভিন্ন ছিল। সুতবাং আর্যরা এদেশে আসার বহুকাল আগেই হরপ্পা আমাদের শিখিয়েছে মৃতদেহ দাহ কবতে এবং মৃতদেহ সমাধিস্থ করতেও।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলছেন, তাম্রাশ্মযুগের লোকেরা এমন কি নবোপলীয যুগেব লোকেবাও বিশ্বাস করতো যে, মানুষ ইহজগতে যেমন জীবন-যাপন করে মৃত্যুব পবেও পরলোকে তারা সে রকমই জীবন-যাপন কববে। তাই সমাধির মধ্যে তাবা বেখে দিত মৃৎপাত্র ও মৃতেব ব্যক্তিগত ব্যবহারেব জিনিষপত্র। মিশরীযদেব মৃতদেহ সংবক্ষণ ও পিবামিড বানানোব মধ্যেও এই একই ধবনেব ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। একালে হিন্দুরা সমাধিব উপব, কিংবা চিতাভস্ম প্রোথিত-কবা সমাধিব উপব স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে নিজেদেব সামর্থ্য অনুযাযী। হরপ্পা সভ্যতাব লোকজনবাও তাদেব সমাধিব উপর স্মৃতিসৌধ বানাতো। আব সেগুলি বানানো হত পোড়া ইট দিয়ে। সুতবাং মৃতদেহ সমাধিস্থ করে তাব উপব স্মৃতিসৌধ বানানোব হিন্দুপ্রথা হবপ্পীয়দেরই অবদান। আবাব মৃতদেহ দাহ করাব ব্যাপাবটাও আমবা শিখেছি হরপ্পা সভ্যতাব কাছ থেকে। প্রসঙ্গত বলা যায, একালে সব হিন্দুই কিন্তু মৃতদেহ পোড়ায় না। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বহু হিন্দু আজও মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। তবে বৈজ্ঞানিক দিকে থেকে মৃতদেহ দাহ কবাটা সবচেযে যুক্তিযুক্ত। ঋগ্বেদে মৃতদেহ দাহ এবং সমাধিস্থ করার অর্থাৎ উভয় প্রথারই কথা আছে। তবে তার বহুকাল আগেই হরপ্পার লোকজনেরা মৃতদেহের সৎকারে উভয় প্রথাই অনুসরণ করতো। আমরা দুটি প্রথাই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি হরপ্পা সভ্যতারই কাছ থেকে—বর্বব আর্যদের কাছ থেকে নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনার্য ও আর্য

'আর্য' শব্দটি মোটেই জাতিবাচক [Racial] শব্দ ছিল না। এটি ভাষাবাচক শব্দ। ঋগ্বেদেব আমলেই 'আর্য' শব্দটি জাতিবাচক হযে উঠে। যে সব জাতি বা নরগোষ্ঠী আর্য ভাষায় কথা বলত তাবাই 'আর্য' নামে পরিচিত হতে থাকে। ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তেই 'আর্য' শব্দটি জাতিবাচক হযেই ব্যবহৃত। যেমন, 'আমি দস্যু জাতিকে 'আর্য' এ নাম হতে বঞ্চিত বেখেছি।' [১০ম মণ্ডল ঃ ৪৯ তম সূক্ত ঃ ৩য ঋক], কিংবা 'তোমাকে সহায পেযে আমবা যেন দাস জাতি ও আর্যজাতি উভযেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে পারি।' [১০ম মণ্ডল ঃ ৮৩ তম সূক্ত ঃ ১ম ঋক] ইত্যাদি। 'আর্য' শব্দ জাতিবাচক হিসাবে ঋগ্বেদে বহুবাবই ব্যবহৃত। ঋগ্বেদের এই দাস বা দস্যু জাতি হল আর্যদেব দ্বাবা পবাজিত হবপ্পীযবা যাদেব পববর্তীকালে 'শূদ্র' জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ বিভাজন হয়েছিল হবপ্পা সংস্কৃতি ও আর্য সংস্কৃতিব সংশ্লেষণেব সময। এই সংশ্লেষণই সৃষ্টি কবেছিল 'ভাবতীয় আর্য সভ্যতা।' [Indo Aryan Civilization], যাব অপব নাম বৈদিক সভ্যতা। এই সময়ই ঋগ্বেদেব দাস, বাক্ষস, দস্যু ইত্যাদি নামে অভিহিত জাতিবা শূদ্র জাতি হিসাবে পরিগণিত হয। আব বিজযী আর্যবা গুণ ও কর্মেব ভেদ অনুসাবে বিভক্ত হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতিতে। সমাজেব সেবাব কাজেব ভাব চাপিয়ে দেওয়া হয পবাজিত হরপ্পীয় তথা শূদ্রদের উপব। সুতবাং আর্য হল সেই বর্বব যাযাবব জাতি যাবা হবপ্পীযদেব হারিযে এ দেশ দখল কবেছিল, ধ্বংস করেছিল হরপ্পা সভ্যতার নগরসমূহ। এরা নিজেদের সেই বিজয কাহিনী, ধ্বংসেব ইতিহাস, বর্বরতার বর্ণনা লিখিয়েছিল অনার্য রমণীর গর্ভজাত পুত্র ব্যাসদেবকে দিযে। আর্য নামের ঋগ্বেদীয় ওই বিশেষ নবগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষেব অবশিষ্ট আদি-অধিবাসী হবপ্পীয়রাই অনার্য। হরপ্পীয়রাই অনার্য কিংবা প্রাগার্য সভ্যতাব ধাবক ও বাহক।

আর্যবা যখন ভাবতে আসে তখন তাবা ছিল যাযাবব বর্বব জাতি। উন্নত হরপ্পা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাবা সভ্য হয। পশুপালন ও যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে তারা কৃষিকাজে মন দেয়, স্থায়ী বসতি স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে হরপ্পীয়দের সঙ্গে মিশে যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন—"হেথায় আর্য হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন / শক-হূন-দল-পাঠান-মোঘল এক দেহে হল লীন"—অনেকটা সেই রকমই। সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ ঘটবাব পব 'আর্য' শব্দের অর্থ নতুন মাত্রা পায়। অসভ্য বর্বরতার

পরিমণ্ডল ছেড়ে 'আর্য' শব্দের অর্থ সভ্যতা, ধার্মিকতা, শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদির প্রতীক হয়ে উঠে। এখন আর্য শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ঃ মানী, পূজ্য, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, গুরু, স্বামী, সজ্জন, সদ্বংশোদ্ভব, উচিত, সঙ্গত, প্রাপ্তব্য, শান্তচিত্ত, উদারচরিত্র, তত্ত্বাবলম্বী, আর্যাবর্তবাসী বেদোক্ত প্রাচীন জাতিবিশেষ, দ্বি-জাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কর্তব্যাচারী, আচারনিষ্ঠ জন, ধার্মিক, সুহৃৎ, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতামহ।

আর্যশব্দের ব্যুৎপত্তি হল — ঋ[গমন কবা]+ঘ্যণ্‌ক, অথবা অর্য্য শব্দ + ষ্ণ। সংস্কৃতে অবশ্য বানানটা 'আর্য' নয় 'আর্য্য'। 'ঋ' ধাতু গমনার্থক। তাই এটি জ্ঞানার্থক; কারণ 'সর্ব্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ'—অর্থাৎ সমস্ত গমনার্থক ধাতু জ্ঞানার্থক ও প্রাপ্ত্যর্থক। অতএব যারা জ্ঞানশীল কিংবা শাস্ত্রসীমায গমন করেন অথবা যাঁরা শাস্ত্রের পার প্রাপ্ত হন তাঁরাই 'আর্য'। এটাই আর্য শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ। আর্য শব্দের এই অর্থ অনেক পরবর্তীকালের। শুরুতে আর্যজাতির যাযাবরত্বের কারণেই সম্ভবত তারা আর্য জাতি হিসাবে খ্যাত হয। আগেই বলেছি, 'আর্য' শব্দ জাতিবাচক নয়, ভাষাবাচক। তবে ঋগ্বেদের আমলেই ওই যাযাবর বর্বর নরগোষ্ঠী নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করতে থাকে। ঋগ্বেদেব অনেক সূক্তে তাব স্পষ্ট উল্লেখ আছে। একটু আগেই ঋগ্বেদ থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। আর্য শব্দের প্রাচীনতম অর্থ তাই 'যাযাবর'।

বর্বর যাযাবর আর্যরা প্রথমে পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তারা দল বেঁধে কিছু ভেড়া-ছাগল সঙ্গে নিযে তৃণভূমি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। এক জাযগার ঘাস-লতাপাতা শেষ হলে অন্যত্র যেত। এইভাবে চলত তাদের যাযাবর জীবন। এই গমনশীলতার জন্য তাদের বলা হতে থাকে আর্য। যাযাবর জীবন থেকে তারা স্থায়ী বসবাসের জীবনে চলে আসে, যখন তারা কৃষিকাজ রপ্ত করে। ভারতে যখন তারা আসে তখন কৃষিকাজটাও তাবা ভালো করে শেখেনি। এখানে এসে এই যুদ্ধবাজ জাতিটি হরপ্পীয়দের কাছ থেকে ভালো করে চাষবাস শেখে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তারা নগর নির্মাণ শৈলীব কিছুই জানতো না। উল্টে হরপ্পীয়দের পরাজিত করে তারা নগরের পর নগর ধ্বংসই করেছে। ঋগ্বেদের রচনাকালে আর্যরা পুরোদস্তুর কৃষিজীবী। ঋগ্বেদে কৃষিকার্যের কথা এতো বেশি আছে যে অনেক পণ্ডিত ঋগ্বেদকে বলেছেন 'চাষার গান'।

'ঋ' ধাতুর আরেকটা মানে হল কর্ষণ করা। সে অর্থে ঋ-ধাতু নিষ্পন্ন 'আর্য্য' শব্দের অর্থ হয় কৃষিকর্মকারী। অর্থাৎ আর্য ভাষাভাষী কৃষিকর্ম নিরত ভারতের বহিরাগত নরগোষ্ঠী, যারা হরপ্পীয় অনার্য অধিবাসীদের পরাজিত করে এদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে, তারাই আর্যজাতি হিসাবে পরিচিত হয়। ঋগ্বেদে এরাই নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিয়েছে। পণ্ডিতবর্গ বলেছেন, এরা ককেশীয় মহাজাতির অন্তর্গত নর্ডিক (Nordic) জাতির নরগোষ্ঠী। এই আলোচনায় একটু পরেই আসছি।

আর্যবিজয়ের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের হিন্দুশাস্ত্রগুলিতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট

গুণসমন্বিত ব্যক্তিকে 'আর্য' নামে অভিহিত করা হতে থাকে। কোন কোন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাব জাতির লোকদেবই আর্য বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কিছু গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিকেই আর্য বলা হয়েছে এবং চতুর্থ বর্ণ হল 'শূদ্র'। শূদ্র হল দাস, দস্যু, রাক্ষস ইত্যাদি। এরা আর্য নয়—অর্থাৎ 'অনার্য'। এই অনার্যবা হল হবপ্পীয এবং এরা মূলতঃ আদি-অস্ট্রেলীয় [Proto-Australoid] জাতি। এদেব কথা একটু পবেই বলা হচ্ছে।

অনেকটা পরবর্তীকালের হিন্দুশাস্ত্রে আর্য এবং অনার্যের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই বলে ঃ

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচাবে স বৈ আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।।
কুলং শীলং দয়া দানং ধর্ম্ম সত্যং কৃতজ্ঞতা।
অদ্রোহ ইতি যেষ্বেতৎ তানার্য্যা সম্প্রচক্ষতে।।"

সুতরাং কর্তব্যাচাবী, আচাবনিষ্ঠ, কুল-শীল-দযা-দান-ধর্ম-সত্য ও কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন এবং দ্বেষহীন ব্যক্তিই আর্য। এব বিপবীত আচবণকাবীবাই অনার্য।

এলিজাবেথ বেকন [Elizabeth E. Bacon] আর্যদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

"Aryan, is a name applied by the philologist Max Muller in the 1800's to the language family now known as Indo-European. The term survives in the name 'Indo-Aryan', a branch of the Indo-European Language family that includes the languages of Pakistan and northern India, such as classical Sanskrit and modern Hindi and Urdu. Although properly, a linguistic term, Indo-Aryan often is employed also to designate the early Indo-European-speaking peoples, who entered the Indian subcontinent from Central Asia about 1500 B.C.

In a book published in 1854, the French writer Count Joseph Arthur de Gobineau gave a racial meaning to Aryan. De Gobineau held the White race to be superior to all others and the Aryan race to be supreme among whites. He identified Teuton as the purest modern representatives of the Aryans. This theory aroused interest in Germany and was espoused by the composer Richard Wagner among others. In the 20th Century, it was taken up by the German dictator Adolf Hitler, who equated Aryan with Nordic race and used the theory to justify his persecution of Jews. Modern anthropologists reject the theory that there are 'pure' or inherently superior human groups."

হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর তথাকথিত আর্যগরিমার দিন শেষ হয়েছে। গত ৮০ বছর ধরেই বিশ্বের অধিকাংশ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং নৃতাত্ত্বিকরা এক বাক্যে বলছেন যে, ৪০০০-৩৫০০ বছর আগে যাযাবর বর্বর নর্ডিক গোষ্ঠী, যারা ঋগ্বেদে নিজেদের আর্য নামে অভিহিত করেছে, ভারতবর্ষে আসবার পরই সভ্য হয়েছে। তাদের বর্বর সংস্কৃতি মিশেছে উন্নত হরপ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে। সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় আর্য সভ্যতা। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. গর্ডন চাইল্ড [V. Gordon Childe] যথার্থই বলেছিলেন যে, আর্যদের বর্বরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের কার্যকলাপে। জগতের যেখানেই গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা সেখানকার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। চাইল্ডের এই মন্তব্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতাসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, বর্বর আর্যরা যেখানেই গেছে সেখানেই উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংসই করেছে। তাদের শ্রমলব্ধ সম্পদ লুটপাট করে ভোগই করেছে। এখন আর্যদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা যখনই কিছু লেখেন, তখনই তাদের বিশেষণ হিসাবে 'বর্বর' শব্দটি ব্যবহার করেন। সর্বত্রই তারা উন্নত মানের প্রাগার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে নিজেদের হীন ও বর্বর সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একমাত্র এক জায়গাতেই বর্বর আর্যদের এই প্রয়াস প্রায় ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। এখানে এসে তারা উন্নত অনার্য বা প্রাগার্য সভ্যতা অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং হরপ্পীয়দের বিরুদ্ধে তারা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল। হরপ্পা সভ্যতার বহু নগর আর্যরা ধ্বংস করেছিল। হরপ্পীয়দের সম্পদ, গোধন এবং রমণী তারা ভোগ করেছিল। পরাজিত হরপ্পীয়দের তারা দাস বানিয়েছিল। তারা তাদের বর্বর সংস্কৃতি হরপ্পীয়দের উপর চাপিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা হরপ্পীয় সংস্কৃতির কাছে মাথা অবনত করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে, উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণে যে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠে তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হরপ্পা সংস্কৃতি। উভয় সংস্কৃতির সংশ্লেষণে অবশ্য ভারতীয় অনার্য তথা হরপ্পীয় নারীদের একটা মস্তবড় ভূমিকা ছিল। সে আলোচনায় পরে আসছি। এ কথা এখন সূর্যের মতই সত্য যে, হিন্দু সভ্যতার মূল উপাদানসমূহই হরপ্পা সভ্যতার অবদান।

ভি. গর্ডন চাইল্ড [জন্ম ১৪ এপ্রিল, ১৮৯২; মৃত্যু ১৯ অক্টোবর, ১৯৫৭] এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের [University of Edinburgh] প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের [Prehistoric Archaeology] অধ্যাপক ছিলেন ১৯২৭ থেকে ১৯৪৬ সাল অবধি। এরপর ১৯৫৬ সাল অবধি তিনি ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজির [Institute of Archaeology] পরিচালক। ১৯২৬-২৭ সালে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর খোঁড়াখুঁড়ি তখনও চলছে, সে সময়েই ১৯২৬ সালেই তিনি প্রমাণ করেন যে, আর্যরা বর্বর এবং যাযাবর জাতি ছিল এবং পৃথিবীর যেখানেই তারা গেছে সেখানেই তারা উন্নত সভ্যতা ধ্বংস করেছে। তারপর গত ৭৫/৮০ বছর ধরে অধিকাংশ ঐতিহাসিক,

প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃতাত্ত্বিকরা এই বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। গর্ডন চাইল্ড ছিলেন আর্য বর্ববতার প্রথম প্রবক্তা। এখন সে তত্ত্ব সর্বতোভাবে প্রমাণিত। তবু ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত আজও আর্য-গরিমার মোহজাল কাটাতে পাবেন নি। তাঁরা আর্যগরিমা নিয়ে আজও অদ্ভুত সব তত্ত্ব খাড়া করেন। তাঁরা এ কথা ভুলে যান যে, তাঁবা মোটেই নর্ডিক [Nordic] গোষ্ঠীর উত্তরসূরি নন কোনওভাবেই। ববং ভারতবর্ষেব অধিকাংশ মানুষই অনার্য হরপ্পীয়দেব উত্তবসূবী। ভাবতের অধিকাংশ লোকই আদি অস্ট্রেলীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপীয় এবং মঙ্গোয়েড গোষ্ঠীব উত্তবসূবী। সুতরাং তাদেব আর্যগরিমার মিথ্যা মোহে আপ্লুত হওয়ার কিছুই নেই—থাকতেও পাবে না। ববং তাদের যা নিয়ে গর্বিত হওয়া উচিত তা হল এই যে, অধিকাংশই ভাবতীযই মহান হরপ্পা সভ্যতার ধারক বাহকদের উত্তরসূরী। যে হরপ্পা সভ্যতা সারা পৃথিবীকে সভ্যতাব আলো দিয়েছিল সেই উন্নততম সভ্যতাব উত্তবপুরুষ হল একালেব ভারতবাসী। যে হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে ভাবতবর্ষ গর্ব কবে, তার চাবভাগেব তিন ভাগই হবপ্পা সংস্কৃতিব অবদান। সুতরাং ভারতীযদের গর্বিত হওযা উচিত এই ভেবে যে, তাঁবা গরিমাময় হবপ্পা সভ্যতার উত্তরপুরুয—হরপ্পার অনার্য গবিমার ধাবক ও বাহক।

হবপ্পা সভ্যতাকে আর্য সভ্যতা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ। স্বাভাবিক কাবণে তাঁর প্রায় অযৌক্তিক তত্ত্বকে একালের কোনও ঐতিহাসিকই আমল দেন নি। এটা এখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, হবপ্পা সভ্যতা আর্য সভ্যতা নয়। আর্যবা ছিল অসভ্য, বর্বর এবং যাযাবর জাতি। ইউনেস্কোর [UNESCO] এক ইতালীয ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাস লিখতে গিযে অত্যন্ত সঠিকভাবেই লিখেছেন ঃ

"After 1500 B.C., the static agricultural and urban culture of the Indus, which had long been ossified and deprived of any growth or probability of growth, decayed and finally disappeared, According to some scholars, the final blow were inflicted by an invader from the North-West. These were the Aryans, a group of tribes, that came perhaps from the Caspian Zone and whose language still formed part of the single Indo-Iranic group, penetrating into Punjub from across the Afghan frontier passes, it is probably they who destroyed the strongholds (Puras) of the Indus Civilization. The Aryans were bearers of a civilization completely different from that of the Indus. Still semi-nomads when they entered India, they were chiefly engaged, apart from war, in cattle raising and only secondarily in agriculture. Gradually they imposed their language and their religion on the earlier Dravidian and Munda population of North India."

স্যার জন মার্শাল থেকে শুরু করে স্যার মোর্টিমার হুইলার [Sir Mortimer Wheeler], অধ্যাপক পিগোটদের পেরিয়ে অধ্যাপক গ্রেগরি পসেল [Gregory Possehl] এবং একালের ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ অবধি সবাই একবাক্যে বলছেন, ভারতে আগন্তুক ওই আর্যজাতি ছিলো বর্বর, অসভ্য এবং যাযাবর। এই একই কথা বলেছেন আমাদের দেশের দয়ারাম সাহানী, মাধো স্বরূপ ভাট, ননীগোপাল মজুমদার, অতুল সুব, যমুনাপ্রসাদ চন্দ, বি. বি. লাল, বি. কে. থাপার, জে. পি. যোশী প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ। কিন্তু স্বামী শঙ্করানন্দের মত কিছু ভারতীয় পণ্ডিত আছেন যাঁরা আর্যগবিমার মোহে প্রবলভাবে আচ্ছন্ন এবং যে আর্যগরিমার প্রবল প্রচারক ছিলেন কাউন্ট জোসেফ আর্থার দ্য গোবিনিউ, রিচার্ড ভাগনার, পণ্ডিত-প্রবর ম্যাক্সমুলাব [Max Muller] প্রভৃতি মনীষিগণ। আর্যগরিমার দিন শেষ হয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি। প্রমাণিত হযে গেছে আর্যরা ছিল বর্বর, অসভ্য, আগন্তুক, যাযাবব জাতি, তবু শঙ্করানন্দ ১৯৭৫ সালে লিখলেন ঃ

"Here we find the Italian writer has based his thesis on the unproved guess of Sir Mortimer Wheeler and Prof Piggott, who brought down to India a cultureless Aryan legion led by their uncultured hero Indra This hypothesis was quite opposite to the hypothesis of Prof Max Mueller and was concocted to suit the condition created by the discovery of the Indus civilization. The excavation at Mahenjodaro did not show any sign of foreign intervention, causing a break in the continuity of the civilization."

এটা বোঝা অসাধ্য যে, শঙ্করানন্দজীব মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা আর্য গরিমার মোহে এতো আচ্ছন্ন কেন? জার্মান পণ্ডিতরা হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়াব আগে নিজেদের প্রয়োজনে আর্য-গবিমা প্রচার করেছিলেন বলে সেটাকে ধ্রুব সত্য বলে আঁকড়ে থাকতে হবে—এমন যুক্তি অর্থহীন। ঋগ্বেদ পড়লেই বোঝা যায় আর্যরা ছিল হাঘরে হাভাতে যাযাবর বর্বর জাত। তাদের নেতা ইন্দ্র ছিল 'পুর বিনাশক' এক বর্বর গুণ্ডা। মহাভারতের কৃষ্ণ ঠিকই কবেছিলেন এই বৈদিক গুণ্ডার পূজা পরবর্তীকালে বন্ধ কবে দিয়ে। সুতরাং সেই বর্বর জাতিকে এবং তার মিথ্যা গরিমাকে যাঁরা আজও মাথায় তুলে নাচেন ঈশ্বর তাঁদের ক্ষমা করুন! কেন তাঁরা বোঝেন না, তাঁরা আর্যদের উত্তরসূরি নন। তাঁবা অনার্য হবপ্পীয়দেব উত্তরসূরি, যে হরপ্পীয়রা সারা পৃথিবীকে সভ্য করে তুলেছে, যে হরপ্পা পৃথিবীকে দিয়েছে প্রাচীন পৃথিবীর উন্নততম সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাঁরা কেন ভুলে যান যে, হিন্দু সংস্কৃতির শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হরপ্পা সংস্কৃতির অবদান। হিন্দুধর্মের চারভাগের তিনভাগ উপাদানই হরপ্পা সভ্যতার—একথা আজ অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং আমরা ভারতীয়রা আজ হরপ্পার অনার্যগরিমায গর্বিত হবো, আগন্তুক, যাযাবর, বর্বর আর্যজাতির মিথ্যা গরিমায় নয়।

আর এটা এখন নির্জলা সত্যি যে, অধিকাংশ ভারতবাসীই হরপ্পীয়দেরই উত্তরসূরি, আর্যদের তথা নর্ডিকগোষ্ঠীর উত্তরসূরি নয়।

'আর্য'শব্দের কথা বলতে গিয়ে Encyclopedia Britannica বলেছে ঃ

"A people who, in prehistoric times, settled in Iran and northern India. From their language, also called Aryan language, the Indo-European languages of South Asia are descended. In the 19th century the term was used as a synonym for 'Indo-European' and also more restrictively, to refer to the Indo-Iranian languages. It is now used in linguistics only in the sense of the term Indo-Aryan languages.

During the 19th century there arose a notion—propagated most assiduously by the Count de Gobineau and later by his disciple Houston Stewart Chamberlain—of an 'Aryan Race', those who spoke Indo-European languages, who were considered to be responsible for all the progress that mankind had made and who were also morally superior to 'Semites', 'Yellows', and 'Blacks'. The Nordic, or Germanic, peoples came to be regarded as the purest 'Aryan'. This notion, which had been repudiated by anthropologists by the second quarter of the 20th century, was seized upon by Adolf Hitler and the Nazis and made the basis of the German Government policy of exterminating Jews, Gypsies and other 'Non-Aryans'."

নিজেদের খাঁটি আর্য হিসাবে প্রতিপন্ন করার দাবীর জন্য কেবল হিটলারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধেকটা জুড়েই জার্মান পণ্ডিতরা জার্মানদের মাথায় এটা ঢুকিয়েছে যে, জার্মানরা খাঁটি নর্ডিক [Nordic] এবং তারাই প্রকৃত আর্য। অবশ্য হিটলারের যুদ্ধস্পৃহা, অত্যাচার ও ধ্বংস প্রাচীন যুদ্ধবাজ আর্যদের কথাই মনে করিয়ে দেয়, যারা ভারতের উন্নত সভ্যতা ধ্বংস করে, হরপ্পীয়দের হত্যা করে গর্বের সঙ্গে ঋগ্বেদে লিখে রাখে তাদের এই সব দুষ্কর্মের বিস্তৃত বিবরণ। সুতরাং যুদ্ধবাজ ইহুদী-নিধনকারী হিটলার যে নিজেদের 'আর্য' বলে দাবী করতেন তা বোধহয় খুব একটা অসঙ্গত ছিল না। কারণ পুর-বিদারক 'পুরন্দর' তথা প্রাচীন আর্যদের নগর-ধ্বংসকারী নেতা ইন্দ্রের প্রবল যুদ্ধাকামিতা, হরপ্পীয়দের নির্বিচারে হত্যা এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন, হিটলারী অত্যাচার, যুদ্ধকামিতা ও ধ্বংসের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এক। হিটলারের মধ্যে খাঁটি 'আর্যরক্ত' থাকুক বা না থাকুক, তার কাজকর্ম ছিল ভারতে আসা আগন্তুক, বর্বর, যাযাবর আর্যজাতির নেতাদের মতই।

ম্যাক্সমুলার সাহেব বলেছেন যে, আর্যজাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাই আর্যভাষা। আগেই বলেছি 'আর্য' শব্দটা ভাষাবাচক। অনেক পরে তা জাতিবাচক হয়েছে। ম্যাক্সমুলার আর্যজাতিভুক্ত কারা তা নির্দিষ্ট করে বলেন নি। হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জার্মান, কেল্ট, স্লাভ প্রভৃতি জাতি আর্য ভাষায় কথা বলে। অতএব, ম্যাক্সমুলারের মত অনুসারে এরা আর্যজাতিভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। 'আর্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে মতভেদ থাকলেও শব্দটা যে Indo-European জাতির প্রাচ্যবিভাগের সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত সে বিষয়ে সবাই একমত। প্রাচ্যবিভাগের যে অংশ ভারতবর্ষে এসে বসবাস করে, তারাই Indo-Aryan নামে অভিহিত। ব্যাকট্রিয়া [Bactria] এবং পারস্য অঞ্চলে আর্যদের যে অংশটা থেকে যায় তাদের বলা হচ্ছে Iranıan। এই ইরান নামটা সম্ভবত আর্য শব্দেরই অপভ্রংশ। যে অংশ ভারতবর্ষে বসবাস স্থাপনা করলো তাদের আবার অনেকে বলছেন Aryo-Indian। বিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি সময়ে কিছু কিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক এবং মনীষী বলেন যে, আর্যজাতি ভাবতবর্ষেবই একটি জাতি, এরা ভাবতে বহিবাগত বা আগন্তুক নয়। এটা একদম ভুল কথা। গত ৭০/৮০ বছবে এটা প্রমাণিত যে, আর্যরা বর্বব, যাযাবব আগন্তুক জাতি। তারা ভাবতবর্ষে এসেছিল হবপ্পীয়দের সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে। এই আর্যরা ককেশীয় মহাজাতির নর্ডিক [Nordıc] নরগোষ্ঠীভুক্ত লোক। ৪০০০ বছব আগের ভাবতবর্ষে যাদেব দেখা আমরা পাই নি।

যাইহোক, এখন সবাই একবাক্যে বলছেন যে, প্রায ৩৫০০/৩৭৫০ বছব আগে আর্যরা হিন্দুকুশ পর্বত পাব হয়ে ভাবতবর্ষে আসে এবং হরপ্পীযদের হাবিয়ে তাবা এখানে 'আর্যাবর্ত' নামক উপনিবেশ স্থাপন করে। বলা হচ্ছে, আম্বালা অঞ্চলে অবস্থান কালে তারা ঋগ্বেদ রচনার বন্দোবস্ত করে। অসভ্য আর্যদের কোনও লিপি ছিল না। কিন্তু হরপ্পীয়দের সুগঠিত সুন্দর লিপি ছিল। ঋগ্বেদ কোন্ লিপিতে প্রথম লেখা হয়েছিল তা অজানা। তবে অনুমান করা হয এটি লেখা হয, ৫০০০ বছবের পুরাতন হবপ্পীয় লিপিতেই। এই লিপির পাঠোদ্ধার আজও হযনি। এখন পণ্ডিতেবা বলছেন এই লিপি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি।

এদেশের পণ্ডিতবা বলছেন, ভাবতে প্রচলিত আর্যজাতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন। আর সংস্কৃত ভাষা এসেছে আর্যদের আদি ভাষার সংস্কার থেকে। অর্থাৎ বর্বর আর্যরা যে ভাষায় কথা বলতো সে ভাষাব সংস্কার করেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। প্রশ্ন হল, সংস্কৃতের মর্ত একটা সমৃদ্ধ ভাষা বর্বব যাযাবর আর্যবা জানলো কেমন করে? শুধু তাই নয়, হরপ্পীয লিপিতে সেই আদি রূপের সংস্কৃত ভাষা বা ঋগ্বেদীয় সংস্কৃত ভাষা লেখা হল কেমন করে? লিপিকার গণেশ মহাভারতই বা লিখেছিলেন কোন লিপিতে? দেব-নাগরী হরফ তো অনেকটা পরবর্তীকালের। হরপ্পীয়দের লিপি যে প্রাচীন দ্রাবিড় লিপি তা এখন কম্পিউটারেব দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু হরপ্পীয়দের ভাষা কী ছিল তা আজও অজানা। তাই সংস্কৃত ভাষার আদি রূপ

কেবল আর্যরাই ব্যবহার করতো কিংবা আদি সংস্কৃত ভাষা আর্যরাই এদেশে এনেছিল এমন কথা আজও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয নি। ববং, এখন এই মত প্রাধান্য পাচ্ছে যে, বর্বর যাযাবব আর্যদেব ভাষা আদি-সংস্কৃত হতে পারে না। ভাবতবর্ষেব যে ভাষা সংস্কৃত হয়ে 'সংস্কৃত ভাষা' হযেছে সে ভাষা হবপ্পীযদেবই হওয়া সম্ভব। সংস্কৃতের মত উন্নত সমৃদ্ধ ভাষা একমাত্র হরপ্পীযদেবই আবিষ্কার বলেই মনে করা যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ভাবতে প্রচলিত ভাষাগুলি সাক্ষাৎভাবে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয়। এঁদের কেউ কেউ বলছেন যে, বৈদিকগণেব ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কোন ভাষা হতেই সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত এবং বর্তমান সময়ের কথিত ভাষাগুলি উদ্ভূত হয়েছে। 'প্রাকৃত' বলতে এখানে প্রাচীনকালেব কথ্য ভাষাগুলিকে বোঝানো হয়েছে। এঁবা বলছেন যে, সেই প্রাচীনতব ভাষাটি বৈদিককালের অনেকটা আগেই দুটি স্রোতে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি স্রোত সংস্কৃত ভাষায় মিশে যায়, অন্য স্রোতটি প্রাকৃত বা প্রাচীন কথ্য ভাষাসমূহে ৰূপান্তবিত হয। প্রায ২৩৫০ বছব আগে পাণিনিব ব্যাকবণ বচিত হয়। এটি সংস্কৃত ভাষা সংস্কাবেব চবম নিদর্শন। তেমনি বররুচি তাব প্রাকৃত ব্যাকরণ দিয়ে কথ্য ভাষাকেও শুদ্ধ কবাব প্রথম প্রযাস চালিযেছিলেন। প্রাকৃত ভাষাগুলির চাবটি মূল ভাগ—(১) মহাবাষ্ট্রীয়, (২) শৌবসেনী, (৩) মাগধী এবং (৪) পৈশাচী। এরপব সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণেবা, মাগধীভাষা বৌদ্ধজনেবা, মহাবাষ্ট্রীয় প্রাকৃত জৈনধর্মাবলম্বীবা ব্যবহাব কবতে থাকে। এই সব প্রাকৃত ভাষা থেকে কালক্রমে বহু স্থানীয় কথ্য ভাষা উদ্ভূত হয। বৌদ্ধধর্মেব প্রভাবে মাগধী প্রাকৃত প্রবল বিস্তাব লাভ কবে। ২৩০০ বছব আগে মাগধী প্রাকৃত জানা বৌদ্ধবা সিংহল যান বৌদ্ধধর্মের প্রচাবে। এই মাগধী প্রাকৃত থেকেই পালিভাষাব উৎপত্তি। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, গুজবাটি, হিন্দী, মাবাঠী, বাংলা ও উৎকলী এই সাতটি ভাবতীয ভাষাকে বলা হয আর্যভাষা। মারাঠী, বাংলা ও উৎকলীতে সংস্কৃতেব 'তৎসম', 'তদ্ভব' ও 'দেশজ' এই তিন জাতীয শব্দের সন্নিবেশ ঘটলেও, ওই তিনটি ভাষায 'তৎসম' শব্দের আধিক্যই বেশি। তেমনি গুজরাটি, পাঞ্জাবী, হিন্দীতে 'তদ্ভব' শব্দেব প্রাধান্য। আব সিন্ধীভাষায় 'দেশজ' শব্দই প্রধান।

আমাদেব আলোচনায হরপ্পা সভ্যতার বাহকদেব আমরা বলছি অনার্য বা প্রাগার্য। এই অনার্যরা কাবা তার বিস্তৃত বিববণ দিযেছেন ডঃ অতুল সুব তাঁব 'সিন্ধু সভ্যতাব স্বৰূপ ও সমস্যা' বইটিতে। তিনি লিখেছেন ঃ

"সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্নকেন্দ্রেব সমাধিস্থানসমূহ থেকে আমবা অনেকগুলি নবকঙ্কাল পেযেছি। তা থেকে আমবা জানতে পাবি যে, (১) হবপ্পা, মহেঞ্জোদাবো ও লোথালের লোকরা অধিকাংশই দীর্ঘশিবস্ক ও বিস্তৃতনাসা ছিল, তবে মহেঞ্জোদারোর লোকদের নাক হরপ্পা বা লোথালের মত অত বিস্তৃত ছিল না। (২) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর তুলনায় লোথালের লোকদেব মাথা চওড়া ছিল। (৩) এই সকল পার্থক্য যথা— মাথার খুলিব আকার, নাকের গঠন ও আকাবেব দিক থেকে বোঝা যায তারা সকলে

একই নবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (৪) তারা দীর্ঘশিরস্ক, প্রশস্তনাসা ও আকারে লম্বা ছিল বটে, কিন্তু হরপ্পা যুগে গুজরাটে ও সিন্ধুপ্রদেশে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতিরও অস্তিত্ব ছিল। (৫) ব্রহ্মগিরি, নাগার্জুনকুণ্ড, পিকলিহাল, মাসকী ও ইল্লেশ্বরম থেকে মেগালিথিক যুগেব প্রাপ্ত নরকঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মেগালিথ (সমাধিস্তুপের উপর স্মৃতিফলক) নির্মাণকারীরা অধিকাংশই বিস্তৃতশিরস্ক, আকারে লম্বা ও দৃঢ দেহবিশিষ্ট লোক ছিল। (৬) কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের আদিচান্নালুবের ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে তারা দীর্ঘশিরস্ক ও নাতিদীর্ঘশিবস্ক ছিল। (৭) উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী ও তক্ষশিলা হতে প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এই সকল স্থানে দীর্ঘশিরস্ক জাতির লোকরাই বাস করত, এবং পরে সেখানে এক বিস্তৃতশিরস্ক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

সুতরাং এই সকল সিদ্ধান্ত থেকে পবিষ্কার বুঝতে পাবা যায যে, (১) নবোপলীয যুগেব লোকরা দীর্ঘশিবস্ক ছিল। (২) হবপ্পা ও অন্যান্য তাম্রাশ্ম যুগের লোকরা দীর্ঘশিবস্ক ও নাতিদীর্ঘশিরস্ক ছিল। কিন্তু গুজরাট ও সিন্ধুপ্রদেশে বিস্তৃতশিবস্ক জাতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। (৩) মেগালিথিক যুগের লোকরা বিস্তৃতশিবস্ক ছিল। এব দ্বাবা প্রমাণিত হয যে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিসমূহেব অনুপ্রবেশ পবে ঘটেছিল। এখানে বক্তব্য যে, বাঙলার পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিযেছে তা দীর্ঘশিরস্ক। তাবা যে ভূমধ্যসাগবীয গোষ্ঠীব লোক, তা এখানে প্রাপ্ত ক্রীট দেশীয এক সীলমোহব দ্বাবা সমর্থিত হয। যেহেতু বাঙলার লোকবা বিস্তৃতশিবস্ক, সেই হেতু মনে হয যে পাণ্ডুবাজাব ঢিবিতে বাণিজ্য হেতু আগত ভূমধ্যসাগবীয গোষ্ঠীব লোকদেব একটা উপনিবেশ ছিল।

সে যাইহোক, মহেঞ্জোদারো, লোথাল প্রভৃতি নগরসমূহ বাণিজ্যকেন্দ্রিক Cosmopolitan Cities ছিল। সেইহেতু এই সকল নগবে নানা নবগোষ্ঠীর লোকেব সমাবেশ হত, এবং তাদেব মধ্যে কেউ মারা গেলে, তাকে ওইখানেই সমাধি দেওয়া হত।''

উৎখননেব ফলে মহেঞ্জোদাবো থেকে পাওযা গেছে ৪১টি, হবপ্পা থেকে ২৬০ টি, চানহুদারো থেকে ১টি, রূপার থেকে ২১টি ও পাণ্ডু রাজাব ঢিবি থেকে ১৪টি নরকঙ্কাল। এগুলি পবীক্ষা করে নৃতত্ত্ববিদরা বলছেন হরপ্পা সভ্যতার লোকরা হল (১) আদি অস্ট্রেলীয [Proto-Australoid], (২) ভূমধ্যসাগরীয, (৩) মোঙ্গলীয় এবং (৪) আলপীয়। হরপ্পা সভ্যতার বেশির ভাগ অধিবাসীই ছিল প্রোটো-অস্ট্রালযেড। হরপ্পা সভ্যতা ছিল প্রাচীন দ্রাবিড়-সভ্যতা। এই সভ্যতা পুরোপুরি অনার্য সভ্যতা কিংবা প্রাগার্য সভ্যতা।

আবারও বলি ভারতবর্ষের যে মানুষেরা প্রাচীনকালে এই উচ্চমানের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তারা কোন্ গোষ্ঠীর মানুষ ছিল সে বিষয়েও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পিগোট বলেন, যে সমস্ত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের খুলির হাড় দেখে অনুমান

করা যায় যে তারা প্রধানত আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) শ্রেণীর ছিল। এদের ললাট অনুন্নত এবং নাসিকা অনতিপ্রশস্ত। আব এক শ্রেণীর কবোটি পাওয়া যায় যা বর্তমান ভারতেব আদিম অধিবাসীদের অনুরূপ মানুষেব পবিচয দেয। অপর এক শ্রেণীব কঙ্কাল পাওয়া যায়, যা ঈঙ্গিত করে এদের মস্তিষ্ক লম্বা ছিল, নাসিকা অপ্রশস্ত। ফ্রিডরিকস্ (Friedricks) ও মুলার (Muller)-এব ধারণায তাবা আদি আর্মেনীয (Armenoid)। মনে হয, বেশির ভাগ অধিবাসীই ছিল আদি-অস্ট্রেলীয় শ্রেণীর। বেশ কিছু দ্রাবিড় শ্রেণীব মানুষও হরপ্পায ছিল।

হবপ্পা সভ্যতার এই মানুষগুলি প্রায় ১৫০০ বছর তাদেব উচ্চ সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষেব বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বসবাস করছিল। সেই ভাবতবর্ষের মধ্যে আফগানিস্তানও ছিল। এবপর প্রায় ৪০০০ বছর আগে পশ্চিম দিক হতে এক নতুন জাতি এসে তাদের পর্যুদস্ত করেছিল। তাবা প্রথমে এসেছিল আফগানিস্তান অঞ্চলে। তাবপব বালুচিস্তান পার হযে তাবা চলে আসে সিন্ধু উপত্যকায। ঐতিহাসিকবা বলছেন এবা পবরর্তীকালের বৈদিক সংস্কৃতিব বাহক আর্যজাতি। এবা ছিল যাযাবব এবং গান্ধার তথা আফগানিস্তানে প্রবেশকালে ঘোবতর বর্বর। এই বর্বব যোদ্ধার জাত আর্যরা হবপ্পা সভ্যতার বহু নগব ধ্বংস করে। অল্প সময়েব মধ্যেই তাবা আফগানিস্তান থেকে শুরু কবে প্রযাগ বা এলাহাবাদ অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল কবে। বিজযী বর্বব আর্যদের সংস্কৃতিব সঙ্গে এই অঞ্চলেব হরপ্পীয সভ্যতাব মিশ্রণ ঘটে। সৃষ্টি হয ভাবতীয়-আর্য সভ্যতা (Indo-Aryan Civilization) বা ভাবতীয-আর্য সংস্কৃতি (Indo-Aryan Culture)। পববর্তীকালে আমবা যাকে হিন্দু সভ্যতা বলি তাব শতকবা পঁচাত্তব ভাগই হল হরপ্পা-সংস্কৃতি এবং মাত্র পঁচিশ ভাগ হল এই বর্বব আর্যদেব সংস্কৃতি।

পূর্বেই বলা হযেছে, ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কুর্দু (Courdoux) লক্ষ্য কবেন যে, সংস্কৃত ভাষাব সঙ্গে গ্রীক ও লাতিন ভাষার বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। স্যব উইলিযাম জোনস ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনিই প্রথম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' গ্রন্থেব ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই সাদৃশ্য তাঁবও দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। এই সাদৃশ্য হতে তাঁরা অনুমান করেন যে, এই ভাষাগুলি একটি প্রাচীনতর ভাষা হতে উৎপন্ন হযেছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বপ (Bopp) এ বিষয গবেষণা কবে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই অনুমানের সপক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। তিনি এই ভাষাগুলিকে ভাবত-ইউরোপীয় (Indo-European) গোষ্ঠীর ভাষা বলে নামকবণ কবেন।

এই ভাষাগুলিতে মৌলিক শব্দগুলিব যেগুলি পাবিবাবিক সম্বন্ধসূচক এবং সংখ্যাসূচক শব্দ, তাদের মধ্যে পরস্পর আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন, সংস্কৃত 'পিতৃ' শব্দ লাতিনে 'পাটের' (Pater) হযে গেছে, ইংবেজীর 'ফাদার' (Father), জার্মান ভাষায় 'ফাটের' (Vater) এবং ফরাসীতে 'প্যাব' (Père)। সংস্কৃত 'শতম্' লাতিন ভাষায় 'সেন্টাম' (Centum)। সংস্কৃত 'ত্রি' ইংবাজিতে 'থ্রি' (Three), জার্মান ভাষায় 'ড্রাই' (Drei), ফবাসীতে 'ত্রোয়া' (Trois) ইত্যাদি। এইসব সাদৃশ হতে

এই রকম অনুমান করা হয় যে, এইসব ভাষাভাষীদের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল এবং তারা একই ভাষায় কথা বলত। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে তারা যখন বিভিন্ন দিকে ছড়িযে পড়ল তাদেব ভাষা পবিবর্তিত হয়ে পরস্পর হতে বিভিন্ন হযে গেল। অনুমান করা হয় যে, এই পূর্বপুরুষদের গোষ্ঠী কৃষিজীবী ছিল, তাবা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, এবং তামা এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত এবং মানুষের আদর্শে কল্পিত (Anthropomorphic) দেবতাদেব পূজা করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায, বৈদিক যুগে বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞেব মত অনুষ্ঠান আলতাই টার্কদেব মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে এবং আয়ার্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এখন প্রশ্ন হল, এই আদিম জাতির বাসভূমি কোথায় ছিল। এই নিয়ে প্রচুর মতদ্বৈধ আছে। জার্মান পণ্ডিত কোসিনা (Kosinna) প্রতিপাদিত কবতে চেষ্টা কবেছিলেন যে, তাদেব আদি বাসভূমি ছিল উত্তব ইউরোপীয উপত্যকায। ভারতীয গবেষক মনীষী বাল গঙ্গাধব তিলক প্রমাণ কবতে চেষ্টা কবেছেন যে প্রাচীন আর্য জাতিব বাস ছিল ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দেব কোন সময় উত্তব মেরু অঞ্চলে।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব হতে সংগৃহীত তথ্যেব ভিত্তিতে একটি তৃতীয মত গড়ে উঠেছে। অধ্যাপক জে. এল. মাযার্স (J.L Myers), হ্যাবল্ড পীক (Harold Peake) এবং চাইল্ড (Childe) এই মতটির সমর্থক। তাঁদের ধাবণায খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয ও দ্বিতীয সহস্রাব্দে এদেব নিবাস ছিল দক্ষিণ কশিয়াতে এবং তাব পূর্বাঞ্চল কাস্পিযান সাগরেব তীবে। এবা খানিকটা যাযাবব ছিল তবে সামান্য কৃযিকার্য কবত এবং স্থায়ী বসতিও স্থাপন কবত। তাবা মেষ, গরু ও অশ্ব পালন কবতে শিখেছিল। তারা মৃতদেব সমাধিস্থ করত।

পিগোটেব ধারণায় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ শতাব্দীর পররর্তী শতাব্দীগুলিতে উত্তব-পশ্চিম দিক থেকে ভাবত একাধিক জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। ভাবত-ইউবোপীয় ভাষাভাযী মানুয তাদেব অন্যতম ছিল। এই সময় পাবস্যেব সীমানায কাসাইট (Kasite) এবং মিটানিযানদেব (Mittanian) স্থাপিত রাজ্য গড়ে ওঠে। তাবা ভাবত-ইউবোপীয় ভাষাভাযী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হুইলাব-এব ধাবণা এই সময়ই ঋগ্‌বেদে বর্ণিত প্রাচীন আর্যজাতি উত্তব-পশ্চিম ভাবতে প্রবেশ কবে এবং হবপ্পা সংস্কৃতির ধারক যে মনুষ্যগোষ্ঠী ছিল তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয। এই সংঘর্যে যারা অধিনায়কেব ভূমিকা গ্রহণ করে তাদেব আদর্শেই ঋগ্বেদেব দেবতা ইন্দ্রের চরিত্রটি কল্পিত হয়েছে। তিনি বলেন, ঋগ্বেদে 'পুবন্দব' কথাটি ইন্দ্রেব উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত। ইন্দ্র সিন্ধুনদের অববাহিকায় যে সভ্য প্রাচীন জাতিদেব শহব ছিল সেইগুলি ধ্বংস করেন বলেই তাঁর নাম 'পুরন্দর'। সিন্ধুর অববাহিকাবাসীরা প্রস্তরের এবং মৃত্তিকাব দুর্গ নির্মাণ করত। তাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই অঞ্চলে সম্প্রতি অনেকগুলি আবিষ্কার করেছেন। ঋগ্বেদে ইন্দ্র এই ধবনের বহু দুর্গ ধ্বংস কবেছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে তা এই সকল দুর্গকেই সূচিত করে।

আগেই বলেছি, পিগোট হুইলাবেব এই প্রতিপাদ্য গ্রহণ কবেছেন। তিনি বলেন এটা সুবিদিত যে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দেব গোড়াব দিকে ভাবতে হরপ্পা সংস্কৃতি পূর্ণ মহিমায অধিষ্ঠিত ছিল। তাদেব সংস্কৃতি ছিল নগবকেন্দ্রিক এবং সেই নগরগুলি দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। আর্যজাতি ভাবতে প্রবেশ কবে তাদেব সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের দুর্গগুলি ধ্বংস কবে দেয। এই ঐতিহাসিক ঘটনাবই ছাযাপাত হযেছে ঋগ্বেদে ইন্দ্রেব বীবত্বসূচক কীর্তিব বর্ণনায। বৈদিক সাহিত্যে যে জাতিব সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হযেছিল তাদেব দস্যু বা দাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের আকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে তাবা কৃষ্ণকায় এবং 'অনাস' অর্থাৎ তাদেব নাক চ্যাপ্টা ছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি, এই প্রাচীনতর জাতিব মানুষেব অধিকাংশ ছিল আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীভুক্ত। তারা কৃষ্ণকায ছিল এবং তাদেব নাক চ্যাপ্টা ছিল। আব আর্যবা ছিল ককাসয়েড (Caucasoid) মহাজাতিব নর্ডিক (Nordic) গোষ্ঠীব লোক।

পণ্ডিতেবা এক বাক্যে বলছেন, 'আর্য' শব্দটা জাতিবাচক শব্দ নয, ভাষাবাচক শব্দ মাত্র। যে বিশেষ নবগোষ্ঠী 'আর্য' ভাষায কথা বলত তাবাই 'আর্য' নামে অভিহিত। এদেব কোন লিপি ছিল না। এবা তাই লিখতে জানত না। এদের দুটি গোষ্ঠী ছিল। একটি 'আলপীয' এবং অন্যটি 'নর্ডিক' (Nordic)। আলপীযবা ছিল 'হ্রস্বকপাল' (Brachycephal) জাতি, আব নর্ডিকবা দীর্ঘকপাল (Dolichocephal) জাতি। 'আর্য গরিমা' তত্ত্বেব ধাবক পণ্ডিতবা অনেক 'মনে হয' যোগ কবে বলেছেন এবা বাশিযাব উরাল পর্বতের দক্ষিণেব শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল অঞ্চলে বসবাস কবতো। নবোপলীয যুগেব বিকাশকালে এবা নাকি দু'বকম হয়ে যায়। আলপীযবা কৃষিকাজ শুরু কবে। আর নর্ডিকবা কবতে থাকে পশুপালন। আলপীযবা তাদেব কৃযিকাজেব সাফল্যেব জন্য সৃজনশক্তি রূপ দেবতাসমূহেব পূজা চালু করে। নর্ডিকবা 'প্রকৃতি' বিষযক দেবতাদেব পূজা কবতে থাকে। তাবা তাদেব উপাস্য দেবতাদেব 'দেব' নামে অভিহিত কবত। মনে কবা হয, আলপীযরা এশিযা মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে ভাবতেব পশ্চিম সাগবেব উপকূল ধবে অগ্রসব হযে সিন্ধু, কাথিযাবাড়, গুজবাট, মহাবাষ্ট্র, কুর্গ, তামিলনাড়ু পেবিয়ে চলে আসে উড়িষ্যা এবং বাংলায়। আর্য ভাষাভাষী এই আলপীযরা 'অসুব' নামে আখ্যাত ছিল। মনে করা হয, এদেবই একটি শাখা প্রথমে শিরদবিযা ও আমুদবিযা নদী দুটিব মধ্যবর্তী সমতল অঞ্চলে বসবাস শুরু কবে এবং পবে তাবা ইবান থেকে এশিযা মাইনব অবধি নিজেদেব আধিপত্য বিস্তাব করে। এবা নাকি নগব নির্মাণ কবতে জানত। স্থাপত্যবিদ্যায বিশেষ পাবদর্শী ছিল। মযদানব বা ময়াসুব নাকি এদেবই বংশধর। অসুবদের বাজতন্ত্র ছিল। অসুববাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরুও ছিলেন অসুরবাজ। পুরু বংশেই জন্ম হয়েছিল ধৃতবাষ্ট্র-পাণ্ডুর। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু অসুব বংশ সম্ভূত। ভারতে অসুরদের বিস্তৃতি ছিল বাংলা থেকে বারাণসী।

বৈদিক আর্যবা তথা নর্ডিকগোষ্ঠীব এক দল চলে যায পশ্চিম ইউবোপে এবং

একদল প্রায় ৩৫০০ থেকে ৪০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে আসে। এরা প্রথম পঞ্চনদের উপত্যকায় বসবাস শুরু করে। হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বহু সংগ্রামে লিপ্ত হয়। হরপ্পা সভ্যতার বহুলাংশ ধ্বংস করে। এই নর্ডিক আর্যরা ছিল বর্বরজাতি। পৃথিবীর যেখানেই তারা গেছে সেখানেই ধ্বংস করেছে। এরা নগর নির্মাণ করতে জানত না। এরা নগর ধ্বংসই কবত। প্রথমদিকে এদের বাজা ছিল না। পরে অসুরদের দেখে এরা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এরা পঞ্চনদ অঞ্চল থেকে ক্রমে বারাণসী অবধি বিস্তার লাভ করে। এদের আসাব আগে ভাবতে যে জনগোষ্ঠী বাস করতো বৈদিক সাহিত্যে তাদেব অসুর, দাস, দস্যু, পণি, নিষাদ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। সর্বত্রই এরা যুদ্ধ করেছে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। পরে তাদের সঙ্গে সংস্কৃতিব সংমিশ্রণ ও আপোস ঘটেছে। গ'ড়ে উঠেছে 'ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি'। আজ হিন্দু সংস্কৃতির শতকরা পঁচাত্তর ভাগই প্রাগার্য সংস্কৃতি এবং বাকী পঁচিশ ভাগ আর্য ও অন্যান্য সংস্কৃতি। সুতবাং বর্বব আর্যবা ভাবতভূমি গায়েব জোবে দখল কবলেও তাব সংস্কৃতির ধাবাকে বদলে দিতে পারে নি নিজেদেব মত কবে। ববং তাদেব যেটুকু সংস্কৃতি ছিল তা মিশে গেছে প্রাগার্য বা অনার্য সংস্কৃতিব বিশাল প্রবাহেব সঙ্গে। সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে অনার্য-বিজয়ই সূচিত হয়েছে আবহমান কাল ধরে।

ব্যাসদেব রচিত মহাভাবত যেহেতু আর্য-বিজয়েব পরে লেখা সেখানে জাতপাতেব ব্যাপারটা কিছুটা থাকতে পাবে। আদি মহাভাবতে জাতপাতেব ব্যাপারটা ঠিক কী ছিল বলা মুশকিল। তবে ঋগ্বেদের আমলে জাতপাতেব কড়াকড়ি তো ছিলই না, উপরন্তু নর্ডিক আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে বাজতন্ত্র চালু হওয়াব আগে অবধি চতুর্বর্ণ বিভাজন ছিল কিনা সন্দেহ। কাবণ ঋগ্বেদেই লেখা হযেছে পিতা ব্রাহ্মণ, তাব পুত্র বৈদ্য এবং তার কন্যা যবভর্জনকাবিণী। অর্থাৎ একই পরিবাবে ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং বৈশ্যের অবস্থান। মনুসংহিতার আমলে অর্থাৎ ২৭০০-৩০০০ বছব আগে জাতিভেদ বা চতুর্বর্ণেব ভেদাভেদ প্রবল আকাব নেয। তখন বৈদ্যরা শূদ্র হয়ে গেছেন এবং ব্রাহ্মণপুত্র বৈদ্য হলে পিতা জাতিচ্যুত হচ্ছেন। কিন্তু ব্যাসদেবেব মহাভারত অতোটা নবীন নয়। কলিযুগ শূদ্রদের যুগ। প্রাগার্য ভারতীযরা বৈদিক আর্যদের কাছে ছিল শূদ্র। তাদের কাছে মহাভারতীয় কাহিনী ছিল 'শূদ্র বিজয়'-এর কাহিনী। তবে 'শূদ্র' বলতে অনেক মনীষী 'শ্রমিকশ্রেণী'-কে বোঝানো হয়েছে বলে মনে করেন। আর মহাভাবতের কাহিনী 'শূদ্র' বা 'অনার্য' মানুষের বিজযকাহিনী। এই কাহিনীর সঙ্গে নর্ডিক আর্যদের কোনও সম্পর্ক নেই।

নর্ডিক আর্যগোষ্ঠী এদেশের হরপ্পীয়দের হারিয়ে এখানে তাদেব অধিকার কাযেম করে। পরাজিত হরপ্পীয়রা তাদের কাছে হ'য়ে যায় 'অনার্য' বা 'শূদ্র' বা 'দাস' কিংবা 'সেবক'। হরপ্পীয়দের মধ্যে যে কেবল এদেশের আদিবাসীরাই ছিল তা নয়। আলপীয, দ্রাবিড়, প্রোটোঅস্ট্রালযেড ইত্যাদি বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে প্রাগার্য জাতি বা হরপ্পীয়দের সৃষ্টি হয়েছে বলেই মনে করা হয়। এদেরই আর্যরা পরবর্তীকালে বলেছে

'শূদ্র'। সত্যবতী, ব্যাসদেব, শান্তনু প্রমুখেরা আর্যদের বিচারে 'দাস' বা 'শূদ্র' বংশীয়। তাই মহাভারতের কাহিনী 'শূদ্র' বিজযেবই কাহিনী। তাছাড়া মহাভারতের কাহিনীকাল এদেশে আর্য-বিজয়ের বহুকাল আগেব কোন একটা সময়। অতএব এই প্রাগার্য কাহিনীর নায়ক-নায়িকারা আর্যদের কাছে 'শূদ্র' হিসাবেই পরিচিত ছিল। এর বিজয়-কাহিনী তাই অনার্যদের বিজয়-কাহিনী বা শূদ্র বিজয়-কাহিনী। আর্য অধিকারের অনেকটা পরে মহাভারতের কাহিনী লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়। তখন আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের যুগ। মহাভারতেব লিখিত অবস্থায় তার কাহিনীর মধ্যে এই সংমিশ্রণের প্রতিফলন ঘটেছে নানাভাবে। তবু এটা অনস্বীকার্য যে প্রাগার্য মহাভারতীয় কাহিনী অনার্য-বিজযেরই কাহিনী তথা শূদ্র-বিজযেব কাহিনী। প্রাগার্য এই কাহিনীর কুশীলবরা আর্যদের চোখে ছিল 'শূদ্র', 'দাস' ইত্যাদি। তাই এটি 'দাস বংশ' প্রতিষ্ঠারও কাহিনী।

যে অর্থেই হোক মহাভাবত শূদ্র-বিজয়েব কাহিনীই বলছে। মহাভাবতেব মহাযুদ্ধেব সময়ই দ্বাপরযুগ শেষ হয়ে কলিযুগ শুরু হয়ে যায়। ওই মহাযুদ্ধ যুগক্রান্তিকালে সংঘটিত হযেছিল। প্রায় ৫১০৩ বছব আগে শুরু হযেছে কলিযুগ। যুধিষ্ঠিবেব রাজ্যাভিষেকেব সময থেকেই শুরু হয়েছে এই কলিযুগ বা শূদ্রযুগ। তিনিই শূদ্রযুগের প্রথম রাজা। আগেই বলেছি, ববাহমিহিব প্রমুখ অবশ্য যুধিষ্ঠিরেব বাজ্যাভিষেক কাল বলেছেন ৬৫৩ কল্যাব্দে অর্থাৎ ৪৪৫০ বছব (২০০৩ সালে) আগেব কোন সময়। অতি সম্প্রতি কচ্ছ উপসাগবেব তলায যে নগবীব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার বয়সও প্রায ৪২০০-৪৫০০ বছব। মনে কবা হচ্ছে এটিই মহাভাবতীয দ্বাবকা নগবী, যা সে সময সমুদ্র কবলিত হয। সুতবাং অনার্য রাজ বা শূদ্রবাজ যুধিষ্ঠিবেব রাজ্যাভিষেককাল ৪৪৫০ বছর আগেব কোনও সময় হওযাব সম্ভাবনাই বেশি। আব ৪৫০০ বছর আগে হরপ্পা সভ্যতা তাব উন্নতির চবম শিখবে উঠেছিল। সুতরাং মহাভারতের কাহিনী হরপ্পা আমলেব কথাই বলছে। বলছে অনার্য গরিমার কথা।

যাইহোক, ভারতে আর্যরা ছিল আগন্তুক জাতি। তাবা কবে এবং কোথা থেকে ভারতে এসেছিল, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে এই তথ্য বের করবার একটা সূত্র আছে। এটা সর্ববাদিসম্মত যে আর্যবাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল এবং ঘোড়ায়-টানা হালকা ধরনের জঙ্গিবথ তৈবি কবেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়েছে যে প্লাইস্টোসিন যুগের শেষভাগে ঘোডা বন্য অবস্থায় রুশ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ও ইউক্রেনিয়ার শুষ্ক ও তৃণাবৃত প্রান্তবে বিচবণ কবত। সেখান থেকে ঘোড়া পূর্বদিকে কাজাখিস্তান ও মধ্য এশিযায বিস্তার লাভ করে। সুতবাং আর্যরা যখন ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, তখন এই অঞ্চলেই কোন স্থানে তাদের আদিম নিবাস ছিল।

পণ্ডিতেরা বলছেন, আর্যরা ঘোড়াকে বশীভূত করেছিল আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। ভোপাল থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরের ভীমবেটকায যে সব গুহাচিত্র পাওয়া গেছে সেই চিত্রগুলির বয়স ১০,০০০ থেকে

৩০,০০০ বছর। এই চিত্রগুলির বেশ কয়েকটিতে দেখানো হয়েছে ঘোড়ায় চড়ে শিকার করার দৃশ্য। অনেকগুলি গুহায় রয়েছে পোষমানা ঘোড়ার ছবি। তাহলে কি বলা যায় না আর্যদের বহু আগেই ভীমবেটকার মানুষেরা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিলেন? ভীমবেটকা নিয়ে গবেষণা এখনো শেষ হয় নি। পণ্ডিতেরা ভীমবেটকার ঘোড়া নিয়ে এখনো কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, হরপ্পার লোকরা ঘোড়ার ব্যবহার জানতেন না। আর জানতেন না বলেই তাঁরা ঘোড়ায় চড়া আর্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নানা জায়গায় পরাজিত হয়েছিলেন। আবারও একটা প্রশ্ন এসেই যায়। তা হল, কমপক্ষে ১০,০০০ বছর আগের ভীমবেটকার মানুষেরা ঘোড়াকে তাদের শিকারের কাজে ব্যবহার করতে পারলেও মাত্র ৫০০০/৫৫০০ বছর আগের হরপ্পার লোকরা ঘোড়ার ব্যবহার জানলো না কেন? হরপ্পা সভ্যতার দক্ষিণ সীমানা থেকে ভীমবেটকার দূরত্ব কিন্তু এমন কিছু নয়। তবু কেন এই অঘটন?

আবারো বলি, 'আর্য' শব্দটি মোটেই জাতিবাচক (Racial) শব্দ নয়। এটা ভাষাবাচক শব্দ। যে সকল জাতি বা গোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলত, তাদেরই আমরা আর্য বলি। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে যে, দুই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী আর্য ভাষায় কথা বলত। তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী ছিল 'নর্ডিক' ও অপর গোষ্ঠী 'আলপীয়'। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ ছিল মাথার খুলির আকার। নর্ডিকরা ছিল দীর্ঘকপাল জাতি, আর আলপীয়রা হ্রস্বকপাল জাতি। নর্ডিকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। এরা উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করেছিল এবং ক্রমশ পূর্বদিকে নিজেদের বিস্তার করেছিল বিদেহ ও মিথিলা পর্যন্ত। আলপীয়দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মধ্যমাকার, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল ও গায়ের রঙ ফরসা ও দৈহিক ওজন নর্ডিকদের চেয়ে কম।

ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল। এখানে নর্ডিক ও আলপীয় এই উভয় গোষ্ঠীর লোকই বাস করত। নবোপলীয় যুগের উত্তরকালে আলপীয়রা কৃষি-পরায়ণ হয়, আর নর্ডিকরা পশুপালনে রত থাকে। এর ফলে উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। নর্ডিকরা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকারের আঙ্গিকের উপাসক ছিল এবং উপাস্যদের 'দেব' বলে অভিহিত করত। আর আলপীয়রা কৃষির সাফল্যের জন্য সৃজনশক্তিরূপ দেবতাসমূহের পূজা করত। তাদের তারা 'অসুর' নামে অভিহিত করত। মনে করা হয়, আলপীয়রাই প্রথম নিজেদের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত করে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীদ্বয় বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূখণ্ডে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য

বিস্তার করে। তাদেরই একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে, ক্রমশঃ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাড় ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং এর একদল পূর্ব উপকূল ধবে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। আরও মনে করা হয় তারা দ্রাবিড়দের অনুসরণে এসেছিল। আর অপরপক্ষে নর্ডিকরা তাদের আদি বাসস্থান থেকে দু'দলে বিভক্ত হয়ে, একদল পশ্চিমে ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয় ও অপর দল ভারতের উত্তব-পশ্চিম প্রবেশদ্বার দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে। এরাই বচনা করেছিল 'ঋগ্বেদ'। ঋগ্বেদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তারা অবিরাম সংগ্রাম করেছিল দুর্গ ও প্রাচীরবেষ্টিত নগবসমূহের অনার্য অধিবাসীগণেব সঙ্গে। এই অনার্য অধিবাসীগণই সিন্ধু সভ্যতার তথা হরপ্পা সভ্যতার বাহক।

আগেও বলেছি, আবারও বলছি, একালেব ঐতিহাসিকদেব মতে আর্যবা নর্ডিক গোষ্ঠীভুক্ত যাযাবর, বর্বর জাতি। তাবা পৃথিবীব যেখানেই গেছে সেখানেই ধ্বংস কবেছে উন্নততর সভ্যতা। হবপ্পীয় বিশাল উন্নততম সভ্যতাকে তাবা অনেকাংশে ধ্বংস কবেছে। পবে অবশ্য তারা মিশে গেছে হরপ্পা সভ্যতাব লোকজনের সঙ্গে। সাংস্কৃতিক এবং শারীরিক মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয়েছে ভাবতীয় আর্য সভ্যতা যাব ৭৫ শতাংশ উপাদান হবপ্পা সভ্যতার এবং বাকী ২৫ শতাংশ বর্বব আর্যদের কিছু বর্বব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। সুতবাং হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের নাযক হল নর্ডিক গোষ্ঠীব লোকবা অর্থাৎ আর্যরা। হাঘবে, হাভাতে এই জাতিটি হবপ্পাব জনগণেব উৎপাদনে ভাগ বসিয়েছে। শ্রমবিমুখ কিন্তু যুদ্ধপ্রিয় আর্যবা হবপ্পার মানুষদেব শ্রমে উৎপাদিত সম্পদকে নিজেদের ভোগে লাগিযেছে বিজয়ী জাতি হিসাবে। ভাবতবর্ষের ১৫ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত হরপ্পা সভ্যতাকে ধ্বংস করতে আর্যদের সময়ও লেগেছে বহুকাল। সবটা তারা ধ্বংস করতেও পারে নি। তাব আগেই তারা মিশে গেছে হরপ্পীযদের সঙ্গে। 'আর্যাবর্ত'-এর বাইবেও বহু জায়গা ছিল যেখানে বহুকাল ধরেই হবপ্পীয় সভ্যতা বিরাজ করেছে।

উন্নত হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের সঙ্গে বর্বর আর্যজাতির যে প্রবল সংঘর্ষ হয়েছিল তার বহুল প্রমাণ মেলে ঋগ্বেদের বহু অংশে। হবপ্পীয়দের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে আর্যরা বিজয়ী হয়। আর বিজিত হরপ্পীয় তথা প্রাগার্য বা অনার্য জাতির লোকদের পববর্তীকালে বৈদিক তথা ভারতীয় আর্য সভ্যতার সমাজে একটি নিকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। নতুন আগন্তুক জাতিরা নিজেদের আর্য বলত এবং যাদেব জয় করে এদেশে তারা বসতি স্থাপন করেছিল তাদের তারা দাস বা দস্যু বলত। এবাই সম্ভবত পবে শূদ্র জাতিতে পরিণত হয়। ঋগ্বেদে আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে বহু প্রমাণ রয়েছে এর সূক্তগুলিতে।

দাস জাতিকে পরাজিত করে তাদের নিকৃষ্ট স্থানে স্থাপিত করায় যে দেবতা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন ইন্দ্র। বৃত্রকে দমন করা ছাড়া এটি তাঁর অন্যতম

প্রধান ভূমিকা। একে ঐতিহাসিক ভূমিকাও বলা যেতে পারে। সম্ভবত ইন্দ্র একজন ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন এবং আর্যদের বিজয় অভিযানে তিনিই মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁকে দেবত্বের পদে উন্নীত করা হয়েছিল।

ঋগ্বেদে যে সব সূক্তে ইন্দ্রের তথা আর্যজাতির এই জয়ের স্তুতি করা হয়েছে তার অন্ততঃ পাঁচটি তুলে ধরা যাক আর্যদের হত্যা, ধ্বংস, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতার নমুনা হিসাবে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৩তম সূক্ত বলছে ঃ

"..৩। সমগ্র সেনানায়ক পৃষ্ঠভাগে ইষুধি সংযোজিত করেছেন। আর্য ইন্দ্র যাঁকে ইচ্ছা করেন, তাঁর নিকট গাভী প্রেরণ করেন। হে প্রকৃষ্টবৃদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদের প্রভূত ধন দান করে আমাদের নিকট ব্যাপারীর মত হয়ে মূল্য নিও না। ৪। হে ইন্দ্র! শক্তিমান মরুৎগণ সমীপে থাকলেও তুমি একক ধনবান দস্যুকে কঠিন বজ্র দ্বারা বধ করেছিলে। যজ্ঞবিরোধী সনকেরা তোমাব ধনু হতে বিনাশ উদ্দেশ করে আগমন করত মরণ প্রাপ্ত হয়েছিল। ৫। হে ইন্দ্র! সে যজ্ঞরহিত ও যজ্ঞানুষ্ঠাতাদের বিরোধীগণ মস্তক ফিরিয়ে পালিযেছে। হে হর্যশ্বসম্পন্ন, পলায়ন রহিত, উগ্র ইন্দ্র! তুমি দিব্যলোক হতে এবং আকাশ ও পৃথিবী হতে ব্রতরহিতদের উঠিয়ে দিয়েছ। ৬। তারা দোষরহিত (ইন্দ্রের) সেনার সাথে যুদ্ধ ইচ্ছা করেছিলো; সচ্চরিত্র মনুষ্যেবা (ইন্দ্রকে) প্রোৎসাহিত কবেছিল। পুরুষেব সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নপুংসকেরা যেরূপ পলায়ন করে, সেরূপ তারা নিরাকৃত হয়ে আপনাদেব শক্তিহীনতা জেনে ইন্দ্রের নিকট হতে সহজ পথ দিযে দূবে পলায়ন কবল। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই রোদনকারী বা হাস্যপরায়ণদের অন্তরীক্ষের প্রান্তে, যুদ্ধ দান করেছ; দস্যুকে দিব্যলোক হতে এনে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করেছ এবং সোমাভিষবকারী ও স্তুতিকাবীর স্তুতিরক্ষা করেছ। ৮। সেই বৃত্রের অনুচরেরা পৃথিবী আচ্ছাদন করেছিল এবং হিরণ্য ও মণিদ্বারা শোভমান হয়েছিল। কিন্তু সেই শত্রুগণ ইন্দ্রকে জয় করতে পারল না, ইন্দ্র সে বাধকদের সূর্য দ্বারা তিরোহিত করলেন। ৯। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক সর্বতোভাবে বেষ্টন করে সমস্ত ভোগ করেছ, অতএব তুমি মন্ত্র দ্বারা দস্যুকে নিঃসারিত কবেছ; সে মন্ত্র-অর্থ গ্রহণে অক্ষম যজমানদেরও রক্ষা করবার মানস কর। ১০। যখন জল দিব্যলোক হতে পৃথিবীব অন্ত প্রাপ্ত হল না এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করলেন এবং দ্যুতিমান বজ্র দ্বারা অন্ধকার রূপ মেঘ হতে পতনশীল জল নিঃশেষিতরূপে দোহন করলেন। ১১। প্রকৃতি অনুসারে জল প্রবাহিত হল; কিন্তু বৃত্র নৌকাগম্য নদীসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল; তখন ইন্দ্র স্থিরসঙ্কল্প বৃত্রকে অতিবলযুক্ত প্রাণসংহারক আয়ুধদ্বারা কয়েক দিনে হনন করলেন। ১২। ইন্দ্র ইলীবিশের প্রবল সৈন্য বিদ্ধ করেছিলেন ও শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ণকে বিবিধ প্রকারে তাড়না করেছিলেন। হে মঘবন্! তোমার যে পরিমাণ বেগ আছে যে পরিমাণ জল আছে, তদ্দ্বারা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শত্রুকে বজ্র দ্বারা হনন করেছিলে। ১৩। ইন্দ্রের কার্যসাধনকারী বজ্র শত্রুকে লক্ষ্য করে পতিত হয়েছিল। ইন্দ্র তীক্ষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ আয়ুধ

দ্বারা বৃত্রের নগরসমূহ বিবিধরূপে ভেদ করেছিলেন; তারপরে তিনি বজ্র দ্বারা বৃত্রকে আঘাত করেছিলেন এবং তাকে সংহার করে আপন উৎসাহ সম্যকরূপে বৃদ্ধি করেছিলেন। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি যে কুৎসের স্তুতি কামনা কর, সে কুৎসকে রক্ষা করেছ; তুমি যুদ্ধরত ও শ্রেষ্ঠ দশদ্যুকে রক্ষা করেছ। তোমার অশ্বের খুর হতে পতিত ধূলি দ্যুলোক স্পর্শ করে; শ্বৈত্রেয় মনুষ্যগণের অগ্রণী হবেন বলে উত্থিত হয়েছিল। ১৫। হে মঘবন্! শমতা গুণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ও জলনিমগ্ন শ্বিত্রাপুত্রকে ক্ষেত্র প্রাপ্তির জন্য তুমি রক্ষা করেছিলে; যারা আমাদের সাথে বহুকাল যুদ্ধ করছে, সেই শত্রুতাকাঙ্ক্ষীদেরও তুমি বেদনা ও দুঃখ প্রদান কর।" (১ম মণ্ডল, ৩৩তম সূক্ত)

এখানে ইন্দ্রকে আর্য বলা হয়েছে। মূলে অবশ্য 'অর্য' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই আর্য বা 'অর্য' সায়নের মতে 'স্বামীরূপ'। 'ঋ' মানে চাষ করা। তাই 'আর্য' বা 'অর্য' শব্দের অর্থ হয় কৃষিব্যবসায়ী। তবে আর্যরা কৃষিকর্মটাও ভাল করে জানতো না। মূলতঃ তারা ছিল যাযাবর। হরপ্পা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বিশেষ করে আফগানিস্তান অঞ্চলে এসে তারা ভাল করে কৃষিকাজ শিখতে থাকে। অনেকে মনে করেন, 'বৃত্র' হল হরপ্পীয়দের নির্মিত নদী বাঁধ, যেগুলির সাহায্যে নদীর জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হত। মদগর্বী ইন্দ্র সেই বৃত্র বা নদী বাঁধগুলি ধ্বংস করে শহরকে প্লাবিত করে দেয়। নগরগুলি এইভাবে বিনষ্ট হয়।

প্রাচীন আর্যগণ হিন্দু, ইরানীয়, গ্রীক, ল্যাটীন, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হবাব পূর্বেই 'আর্য' নাম ধারণ করেছিল। আর্যদের একটা গোষ্ঠী মেষপালনরত ছিল এবং এক স্থানে না থেকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতো। তারা নিজেদের ত্বরিত গতির গৌবব কবেই বোধহয় 'তুরাণীয়' নাম ধারণ করেছিল। আর্যগণ ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হবার পর যে যে স্থলে গিয়েছে সেই সব জায়গায় 'আর্য' নামের নিদর্শন পাওয়া যায়। আচার্য ম্যাক্সমুলার বিবেচনা করেন ইরান, আবমেনীয়, আলবেনীয়, ককেসাসের উপত্যকায় আইরন, গ্রীসের উত্তরে আরীয়, জার্মানদের মধ্যে আরিযাই এবং এরিন বা আয়ারল্যাণ্ড, আর্য নামের পরিচয় বহন করছে।

উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হরপ্পীয় সভ্যতার মনুষ্যগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাবতবর্ষের উর্বর ক্ষেত্রের দখল নিয়ে ওই আর্যদের বহু শতাব্দী ধরে যুদ্ধ-বিবাদ চলেছিল। সেই দীর্ঘকালীন যুদ্ধে হরপ্পীয়বা হেবে যায়। আর্যরা জয়ী হয়, কারণ তারা ছিল যুদ্ধবাজ জাতি। অশ্বকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কবতে পাবার ফলে এই যুদ্ধে জয় আরও সহজ হয়। হরপ্পীয়রা ঘোড়াব ব্যবহার জানতো না। ঘোড়া তখনও পোষ মানে নি হরপ্পীয়দের। আর্যরা প্রথমে হিন্দুকুশ পেরিয়ে কাবুল উপত্যকায় আসে। ওটাই তখন ভারতের পশ্চিম প্রান্ত।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৩ তম সূক্তে বলা হয়েছে ইন্দ্র বঙ্গৃদ নামক শত্রুর শত নগর ভেদ করেছিলেন। বলা হয়েছে ঃ

" হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুধর্ষণকারীরূপে যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বলদ্বারা নগরের

পর নগর ধ্বংস কর। হে ইন্দ্র! তুমি নথী ঋষির সাহায্যে দূর দেশে নমুচি নামক মায়াবীকে বধ করেছিলে। ৮। তুমি অতিথিগ্ব নামক রাজার জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় নামক শত্রুদ্বয়কে তেজস্বী বর্তনী দ্বারা বধ করেছ; তারপর তুমি অনুচর রহিত হয়ে ঋজিশ্বান নামক রাজার দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত বঙ্গৃদ নামক শত্রুর শত নগর ভেদ করেছিলে। ৯। সহায় রহিত সুশ্রবা নামক রাজার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য যে বিংশ নরপতি ও ৬০,০৯৯ অনুচর এসেছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র! তুমি শত্রুদের অলঙ্ঘ্য রথচক্র দ্বারা তাদের পরাজিত করেছিলে। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি তোমার রক্ষাসমূহ দ্বারা সুশ্রবা রাজাকে রক্ষা করেছিলে, তূর্বযান রাজাকে তোমার পরিত্রাণ সাধনসমূহ দ্বারা রক্ষা করেছিলে; তুমি কুৎস, অতিথিগ্ব ও আয়ুকে এ মহৎ যুবক রাজার অধীন করেছিলে। ১১। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখা স্বরূপ যজ্ঞ সমাপ্তিতে বর্তমান আছি ও দেবগণের দ্বারা পালিত হচ্ছি, আমাদের সকলই মঙ্গল। আমরা তোমার স্তুতি করি এবং তোমার প্রসাদে শোভনীয় পুত্র পাই ও প্রকৃষ্ট রূপে দীর্ঘ জীবন ধারণ করি।" (১ম মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত)।

ইন্দ্রের এই শতপুরী ধ্বংসের কথা ঋগ্বেদে আরও কয়েকটি সূক্তে রয়েছে। যেমন ঃ "...৬। তুনি নর্য, তুর্বশ, যদু নামক রাজাদের রক্ষা করেছ; হে শতক্রতু! তুমি বর্য কুলের তুর্বীতি নামক রাজাকে রক্ষা করেছ; তুমি আবশ্যকীয় ধন নিমিত্ত যুদ্ধে তাদের রথ ও অশ্ব রক্ষা করেছ; তুমি শম্বরের নবনবতি নগর ধ্বংস করেছ। ৭। যিনি ইন্দ্রকে হব্য দান করে ইন্দ্রের স্তুতি প্রচার করেন, অথবা হবোর সাথে উক্থ পাঠ করেন, তিনিই বিরাজ করেন, তিনি সাধুগণকে পালন করেন এবং আপনাকে বর্ধন করে; ফলদাতা ইন্দ্র তাঁর জন্য আকাশ হতে মেঘের জল বর্ষণ করেন। ৮। ইন্দ্রের বল অতুল, তাঁর বুদ্ধিও অতুল। হে ইন্দ্র! যারা তোমাকে হব্যদান করে তোমার মহৎ বল এবং স্থূল পৌরুষ বৃদ্ধি করে, সে সোমপায়ীগণ যজ্ঞকর্মদ্বারা প্রবুদ্ধ হোক।..." (১ম মণ্ডল, ৫৪ সূক্ত)।

"... ৩। আমি সোমপানে মত্ত হয়ে শম্বরের নবনবতি সংখ্যক পুরী এককালে ধ্বংস করেছি। আমি যখন অতিথিগ্ব দিবোদাসকে যজ্ঞে পালন করেছিলাম তখন তাকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়েছিলাম।..." (৪র্থ মণ্ডল, ২৬ সূক্ত)।

"...২। যিনি বাহুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরীভেদ করেছিলেন, যে বৃত্রহা অহিকে বধ করেছিলেন। ৩। যে কল্যাণকর, বন্ধু ইন্দ্র আমাদের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত গোযুক্ত যবযুক্ত ধন প্রভূত পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন করুন। ৪। হে বৃত্রহা সূর্যরূপ ইন্দ্র! অদ্য যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে প্রাদুর্ভূত হয়েছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হয়েছে। ৫। হে প্রবৃদ্ধ সৎপতি ইন্দ্র! যদি আপনাকে অমর মনে কর, তবে তোমার সে মনে করাই সত্য। ৬। দূরদেশে এবং নিকটবর্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিষুত হয়, হে ইন্দ্র! তুমি সে সকলেরই অভিমুখে গমন কর। ৭। আমরা মহান বৃত্রকে হননার্থে সে ইন্দ্রকেই অন্নদ্বারা বলবান করব। ধনবর্ষী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হোন। ...' (৮ম মণ্ডল, ৯৩ সূক্ত)।

এই 'নব নবতি' সংখ্যক পুরীব অর্থ হল ৯৯টি নগর বা শহর। সুতরাং বর্বর আর্যজাতির সেনানায়ক ইন্দ্র প্রচুর সংখ্যক নগব ধ্বংস করেছেন। প্রাগার্য বা অনার্যদের পরাজিত করে দাস বানিয়েছেন। একটু আগেই বলা হল ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে আছে ইন্দ্র বঙ্গৃদ নামক শত্রুব শত নগর ভেদ করেছিলেন। ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে তিনি যেন নগবেব পর নগর ধ্বংস করেন এবং দস্যুকে ধ্বংস করে শত্রু হতে যজমানদের মুক্ত করেন। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের চতুর্থ ঋকে আছে তিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থাপিত করেছেন। তৃতীয় মণ্ডলের চৌত্রিশ সূক্তের নবম ঋকে আছে ইন্দ্র দস্যুদের বধ করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছেন। চতুর্থ মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তেব ত্রয়োদশ ঋকে আছে ইন্দ্র পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলেন এবং শম্ববেব নগরসমূহ ধ্বংস করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ চতুর্থ মণ্ডলেব ২৬ তম সূক্তেব তৃতীয় ঋকে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ইন্দ্র শম্ববেব ৯৯টি পুবী ধ্বংস কবেছিলেন এবং দিবোদাসকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়েছিলেন। সেইজন্যই ঋগ্বেদে ইন্দ্রের আর এক নাম 'পুরন্দর'। দুটি পৃথক জাতি যে ছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ১০/১০২/৩ ঋকে। সেখানে বলা হয়েছে শত্রু যদি আর্যজাতিব হয় তাকেও বিনাশ কবতে হবে, যদি দাসজাতির হয তাকেও বিনাশ কবতে হবে। মনে হয়, পববর্তীকালে আর্যজাতির এবং দাসজাতির মধ্যে একটা বোঝাপডা হয়েছিল। উভয়েই সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছিল। দাসজাতিব অন্তর্ভুক্ত বাজাবও অস্তিত্বেব প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০/৬২/১০ ঋকে যদু ও তুর্বণ নামে দাসজাতীয দুই বাজাব উল্লেখ আছে। পুরুষ সূক্তে যে শূদ্রেব উল্লেখ আছে (১০/৯০/১২) তারা সম্ভবত দাস জাতির অন্তর্ভুক্ত।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেব ১০৯ তম সূক্তের ৮ম ঋকে ইন্দ্রকে পুবন্দর বা নগরবিদারক বলে সম্বোধন কবা হযেছে। বলা হযেছে, ''পুবন্দরা শিক্ষতং বজ্রহস্তাস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী অবতং ভরেষ্'। অর্থাৎ ''হে বজ্রহস্ত নগরবিদারক ইন্দ্র ও অগ্নি। আমাদের ধনদান কর, সংগ্রামে আমাদের বক্ষা কব।'' সুতরাং বর্বব আর্যদের সেনাপতি ইন্দ্র হরপ্পীয় সভ্যতার নগরগুলিকে ধ্বংস কবেই 'পুরন্দর' হয়েছেন। উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন এইসব নগরগুলি লুঠ কবে ধ্বংস করাই ছিল আর্যদের মূল কাজ। তারা নগর সভ্যতা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। একটা বর্বব জাতির পক্ষে তা জানা সম্ভবও ছিল না। তাই তারা নগরগুলিতে বাস কবে নি। লুঠপাট, ধ্বংস করেছে হরপ্পীয় সভ্যতার নগরগুলিতে। লুটের অর্থ, গোধন, নাবী ইত্যাদি নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের মধ্যে ভাগাভাগি করে ভোগ করেছে। 'বধূ' শব্দটা এসেছে 'বহ্+উর্ম্ম' থেকে। অর্থাৎ বধূ হল 'বহন করে আনা নারী' বা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে 'বধূ' হল 'Captured Lady'। আগেও এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে বেশ স্পষ্ট করেই গান্ধার দেশের উল্লেখ আছে। যাযাবর আর্যরা উত্তরের অক্সাস (Oxus) নদী পেরিয়ে এসে দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল 'বাখদি' বা

ব্যাক্‌ট্রিয়া (Bactria) অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। অন্যদল ইরানীয় মালভূমির দিকে চলে আসে এবং সুমেরীয় সভ্যতার উপর অনুরূপ বর্বর আক্রমণ চালায় এবং অনেকটাই ধ্বংস করে। এই দলেরই কিছুটা অংশ আরও দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে চলে আসে কাবুল উপত্যকায় অর্থাৎ বর্তমানের আফগানিস্তান। তারপর তারা সিন্ধু-উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং প্রাগার্য সভ্যতার দ্রাবিড় এবং আদি অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করে জয়ী হয়। অতি উন্নত এবং বহু বিস্তৃত প্রাগার্য সভ্যতার সমৃদ্ধ নগরগুলিকে তারা ধ্বংস করে। অনেক পরে প্রাগার্য সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার একটা মিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রিত সভ্যতা হল 'ভারতীয়-আর্য সভ্যতা' (Indo-Aryan Civilization)। এর থেকেই উদ্ভূত হয় হিন্দু সভ্যতা এবং হিন্দু সংস্কৃতি, যার ৭৫ শতাংশই হরপ্পীয় সভ্যতা থেকে নেওয়া এবং মাত্র ২৫ শতাংশ হল বর্বর আর্যদের সংস্কৃতি। অনার্য বা হরপ্পীয় সভ্যতার লোকদের যুদ্ধে হারানোর পর পরই রচিত হয়েছিল 'ঋগ্বেদ' যা এখন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। আর্যদের একটা ভাষা থাকলেও তাদের লিপি ছিল না। এই লিপি তারা পেয়েছিল হরপ্পীয়দের কাছে। সংকলিত হয়েছিল ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬তম সূক্তে গান্ধারের কথা রয়েছে উপমার ছলে। এই সূক্ত শুধু গান্ধার দেশের কথাই বলে না। ৩৫০০/৪০০০ বছর আগে 'নিস্ক' বা 'সুবর্ণ খণ্ড' যে মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত ছিল সে কথাও বলে। গান্ধার দেশেও নিস্ক প্রচলিত ছিল এবং তা ছিল বর্তমানের আফগানিস্তানে। আর্যরা সম্ভবত কাবুল উপত্যকায় এসেছিল বামিয়ানের অতিবিখ্যাত 'রেশম পথ' (Silk Route) ধরেই। তবে রেশম পথ নামটা অনেক পরবর্তীকালের।

"১। সিন্ধুনিবাসী ভাবয়ব্যের জন্য নিজ বুদ্ধিবলে বহু সংখ্যক স্তোম সম্পাদনা করি। হিংসারহিত রাজা, কীর্তিলাভ কামনায়, আমার জন্য সহস্র সোম যাগের অনুষ্ঠান করেছেন। ২। অসুর রাজা গ্রহণের জন্য আমাকে যাজ্ঞা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কক্ষীবান তাঁর নিকট শত নিস্ক শত লক্ষণযুক্ত অশ্ব ও শত বলীবর্দ গ্রহণ করলাম। রাজা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্তি বিস্তার করবেন। ৩। স্বনয় কর্তৃক প্রদত্ত শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হল। এক সহস্র ষষ্টিসংখ্যক গাভী উপস্থিত হল। কক্ষীবান গ্রহণ করে পর দিনেই তা আপনার পিতাকে দান করলেন। ৪। গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলতে লাগল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করে মদস্রাবী সুবর্ণময় আভরণ বিশিষ্ট সতত গতিশীল অশ্বদের মার্জন করতে লাগল। ৫। হে বন্ধুগণ! পূর্বের দান স্মরণ করে, তোমাদের জন্য একাদশ সংযুক্ত রথ এবং বহুমূল্য গো গ্রহণ করেছি। প্রজাসমূহের ন্যায় পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হয়ে আঙ্গিরাগণ শকটবিশিষ্ট হয়ে কীর্তিলাভের চেষ্টা করুক। ৬। এ সম্ভোগযোগ্যা রমণী বিশেষরূপে আলিঙ্গিতা হয়ে সূতবৎসা নকুলীয় ন্যায় চিরকাল রমণ করে। বহু তেজোযুক্তা হয়ে রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করছে। ৭। নিকটে এসে বিশেষরূপে স্পর্শ কর। আমার অঙ্গে

লোম অল্প মনে করো না, আমি গন্ধার দেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা।" (১ম মণ্ডল, ১২৬ সূক্ত)।

'গন্ধার' হল গান্ধাব দেশ। গান্ধাব সে সময় লোমপূর্ণ মেষ, ছাগ এবং উত্তম শাল ও পশমী বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। অর্থাৎ আফগানিস্তান অঞ্চলও তখন পশমের জন্য বিখ্যাত ছিল। আর্যদের সেনাপতি বা নেতা ইন্দ্র তাদের অনার্য বিজযেব কথা বলতে গিয়ে নিজের সম্বন্ধে যে সব প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন তাতে মনে হয় তারা সত্যি সত্যিই বর্বর ছিল। ঋগ্বেদেব ১০ম মণ্ডলের ৪৯ তম সূক্ত বলছে ঃ

"১। স্তবকারী ব্যক্তিকে আমি চমৎকার সম্পত্তি দান করি। আমি যজ্ঞানুষ্ঠানেব পদ্ধতি করে দিয়েছি, এতে আমাবই ক্ষমতা বৃদ্ধি হয। আমি যজ্ঞকর্তাবাক্তির উৎসাহদাতা হয়ে থাকি, আর যারা যজ্ঞ কবে না তাদেব সকল যুদ্ধেই পরাভব করি। ২। স্বর্গের দেবতাবা এবং ভূচর ও জলচব জন্তুরা আমাকে ইন্দ্র এ নাম দিয়েছে। আমাব দুই তেজস্বী ঘোটক আছে, তারা অদ্ভুত লীলাবিশিষ্ট এবং অতিবেগবান। আমি অন্ন উপার্জনেব জন্য দুর্ধর্ষ বজ্র ধাবণ কবি। ৩। আমি কবি নামক ব্যক্তির মঙ্গলেব জন্য অৎক নামক ব্যক্তিকে প্রহারের দ্বাবা বধ কবেছি। আমি রক্ষণোপযোগী নানাকার্য সাধন করে কুৎস নামক ব্যক্তিকে বক্ষা কবেছি। আমি শুষ্ণ নামক ব্যক্তি বধেব জন্য বজ্র ধারণ করেছিলাম। আমি দস্যুজাতিকে 'আর্য' এ নাম হতে বঞ্চিত রেখেছি।

৪। কুৎস বেতসু নামক প্রদেশ কামনা কবেছিল, আমি তাব পিতাব ন্যায বেতসু প্রদেশ তাব বশীভূত কবে দিলাম, এবং তুগ্র ও স্নদিভ এই দুই ব্যক্তিকে কুৎসের বশীভূত কবে দিলাম। আমার প্রসাদেই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তি শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হয। আমি পুত্রেব ন্যায তাকে প্রিযবস্তু প্রদান কবি, তাতে সে দুর্ধর্ষ হযে উঠে। ৫। যেকালে শ্রুতর্বা আমাব শরণাগত হল এবং স্তব কবতে লাগল, আমি মৃগয নামক ব্যক্তিকে তাব বশীভূত করে দিলাম। আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত কবে দিযেছি, আমি ষটগৃভিকে সব্যেব বশীভূত করে দিয়েছি। ৬। আমি সে ইন্দ্র, যেমন বৃত্রেব হন্তা হয়ে বৃত্রকে নিধন করেছিলাম, সেরূপ দাসজাতীয নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দু-ব্যক্তিকে ভগ্ন কবেছি। সে সময় ঐ দুই শত্রু বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রাপ্ত হচ্ছিল, আমি তাদেব পশ্চাৎ সংলগ্ন হয়ে সূর্যালোক সমুজ্জ্বলিত এ ভুবনের বহির্ভূত কবে দিলাম। ৭। আমাব যে শীঘ্রগামী ঘোটকগুলি আছে তারা আমাকে বহন করে, আমি সে বহনে সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণ করি। যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করে শোধন করবাব জন্য আমাকে অনুরোধ কবে আমি তখন দাসজাতীয় ব্যক্তিকে প্রহাব করে দ্বিখণ্ড কবি, ঐ দশাব জন্যই সে জন্মেছে। ৮। আমি সপ্ত শত্রুপুরী ধ্বংস করেছি। যে যত বড় বন্ধন-কর্তা হোক, আমি তা অপেক্ষাও অধিক বন্ধনকর্তা। তুর্বস ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান বলে খ্যাত্যাপন্ন করেছি। আমি অন্যান্য ব্যক্তিকেও বলে বলী করেছি। নবনবত্তি নগরকে আমি বিনষ্ট করেছি। ৯। আমি জল বর্ষণ করে থাকি, যে সপ্তসিন্ধু দ্রবময় মূর্তিতে পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়, আমিই তাদের স্ব স্ব স্থানে বেখে দিযেছি। আমার সকল

কার্যই শুভকর, আমিই জল বিতরণ করে থাকি। আমি যুদ্ধ করে যজ্ঞকর্তাব্যক্তির জন্য পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি। ..” *(১০ম মণ্ডল, ৪৯ তম সূক্ত)*

এই সকল তথ্য হতে অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে উত্তব-পশ্চিম হতে আর্যজাতিরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেখানে অধিষ্ঠিত যে প্রাচীনতর নগবভিত্তিক সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সংঘর্ষে আসে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে এই সংঘর্ষের ছায়াপাত রয়েছে। আবও বহু সূক্ত আছে ঋগ্বেদে যেগুলিতে আর্য এবং প্রাগার্য সভ্যতার লোকদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে এবং যেগুলির থেকে সহজেই বোঝা যায় আর্যরা ছিল এক বর্বর জাতি এবং উন্নত হরপ্পীয় সভ্যতার ধ্বংসকারী। আর্যদের এই বর্বরতার বিশদ বিববণ ছড়িয়ে আছে সারা ঋগ্বেদ জুড়ে। প্রাচীন আর্যজাতির ধ্বংসাত্মক মনোভাব একালে অনেকটাই যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আধুনিক তালিবানদেব মধ্যে।

ককাসয়েড (Caucasoid) মহাজাতির নর্ডিক (Nordic) গোষ্ঠীর লোকবাই 'আর্য'। 'আর্য' শব্দটি আমরা জাতিবাচক (Race) অর্থে ব্যবহাব কবলেও ম্যাক্সমুলাব, উইলিয়াম জোনস প্রভৃতিব মতে 'আর্য' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একটি ভাষাগোষ্ঠীব নাম। গ্রীক, ল্যাটীন, জার্মান, গথিক, কেলটিক, পারসিক এবং সংস্কৃত এই ভাষাগোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত। যারা এই ভাযাগুলির মধ্যে যে কোন একটি ভাষায় কথা বলে, তাদেব বলা হয আর্য। এখানে শুধু এইটুকু বলা যায়, পাশ্চাত্যেব পণ্ডিতবর্গ 'আর্য-গবিমা' প্রতিষ্ঠাব জন্য নানা কসবত কবেছেন। নানা যুক্তিব জাল বিস্তাব করেছেন। তাঁরা দেখাতে চেযেছিলেন, আর্যবা ভারতবর্ষকে সভ্যতার আলো দেখিযেছিল। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাব পরবর্তী কালে ভাবতবর্ষেব বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হবপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হওযার পর পৃথিবীর প্রায় সব ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ এখন একবাক্যে বলছেন, আর্যরা ছিল বর্বর যাযাবর জাতি। খাদ্যান্বেষণে বেবিয়ে তাবা ভারতবর্ষে এসেছিল এবং প্রথমে ঢুকেছিল হিন্দুকুশের দক্ষিণ-পূর্বে কাবুল উপত্যকায় এবং তারপর গান্ধার পেরিয়ে সিন্ধু উপত্যকায়। এই যুদ্ধবাজ বর্বব জাতির ধ্বংসলীলায়, লুণ্ঠনে, অত্যাচারে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রাচীনতম হরপ্পা সভ্যতা বেশ কিছুটা ধ্বংস হয়েছিল এবং অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর্যরা ভারতবর্ষে তাদের প্রথম বসতি স্থাপন কবেছিল এই আফগানিস্তানেই। মুণ্ডিগাক অঞ্চলের তাম্রাশ্ম সভ্যতা বিনষ্ট হযেছিল তাদের আক্রমণে। এরপর আর্যদের একটা দল কাবুল উপত্যকায বসবাস শুরু করে। এখনকার জনগোষ্ঠীর কৃষ্টিব সঙ্গে তাদেব কৃষ্টি মিশে গিয়ে কিছুটা নতুন এক কৃষ্টির উদ্ভব হয়। এমনটি হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকায়, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাযগাতেও। সারা আর্যাবর্ত জুড়ে চলতে থাকে বিজযী বর্বর আর্যদের প্রবল প্রাধান্য। কাবুল উপত্যকায় তাম্রাশ্ম সভ্যতার যুগ পেরিয়ে আসে ভারতীয় আর্য সভ্যতার যুগ।

এক সময় এদেশে যে আর্যরা সীমাহীন বর্বরতার নজির রেখেছিল তার বহু উদাহরণ

রয়েছে ঋগ্বেদে। কিছু উদাহবণ তো আগেই দেওয়া হয়েছে। আর্যদের বর্বরতার আরো কিছু কথায আসার আগে হরপ্পা সভ্যতা যে আর্য-সভ্যতা নয় সে আলোচনায আসা যাক।

প্রায় চার হাজার বছর আগে 'আর্য' ভাষাভাষী এক বর্বব জনগোষ্ঠী মেসোপটেমিয়ায় এবং হবপ্পা সভ্যতা অধ্যুষিত ভাবতে যে ধ্বংসলীলা চালিযেছিল তা তালিবানী বর্বতারই সমকক্ষ। আর্যদেব সেই ধ্বংসলীলা কতটা দেশজযের প্রযোজনে, কতটা ধর্মেব কারণে কিংবা প্রবল সভ্যতাহীনতা বা বর্বরতার কারণে, তা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। ঐতিহাসিকরা একালে যতটুকু বলছেন তার যৎসামান্য আলোচনায আসা যাক। সিন্ধু সভ্যতা বা হবপ্পা সভ্যতা সম্বন্ধে ডঃ অতুল সুব লিখেছেন ঃ

"গত ষাট বৎসরের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, আবাব অনেক কিছু জানিওনা। যা জেনেছি তা হচ্ছে ঃ

(১) এ সভ্যতা তাম্রাশ্ম সভ্যতা, ইংবেজিতে যাকে বলে Chalcolithic Civilization। Chalcolithic শব্দটাব উচ্চাবণ হচ্ছে ক্যাল্কোলিথিক, চ্যালকোলিথিক নয। গ্রীক ভাষাব সঙ্গে পবিচয় থাকলেই, যাঁবা চ্যালকোলিথিক উচ্চারণ কবেন, তাঁবা তাঁদেব ভুল বুঝতে পাববেন। দুটো গ্রীক শব্দ, যথা Khalkos ও Lithos-এব সমন্বযে শব্দটা গঠিত। (মনে বাখতে হবে, গ্রীক বর্ণমালায ইংবেজি বর্ণমালাব 'C' বর্ণটা নেই।) Khalkos মানে তামা, আব Lithos মানে পাথব। তাব মানে, যে সভ্যতাব ধাবকবা তাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি মাত্র তামা ও পাথব দিয়ে তৈবি কবে, সেই সভ্যতাকেই আমবা তাম্রাশ্ম বা ক্যাল্কোলিথিক সভ্যতা বলি।

(২) সিন্ধুসভ্যতা প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা

(৩) সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক আর্য সভ্যতা নয।

(৪) সিন্ধুসভ্যতা শিক্ষিত সাক্ষব সমাজেব সভ্যতা।

(৫) সিন্ধুসভ্যতা বণিক সভ্যতা।

(৬) সিন্ধুসভ্যতা পববর্তীকালের হিন্দু সভ্যতাব গঠনে অনেক উপাদান যুগিয়েছে।

(৭) প্রত্যক্ষ প্রমাণেব ভিত্তিতে আমরা জানি যে সিন্ধু সভ্যতার ধারকবা নগব, ঘরবাড়ি, বাস্তাঘাট, শস্যাগাব পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি নির্মাণ কবত।

(৮) সিন্দুসভ্যতাব ধাবকদেব বীতিমত গণিত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও খোদন শিল্পেব জ্ঞান ছিল।

(৯) সিন্ধু সভ্যতার কুলালদেব অসামান্য নান্দনিক অনুভূতি ছিল।

(১০) সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে চাউল ও মৎস্যজীবী জাতিরাও উপস্থিত ছিল।

(১১) এই সভ্যতা এক ব্যাপক অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।

আর যা আমরা এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি, তা হচ্ছে (১) সিন্ধুলিপিব সঠিক

পাঠ ও (২) কোন ভাষায় তাদের অভিলেখনসমূহ রচিত হত, তা। যতদিন না আমরা এ দুটো বিষয় জানতে পারছি, ততদিন পর্যন্ত আমরা সিন্ধুসভ্যতার কোন সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাব না।"

হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধুসভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয় তার আরও বিস্তৃত আলোচনা করে ডঃ অতুল সুর আবারও লিখেছেন ঃ

"বস্তুত অনেকেই বলেন যে সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা অভিন্ন। কিন্তু এটা যে ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দুই সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যাবে। এই দুই সভ্যতার মধ্যে মূলগত পার্থক্যগুলি আমি নিচে বিবৃত করছি।

১। সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা শিশ্ন-উপাসক ছিল, ও মাতৃকাদেবীর আরাধনা করত। আর্যরা শিশ্ন উপাসক ছিল না। তারা শিশ্ন উপাসকদের ঘৃণা ও নিন্দা করত। লিঙ্গ উপাসনা ভারতে নবোপলীয় যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এর ভূবি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মাতৃকাদেবীর পূজার কোন আভাসই আমবা ঋগ্বেদে পাই না। আর্যবা পুরুষ দেবতাগণের উদ্দেশেই স্তোত্র রচনা ও যজ্ঞ করত। তাদের যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত কোন দ্রব্য বা উপকরণ সিন্ধু সভ্যতাব কোন কেন্দ্রে পাওয়া যায় নি।

২। আর্যদেব কাছে ঘোড়াই সবচেযে শ্রেষ্ঠ জন্তু ছিল। সিন্ধু সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে ঘোড়ার কোন কঙ্কালই পাওযা যাযনি। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্তু ছিল, এটা সীলমোহরসমূহের ওপর পুনঃ পুনঃ বলীবর্দের প্রতিকৃতি খোদন থেকে বুঝতে পারা যায়। পশুপতি শিব-আরাধনার প্রমাণ মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া গিয়েছে। বলীবর্দ শিবেরই বাহন। সুতবাং সিন্ধু সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে বলীবর্দের প্রাধান্য সহজেই অনুমেয়। 'শিব' শব্দটা যে দ্রাবিড় ভাষাব শব্দ, তার প্রতি আমি বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। দ্রাবিড় ভাষায় "শিব" শব্দের অর্থ 'রুদ্রবর্ণ'। মনে হয় পরবর্তীকালে বৈদিক সমাজে রুদ্রেব আরাধনা অনার্য শিব থেকেই এসেছিল।

৩। সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা নগরবাসী ছিল। আর্যরা নগর নির্মাণ করত না। তারা নগর ধ্বংস কবত। সেজন্য তারা তাদের দেবতা ইন্দ্রের নাম 'পুবন্দর' রেখেছিল। 'নগর' বা 'পুর' শব্দটা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। দ্রাবিড়রাই নগব নির্মাণ করত। এ থেকে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে দ্রাবিড়দের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়।

৪। আর্যরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করত। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা মৃতকে সমাধিস্থ করত। এটা সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে সমাধিস্থানের অস্তিত্ব থেকে বুঝতে পারা যায়।

৫। আর্যদের মধ্যে লিখন প্রণালীর প্রচলন ছিল না। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার

ধারকদের মধ্যে লিখন প্রণালী সুপ্রচলিত ছিল। আর্যরা সাহিত্য কণ্ঠস্থ করত।

৬। সিন্ধুসভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয়, তাব সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। কুরু-পাঞ্চাল দেশ, তার মানে যেখানে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল, সেখানকার বৈশিষ্ট্যমূলক মৃৎপাত্রেব বঙ ছিল ধূসর বর্ণ। সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে যেসব মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলির রঙ হচ্ছে 'কালো লাল'।

৭। সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে কৃষিকর্ম জানতেন না। এটা শতপথ ব্রাহ্মণের (২/৩/৭-৮) এক উক্তি থেকে প্রকাশ পায়। সেখানে বলা হযেছে — 'প্রথমত দেবতারা একটি মানুষকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করলেন। তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করল। তাবপর দেবতারা অশ্বকে উৎসর্গ কবলেন। উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহ হতে পুনরায় বলীবর্দে প্রবেশ কবল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে, ওই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল। মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে, পৃথিবীতে প্রবেশ করল। দেবতাবা পৃথিবী খনন করে গম ও যব আকাবে ওই আত্মাকে পেলেন। তদবধি সকলে শস্যাদি কর্ষণ দ্বারা পেযে থাকে।' শতপথ ব্রাহ্মণের এই বিবরণটা অত্যন্ত অর্থদ্যোতক। এব মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় লুক্কায়িত আছে, আর্যদের কৃষ্টির ইতিহাস। এ থেকে বুঝতে পাবা যায় যে আর্যরা প্রথমে ভূমিকর্ষণ দ্বাবা শস্যাদি উৎপাদন কবতে জানতেন না। তাঁবা ছিলেন যাযাবর জাতি, এবং সম্ভবত তাঁদের আদিম বাসস্থান ছিল কোন শীতপ্রধান দেশে। সেখানে শরীরকে গরম রাখাব জন্য তাঁবা মাংসাশী ছিলেন। সেখানে উৎসর্গীকৃত প্রাণীসমূহের মাংস তাঁবা ভক্ষণ কবতেন। ভারতে আসবার পর অশ্বমেধই তাঁদের প্রধান যজ্ঞ ছিল। অশ্বমেধেব ঘোড়ার রান্না মাংস খাবার জন্য ঋষিদের বসনায় জল গড়াত *(ঋগ্বেদ ১/১৬২/২১)*। শুধু অশ্ব নয়, মহিষ, বৃষ, গাভী ও গোবৎসও তাঁদেব প্রিয় খাদ্য ছিল *(ঋগ্বেদ ৬/১৭/১১; ১০/৮৬/১৩; ১০/৮৬/১৪)*। অতিথি এলে তাঁরা গরুর মাংস রান্না করে খাওয়াতেন। এর জন্য অতিথিব এক নাম ছিল 'গোঘ্ন'। সিন্ধু সভ্যতার ধারকরা গো-মাংস খেত না। তা ছাড়া সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা মৎস্যভোজী ছিল। আর্যবা মৎস্যভক্ষণ করত না।

৮। সিন্ধু সভ্যতার লোকেবা হাতিব সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিল। আর্যদের কাছে হাতি এক নতুন জীব বিশেষ ছিল। সেজন্য তারা হাতিকে 'হস্তবিশিষ্ট মৃগ' বলে বর্ণনা করত।

৯। হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা কুক্কুট, মৎস্য, কচ্ছপ ও বরাহের মাংস ভক্ষণ

করত। কিন্তু আর্যরা তা করত না। বর্তমান কালে ভারতের আদিম অধিবাসীদের পূজা-আর্চাদিতে কুক্কুট উৎসর্গ করা একটা অবশ্য করণীয় অঙ্গ।

১০। সিন্ধু সভ্যতার বাহকরা যে আর্য নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আর্য ভাষাভাষী নর্ডিক নরগোষ্ঠীব কঙ্কালের অভাব। যে সকল নরগোষ্ঠীর কঙ্কাল সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পাওয়া গিয়েছে, তারা হচ্ছে, (১) মেডিটেরেনিয়ান (২) প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, (৩) মংগোলয়েড ও (৪) আলপিয়ান। এসব কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে; লোথাল, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান ও রূপারে।"

সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা এক উন্নত বৈষযিক সভ্যতার ধাবক ছিল। অপরপক্ষে আর্যবা ছিল এক বর্বর জাতি। বস্তুত আর্যবা যে এক বর্বব জাতি ছিল, গত সত্তর বছবের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও বৈদিক অনুশীলনেব ফলে তা জানা গিয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. গর্ডন চাইলড্ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বলেছিলেন যে, আর্যদের বর্ববতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেযেছিল, তাদেব কার্যকলাপে। জগতের যেখানেই গিযে তাবা বসতি স্থাপন কবেছিল, সেখানেই তাবা সেখানকাব উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস কবেছিল। চাইলড্-এব এই মন্তব্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতাসমূহেব সঙ্গে মিলিযে দেখে, পণ্ডিত সমাজ এটা একবাক্যে স্বীকাব কবে নিযেছেন। এখন আর্যদেব সম্বন্ধে যখনই কিছু লেখা হয, তখনই তাদেব বর্বব জাতি বলে অভিহিত করা হয। সর্বত্রই তারা উন্নতমানেব প্রাগার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে নিজেদের হীন ও বর্বর সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। মাত্র এক জায়গাতেই আর্যদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। সেটা হচ্ছে ভাবতবর্ষ। ভাবতবর্ষে এসে তারা যে উন্নতমানের সভ্যতার সম্মুখীন হয়েছিল, এবং যাদের বাহকদেব বিরুদ্ধে তাবা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই তাদের মাথা অবনত কবতে হয়েছিল। কেননা সিন্ধু সভ্যতার মধ্যেই আমরা দেখি পরবর্তীকালের উন্নত হিন্দু সভ্যতার মূল উপাদানসমূহ।

আমাদের দেশের ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে একমাত্র ডঃ সুরই হলেন সেই বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি স্যার জন মারশালের নির্দেশে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মহেঞ্জোদারোয় অবস্থান কবে 'হিন্দুসভ্যতার গঠনে প্রাগার্যদের দান' নিয়ে গবেষণা করে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে, হিন্দুসভ্যতার গঠনের মূলে বারোআনা ভাগ (৭৫ শতাংশ) হচ্ছে প্রাগার্য উপাদান, আর মাত্র চার আনা ভাগ (২৫ শতাংশ) আর্যসভ্যতার অবদান। ১৯৩৬ সালে ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "হিন্দু সভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণে উদ্ভূত এটা যে চারজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন

মার্শাল, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ স্টেলা ক্রামরিশ এবং শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর।" ডঃ ভাণ্ডারকার এই ভাষণ দিয়েছিলেন 'ইণ্ডিযান কালচাবেল কনফারেন্স'-এর সভায় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন এব সভাপতি। অপ্রিয সত্য ভাযণে ডঃ সুরেব সুনাম রয়েছে। আব ঐতিহাসিক কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিকরা নির্ভেজাল সত্য বলবেন এটাই সবার কাম্য। তাই ডঃ সুরের ওই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে এটা বোঝানোব চেষ্টা করা হল যে, হরপ্পা সভ্যতা আর্য সভ্যতা নয়। হরপ্পা সভ্যতা অতুলনীয উন্নত প্রাগার্য সভ্যতা। আর্যরা বর্বর জাতি। তাবা ভারতে এসে এই অত্যুন্নত সভ্যতাব বেশ কিছুটার ধ্বংস সাধনই করেছিল। তাদের বহুল ধ্বংসের আরও কিছু নমুনা 'ঋগ্বেদ' থেকে তুলে ধরা যাক। যদিও বাস্তবে তাদের ধ্বংসের ভযাবহতা, নৃশংসতা, পৈশাচিকতা আরও অনেক প্রবল ছিল বলে অনুমান কবা হয। তবু তার কিছুটা আভাস দেওয়া যাক ঋগ্বেদেব কিছু 'সূক্ত' থেকে। কতকগুলি সূক্তেব থেকে উদ্ধৃতি দিযে এইসব বর্বরতার বেশ কিছু উদাহবণ একটু আগেই দেওয়া হযেছে।

ঋগ্বেদে বর্ণিত ধ্বংসেব আবও কিছু উদাহবণে আসার আগে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দবকার। ঋগ্বেদে কোন বিশেষ সমযেব সামাজিক বা নৃতাত্ত্বিক চিত্র নেই। ঋগ্বেদের অন্তত সাতটা কালস্তব আছে বলে পণ্ডিতেবা অনুমান কবেন। এতে বিভিন্ন যুগেব আচার-ব্যবহাব, বীতিনীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞেব চিত্র পাওয়া যায। এমন কি আর্যবা এদেশে আসাব আগে ভাবতে যে সব আচাব-ব্যবহাব, বীতিনীতি প্রচলিত ছিল তাদেবও কিছু কিছুর সন্ধান পাওযা যায এই তথাকথিত ধর্মগ্রন্থে।

আগেই বলা হযেছে যে, সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন। সিন্ধু সভ্যতা প্রথমে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা হিসাবে শুরু হলেও পববর্তীকালে তা হয়ে ওঠে নগরভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা যখন এদেশে আসে তখন হবপ্পা তথা সিন্ধুসভ্যতা ছিল পুবোপুরি নগবভিত্তিক সভ্যতা। অন্যদিকে আর্যবা ছিল যাযাবব বর্বর জাতি। আর বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক সভ্যতা। আর্যবা ছিল যোদ্ধাব জাত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকেব জাত। এই বণিকদেব ঐশ্বর্য, ধনদৌলত ও সমৃদ্ধি আর্যদের কাছে ছিল ঈর্ষা এবং লোভেব বিষয়। তাছাড়া হা-ঘবে আর্যরা গায়ের জোরে এই বণিকদের সম্পদ ভোগ কবতে চেযে আক্রমণ করেছিল হরপ্পা সভ্যতা এবং তাতে তারা সফলও হয়েছিল। এই লোভ এবং ঈর্ষাই আর্য-যাযাববদের সিন্ধুসভ্যতার নগরসমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত করেছিল। নগরসমূহকে ধ্বংস করে বিজয়গৌরবের উন্মত্ততায আর্যরা তাদের প্রধান নেতা কিংবা দেবতাব নাম রেখেছিল 'পুবন্দর'। এদের নেতা ইন্দ্র তাই 'পুবন্দর' নামেও অভিহিত হয়েছে ঋগ্বেদে।

ঋগ্বেদের পুরোহিতরা খুব আড়ম্বরবহুল যজ্ঞ এবং তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের সৃষ্টি করেছিল। সে সময় রাজারাজড়ারা যজ্ঞ করাকে খুবই গৌরবের মনে করত এবং পুরোহিতদের দিয়ে অশ্বমেধ, গোমেধ ইত্যাদি যজ্ঞ সম্পাদন করাতো। যাযাবর আর্যরা অশ্বের ব্যবহার জানতো। তাই আর্যরা অশ্ব-বাহনে এদেশে এসেছিল। এদেশে

অশ্ব ছিল না। তার প্রমাণ, সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোথাও অশ্বের কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদের ছিল বলীবর্দ। সুতরাং আর্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে বলীবর্দের মন্থরতাই তাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হরপ্পীয়দের হেরে যাওয়ার প্রধান কারণই হল অশ্ব না থাকা। তাছাড়া হরপ্পীয়দের অস্ত্রশস্ত্রও তেমন কিছু ছিল না। কারণ তারা ছিল মূলত বণিকের জাত। অন্যান্য অনেক কিছু বিষয়ে তারা অত্যুন্নত জ্ঞানের অধিকারী হলেও তারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল না। মনে করা হয়, আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল খুব কম। যোদ্ধার দলের তাই হওয়াই স্বাভাবিক। সেটা ঋগ্বেদ পড়লে বুঝতে পারা যায়। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে ঋগ্বেদের উৎপত্তি হলেও, সমগ্র ঋগ্বেদেই উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে, দেবতাদের কাছে তাদের একই বৈষয়িক প্রার্থনা। ঋগ্বেদের প্রায় ১০,০০০ মন্ত্রের মধ্যে অন্তত এক হাজার মন্ত্রে শুধু একটা কথাই বলা হয়েছে—"দাও আমাদের শত্রুর ধান, দাও আমাদের শত্রুর সম্পদ, দাও আমাদের শত্রুর গাভী, দাও আমাদের শত্রুর নারী" ইত্যাদি। সর্বত্রই বলা হয়েছে—"আমাদের শত্রুকে ধ্বংস কব, তাদের সকল ধন আমাদের দাও, অন্য কাউকে দিও না, কেবলমাত্র আমাদের মঙ্গল কর।" প্রথম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তে বলা হয়েছে—"শত্রুরা যাঁর রথযুক্ত অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হতে পারে না, তিনি ইন্দ্র। আমাদের ধন প্রদান করুন, স্ত্রী প্রদান করুন, অন্ন নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করুন।" *(১/৫/৩)*। তার মানে এই তিনটা জিনিসের অভাব ছিল আর্যদের—ধন, স্ত্রী ও অন্ন। আবার আটের সূক্তে বলা হয়েছে—"হে ইন্দ্র! আমাদের রক্ষণার্থে সম্ভোগযোগ্য, জযশীল, সদা শত্রুবিজয়ী, প্রভূত ধন দাও *(১/৮/১)*। যে ধন দ্বারা নিরন্তব মুষ্টিপ্রহাব দ্বারা আমরা শত্রুকে নিবারণ করব, অথবা তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করে, যুদ্ধে স্পর্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করব!"

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫১তম সূক্ত বলছে ঃ

"৫। যারা যজ্ঞ অন্ন আপনাদের মুখে স্থাপন করেছিল, হে ইন্দ্র! সে মায়াবীদের তুমি মায়া দ্বারা পরাস্ত করেছিলে। তুমি মানুষের প্রতি প্রসন্নমনা; তুমি পিপ্রু নগর ধ্বংস করেছিলে এবং ঋজিশ্বান নামক স্তোতাকে দস্যুদের হস্তে হত্যা হতে সম্যকরূপে রক্ষা করেছিলে।

৬। তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সাথে যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করেছিলে, তুমি অতিথিদের রক্ষার্থ শম্বরকে হনন করেছিলে। তুমি মহান অর্বুদকে পদ দ্বারা আক্রমণ করেছিলে; অতএব তুমি দস্যু হত্যার জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছ।

৭। তোমাতে সমস্ত বল নিঃসংশয়রূপে নিহিত আছে। তোমার মন সোমপানে হৃষ্ট হয়। তোমার হস্তদ্বয়ে বজ্র আছে তা আমরা জানি, অতএব শত্রুর সমস্ত বীর্য ছেদন হয়।

৮। হে ইন্দ্র! কারা আর্য এবং কারা দস্যু তা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের

বিরোধীদের শাসন করে বশীভূত কর। তুমি শক্তিমান, অতএব যজ্ঞসম্পাদকদের সহায় হও। আমি তোমার হর্ষজনক যজ্ঞে তোমার সেই কর্ম প্রশংসা কবতে ইচ্ছা করি।

৯। ইন্দ্র যজ্ঞবিমুখদের যজ্ঞপ্রিয় যজমানদের বশীভূত করে ও অভিমুখস্তোতাদের দ্বারা স্তুতি পরাঙ্মুখদের ধ্বংস করে অবস্থিতি করেন। বম্র ঋষি বর্ধনশীল ও স্বর্গব্যাপী ইন্দ্রের স্তুতি করতে করতে সঞ্চিত যজ্ঞদ্রব্যসমূহ নিয়ে গিয়েছিলেন।''

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৯ তম সূক্তে আছেঃ ''৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা (স্তোতাদের মধ্যে) ধন বিভাগে রত থেকে বৃত্রহননে অতিশয় বল প্রকাশ করেছিলে, তা শুনেছি; হে সর্বদর্শিদ্বয়। আমাদের এ যজ্ঞে কুশে উপবেশন করে অভিষুত সোম পান করে হৃষ্ট হও। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যুদ্ধের সময় আহ্বান করলে তোমরা এসে স্বকীয় মহত্ত্ব দ্বারা সকল মানুষ অপেক্ষা বড় হও, পৃথিবী অপেক্ষা, আকাশ অপেক্ষা, নদী ও পর্বতসমূহ অপেক্ষা বড় হও; তোমরা অন্য সকল ভুবন অপেক্ষা বড়। ৭। হে বজ্রহস্ত ইন্দ্র ও অগ্নি। ধন আহরণ কব, আমাদের প্রদান কর, কর্মদ্বারা আমাদের রক্ষা কর। সূর্যের যে রশ্মিসমূহ দ্বারা আমাদের পূর্বপুরুষগণ সমবেত হয়েছিলেন, সে এই। হে বজ্রহস্ত নগরবিদারক, ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদের ধন দান কর, সংগ্রামে আমাদের রক্ষা কব।''

ইন্দ্রেব কাছে, অগ্নিব কাছে যেমন প্রভূত ধন দানের প্রার্থনা জানানো হযেছে তেমনি ইন্দ্রকে সম্বোধন করা হযেছে 'নগব বিদাবক' বলে। অর্থাৎ ইন্দ্র নগব ধ্বংসকারী তথা পুরন্দর। দ্বিতীয় মণ্ডলেব ২০তম সূক্তে বলা হল ঃ

''৬। দ্যুতিমান, কীর্তিমান অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, শত্রুনাশক বলবান ইন্দ্র যেন লোক অনিষ্টকারী দাসের প্রিয়মস্তক নিম্নে নিক্ষেপ করেন। ৭। বৃত্রহা, পুরনাশক, ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে বিনাশ করেছেন, মনুব জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি কবেছেন। তিনি যেন যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ কবেন। ৮। স্তোতাগণ উদকলাভের নিমিত্ত সে ইন্দ্রের উদ্দেশে সতত অনুক্রমে বলবর্ধক অন্ন প্রদান করেছেন; যখন তাঁর হস্তে বজ্র প্রদত্ত হয়েছিল তখন তিনি তা দিয়ে দস্যুদের হনন করে, তাদের লৌহময পুরী ধ্বংস করেছিলেন। ৯। হে ইন্দ্র! তোমার ধনপতি দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সে দক্ষিণা আমাদের দাও। তুমি ভজনীয়, তুমি আমাদের অতিক্রম করে আব কাকেও প্রদান করো না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হযে এ প্রভূত স্তুতি করব।''

এখানে কৃষ্ণযোনি দাস সেনা হল অনার্য জাতি। 'লৌহময় পুরী' সম্ভবত হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীর বেষ্টিত নগর। 'দস্যু' হল প্রাগার্য হরপ্পীয় সভ্যতার অধিবাসীরা। ৪র্থ মণ্ডলের ষোড়শতম সূক্ত বলছে ''১১। যে দিবস কবি কুৎস গ্রহণীয় অন্নের ন্যায় ঋজুগামী অশ্বদ্বয়কে আপন রথে যোজিত করে আপদ হতে মুক্ত হতে সমর্থ

হয়েছিলেন, সে দিবসে, হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসকে রক্ষা করবার ইচ্ছায় তাঁর সঙ্গে এক রথে গিয়েছিলে। তুমি শত্রুনাশক এবং বায়ু সদৃশ অশ্বের অধিপতি। ১২। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের জন্য সুখরহিত শুষ্ণকে বধ করেছিলে, দিবসের প্রারম্ভে কুযবকে বিনাশ করেছিলে এবং বহুজন পরিবৃত হয়ে সে সময়েই বজ্রদ্বারা দস্যুদের বিনাশ করেছিলে। তুমি সংগ্রামে সূর্যের চক্র ছিন্ন করেছিলে। ১৩। তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করেছিলে, তুমি সকলকে বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বার বশীভূত করেছিলে। তুমি পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করেছিলে। জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে, তুমি সেরূপ শম্বরের নগরসমূহ বিনাশ করেছিলে। ১৪। তুমি মরণরহিত, তুমি যখন সূর্যের সমীপে আপন শরীর ধারণ কর, তখন তোমার রূপ প্রকাশিত হয়। তুমি হস্তীয় ন্যায় পরাক্রান্ত, তুমি শত্রুগণের বল দগ্ধ করে এবং আয়ুধারণ করে সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়ে থাক।"

এখানেও সেই কৃষ্ণবর্ণ শত্রু অর্থাৎ অনার্য হননের কথা। এখানেও সেই নগর ধ্বংসের বর্ণনা। চতুর্থ মণ্ডলের ৩০তম সূক্তের মধ্যে নানা হত্যা, নানা নগর ধ্বংসের কথা আছে। ইন্দ্র দলে দলে অনার্যদের হত্যা করেছেন, অনার্যদের তথা হরপ্পীয়দের নগর ধ্বংস করেছেন, এসব কথা সবিস্তারে এই সূক্তে বলা হয়েছে।

"৪। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি যুদ্ধকারী কুৎস এবং তার সহকারিগণের জন্য সূর্যের রথচক্র অপহরণ করেছিলে ৫। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি একাকী দেবগণের বাধাকারী সকলের সাথে যুদ্ধ করেছিলে এবং হিংসকদের বধ করেছিলে। ৬। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তুমি মনুষ্যের জন্য সূর্যকে হিংসা করেছিলে এবং যুদ্ধ কর্ম দ্বারা এতশকে রক্ষ করেছিলে। ৭। হে বৃত্রহন্তা মঘবা! তৎপরে তুমি কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলে? তুমি এ অন্তরীক্ষে দিবসেই দনুর পুত্রকে বধ করেছিলে। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি এ প্রকার বীর্যশালী বল প্রদর্শন করেছিলে। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা হননাভিলাষিণী স্ত্রীকে বং করেছিলে। ৯। হে মহান ইন্দ্র! তুমি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয়া ঊষাকে সংপিষ্ট করেছিলে। ১০। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যখন ঊষার শকট ভগ্ন করেছিলেন তখন ঊষ ভীতা হয়ে ভগ্ন শকট হতে অবতরণ করেছিলেন। ১১। ঊষাদেবীর চূর্ণীকৃত শকট বিপাশ নদীর তীরে পড়ে থাকল, তিনি দূরদেশে অপসৃত হলেন। ১২। হে ইন্দ্র তুমি সম্পূর্ণজলা তিষ্টমনা সিন্ধুকে পৃথিবীতে প্রজ্ঞা দ্বারা সংস্থাপিত করেছিলে। ১৩ হে ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী। যখন তুমি শুষ্ণের নগর সকল সংপিষ্ট করেছিলে, তখন তুমি তার ধন লুণ্ঠন করেছিলে। ১৪। হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্বতের উপরে নিম্নমুখ করে বধ করেছিলে। ১৫। হে ইন্দ্র! চক্রের চতুর্দিকস্থিত শঙ্কুর ন্যায় দাস বর্চির চতুর্দিকস্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক অনুচরদের তুমি বিশেষ রূপে বধ করেছিলে। ১৬। শতক্রতু ইন্দ্র সে অগ্রুর পুত্র পরাবৃত্তকে স্তোত্রভাগী করেছিলেন। ১৭। যজ্ঞপতি বিদ্বান ইন্দ্র অনভিষিক্ত সে তুর্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য করেছিলেন। ১৮। হে ইন্দ্র! তুমি তৎক্ষণাৎ সরযূ নদীর পারে আর্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করেছিলে। ১৯। হে বৃত্রহন্তা তুমি বন্ধুগণ কর্তৃক ত্যক্ত অন্ধ ও

পঙ্গুকে অনুনীত করেছিলে, তোমাব দত্ত সুখ কেউ অতিক্রম করতে সমর্থ নয়। ২০। ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের পাষাণ নির্মিত শত সংখ্যক পুরী প্রদান করেছিলেন। ২১। ইন্দ্র, দভীতিতির জন্য মাযাবলে ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন কবে প্রসুপ্ত করেছিলেন। ২২। হে ইন্দ্র! তুমি এ সমস্ত শত্রুদেব প্রচ্যুত করেছ। হে বৃত্রহন্তা! তুমি গাভী সকলের পালক, তুমি সকল যজমানের নিকট সমান। ২৩। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি তোমাব বলকে সামর্থ্যযুক্ত কবেছিলে, অতএব অধুনাতন কোনও ব্যক্তি একে হিংসা করতে পাবে না। ২৪। হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র! অর্যমাদেব তোমার সে মনোহর ধন দান করুন, পূষা সে মনোহব ধন দান করুন, ভগ সে মনোহর ধন দান করুন। করূলতী দেব সে মনোহব ধন দান করুন।''

এই সূক্তের অষ্টম ঋকেব ব্যাখ্যায ম্যাক্সমুলাবেবা বলেছেন দিবা বা সূর্যরূপ ইন্দ্র উদয় হলে ঊষা বিনষ্ট হয, এ ঋকেব মর্ম হল এই। কিন্তু পবের ঋকগুলি স্পষ্ট করেই অনার্য হরপ্পীয়দেব হত্যাব কথা, তাদেব নগব ধ্বংস বা দখলেব কথা বিশদভাবে বলেছে। তার সঙ্গে আছে ইন্দ্রেব কাছে প্রচুব ধন-সম্পদ দানেব আকুল প্রার্থনা। হা-ভাতে আর্যদের সেই চিবন্তন চাওযা, ধন-সম্পদ দাও, শত্রুব গোধন দাও, শত্রুদের রমণী দাও ইত্যাদিও বাদ পড়ে নি এই সূক্তেব ঋকগুলিতে।

ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলেব ২৯তম সূক্তেও আছে ইন্দ্রের বৃত্র সংহারের কথা, শম্বরেব 'নব-নবতি' সংখ্যক নগব ধ্বংসেব কাহিনী, ইন্দ্রেব মহিষ মাংস ভক্ষণেব ও সোমরস পানের বৃত্তান্ত, ইন্দ্রেব নানা বীবত্বেব স্তবস্তুতি এবং অনার্য তথা হরপ্পীযদের ধেনু ও ধন-সম্পদ হবণেব বর্ণনা ও প্রার্থনা।

''...২। যেকালে মরুৎগণ সোম পান কবে উল্লাসিত ইন্দ্রেব স্তব কবেছিলেন তখন তিনি বজ্রগ্রহণপূর্বক বৃত্রকে সংহাব কবলেন এবং প্রকাণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছানুসারে প্রবাহিত কবলেন। ৩। হে বলশালী মরুৎগণ! হে ইন্দ্র! তোমরা এ সোমরস পান করলে, যজমান ধেনু লাভ কববেন এবং এ পান করে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছেন। ৪। ইন্দ্র সোম পান কবে স্বর্গ ও পৃথিবীকে অবিচলিত ভাবে স্থাপিত কবলেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে গমন কবে মৃগবৎ বৃত্রকে ভযাভিভূত করলেন। দানব লুক্কাযিত হবার জন্য সচেষ্ট হযে ভযে দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবল, ইন্দ্র তাকে আচ্ছাদন বিমোচনপূর্বক সংহাব কবলেন। ৫। হে ঐশ্বর্যসম্পন্ন ইন্দ্র! তোমাব এ বীবত্ব নিবন্ধন সমস্ত দেবতা ক্রমানুসাবে তোমাকে পানার্থে সোমবস প্রদান কবেছেন; তুমি এতশেব জন্য সম্মুখবর্তী সূর্যাশ্বগণেব গতিবোধ কবেছিলে। ৬। যখন ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্র বজ্রদ্বাবা একবারে সে শম্ববেব নবনবতি সংখ্যক নগব নষ্ট করলেন, তখন মরুৎগণ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের ত্রিষ্টুপ ছন্দে স্তব কবায, তিনি ঐ উদীপ্ত অসুরকে পীড়িত করলেন। ৭। ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয়মিত্র ইন্দ্রেব কার্যে সহাযতা করবাব জন্য সত্বর তিন্ শত মহিষ পাক করলেন এবং ইন্দ্র বৃত্রবধেব জন্য মনুপ্রদত্ত তিন পাত্র সোমবস এককালে পান করলেন। ৮। হে ইন্দ্র! যখন তুমি তিনশত মহিষেব মাংস ভক্ষণ কবেছিলে, যখন

ঐশ্বর্যসম্পন্ন তুমি তিন পাত্র সোমরস পান করেছিলে; তখন তিনি বৃত্র সংহার করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতা সোমপানকারী ইন্দ্রকে ভৃত্যবৎ যুদ্ধস্থলে আহ্বান কবেছিলেন। ৯। হে ইন্দ্র! যখন তুমি এবং উশনা বলবান ও দ্রুতগামী অশ্বগণের সাথে কুৎসের গৃহে গিয়েছিলে তখন তুমি শত্রু সংহার করে কুৎস ও দেবগণের সাথে একরথে গমন করেছিলে এবং তুমিই শুষ্ণকে বধ করেছিলে। ১০। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্বে সূর্যের একখানি রথচক্র ছেদন করেছিলে; অপর একখানি ধনলাভের জন্য কুৎসকে প্রদান করেছিলে; তুমি বজ্রদ্বারা বাকশক্তিহীন দস্যুগণকে হতবুদ্ধি করে যুদ্ধে তাদের বধ করেছিলে। ১১। হে ইন্দ্র! গৌরিবীতির স্তব সকল তোমাকে বর্ধিত করুক; তুমি বিদথিনের পুত্র ঋজিশ্বের জন্য পিপ্রুকে বশীভূত করেছিলে; ঋজিশ্বা তোমার সাথে বন্ধুত্ব লাভের জন্য পুরোডাশাদি পাক করে তোমার সম্মুখে এনেছিলেন এবং তুমি তাঁর সোমরস পান করেছিলে। ১২। নবগ্ব ও দশগ্বগণ স্তবদ্বারা ইন্দ্রের পূজা করেন। ইন্দ্রের প্রধান উপাসক তাঁর স্তব করে যে গুহার মধ্যে গোসমূহ সুগুপ্ত ছিল তা উন্মুক্ত কবেছেন। ১৩। হে ধনবান ইন্দ্র! তুমি যে সকল বীরত্ব প্রকাশ করেছ, যদিও আমি তা অবগত আছি, তথাপি আমি কিরূপে সে সকল বীরত্বের যথাযোগ্য স্তব করব; হে মহাবলসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি যে সকল নতুন বীরত্ব প্রকাশ করবে, আমরা যজ্ঞে তৎসমুদয়ের কীর্তন করব।."

এখানে মহিষপাক ও মহিষভক্ষণের কথা আছে। আর্যবা অশ্ব মাংসেব সঙ্গে গরু-মহিষের মাংসও ভোজন করতো। অনার্য হরপ্পীয়রা গরু-মহিষদের মাংস খাওয়া দূরে থাক তাবা গরু-মহিষের পূজা করতো। দ্বাদশ ঋকের 'নবগ্ব' ও 'দশগ্ব' হল নবম ও দশম মাসের উপযুক্ত স্তবসমূহ। এই সূক্তেও আর্যদেব বিজয় কাহিনী প্রচারিত। তাদের বর্বর নেতা ইন্দ্রের নানা প্রশস্তি সহযোগে স্তবস্তুতি করা হয়েছে এই সূক্তটিতেও।

ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৭তম সূক্তেব ৫ম ঋক বলছে হরপ্পার কথা। এই সূক্তে উল্লেখিত হয়েছে, শৃঞ্জয় নামক আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় হরিয়ুপীয়ার (হরপ্পার?) পূর্বভাগে অবস্থিত বরশিখবংশীয় যজ্ঞপাত্র ধ্বংসকাবী বৃচিবৎগণকে নিধন করেছিলেন। 'হরিয়ুপীয়া' যে 'হরপ্পা' একালের পণ্ডিতেরা তা স্বীকার করেছেন।

সারা ঋগ্বেদ জুড়ে রয়েছে অনার্য তথা প্রাগার্য জাতিদের হত্যা করার কথা, তাদের নগরসমূহ ধ্বংসের কাহিনী। তার সঙ্গে প্রার্থনা করা হয়েছে ধন দাও, গোধন দাও, নারী দাও। এই সব ঋকের অধিকাংশই নিবেদিত হয়েছে আর্যগোষ্ঠীর নেতা তথা দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশে। আর এইসব সূক্তের স্তবকারীরা হল এককালের যাযাবর বর্বর আর্যজাতি। এদের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা' (Indo Aryan Civilization)। যাইহোক, আবার আসি আর্যদের ধ্বংসলীলার কথায়। ঋগ্বেদ থেকেই আবারও কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

"৭। হে ইন্দ্র! যে বিশ্বদেবগণ তোমার সখা হয়েছিলেন, তারা বৃত্রের নিঃশ্বাস হতে ভীত হয়ে পলায়ন করে তোমায় ত্যাগ করে গেলেন। মরুৎগণের সাথে তোমার

সখ্য হয়েছিল। পরে তুমি সমস্ত শত্রুসেনা জয় করলে। ৮। হে ইন্দ্র! ত্রিষষ্ঠিসংখ্যক মরুৎগণ একত্রীভূত গোসমূহের ন্যায় তোমায় বর্ধিত কবেছিলেন বলে যজ্ঞার্হ হয়েছেন। আমবা সে ইন্দ্রেব নিকট গমন করব। আমাদেব ভজনীয় ধন দান কর, তোমার উদ্দেশে শত্রুশোষক বল বিধান করব। ৯। হে ইন্দ্র! তোমাব তীক্ষ্ণ আয়ুধ তোমার মরুৎ সৈন্য, তোমাব বজ্রেব কে প্রতিকূলতা করতে পাবে? হে ঋজীষী! তুমি চক্রের দ্বারা আয়ুধবহিত, দেবদ্রোহী অসুরদের দূর করে দাও। ১০। পশুলাভেব জন্য মহান উগ্র প্রবৃদ্ধ কল্যাণতম, ইন্দ্রের উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি প্রকাশ কব। স্তুতিভাক ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান কর, ইন্দ্র পুত্রের জন্য বহু ধন প্রেবণ করুন। ১১। উক্‌থ বাহিত, মহান ইন্দ্রের উদ্দেশে নদী পারকারী নৌকার ন্যায় স্তুতি উচ্চাবণ কব। বহু বিস্তৃত, প্রীতিপদ ইন্দ্র ধন প্রেবণ ককন, পুত্রের জন্য বহুধন প্রেবণ ককন। ১২। ইন্দ্র যা স্বীকার কবেন তা কব, সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ কব, স্তোত্রদ্বাবা ইন্দ্রেব পবিচর্যা কব। হে স্তোতা! অলঙ্কৃত হও, বোদন করো না, বাক্য শ্রবণ কবাও, ইন্দ্র বহু ধন প্রদান কববেন। ১৩। দশসহস্র সৈন্যেব সাথে দ্রুতগমনকাবী কৃষ্ণ অংশুমতী নদী তীবে অবস্থান কবছিলেন। হে ইন্দ্র! প্রজ্ঞাদ্বাবা সে শব্দকাবীকে প্রাপ্ত হলেন। মনুষ্যদেব হিতাভিপ্রাযে হিংসাকাবিণী সেনাদেব বধ কবলেন। ১৪। ইন্দ্র বললেন, দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম, সে অংশুমতী নদীব গূঢস্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচবণ কবছে ও সূর্যেব ন্যায় অবস্থিতি কবছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুদ্‌গণ! আমি ইচ্ছা কবি, তোমবা যুদ্ধ কব এবং যুদ্ধে তাঁকে সংহাব কব। ১৫। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হযে শবীব ধাবণ কবছে। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে সহায় লাভ কবে দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করলেন।" *(৮ম মণ্ডল, ৯৬তম সূক্ত)*

এই যুদ্ধ এবং হত্যার কাহিনী এই সূক্তের অন্য ঋকগুলিতেও আছে। যেমন ঃ

"১৬। হে ইন্দ্র! তুমিই সে কর্ম কবেছ, তুমিই জন্মিবামাত্রেই শত্রুশূন্য সপ্তশত্রুর শত্রু হযেছে, অন্ধকারাবৃত দ্যাবা-পৃথিবীকে প্রাপ্ত হযেছ, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধাবণ কবেছ। ১৭। হে ইন্দ্র! তুমি সে কার্য কবেছ। হে বজ্রী! তুমিই কুশল হয়ে অনুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করেছ, তুমিও আয়ুধের দ্বারা শুষ্ণকে নিম্নমুখ করে বধ কবেছ, তুমি আপনাব কার্যদ্বাবা গোলাভ কবছে। ১৮। হে ইন্দ্র। তুমিই সে কার্য কবো। হে অভিলাষপ্রদ! তুমি মনুষ্যদের উপদ্রবেব হন্তা, অতএব প্রবৃদ্ধ হয়েছিলে, তুমি স্তম্ভমান সিন্ধুগণকে গমনার্থে ছেড়ে দিযেছিলে, পবে দাসগণের অধিকৃত জল জয কবেছিলে। *(৮ম মণ্ডল, ৯৬তম সূক্ত)*।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২২তম সূক্তে বলা হয়েছে ঃ "আমাদের চতুর্দিকে দস্যু জাতি আছে, তারা যজ্ঞকর্ম করে না, তারা কিছু মানে না, তাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী! তাদেব নিধন কর। সে দাসজাতিকে হিংসা কর।" *(১০/২২/৮)।*

এখানে প্রাগার্য বা হরপ্পীয় সভ্যতার লোকজনকে বলা হযেছে 'দাস' জাতি। তাদের

দস্যুও বলা হয়েছে। আসলে আর্য বিজয়ের পর তাদের লেখানো ঋগ্বেদে হরপ্পা সভ্যতার লোকজনকে 'দাস', 'দস্যু', অসভ্য, পক্ষীর জাত, ধর্মহীন ইত্যাদি বহু বিশেষণেই অভিহিত করা হয়েছে। এখন এটা সূর্যের মত সত্য যে, আর্যরাই ছিল অসভ্য বর্বর যাযাবব জাতি। ভারতে তারা ছিল আগন্তুক, লুণ্ঠনকারী তথা ধ্বংসকারী। উন্নত হরপ্পা সভ্যতা তাদের হাতে বহুলাংশে ধ্বংস হয়েছে।

বিজয়ী আর্যদেব নেতা ইন্দ্রের দম্ভপূর্ণ হিটালারীয় ভাষণ আছে ঋগ্বেদেব অনেকগুলি সূক্তে। উন্নত হরপ্পীয় সভ্যতা ধ্বংস করে, তাদের লোকজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে, তাদের শত শত পুরী ধ্বংসের মাধ্যমে নিজেকে 'পুরন্দর' বলে জাহির করে, তাদের নাবীদেব জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ভোগ করে কিংবা বিবাহ কবে ইন্দ্র তার বর্ববোচিত কৃতিত্বের কথা অত্যন্ত গর্ব সহকারে নির্লজ্জভাবে প্রচার করেছেন তাঁব ভক্তদের কিংবা অনুগৃহীত মোসাহেবদের কাছে ঋগ্বেদের মাধ্যমে। মনে বাখতে হবে 'বধূ' মানে বহ্ + উ (স্ত্রী), অর্থাৎ যাকে বহন করা যায়। পণ্ডিতেরা বলেছেন, আর্যদেব 'বধূ' হল ধবে আনা বা বয়ে আনা নারী যাকে ইংবেজীতে বলা হয 'Captured Lady'। ঋগ্বেদেব ইন্দ্রের এই সব দাম্ভিক উক্তির জন্যই সম্ভবত মহাভারতেব কৃষ্ণ, যাঁব গাযেব রং শ্যামবর্ণ এবং সম্ভবত যিনি আর্যগোষ্ঠী বা নর্ডিক জাতির লোক নন, ইন্দ্রের পূজা বন্ধ কবে দেন, পরিবর্তে প্রাগার্য বীতিনীতি চালু কবেন এবং তৎসহ গীতা তথা উপনিষদীয় ধর্মের উপদেশ দেন। অবশ্য মহাভাবত উপনিষদীয় যুগেব মত অতো নবীনতর কিনা তা নিয়ে বিতর্কেব অবকাশ আছে।

যাইহোক, আবার ইন্দ্রেব হিটলারী বক্তৃতায় ফিরে আসি। ঋগ্বেদেব ১০ম মণ্ডলেব ৪৮ তম সূক্ত বলছে ঃ

"১। (ইন্দ্র বলছেন) আমি সম্পত্তিসমূহের প্রধান অধীশ্বর হয়েছি। আমি চিবকালই সকল সম্পত্তি জয কবে নিই। প্রাণিগণ পিতাব ন্যায় আমাকে ডেকে থাকে। যে দাতা, আমি তাকে ভোগেব সামগ্রী দিয়ে থাকি। ২। আমি অথর্ব ঋষিব বক্ষস্থল বোধ করেছিলাম। আমি বৃত্রেব নিকট গাভী সমস্ত কেড়ে ত্রিতকে দিয়েছিলাম। আমি দস্যুদের সম্পত্তি কেড়ে নিযেছিলাম। আমি দধীচির নিকট এবং মাতরিশ্বাব নিকট গাভীসমস্ত তাড়িয়ে নিযে গিযেছিলাম। ৩। আমাব জন্য ত্বষ্টা লৌহময় বজ্র নির্মাণ করে দিযেছেন, দেবতাবা আমাব জন্য কার্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। আমার সৈন্যগণ সূর্যেব সৈন্যেব ন্যায দুর্ধর্ষ, যে যা কিছু কবেছে বা যা ভবিষ্যতে করবে সকলেতেই আমাব উপব নির্ভব কবে। ৪। যখন কেউ স্তবের সাথে সোমরস দিয়ে আমাকে পরিতুষ্ট কবে তখন আমি দাতাব্যক্তিকে সহস্রাধিক গো, অশ্ব, মনুষ্য ও পশু, বাণ দ্বারা জয় করে দিই এবং অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করি। ৫। কেউ কখনো কোন সম্পত্তি আমাব নিকট জয় করে নিতে পারে নি, মৃত্যুর নিকট কখনো আমি নত হই নি। হে পুরুবংশীয়গণ! তোমরা সোমরস প্রস্তুত কবে যা ইচ্ছা আমার নিকট যাজ্ঞা কর। দেখ আমার বন্ধুত্ব যেন কখনো তোমরা হারিও না। ৬। এ যে সকল শত্রু, যারা প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ

করতে করতে দু-দু-জন করে অস্ত্রধারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, যারা স্পর্ধাপূর্বক আমাকে আহ্বান করছিল, আমি ইন্দ্র, কঠোরবাক্য উচ্চারণপূর্বক তাদের এমন প্রহার করলাম যে তাদের নিধন হল। তারা নত হল, আমি নত হবার নই। ৭। যদি একজন আসে, তাকেও আমি পরাভব করি, যদি দু-জন আসে তাদেরও পরাভব করি, তিন জন এসেই বা আমার কি কবতে পাবে? যেরূপ কৃষক ধান্য মর্দন করবার সময় পুরাতন ধান্যস্তম্ভ অনায়াসেই মর্দন কবে, আমিও সেরূপ যত শত্রু আসুক না কেন অনায়াসে নিধন করি। ইন্দ্র যাদের প্রতি বিমুখ, সে সমস্ত শত্রু কি আমাকে নিন্দা অর্থাৎ পরাভব করতে পারে? ৮। আমিই গুঙ্গুদের দেশে প্রজাবর্গেব মধ্যে অতিথিগুলির পুত্রকে স্থাপন করেছি, তিনি তাদেব শত্রু সংহাব করছেন, বিপদ নিবারণ করছেন এবং মূর্তিমান ভক্ষ্যভোজের ন্যায় তাদের পালন করছেন। সে সময়ে পর্ণয় এবং করন্ধ নামক শত্রুদ্বযকে বধ কবা হযেছিল এবং বৃত্রের সাথে যে তুমুল যুদ্ধ হয তাতে আমাব নাম বিখ্যাত হয়েছিল। ৯। আমাকে যে নমস্কাব কবে, সে সকলেবই আশ্রয়স্থানস্বরূপ হয়, সে অন্নবান ও ভোগবান হয়, তোমবা তাব সাথে বন্ধুত্ব কব এবং গোধন গ্রহণ কব, এ দুই কার্য তোমাদেব তাব নিকট সম্পন্ন হবে। সে ব্যক্তির যুদ্ধ উপস্থিত হলে আমি নিজেই তার পক্ষে উজ্জ্বল অস্ত্র ধারণ করি, আমার প্রসাদে সে ব্যক্তি সকলের নিকট প্রশংসাভাজন হয়। সকলে তাকে স্তব কবে। ১০। দৃষ্ট হল যে, দু'জনের মধ্যে একজন সোমযাগ কবছে। পালনকর্তা ইন্দ্র তাব পক্ষে বজ্র ধাবণপূর্বক তাকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন কবলেন। আব তাব যে শত্রু সে তীক্ষ্ণতেজা সোমযাগকারী ব্যক্তিব সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হল, সে অন্ধকাব মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বইল। ১১। আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ এবা সকলেই দেবতা, আমিও দেবতা। অতএব আমি তাঁদের স্থান উৎখাত করি না। তাঁরা আমাকে এ উদ্দেশে নির্মাণ কবেছেন যে, আমি চমৎকার অন্ন উৎপাদন কবব। সে নিমিত্তই আমাকে কেউ পরাজয় বা হিংসা করতে পারে না, কেউ আমাব সম্মুখে অগ্রসর হতে পাবে না।"

ম্যাক্সমুলার মহোদয়গণের আর্যগরিমা (!) প্রচারের যুগ শেষ হযে গেছে। হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হওযার পর এখন প্রমাণিত হয়েছে, আর্যরা ছিল যাযাবর বর্বর জাতি। তারা ৩৫০০-৪০০০ বছর আগে হবপ্পা সভ্যতার একাংশ ধ্বংস করেছে অনেকটা তালিবানী কায়দায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই সম্ভবত মানুষের দ্বাবা সঙ্ঘটিত প্রাচীনতম ধ্বংসলীলা।

আবারো বলি, আর্যরা গরু, মহিষ ও অশ্ব মাংস ভীষণভাবে পছন্দ করতো। হরপ্পাব লোকরা কিন্তু ওই সব প্রাণীর মাংস খেত না। তারা বড় জোর মুরগী, কচ্ছপ ও শূকরের মাংস খেত। মাছও খেত। বন্য বরাহ, বন্য কুক্কুট তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। আর্যদের ঘোড়ার মাংসের প্রতি প্রবল লোভ দেখলে মনে হয় তারা সঠিকভাবেই ককেশীয় মহাজাতির নর্ডিক গোষ্ঠীর লোক ছিল। আলপীয়রা এখানে নর্ডিকদের আগে

এলেও তারা ঘোড়া, গরু ও মহিষের মাংস খেত না। আবারো বলি, হরপ্পীয়রা মূলত মাংসভোজী ছিল না, ছিল মৎস্যভোজী। সুতরাং তাদের অশ্বমাংস ভোজনের কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু মাংসাশী আর্যদের কাছে অশ্ব মাংস ছিল অত্যন্ত প্রিয় এবং তা ছিল লোভনীয় অমৃত।

অশ্বের মাংস দিয়ে ভোজ খাওযার জন্য যে আর্য ঋষিদের রসনায় জল গড়াত তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬২ তম সূক্তে। আর্যদের কাছে অশ্বমাংস যে খুবই প্রিয় ছিল তা ওই সূক্তটি থেকে জানতে পারি। কিছুটা অপ্রয়োজনীয় হলেও আগ্রহী পাঠকদের জন্য ওই সূক্তটির পুরোটারই বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হল ঃ

"১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের বীরকর্ম কীর্তন করছি অতএব মিত্র, বরুণ, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদের নিন্দা না করেন (১) ২। সুন্দব স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বেব সম্মুখে (ঋত্বিকগণ) উৎসর্গার্থে ছাগ ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। বিবিধ বর্ণ ছাগ শব্দ কবে তদভিমুখে গমন কবছে, এ ইন্দ্র ও পূষাব প্রিয় অন্ন হোক। ৩। সকল দেবতাব উপযুক্ত ছাগ পূষাবই ভাগে পড়ে, একে দ্রতগতি অশ্বেব সাথে সম্মুখে আনা হচ্ছে। অতএব ত্বষ্টা দেবতাগণেব সুভোজনেব নিমিত্ত অশ্বের সাথে ঐ অজ হতে সুখাদ্য পুবোডাশ প্রস্তুত করুন। ৪। যখন ঋত্বিকগণ দেবতাগণেব লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতি ঋতুতে তিনবার অগ্নিব নিকট নিযে যায, সে সময পূযাব প্রথমভাগের ছাগ দেবতাগণের যজ্ঞের কথা প্রচাব কবে অগ্রে গমন কবে। ৫। হোতা, অধ্বর্যু আবয়া, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ, শংস্তা ও মেধাবী ব্রহ্মা এঁরা সকলে (২) প্রসিদ্ধ, অলঙ্কৃত, সুন্দর যজ্ঞ দ্বারা নদী সকল পবিপূর্ণ করুন। ৬। যারা যূপবৃক্ষ ছেদন করে, যারা যূপবৃক্ষ বহন কবে, যারা অশ্বযূপেব জন্য চষাল প্রস্তুত কবে, (৩), যারা অশ্বেব জন্য পাকপাত্র সংগ্রহ কবে, আমাদের সংকল্পই যেন তাদেরও সংকল্প হয। ৭। আমার মনোরথ আপনিই সিদ্ধ হোক, মনোহব পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব দেবতাগণের আশা পূবণার্থে আসুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমবা তাকে উত্তমরূপে বন্ধন করব, যশস্বী ঋত্বিকগণ আনন্দিত হোন। ৮। যে রজ্জুদ্বারা অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যাব দ্বারা তার পদ বদ্ধ হয, যে রজ্জু তার মস্তকে বদ্ধ থাকে, সে রজ্জুসকল এবং তার মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ করা হয়, সে সমস্তই দেবগণের নিকট যাক। ৯। অশ্বের অপক্ব মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা পরিষ্কাব কববাব সময় ছেদন ও পবিষ্কাব সাধন অস্ত্রে যা লিপ্ত হয়, ছেদকেব হস্তদ্বয়ে এবং নখে যা লিপ্ত থাকে, সে সমস্তই দেবগণের নিকট যাক। ১০। উদবেব যে অজীর্ণ তৃণ বার হয়ে যায়, অপক্ব মাংসের যে লেশ মাত্র থাকে, ছেদনকর্তা তা নির্দোষ করুন এবং পবিত্র মাংস দেবতাগণের উপযোগী করে পাক করুন। ১১। হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক কববার সময়, তোমার গাত্র হতে যে রস বার হয় এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে তা যেন ভূমিতে পড়ে না থাকে এবং তৃণের

সাথে মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হয়েছেন, সমস্তই তাঁদের প্রদান করা হোক। ১২। যারা চারিদিক হতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যারা বলে এর গন্ধ মনোহর হয়েছে, এখন নামাও এবং যারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাদের সংকল্প আমাদের সংকল্প হোক। ১৩। যে কাষ্ঠদণ্ড মাংস পাক পরীক্ষার্থ ভাণ্ডে দেওয়া হয় (৪), যে সকল পাত্রে রস (ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখা দ্বারা অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিহ্নিত কবা হয় এবং যে ছুরিকা দ্বারা পরে ঐ চিহ্ন অনুসারে অবয়ব কর্তিত হয়, এবা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করছে। ১৪। যে স্থানে অশ্ব গমন করেছিল, যে স্থানে উপবেশন করেছিল, যে স্থানে লুণ্ঠন করেছিল, যা দিয়ে তার পদ বদ্ধ হয়েছিল, যা সে পান করেছিল এবং যে ঘাস আহার করেছিল, সে সমস্তই দেবতাগণেব নিকট গমন করুক। ১৫। হে অশ্বগণ! ধূমগন্ধী অগ্নি যেন তোমাকে শব্দ করাতে না পাবে, অত্যন্ত অগ্নিসংযোগে প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চলিত না হয়। যজ্ঞের জন্য অভিপ্রেত, হোমের জন্য আনীত, সম্মুখে প্রদত্ত ও বষট্‌কার দ্বারা শোভিত অশ্বকে দেবগণ গ্রহণ করুন। ১৬। যে আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্র দ্বারা অশ্বকে আচ্ছাদিত করা যায়, একে যে হিরণ্ময় আভরণ সকল প্রদান করা যায়, যা দিয়ে ওর মস্তক ও পাদ বন্ধন করা যায়, এ সকল বস্তু দেবতাগণের প্রিয়। ঋত্বিকগণ দেবগণকে এ সকল প্রদান কবেছেন। ১৭। হে অশ্ব! তুমি সবলে নাসাধ্বনি কবে গমনে বিবত হলে কশাঘাত দ্বাবা অথবা তোমাব পার্ষ্ণিদেশে পদাঘাতদ্বারা যে ব্যথা উৎপন্ন হযেছিল, যজ্ঞে স্রুকদ্বাবা হব্য প্রদত্ত হয, সেরূপ মন্ত্রদ্বাবা তোমার সে সমস্ত ব্যথা আহুতি প্রদান করি। ১৮। দেবতাগণেব বন্ধুস্বরূপ অশ্বের বক্রভূত চতুস্ত্রিংশৎ পার্শ্বাস্থিচ্ছেদনেব জন্য খড়্গ গমন কবছে। হে অশ্বচ্ছেদক! এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ কর যেন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হযে না যায়; শব্দ করে ও দেখে দেখে পর্বে পর্বে ছেদন কব (৫)। ১৯। ঋভুই তেজঃপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্তা এবং দু'জন তাকে ধারণ করে। হে অশ্ব! তোমাব শরীরের যে অবয়ব সকল যথাকালে কর্তন করি, তা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান কবি। ২০। হে অশ্ব! তুমি যখন দেবতাগণের নিকট যাও, তখন তোমার প্রিয় দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়, খড়্গ তোমার সঙ্গে যেন অধিকক্ষণ না থাকে। মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি অতিক্রম কবে তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না করে। ২১। হে অশ্ব! তুমি মরছ না অথবা লোকে তোমার হিংসা কবছে না, তুমি উত্তম পথে দেবতাগণের নিকট যাচ্ছ। ইন্দ্রের হরিনামক অশ্বদ্বয এবং মরুৎগণের পৃষতীনামক বাহনদ্বয়, তোমার রথে যোজিত হবে; অশ্বিদ্বয়ের বাহন বাসভেব পরিবর্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হবে। ২২। এ অশ্ব, আমাদের গো ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুক, আমাদের পুত্র ও অপত্য প্রদান করুক। তেজস্বী অশ্ব আমাদের পাপ হতে বিরত করুক। হবির্ভূত অশ্ব আমাদের শারীরিক বল প্রদান করুক।"

টীকা ঃ ১। সায়ণ 'আয়ু' অর্থে বায়ু করেছেন এবং 'ঋভুক্ষা' অর্থে দেবগণের

নিবাসভূত প্রজাপতি করেছেন। সিন্ধুতীরে প্রথম আর্যগণ এসে উপনিবেশ করলে তাঁদের মধ্যে যেরূপ অশ্বযজ্ঞ প্রচলিত ছিল তা এ সূক্তে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়েছে। পবে এই বেদবর্ণিত অশ্বযজ্ঞ রূপান্তরিত ও বর্ধিতাবযব হয়ে ভাবতবর্ষের রাজাদের যে প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় তা মহাভারতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ২। এখানে কয়েকজন ঋত্বিকের কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। হোতা দেবগণকে আহ্বান করেন, অধ্বর্যু যজ্ঞের নেতা, আবয়া হব্যদান কবেন, অগ্নিমিন্ধ অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, গ্রাবগ্রাভ প্রস্তব দ্বারা সোম ছেঁচে রস প্রস্তুত করেন, শংস্তা নিয়মানুসারে কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রহ্মা সমস্ত যজ্ঞকার্যের প্রধান সম্পাদনকারী। ৩। 'যূপস্য উপরি স্থাপ্যং যুপাগ্রভাগং চষালমাহ।' সায়ণ। "Who fasten the ring on the top of the post to which the horse is bound."–Wilson ৪। ১১ ঋকে আছে যে, অশ্ব মাংস শূলে বিদ্ধ হয ও তা পাক হবার সময় রস নির্গত হয়। আবার ১৩ ঋকে আছে যে, মাংস ভাণ্ডে কবে রন্ধন হয়, সিদ্ধ হযেছে কিনা কাঠি দিযে পবীক্ষা কবা হয়। অতএব roasting এবং boiling অশ্ব মাংসের উভয় প্রকাব বন্ধনই প্রচলিত ছিল। ৫। মৃত অশ্বকে পর্বে পর্বে ছেদন করতে বলা হচ্ছে, যাতে মাংসখণ্ডগুলি ছিন্নভিন্ন না হযে যায়।

অশ্ব নিয়ে আবও দু-তিনটি এমনি বিস্তারিত বর্ণনাযুক্ত সূক্ত রয়েছে ঋগ্বেদে। আর্যরা যে গরু, মহিষ, বৃষ ভক্ষণ করত সে কথা ঋগ্বেদের অনেক সূক্তেই বলা হয়েছে। বহু সংখ্যায় গোহত্যাব ফলে উৎপন্ন সামাজিক সমস্যা, চাযবাসেব সমস্যা ও গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশে গোমাংস ভক্ষণজনিত নানা রোগ-ব্যাধির সমস্যা দূর করতে আর্যবা এক সময গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে। গো-মেধ যজ্ঞও বন্ধ কবে দেওযা হয। মনুসংহিতায এই নিষিদ্ধকরণ আইন রয়েছে। কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞ মনুসংহিতার বহুকাল পরেও এদেশে চালু থাকে। তবে অশ্ববধ কবা হত এক বিশেষ অনুষ্ঠান করে। রাজাবা করতেন সে সব অশ্বমেধ যজ্ঞ। যজ্ঞের ঘোড়াকে ঘুবিয়ে আনা হত নানা দেশ। যে সব দেশে বিনা বাধায় অশ্ব তার পরিভ্রমণ শেষ করত সে সব দেশ অশ্বের মালিক যে বাজা তার বশ্যতা স্বীকার করেছে বলে ধরে নেওয়া হত। যারা অশ্বকে ধবে আটকে রাখতো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অশ্বকে ছাড়িয়ে আনতে হত অশ্বমেধ যজ্ঞকাবী রাজাকে। আটককারী বাজাকে পরাজিত না করতে পারলে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। যে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন কবতে পাবতো তাকে 'রাজচক্রবর্তী' বলে গণ্য করা হত। অশ্বমেধ যজ্ঞের মাংস স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ভোজন করত। এই অশ্বমাংস প্রীতিই প্রমাণ করে আর্যরা ককাসয়েড মহাজাতির লোক।

The Oxford History of India গ্রন্থে Vincent A. Smith আর্যদের সম্পর্কে একটু অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে আর্যরা ছিল পাঁচটি বা তারও বেশি সংখ্যক উপজাতির সমাহার। তারা একের পর এক ভারতে এসেছে এবং হরপ্পীয়দের সঙ্গে বহুকাল ধরে যুদ্ধ করেছে। এরাই স্থাপন করেছে 'আর্যাবর্ত' নামের উপনিবেশ

উত্তর-ভারত জুড়ে। এই উপজাতিগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ছিল। এরা নিজেদের 'আর্য' বলতো। স্মিথও বলছেন, এরা ছিল যাযাবর উপজাতি এবং একেবারে অসভ্য। এবা মূলতঃ চাষবাস করতো এবং যবেব চাষটাই কেবল জানতো ভাবতবর্ষে আসার আগে। রাজতন্ত্র তাদের ছিল না প্রথমদিকটায়, পরে তাদের শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র চলে আসে। স্মিথ বলছেন ঃ

"The Indo-Aryan invasion or immigration evidently was a prolonged movement of a considerable number of tribes, five or more, apparently related one to the other, who called themselves collectively Aryas, as the Iranians did. The term Arya, which seems originally to have meant merely 'kinsman', was understood in later time to imply nobility or respectability of birth, as contrasted with Anārya, 'ignoble'. The habits of the tribes, while dwelling to the west of the Indus, were those of an agricultural and pastoral people, who reckoned their wealth in terms of cows, The description of the Indo-Aryans by some writers of authority as 'nomads' is opposed to the evidence of the hymns. Many passages of the Rigveda, both in the earliest and the latest books, testify to the habitual cultivation of yava (যব), which primarily means 'barley', but may include wheat, which is not mentioned separately.

The tribe as they settled down in interior India naturally would have become more agricultural and less pastoral, like the Gurjars and Ahirs of later ages. Some of the tribal names, as, for example, Puru and Chedi, survived into the Epic period, while many died out. Each tribe was a group of families, and in each family the father was master. The whole tribe was governed by a Raja, whose power was checked to an undefined extent by a tribal council. The tribes dwelt in fortified villages, but there were no towns. The details recorded suggest that the life of the people was not unlike the tribes of Afghanistan in modern times before introduction of fire-arms."

হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলিব পতনের কারণ হিসাবে চারটি ঘটনার কথা বলা হয় ঃ (১) নগরগুলিব পরিবেশের ক্রম পরিবর্তন এবং তার ফলে চাষবাসের বিপর্যয়, (২) ভূ-স্তর চলনের [Tectonic Movement] ফলে মহেঞ্জোদারো শহরে বন্যা হওয়া কিংবা সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়া; (৩) পশ্চিম দিক থেকে বর্বর আর্যদের সরাসরি

আক্রমণ কিংবা তাদের দ্বারা হরপ্পীয়দের স্থল-বাণিজ্য রুদ্ধ হওয়া এবং (৪) মহামারী কিংবা ওই জাতীয় কিছু দুর্বিপাক। তবে ঐতিহাসিকরা আর্যদের আক্রমণটাই হরপ্পাব পতনের মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

"Scholars generally agree that the arrival and spread of people speaking old Indo-Aryan dialects of the Indo-Iranian branch of the Indo-European language family took place during the late 3rd and 2nd millennia BC. Probably these people came from the steppes to the north and east of the Caspian Sea, moving first southward into the southern parts of Central Asia and from there fanning out across the Iranian Plateau. This movement may already have began during the life span of the Indus Civilization. The movement itself remains hypothetical, but evidence from cemeteries at Sibri and south of Mehrgarh, near the mouth of the Bolan Pass, shows striking parallels including "foreign" copper and bronze tools and weapons and typical pottery forms—with that from cemeteries of the Sapalli-Tepe group in Tajikistan and Uzbekistan. This correspondence suggests a date of about 2000 BC for the presence of these people on the borders of the Indus system. It is even more difficult to identify traces that may be associated with the movement of Indo-Aryan speakers into the central Indus plains or to determine whether the occasional copper or bronze weapons of "foreign" type found in late contexts at Mohenjo-daro or Chanhu-daro are evidence of their presence there.

It is possible that Indo-Aryans actually conquered some of the Indus cities and established hegemony over the local population: if so, it has to be explained why they appear to have given up many of their distinctive material products while presumably retaining their distinctive speech. One hypothesis is that between about 2000 and 1500 BC. a continuing spread of Indo-Aryan speakers occurred. Carrying them much farther into India, to the East and South and coinciding with a growing cultural interaction between the native population and the new arrivals. From these processes a new cultural synthesis emerged givnig rise by the end of the 2nd millennium to the conscious expressions of Aryan ethnicity found in the Rigveda particularly in the later hymns."

অধিকাংশ পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন যে, আর্যভাষায় কথা বলতো যে যাযাবর জাতি তারাই আর্য জাতি হিসাবে পরিচিত হয়। তাঁদের অনেকেই মনে করেন, এই আর্যভাষায় যারা কথা বলে তাবা পরস্পর রক্ত সম্পর্কিত এবং তারাই আর্য। এটা একেবারে ভুল ধারণা। আর্যভাষায় কথা বললেই আর্য হয় না। মুখের ভাষা সহজে বদল হয় সামাজিক প্রয়োজনে, তার সঙ্গে রক্তের ধারা পবিবর্তনের কোন সম্পর্ক নেই। Vincent A. Smith সাহেবের 'The Oxford History of India' বলছে ঃ

"Sanskrit, with its derivative vernaculars; the old Persian, or Zend language; Greek, Latin, German, English and many other European tongues, form a well-defined group of family of languages which is designed either as Indo-Germanic or as Aryan. Many authors have shown a tendency to assume that the various peoples who speak Aryan tongues must be of Aryan race, connected one with the other more or less closely by ties of blood. That assumption is wholly unwarranted. Community of language is no proof of community of blood. The population of India, as we have seen, comprise extremely various elements, descended from all sorts of people who formerly spoke all sorts of languages. In the north, for instance, no trace remains of the central Asian tongues spoken by the diverse tribes comprised under the terms Saka, Huna, or Yueh-chi. The descendants of those people now speak Hindi and other languages closely related to Sanskrit. Similar cases may be observed all over the world. Languages become extinct and are replaced by others spoken by races whose position gives them an advantage. Thus, in Great Britain, the Cornish language is absolutely extinct, and the Cornish people, who are different race from the English, now speak nothing but English.

Aryan ideas and institutions have shown marvellous power and vitality in all parts of India, but the proportion of Aryan blood in the veins of the population, which is small almost everywhere, is non-existent in some provinces."

আর্য ভাষাই নাকি পরে সংস্কৃত হয়েছে। আর্যভাষার সংস্কারেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। আবারো বলি, বর্বর যাযাবর আর্যদের অমন একটা সুন্দর ভাষা থাকতে পারে না। যে আর্যদের কোনও লিপি ছিল না, তাদের সংস্কৃতের মত উন্নত এমন

একটা ভাষা ছিল, এ কথা যুক্তিতে মেনে নেওয়া মুশকিল। মনে হয়, আর্যভাষার সঙ্গে হরপ্পীয় দ্রাবিড় ভাষাব সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা। আর এই মিশ্রণের ফলেই সংস্কৃত ভাষা অমন সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল। হরপ্পার ভাষা কী ছিল তা আজও অজানা। হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার হলে জানা যাবে প্রকৃত সত্য। বিজয়ী আর্যজাতির কথ্য আর্যভাষার সঙ্গে হবপ্পীয় ভাষার সংমিশ্রণেই সংস্কৃত ভাষাব সৃষ্টি হয়েছিল মনে হয়। আগেই বলেছি, একদল পণ্ডিত মনে করেন যে, বৈদিকগণের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কোন ভাষা থেকেই সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি। এটা সত্যি হলে, হরপ্পীয ভাষা থেকেই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে এটা বলা যায়। কারণ বৈদিককালের পূর্বে ভারতবর্ষে যে ভাষা সমৃদ্ধতম ভাষা ছিল তা হল হরপ্পীয় ভাষা, যার স্বরূপ বের করতে পণ্ডিতেরা আজও মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন।

সুমেবীয়দেব ব্যাবিলন এবং নীলনদের মিশর আর্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল ৩৫০০ কিংবা ৪০০০ বছব আগে। এই সব অঞ্চলে লৌহেব ব্যবহারেব উল্লেখ পাওযা ৩২০০/৩৩০০ বছব পূর্ব থেকে। অনুমান করা হয় বর্বর আর্যরা লৌহ নির্মিত অস্ত্রেব বলে প্রায ৩৫০০ বছর আগে প্রাচীন সুমের ও আসুর রাজ্য জয় কবেছিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, যাযাবব আর্যরা লৌহের ব্যবহার জানলো কেমন কবে আজ থেকে ৩৫০০ বছর আগে! মধ্য এশিযা থেকে আর্যদের সুমেব, মিশব এবং ভারতবর্ষে চলে আসা সম্পর্কে বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থেব ১ম খণ্ডে লিখেছেন ঃ

"খৃষ্টেব জন্মের সার্দ্ধ সহস্র বা দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যজাতি এশিযাখণ্ডেব মধ্যভাগে অবস্থিত মরুময় পুবাতন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসব হইতে আবম্ভ করেন। আর্য্যগণের আক্রমণে, খৃষ্টের জন্মের পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বাবিরুষ ও মিশরের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব যোড়শ শতাব্দীতে আর্য্যবংশজাত কাশীয়জাতি (Kassıtes, Cossıtes, Kaso-shu) বাবিরুষ অধিকার করিযা নূতন রাজ্যস্থাপন করেন। কাশীয়গণ যে আর্য্যজাতীয় সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতার নাম সূর্য্যস এবং তাঁহাদিগের ভাষা আর্য্যজাতিসমূহের ভাষার অনুরূপ। কাশীয়গণের পবন দেবতাব নাম মরুত্তস্ (সংস্কৃত মরুৎ)। ইঁহারা তাঁহাদিগের খোদিত লিপিসমূহে আপনাদিগকে খারি অর্থাৎ আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন। বাবিরুষের উত্তর-পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদদ্বয়ের মধ্যে আর্যবংশ সম্ভূত পরাক্রান্ত মিতান্নিজাতি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান পণ্ডিত হিউগো উইঙ্কলার (Hugo Wınckler) তুরস্করাজ্যে বোগাজকোই নামক স্থানে কীলকাক্ষরে (Cuneıform) লিখিত প্রাচীন মিতান্নি-রাজগণেব কতকগুলি মৃন্ময় সন্ধিপত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সন্ধিপত্র গুলিতে মিতান্নিরাজ মত্তিউয়জ, মিত্র, বরুণ, অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিন্‌গণের নামগ্রহণ করিয়া সন্ধিপত্র আরম্ভ করিয়াছেন। মিশরদেশের প্রাচীন ইতিহাস হইতে

জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশরের প্রাচীন রাজবংশ এসিয়াবাসী যাযাবরজাতিসমূহ কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সকল যাযাবরজাতি আর্য্যজাতিব আক্রমণে পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান কবেন যে, এই সময়ে আর্য্যগণও মিশবদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।"

রাখালদাস মহাশয়েব এই বাবিরুষ হল সুমেব সভ্যতাব ব্যাবিলোন [Babylon]। এই আর্যরা বাংলা এবং মগধ অঞ্চলে এসেছিল অনেকটা পরেই। আর্যাবর্তে তাদেব উপনিবেশ স্থাপিত হওয়াব অনেককাল পরে তাবা মগধ ও বাংলা অঞ্চলে আসে। তাই ঋগ্বেদে এই অঞ্চলের লোকদেব ধর্মহীন পক্ষীব জাত, দস্যু, নিষাদ ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। এই সব অঞ্চলে কাবণে কিংবা অকারণে কোন আর্য এলে তাকে ব্রাত্য কিংবা পতিত বলে গণ্য কবা হত এবং আর্যাবর্তে ফিবতে হলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত কবতে হত। বাখালদাস লিখেছেন ঃ

"এই আর্য্যজাতিব এক শাখা ভাবতেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেব পর্বতশ্রেণী অতিক্রম কবিযা পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন কবিযাছিলেন। ইঁহাবা ক্রমশ পূর্ব্বদিকে স্বীয় অধিকাব বিস্তার কবিযাছিলেন এবং দুই তিন শতাব্দীব মধ্যে উত্তবাপথেব অধিকাংশ হস্তগত কবিযাছিলেন। কেহ কেহ অনুমান কবেন যে, মগধেব দক্ষিণ অংশেব প্রাচীন নাম কীকট। ইহা যদি সত্য হয, তাহা হইলে ঋগ্বেদেব তৃতীয়াষ্টক বচনাকালে পঞ্চনদ ও মধ্যদেশবাসী আর্য্যগণ মগধদেশেব অস্তিত্বেব কথা অবগত ছিলেন। অথর্ব্ববেদ সংহিতাব ৫ম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশেব নাম আছে , সুতবাং ইহা স্থিব যে এই সময়ে অঙ্গ ও মগধদেশ আর্য্যগণেব নিকট পবিচিত হইযাছিল। ঐতবেয ব্রাহ্মণে ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রে পুণ্ড্র জাতিব উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন যদি পুণ্ড্রগণেব তৎকালীন বাসস্থান হয, তাহা হইলে উত্তববঙ্গ তখন আর্য্যগণেব পবিচিত হইয়াছিল। ঐতবেয় আরণ্যকে বঙ্গ শব্দেব সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওযা গিযাছে। ঐতরেয আবণ্যক বচনাকালে বঙ্গ, মগধ ও চেবদেশবাসিগণকে আর্য্যগণ পক্ষিবৎ জ্ঞান কবিতেন। বঙ্গ বঙ্গদেশের নাম, বগধ হয মগধেব প্রাচীন নাম অথবা লিপিকর প্রমাদের ফল, এবং চেব, জাতি অথবা দেশবিশেষেব নাম।"

মগধ এবং বাংলায আর্য-অধিকাব সম্পর্কে রাখালদাস লিখেছেন ঃ "উত্তবাপথেব পশ্চিমাংশ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইবাব বহুকাল পবেও মগধ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ বচিত হইযাছিল, সে সময়ে মিথিলায আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও মগধ ও বঙ্গ আর্য্যজাতিব নিকট মস্তক অবনত কবে নাই। তখনও পর্য্যন্ত এই দেশদ্বয় আর্য্যাবর্ত্তের সীমাভুক্ত ছিল না। প্রবাদ শুনিতে পাওযা যায যে, অঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তীর্থযাত্রা বিনা অন্য কারণে গমন কবিলে পাতিত্যদোষ জন্মিত ও পুনঃসংস্কার আবশ্যক হইত। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুদ্ধিলাভার্থ

যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত। পূর্ব্বোক্ত নিষেধবাক্য দেখিয়া বোধ হয় যে, বৌধায়ন স্মৃতির রচনাকালেও বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পিতৃপুরুষের পূজার্চ্চনারীতির ও প্রাচীন দেবসমূহেব গৌরব অক্ষুণ্ণ বাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্যই গর্ব্বিত আর্য্যগণ উক্ত দেশসমূহে গমন সম্বন্ধে নিষেধবাক্য প্রচার করিয়াছিলেন।''

বঙ্গে আর্যদের অধিকার কখন কাযেম হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এ ব্যাপারে কাল নির্ধারণের জন্য রাখালদাস মহাশয় বিজয সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনীর সাহায্য নিয়েছেন। বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়ের এই কাহিনী বেশ কিছুটা বিতর্কিত। এই কাহিনীব সভ্যতা নিযে অনেকেই সন্দিহান। তবে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, বিজয়সিংহ নামটা অনার্য নাম নয়, আর্য নাম। সুতরাং বিজয়সিংহেব কিছুটা আগে বঙ্গে আর্যাধিকার কায়েম হয়েছিল বলেই তাঁর অনুমান।

''প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারেব কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকাব কবিযাছিলেন তাহা নির্ণয় কবা দুঃসাধ্য। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজযসিংহ নামক বঙ্গদেশীয কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনাব মূলে সত্য আছে কিনা তাহা বলিতে পারা যায না, তবে ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকাব করিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীব পূর্ব্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা প্রচাবিত হইযাছিল। বিজয়সিংহ নাম অনার্য্য নাম নহে, সুতরাং তাহার জন্মের পূর্ব্বেই বঙ্গ-মগধেব প্রাচীন অধিবাসিগণ পুবাতন ভাষা ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যজাতীয় আচাব-ব্যবহার ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।''

বাংলার সংস্কৃতি গ'ড়ে তোলার পিছনে আর্যদের অবদান খুবই সামান্য। বাঙলাদেশের যে জন-সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধবে গ'ড়ে উঠেছে তার প্রায় সবটাই প্রধানত আলপীয় ও আদি অস্ট্রেলীয় এই দুই জনগোষ্ঠীর। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' [আদিপর্ব] গ্রন্থে বলেছেন, ''পরবর্তী কালে আগত আর্যভাষাভাষী আদি নর্ডিক [Proto-Nordic] নরগোষ্ঠীর বক্ত প্রবাহ ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র; এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজবিন্যাসেব উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ, ইহার ধারা বাঙালীর জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই।'' বাঙালী নাবিকদের সিনাইয়ের হাটে তামা বিক্রিব কথা, গঙ্গারিডির নাবিকদের শৌর্যের কাহিনী, বাঙলার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সমৃদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তের গরিমাময় ইতিহাস আগেই কিছুটা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এই সব বাঙালীরা আর্য নয় — এরা সবই অনার্য। এদের উৎপত্তি আদি অস্ট্রেলীয়, আলপীয় এবং মোঙ্গলীয়দের মিশ্রণে। হরপ্পা সভ্যতায়ও বাঙালীর অবদান অমূল্য। বাংলার তামা না হলে গ'ড়ে উঠত না মিশর, সুমের এবং হরপ্পার তাম্রাশ্ম সভ্যতা।

অনার্য নরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান দুটি গোষ্ঠী হল, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠী এবং দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। আদি অস্ট্রেলীয়দের ভাষা ছিল অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়দের ভাষা ছিল দ্রাবিড়। এই দুই অনার্য জাতিই হরপ্পা সভ্যতার মূল স্থপতি। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই আমাদের প্রধান অর্থনৈতিক সম্বল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি এ দেশে যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধাবা আমাদের দেশে চলে এসেছে তা একান্তভাবেই কৃষি-সভ্যতা এবং কৃষি-সংস্কৃতি। এই কৃষিকাজ যে অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রেলীয়রা আমাদের দেশে প্রচলন করেছিল তা এখন নানাভাবে প্রমাণিত। অনার্য আদি অস্ট্রেলীয়রা এদেশে কৃষিকার্যের আদি জনক। প্শিলুস্কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ কবেছেন যে, 'লাঙ্গল' কথাটি অস্ট্রিকভাষীদের ভাষা থেকে নেওয়া। এই ভাষায় লাঙ্গল শব্দের অর্থ 'চাষ করা' এবং 'চাষ করার যন্ত্র' দুই-ই হয়। খুব প্রাচীনকালেই 'লাঙ্গল' শব্দটি আর্যভাষায় গৃহীত হয়েছিল। আর্যভাষীরা চাষবাস জানতো না। সে কাবণে যে যন্ত্রেব দ্বাবা চাষ কবা হয সে যন্ত্রের সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল না। ফলে, আর্যবা 'লাঙ্গল' শব্দটি আদি অস্ট্রেলীয়দেব কাছ থেকে তাদের ভাষায় নিয়েছিল।

অনার্য আদি-অস্ট্রেলীয়বা যে প্রধান শস্য চাষ করতো তা হল ধান। তারা সমতলভূমিতে ও পাহাড়ের স্তবে স্তবে চাষেব ব্যবস্থা কবে ধানকে লোকালয়ের কৃষিবস্তু করে নিয়েছিল এবং ধানই ছিল তাদেব প্রধান উপজীব্য। অস্ট্রিক ভাষী লোকেরা ভারতবর্ষের যেখানেই গেছে সেখানেই তাবা ধানচায চালু করেছে। তবে বাবিবহুল নদনদীবহুল সমতলভূমিতেই বেশি ধান জন্মাতো। আসাম, বাংলা, ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতট অঞ্চলে ধানচাষ খুবই প্রসার লাভ করেছিল। উত্তব ভারতে ধান চাষ ততটা প্রসার লাভ করে নি। পরবর্তীকালে দ্রাবিড়ভাষী দীর্ঘ মুণ্ড দ্রাবিড় লোকেরা ভারতবর্ষে যব ও গমের চাষ প্রচলন করে। তাবা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বিহার অবধি যব ও গম চাষবাসের প্রচলন ঘটায়।

আদি অস্ট্রেলীয়রা ধান ছাড়াও চাষ করত কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান, নারিকেল, বাতাবি লেবু, কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, সুপারি, ডালিম ইত্যাদি। এইসব কৃষি দ্রব্যের নাম কিন্তু অস্ট্রিক ভাষা থেকেই এসেছে। এব সবগুলিই বাঙালির প্রিয় খাদ্যবস্তু। অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেরা গো-পালন তেমন করতো না। গো-পালন ব্যাপারটা সম্ভবত আর্যভাষীদের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। তুলার কাপড়ের ব্যবহারও অস্ট্রিকভাষীদের অবদান। 'কর্পাস' তথা কার্পাস শব্দটি মূলতঃ অস্ট্রিক। পট বা পট্টবস্ত্র, কর্পট (পট্টবস্ত্র) এই দুটি শব্দ অস্ট্রিক ভাষার। এবা মেড়া বা ভেড়া পালন করত। ভেড়ার লোম থেকে বানাতো কম্বল। 'কম্বল' শব্দটাও অস্ট্রিক।

অস্ট্রিকভাষী আদি অস্ট্রেলীয়রা ছিল মূলতঃ কৃষিজীবী। কিন্তু এদের সকলের জীবিকা কৃষিকার্য ছিল না। আদি অস্ট্রেলীয়দেব কতকগুলি শাখা ছিল অরণ্যচারীও। এই অরণ্যচারীরা হল নিষাদ ও ভীল, কোল শ্রেণীর শবর, মুণ্ডা, গদব, হো, সাঁওতাল।

এরা প্রধানত ছিল পশুশিকাবজীবী এবং পশুশিকারে ধনুর্বাণই ছিল ওদের প্রধান অস্ত্রোপকবণ। বাণ, ধনু বা ধনুক, পিনাক —এই সব শব্দ অস্ট্রিক ভাষার। এদের শিকার কবা প্রাণীগুলির নাম — মেড়া [ভেড়া], হাতি, কাক, কর্কট [কাঁকড়া] এবং কপোত ইত্যাদি। গজ, মাতঙ্গ, গণ্ডার [হস্তী অর্থে] এবং কপোত শব্দগুলি অস্ট্রিক ভাষাব।

সমুদ্র তীরবর্তী অস্ট্রিকভাষীরা মেলানেশীয়, পলিনেশীয় প্রভৃতি দেশে যাতাযাত করতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেতো গুঁড়ি কাঠের এক ধরনের লম্বা ডোঙায় চড়ে। ডোঙা কথাটাও অস্ট্রিক। এরা লম্বা লম্বা খণ্ড খণ্ড গুঁড়িকাঠ একত্র কবে ভাসমান ভেলার আকারে বড় বড় নৌকো বানাতো। ডোঙ্গা, ডিঙ্গা ও ভেলা শব্দগুলি অস্ট্রিক। এগুলিতে চড়েই আদি অস্ট্রেলীয়রা দূর-দূরান্ত পাড়ি দিত সমুদ্রপথে। এইভাবে অতি প্রাচীনকালেই তাবা এক বৃহৎ সামুদ্রিক বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। হরপ্পা সভ্যতা সেই বিশাল বাণিজ্যেবই ফলশ্রুতি। নৃতত্ত্ববিদবা বলছেন, প্রায ৩০,০০০ বছব আগে আদি অস্ট্রেলীয়বা ভারত থেকে অস্ট্রেলিযা মহাদেশে গিযে প্রথম পৌছেছিল ওই বকম ভেলাব সাহায্যেই। সামুদ্রিক বাণিজ্যেব ব্যাপক বিস্তৃতিই হবপ্পা সভ্যতাব সমৃদ্ধির অন্যতম কাবণ। আদি অস্ট্রেলীযরা ছিল সে সভ্যতার অন্যতম কিংবা বলা যায় প্রধানতম শবিক।

আসামে, বাংলায ওড়িশায, দক্ষিণ ভারতেব সর্বত্র, গুজবাতে, মহারাষ্ট্রে লোকেবা সাধারণত বান্নাব কাজে সরিষা, নারিকেল অথবা তিল তৈল ব্যবহার কবে। এবা সেলাইবিহীন উত্তব ও নিম্নবাস, যেমন, ধুতি, চাদব, উড়ুনি, উত্তবীয ইত্যাদি পবিধেয হিসাবে ব্যবহাব কবে। এবা সাধাবণত গোড়ালি খোলা চটি জাতীয জুতা পবে। এগুলি সম্ভবত আদি অস্ট্রেলীযদেব সংস্কৃতি। আবাব বিহারের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বসবাসকারী মানুযেরা ব্যবহাব কবে ঘৃত বা কোন প্রকাব জান্তব চর্বি, সেলাই কবা জামা-কাপড এবং বন্ধ-গোডালি পাদুকা। এই বিপরীত সংস্কৃতি সম্ভবত আর্যদের কাছ থেকে নেওযা। এই সব পার্থক্যই বলে দেয আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির পার্থক্য।

আদি অস্ট্রেলীযরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। এদেব সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রামকেন্দ্রিক। তবে এরাই ছিল হরপ্পাব নগব-সভ্যতার মুখ্য কলাকাব। আর বিশাল নগব সভ্যতাব আসল স্রষ্টা হল ভূমধ্যসাগবীয়বা, যারা দ্রাবিডভাষাভাষী দ্রাবিড জনগোষ্ঠী হিসাবে পবিচিত। আদি অস্ট্রেলীয়বা কিন্তু পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পঞ্চাযেত ব্যবস্থা চালু করেছিল। শবৎকুমার রায় মহাশয লিখেছেন, "পঞ্চাযেত প্রথা সম্ভবত ভাবতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্তিত। পঞ্চায়েতকে ইহাবা সত্যসত্যই ধর্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বে মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি-প্রথ অনুসাবে পঞ্চের নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, 'সিরমাবে সিঙ্গবোঙ্গা ওতেবে পঞ্চ', অর্থাৎ আকাশে সূর্য দেবতা পৃথিবীতে পঞ্চায়েত।" তিনি আরও লিখেছেন

'ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির কিংবদন্তী আছে যে, এক সময় ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণতান্ত্রিক (?) রাজ্য ছিল। রাজশক্তির চিহ্ন স্বরূপ মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রামসঙ্ঘ ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন চিহ্ন-অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়। মধ্যপ্রদেশে দ্রাবিড় পূর্ব গন্দ জাতিব শক্তিশালী সমৃদ্ধ বাজ্য আধুনিক কাল পর্যন্ত ছিল। গঙ্গা যমুনা উপত্যকায় রাজ্যাধিকারেব কিংবদন্তী মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এখনও বর্তমান।'' হবপ্পা সভ্যতার এক শবিক আদি অস্ট্রেলীয়দের তথা অনার্যদের কিছু গরিমার কথা বলা হল। এগুলি অনার্য গবিমা। এবার ভূমধ্যসাগরীয় বা দ্রাবিড়ীয়দের গৌরবগাথায় আসি। এও অনার্য গরিমা।

দ্রাবিড় জাতি একেবারে খাঁটি ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী নয। এই জাতি ভারতের দীর্ঘ শিরস্ক এক জনগোষ্ঠী ও ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এরা অনার্য [Non-Aryan] জাতি। এই দ্রাবিড় জাতিই আদি অস্ট্রেলীযদের সঙ্গে মিলে বানিযেছিল হবপ্পা সভ্যতা। অনার্য দ্রাবিড়জাতিই ছড়িযে পড়েছিল মিশব থেকে সুমের হযে ভাবতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ অবধি। এই দ্রাবিড়জাতি ভাবতবর্ষে সিন্ধুনদেব উপত্যকা হতে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তব ভারতেও প্রায় সর্বত্রই এক বিবাট জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল। নব্যপ্রস্তবযুগেব এই দ্রাবিড়ভাষাভাষীরাই ভারতবর্ষে নগর-সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। এবাই হবপ্পা সভ্যতার নগবসমূহের স্রষ্টা।

সংস্কৃত ভাষাব 'উর', 'পুর', 'কূট' প্রভৃতি নগর-বাচক যে সব শব্দ আছে তার প্রায সবগুলিই দ্রাবিড় ভাষা থেকে উদ্ভূত। রামাযণের স্বর্ণ লঙ্কাব বিববণ, মহাভারতের মযদানবেব গল্প, মহেঞ্জোদারোর নগরবিন্যাসের উন্নত ও সমৃদ্ধ রূপ, ভাবতের বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ—এ সমস্তই বলছে দ্রাবিড়ীয় নগব সভ্যতার গৌবব গাথা। নগর নির্ভব সভ্যতা বেশ জটিল। এই সভ্যতাব উপাদান-উপকরণও জটিল হতে বাধ্য। বিচিত্র খনিজ বস্তুর ব্যবহার তার অন্যতম প্রমাণ। এই জনগোষ্ঠীব লোকেরা সোনা, রূপা, সীসা, ব্রোঞ্জ ও টিনের ব্যবহার জানত। শিলাজাত নানা প্রকাব পাথর, জান্তব হাড়, পোড়ামাটি ও নানা প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক দ্রব্য ইত্যাদি নিজেদের বিচিত্র প্রযোজনে, অলংকরণে, বিচিত্র রূপে ও রচনায় ব্যবহার কবতো। এঁদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল বর্শা, ছুরি, খড়্গ, কুঠার, তীর, ধনুক, মুষল, বাঁটুল, তরবারি, তীব ইত্যাদি। হরপ্পীয় দ্রাবিড়জনেবা বানিয়েছিল পাথরের হলমুখ, চকমকি পাথরের ছুবি ও কুঠার, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটিব থালাবাটি ইত্যাদি। বিচিত্র রূপের নিত্যব্যবহার্য গৃহোপকবণ, মাটির তৈরি নানা রকম খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের দেহসজ্জার উপকবণ, খেলাব জন্য ঘুঁটি ও পাশা ইত্যাদি। অসংখ্য বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ হরপ্পা সভ্যতা। গরুর গাড়ী এই সভ্যতার অবদান। তুলার চাষ, সুতাকাটা, কাপড় বোনা এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। চাল, যব ও গম, মাছ, মেষ, শূকর ও কুক্কুট মাংস এদের প্রিয় খাদ্যবস্তু। বৃহৎ বৃষ, গরু, মহিষ, মেষ, হাতি, উট, শূকর ছাগল, মুরগি, কুকুর ছিল এদের

গৃহপালিত জন্তু। এদের বিলাসদ্রব্যের প্রাচুর্য এবং আরাম উপভোগের উপকরণের যে পরিচয়, নানা প্রকার হস্ত ও কারুশিল্পের যে পরিচয় হরপ্পার ধ্বংশাবশেষে এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যায় তার থেকে আমরা এদের এক সমৃদ্ধ নগর-নির্ভর সভ্যতাব সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। তাম্র-প্রস্তর যুগের চিত্রকলার, জ্যামিতিক রেখাঙ্কন এবং অলংকরণের, মাটির পুতুল ও খেলনায় চারুকলার যে রূপেব সঙ্গে আমরা একালে পরিচিত তারও অনেকটাই এই দ্রাবিড়দেরই সৃষ্টি। ছোটবড় একেবারে সোজা রাস্তা, জল নিষ্কাশন প্রণালী, ছোট-বড় একাধিক তলাবিশিষ্ট ইঁটকাঠের বাড়ি, দূর্গ, সিঁড়ি, খিলানযুক্ত দরজা-জানলা, স্নানাগার, শস্য সংরক্ষণ স্থান প্রভৃতি নাগরিক বিন্যাসের যা কিছু প্রয়োজন, তা হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলিতে বিদ্যমান ছিল। আর এগুলির অধিকাংশই অনার্য দ্রাবিড়গণেরই সৃষ্টি। আদি অস্ট্রেলীয়দের শ্রম এবং দ্রাবিড়ীয়দের প্রয়োগ কৌশলই হরপ্পা সভ্যতার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে তৈবি করেছিল পৃথিবীর উন্নততম প্রাচীন সভ্যতা।

তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ, কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার এবং এই সব বস্তুব সাহায্যে যে কারুশিল্প হয় তা এবা জানতো। বাঙলায কামার এবং সংস্কৃতের কর্মকার এসেছে দ্রাবিড় ভাষাব 'কর্মার' শব্দ থেকে।' 'রূপ' ও 'কলা' এই শব্দ দুটিও দ্রাবিড়। 'কুলাল' 'কপি', 'মর্কট', 'খড়্গ' এবং 'ময়ূব' শব্দগুলি দ্রাবিড় শব্দ। 'কুলাল' হল কুম্ভকাব। আবাব চালেব যে কটি শব্দ সংস্কৃত ভাষায আছে তাব অন্তত দুটি 'তণ্ডুল' ও 'ব্রীহি' দ্রাবিড় ভাযা থেকে গৃহীত। পণ্ডিতেরা বলছেন, ''আর্য সভ্যতার প্রথম স্তবেব ইতিহাসেই দ্রাবিড় সভ্যতার বাস্তব উপকরণগত এইরূপ অনেক শব্দ ঢুকিয়া পড়িযাছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বস্তুবাচক আরও কত অসংখ্য শব্দ যে ঢুকিয়াছে তাহাব ইয়ত্তা নাই। এইসব বস্তুর সঙ্গে যদি পূর্ব হইতেই আর্যভাষীদের পরিচয় থাকিত তাহা হইলে হয়তো তাহাদের ভাষায় সেইসব বস্তুর নামও থাকিত, ছিল না বলিয়াই হয়তো এমন ভাষাভাষী লোকদের নিকট হইতে তাহা ধার করিয়া আত্মসাৎ কবিযা লইতে হইয়াছে, যাহাদেব মধ্যে সেই বস্তু ছিল এবং সেই হেতু তাহাদের নামও ছিল, এবং যাহাদেব সঙ্গে আর্য ভাষাভাষীদের পাশাপাশি বাস করিতে হইয়াছে, কখনও শত্রু ভাবে, কখনও মিত্রভাবে। এইসব বস্তুবাচক অসংখ্য শব্দের ইতিহাসেব মধ্যে দ্রাবিড় ভাষাভাষীজনদের উন্নত বাস্তব সভ্যতার ঈঙ্গিতও সুস্পষ্ট।''

প্রাচীন আর্যদের সভ্যতার মান সম্পর্কে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন বায় 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

''বৈদিক আর্যভাষীদেব বাস্তব সভ্যতা ছিল একান্তই প্রাথমিক স্তরের। খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বল্পকালীন কুঁড়ে ঘরে অথবা পশুচর্ম নির্মিত তাঁবুতে ইহারা বাস করিত। গো-পালন জানিত, পশু মাংস পোড়াইয়া তাহাই আহার করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া এক জাযগা হইতে অন্য জাযগায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাযাবরত্ব ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিযা যথাক্রমে কৃষি অর্থাৎ গ্রাম-সভ্যতা এবং নগর-সভ্যতার সঙ্গে ধীরে ধীবে

তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রমে তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব এক নতুন সভ্যতা গড়িয়া তুলিল। এই সভ্যতার বাহন হইল আর্যভাষা। এই দুই সভ্যতার সমন্বিত আর্যীকরণ হইল আর্যভাষীদের বিরাট কীর্তি, অথচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের একান্ত নিজস্ব কিছু তাহাতে বিশেষ নাই।"

আমরা মনে করি না, গ্রাম-সভ্যতা এবং নগর-সভ্যতার সংশ্লেষণে বর্বর আর্যদের কোনও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই সংশ্লেষণ তো হরপ্পা সভ্যতার অবদান। বর্বর আর্যরা যেটা করেছিল তা হল এই দুই সভ্যতার আর্যীকরণ। সেটা তারা করতে পেরেছিল তরবারির জোরেই। পরবর্তীকালে হবপ্পা সংস্কৃতি ও আর্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণে যে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি গড়ে উঠে তার উপাদানের শতকরা পঁচাত্তর ভাগই আসে হরপ্পা সংস্কৃতি থেকেই। কারণ হরপ্পা সংস্কৃতি ছিল আর্য সংস্কৃতির চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তাই ভারতবর্ষেব দেশীয় সংস্কৃতি তথা হরপ্পা সংস্কৃতিই তরবারির জবরদস্তিকে হারিয়ে বৈদিকযুগেই নিজ মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ কবে। হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা, মন্দির, পশুবলি, বহু দেবদেবী ইত্যাদি এসেছে হবপ্পার অনার্য দ্রাবিড় ভাষাভাষীদেব সংস্কৃতি থেকে। যাগযজ্ঞও, যতদূব জানা গেছে, ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। এদের কাছ থেকেই ঋগ্বেদীয় আর্যভাষীরা এই যাগযজ্ঞের পরিচয় লাভ করে। যজ্ঞের 'অরণি' ও 'ব্রীহি' এই দুটি শব্দই দ্রাবিড়ভাষার। পূজা, পূজন, পুষ্প—এই শব্দগুলিও দ্রাবিড়। বৈদিক দেবতাদেব বাতিল করে হিন্দুবা আজ যে সব দেবদেবীর পূজা করে তাব সবগুলিই হবপ্পা সভ্যতার দ্রাবিড়ীয় দেবদেবী।

আদি অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় সংস্কৃতিব অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতির আরও অনেক কিছুই আমবা দৈনন্দিন জীবনে ধবে বেখেছি। যেমন, ধামা, চুবড়ি, কুলা, ঝাঁপি, বাটনা বাটবাব শিল-নোড়া, শস্য-পেষাইয়েব জাঁতা ইত্যাদি, গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত পাথরের থালা, গেলাস, বাটি, খোরা আজও বহু বাড়িতে ব্যবহৃত হয়। এযুগেব নৌকা, ডিঙি, গোরুর গাড়ি অনার্য সংস্কৃতিবই অবদান। জ্বালানি হিসাবে কাঠ ও ঘুঁটের ব্যবহারও অনার্যদেব কাছ থেকেই পাওয়া। নবোপলীয় যুগে অনার্যদের এই সব অবদানের প্রশস্তি করে নৃতত্ত্ববিদরা বলেছেন ঃ

"Neolithic habits of living have survived in modern Europe, India, China, South America and other regions of high civilization. This does not mean that their inhabitants still cut wood with polished stone tools, but their village life remains Neolithic pattern in its frame of mind To find whole Neolithic cultures surviving into recent time we must trace the early migrations of food-production to their final goals and see how Neolithic man filled in the gaps on the map unoccupied by earlier hunters. So efficient was Neolithic technology that by its means men conquered the treeless cold and sailed to new islands across distant seas."

আগেই বলেছি আদি অস্ট্রেলীয়রা প্রায় ৩০,০০০ বছর আগে ভারতবর্ষে থেকে

অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছিলো। হরপ্পা সভ্যতা আদি অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড়ীয়দের নবোপলীয় সভ্যতারই বিবর্তিত রূপ। ভারতবর্ষেব দেশজ নবোপলীয় সভ্যতাই রূপান্তরিত হয় হরপ্পার নগর সভ্যতায। আদি অস্ট্রেলীয় এবং দ্রাবিড়ীযরাই হরপ্পা সভ্যতার জনক। এরাই প্রাক-হরপ্পীয় নবোপলীয় সভ্যতার স্রষ্টা। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির আদি রূপকার হলো এই দুই অনার্য নরগোষ্ঠী—আদি অস্ট্রেলীয় এবং দ্রাবিড় জাতি। ভারতীয় আর্য সভ্যতার তথা হিন্দু সংস্কৃতির বেশির ভাগ উপাদানই এই দুই অনার্য জনগোষ্ঠীর অবদান। সুতরাং ভারতেব সভ্যতার গৌববময় ধারক এবং বাহক হল অনার্যরাই, আর্যরা নয়।

তবে ভারতীয আর্য সভ্যতা গড়ে ওঠাব পিছনে যাযাবর বর্বর নর্ডিক আর্যদেব কিছু অবদানও ছিল। বিজযী জাতি হিসাবে নিজেদের গৌবব তাবা নানাভাবে প্রচাব করলেও তাদের মধ্য দিযেই বিচিত্র পূর্বতন ধর্মের আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান সব মিলে মিশে এক নতুন ধর্ম গড়ে উঠল। সে ধর্ম পৌবাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ফিবে এলো হরপ্পার দেবদেবী নতুন রূপে। বৈদিক দেবদেবীরা নিল বিদায অথবা পবিবর্তিত রূপ। সকলকে আশ্রয় দিযে, সকলেব মধ্যে বিস্তৃত হয়ে এই ধর্ম এবং সংস্কৃতির নাম হল 'ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি' বা 'ভাবতীয় সংস্কৃতি'। বিরোধ-মিলনের মধ্যে দিযে সৃষ্টি হল নতুন ধর্ম, নতুন সংস্কৃতি। জীবনেব গতিধর্ম হল চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ প্রবাহ ও সমন্বিত প্রবাহ। এইভাবেই চলছে সংস্কৃতিব চলমান প্রবাহ। সে দিনেব ভাবতবর্ষ আর্যদের, বর্বব সংস্কৃতি কিছু সময মেনে নিলেও আবাব তাবা ফিবে গেছে প্রাগার্য সভ্যতায় তথা হরপ্পীয় সভ্যতায। কিছুটা সংশ্লেষণ ততদিনে ঘটে গেছে হবপ্পীয ও আর্য সংস্কৃতির। সৃষ্টি হযে গেছে ভাবতীয আর্য সংস্কৃতি তথা ভাবতীয সংস্কৃতি, যাকে আমরা বলি 'হিন্দু সংস্কৃতি'। ববীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলববে
ভেদি মরুপথ গিবিপর্বত যাবা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রযেছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর।"

যুদ্ধবাজ যে আর্যরা এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ৩৫০০/৪০০০ বছর আগে, হরপ্পার উন্নত সভ্যতার ধারক অনার্যদের পবাজিত করেও তারা মিলে-মিশে এক হয়ে গেল ভারতের জীবন প্রবাহে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/ শক-হূণদল, পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন'—প্রায় তেমনভাবেই সবাই একাকার হয়ে গেল এবং 'বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া'।

আর্য গরিমায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমাদের দেশের কিছু মনীষী মনে করেন আর্যরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন তাঁদের ঐক্য বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির সাহায্যে। তাঁরা লিখেছেন ঃ

"অস্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক, মিশ্র নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো দ্রাবিড়, এই সব জনগণ, যখন উত্তর ভারতের অনার্য জনরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস কবিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে কোনও ঐক্য-বিধাযিনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না—এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সংঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হইলে গ্রহণ কবিতে সদা চেষ্টিত, এমন আর্য জাতি ভাবতে দেখা দিল। আর্যভাষীরা আসিয়া খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবতকে এক ধর্মরাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতিব গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। ভারতবর্ষে তাহাবা বৈদিক ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল, তাহাবা আনিল তাহাদেব নিজেদেব সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসুবীয এবং পশ্চিম এশিযাব অন্য সভ্য নবগোষ্ঠীব প্রভাব যথেষ্ট পবিমাণে ছিল।' [বাঙালীব ইতিহাস (আদিপর্ব) ঃ অধ্যাপক নীহাব রঞ্জন বায়।]

বস্তুতপক্ষে, হবপ্পা সভ্যতা ধ্বংসকাবী বর্বব আর্যদেব সম্পর্কে এই সব প্রশংসাসূচক বিশেষণ কিছুতেই প্রযোজ্য হতে পাবে না। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই তা স্পষ্টভাবে প্রতীযমান হযেছে। একটা শক্তিশালী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি না থাকলে হরপ্পা সভ্যতার অত্যন্ত পবিকল্পিত নগবসমূহ নির্মিত হতে পাবত না। বিশাল বহির্বাণিজ্যও সম্ভব ছিল না হবপ্পা অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তৃত শক্তিশালী প্রশাসন না থাকলে। বর্বর আর্যবা ধাব কবা কিছু সংস্কৃতি এনেছিল ঠিকই, কিন্তু পববর্তীকালেব ভারতীয় আর্য সংস্কৃতিতে তথা হিন্দু সংস্কৃতিতে তাব প্রভাব ছিল খুবই কম। আগেই বলেছি হিন্দু ধর্মেব বারো আনা উপাদান হবপ্পা সংস্কৃতির আব মাত্র চাব আনা উপাদান ওই ধাব কবা আর্য সংস্কৃতিব। এক ধর্মবাজ্য পাশে সাবা ভাবতবর্ষকে আর্যবা কোনদিনই আনতে পারে নি। তাদেব দৌড় ছিল আর্যাবর্তেব মধ্যেই। আর্যাবর্তের বাইরে বিশাল ভাবতবর্ষ বহুকালই ছিল হবপ্পা তথা দ্রাবিড সংস্কৃতিব একান্ত অনুগামী। পৌবাণিক কালে এসে প্রাগার্য সংস্কৃতি তথা অনার্য সংস্কৃতি তাব পূর্বকালীন প্রাধান্য ফিরে পায়। ভারতবর্ষ তখন খণ্ড, ছিন্ন এবং যথাবীতি বিক্ষিপ্তই ছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুশে ভেদজ্ঞান' রহিত কবার শক্তি আর্যদেব কোন দিনই ছিল না। হবপ্পা সংস্কৃতি ও আর্য সংস্কৃতির মিশ্রণের পব সারা ভাবতে ধর্মীয় সংহতিব আবহাওযা সৃষ্টি হলেও রাজনৈতিক একতা কোনদিনই আর্যদের দ্বারা সাধিত হয নি।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে আজ আর্য ও অনার্যেব ভেদরেখা টানা সত্যিই মুশকিল। হাজার হাজার বছর ধরে মিশ্রণেব ফলে আজ সব 'একদেহে' লীন হয়ে গেছে। তবু আমরা যে সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ এখন থেকে ৩৫০০/৪০০০ বছর আগে এই ভেদাভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীব আর্যগরিমা প্রচারক পণ্ডিতদের ভ্রান্তি অপনোদন করে আজ এই কথা প্রচারেব দিন এসেছে যে, আর্যরা

নয় অনার্যরাই পৃথিবীকে উন্নততর সভ্যতার আলো দেখিয়েছিল। আর্যরা যখন অসভ্য, যাযাবর এবং বর্বর, হরপ্পা সভ্যতার অনার্য জনগোষ্ঠী তখন অত্যন্ত উন্নত নগরসমূহ নির্মাণ করেছে, সৌষ্ঠবপূর্ণ লিপির উদ্ভাবন করে লিখেছে, দশমিকের অঙ্ক কষে দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ করেছে, সমৃদ্ধ লোথাল বন্দর দিয়ে মিশর, মেসোপটেমিয়ায় বহির্বাণিজ্য করে বেড়াচ্ছে। আমরা যাকে আর্যগরিমা বলে গৌরব বোধ করছি তার প্রায় সবটাই অনার্য গৌরব —অনার্য গরিমা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভারতীয় আর্য সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতা তার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায় ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। তিন-চারশো বছব ধরে এই সভ্যতার রমরমা চলতে থাকে। তারপর এই সভ্যতার অবনতি ঘটতে থাকে। কী কারণে এই উন্নত নগর সভ্যতার পতন ঘটল তা নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। বেশির ভাগ পণ্ডিতের অভিমত হল এই সভ্যতাব পতনের অন্যতম কারণ হল বর্বব, যাযাবব, নর্ডিক আর্যদের অক্রমণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধিব সঙ্গে প্রাকৃতিক পবিবেশ কিছুটা প্রতিকূল হওয়ায় হবপ্পা সভ্যতাব বমবমা হ্রাস পেতে থাকে। স্তিমিত হয়ে আসা এই সভ্যতার উপর চবম আঘাত হানে যাযাবর, অসভ্য আর্যরা। এই আক্রমণকাল নিয়েও মতভেদ আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ অবধি আর্যদেব এই আক্রমণকাল হতে পারে বলে মত প্রকাশ কবেছেন বিদগ্ধজনেরা। এখানেও নানা মুনিব নানা মত।

পিগোট, হুইলাব প্রভৃতি পণ্ডিতদেব মতে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে অর্থাৎ প্রায় ৪০০০ বছব আগে উত্তব-পশ্চিম দিক থেকে এসে আর্যজাতি ভাবতবর্ষেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সেখানেব প্রাচীনতব যে উন্নত নগবভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে আসে। এই প্রাচীনতর নগরভিত্তিক সভ্যতাই হবপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা। আর্যজাতি সিন্ধু উপত্যকাবাসীদেব পরাজিত করার পর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করে। তারপর অতি দ্রুত কাশী অবধি তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদেব এই বিস্তৃত উপনিবেশের নাম হয 'আর্যাবর্ত'।

স্যার মোর্টিমার হুইলার মনে করেন যে, সিন্ধু সভ্যতার নগরসমূহ আগন্তুক আর্যদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি বলেন যে, ঋগ্বেদে বর্ণিত ইন্দ্র দ্বারা বিনষ্ট নগরগুলি সিন্ধু সভ্যতারই নগরসমূহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর মতে—"Climatic, economic, political deterioration may have weakened it, but its ultimate destruction is more likely to have been completed by deliberate and large scale destruction." [R. Mortimer Wheeler, 'Ancient India' No:8, 1947, pages 73-82]। এর অনেকটা আগেই ডঃ অতুল সুর ১৯২৮-৩১ সালে বলেছিলেন, বৈদিক আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল বটে, কিন্তু তারা হরপ্পা সভ্যতার সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে পারে নি। পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতাই হরপ্পা সভ্যতার পরিবর্তিত রূপ।

প্রায় ৪০০০ বছর আগে আর্যরা এদেশে এলেও হরপ্পার অধিবাসীদের সঙ্গে একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহে তাদের বহুকাল কেটে যায়। তবে ২০০/৩০০ বছরের মধ্যেই পশ্চিমে গান্ধার থেকে শুরু করে পূর্বে বারাণসী এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল অবধি আর্যরা তাদের উপনিবেশ বিস্তৃত করে। আর্য অধিকৃত এই বিশাল অঞ্চলের নাম হয় 'আর্যাবর্ত'। শারীরিক ও জীবনচর্যার বৈষম্যযুক্ত দু-দল মানুষ যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন তাদের মধ্যে বাধে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ। এক্ষেত্রে আর্যরা ছিল হা-ঘরে, হা-ভাতে জাতি। তারা যখন এদেশে আসে তখনও তারা অসভ্য যাযাবর। পশুপালনটুকুই কেবল শিখেছে এবং ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছে। প্রায় ৪০০০ বছর আগে আর্যরা ঘোড়াকে পোষ মানায় বলে মনে করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন প্লাইস্টোসীন যুগের শেষভাগে ঘোড়া বন্য অবস্থায় রুশ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং ইউক্রেনের শুষ্ক ও তৃণাবৃত অঞ্চলে বিচরণ করত। এটা এখন সব পণ্ডিতরাই বলেছেন যে, আর্যরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল এবং ঘোড়ায় টানা হালকা ধরনের জঙ্গী-রথ তৈরি করেছিল। এর থেকে অনুমান করা হয়, আর্যরা যখন ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল তখন তারা কাজাখিস্তান কিংবা মধ্য-এশিয়ার কোনও অঞ্চলে বাস করতো। কারণ, বন্য ঘোড়া ক্রমশঃ পূর্বদিকে কাজাখিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ঘোড়াকে আর্যরা পোষ মানায় ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। ১৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এক ফলক থেকে আমবা ঘোড়ায় টানা রথের কথা জানতে পারি।

খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ব্যাবিলনের কাশাইট বংশীয় শাসকরা নিজেদের 'আর্য' বলতো। পরবর্তী মিতান্নি শাসকরাও তাই। প্রায় ১৩৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের হিট্টাইট্‌দের রাজা সুবিলুলিউমাব মিতান্নিদের রাজা মত্তিউয়জ বা মতিওয়াজার এক সন্ধি হয়েছিল। এই সন্ধিপত্রে ঋগ্বেদের মিত্র বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, বোঘাজকোই থেকে যে সব লিপি-ফলক পাওয়া গেছে, তার অন্যতম হচ্ছে মিতানবাসী জনৈক কিককুলী-র লেখা 'অশ্ববিদ্যা' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ।

আগেই বলেছি 'আর্য' শব্দটা জাতিবাচক নয়, ভাষাবাচক। যে সব জাতি বা নরগোষ্ঠী এই ভাষায় কথা বলত তাদের বলা হত 'আর্য'। নৃতাত্ত্বিকরা বলছেন, প্রাচীনকালে দুই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী আর্য-ভাষায় কথা বলত। এই দুটি নরগোষ্ঠী হল ককেশীয় মহাজাতির নর্ডিক গোষ্ঠী এবং অপরটি হল আলপীয় নরগোষ্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমূলক প্রভেদ ছিল মাথার খুলির আকারে। নর্ডিকরা ছিল দীর্ঘকপাল জাতি, আর আলপীয়রা হ্রস্বকপাল জাতি। নর্ডিকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হল তারা বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। এরাই উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে এসেছিল। এরাই বৈদিক আর্য। এরা ভারতে আসার সময় ছিল যাযাবর বর্বর জাতি। আলপীয়রা ছিল মধ্যমাকার, মাথার খুলি তাদের অপেক্ষাকৃত ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়ের রং ফরসা।

পণ্ডিতেরা বলছেন, আলপীয়রা এবং নর্ডিকরা উবাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছিদ সমতল ভূমিতেই এক সময় বাস কবতো। যাযাবব জীবন ছেড়ে নবোপলীয় যুগের উত্তবকালে আলপীযবা কৃষিকাজ শিখে ফেলে। নর্ডিকরা পশুপালনেই বত থাকে এবং তাদেব যাযাবর বৃত্তি বজায় রাখে। মনে কবা হয়, আলপীয়বাই প্রথম নিজেদের এক বিশেষ শাখায় বিভক্ত কবে শিরদবিযা ও আমুদবিয়া নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সুবিস্তীর্ণ সমতল ভূ-খণ্ডে বসবাস শুরু কবে। তাবপব তারা পশ্চিমদিকে এগিয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর অবধি তাদেব আধিপত্য বিস্তার কবে। তাদেরই একদল বালুচিস্তান হযে পশ্চিম সাগবেব উপকূল ধরে অগ্রসর হযে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজবাট, মহাবাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ুতে হাজিব হয এবং পূর্ব উপকূল ধরে চলে আসে ওড়িশা এবং বাঙলায। আলপীযরা এসেছিল দ্রাবিড়দের অনুসরণে। তাবা মিশে যায এদেশেব জনগণেব সঙ্গে। নর্ডিকবা তাদেব আদি বাসস্থান ছেড়ে অনেকটা পবেই ভাবতবর্ষে আসে। এবা নিজেদেব 'আর্য' নামে অভিহত কবে। এরা ভাবতবর্ষেব উত্তব-পশ্চিমেব প্রবেশদ্বাব দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসেছিল। এবাই 'ভারতীয আর্য'। এবাই এখানে এসে শিখেছিল কৃষিকাজ। এবাই ধ্বংস কবেছিল হরপ্পা সভ্যতাব নগবসমূহ। পববর্তীকালে এবাই বচনা করেছিল ঋগ্বেদ। আব ঋগ্বেদ থেকেই আমবা জানতে পাবি, এই নর্ডিক আর্যবা অবিবাম সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল হবপ্পীযদেব সঙ্গে। তাদেব পবাজিত কবে প্রতিষ্ঠা কবেছিল 'আর্যাবর্ত' উপনিবেশ।

ডঃ অতুল সুব লিখেছেন, ''সমস্ত ঋগ্বেদখানা পড়লে বুঝতে পাবা যায় যে, আর্যরা ছিল একটা হাঘবে জাত। ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বেদেব উৎপত্তি হলেও সমগ্র বেদখানাতে উলঙ্গভাবে প্রকটিত হয়েছে দেবতাদেব কাছে তাদেব বৈষযিক প্রার্থনা—ঋগ্বেদেব প্রায় ১০,০০০ মন্ত্রেব মধ্যে হাজাবখানেকেতে শুধু একই কথা বলা হয়েছে —'দাও আমাদেব শত্রুব ধন, দাও আমাদেব শত্রুব সম্পদ, দাও আমাদের শত্রুর গাভী, দাও আমাদেব শত্রুব নাবী' ইত্যাদি। আর্যরা এক সামাজিক দুর্বলতা নিযে এদেশে এসেছিল। এই যোদ্ধা জাতের সেই দুর্বলতা হল যে, ওদেব সঙ্গে নারীব সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। সে জন্য তাবা হরপ্পীযদেব সঙ্গে অবিবাম সংগ্রাম করেছে অনার্য মেয়েদের ছিনিয়ে নেবার জন্য। বংশ বৃদ্ধির জন্য এটা তাদেব বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই জন্য একটা বচনের উপর তারা বিশেষ জোব দিয়েছিল, তা হল 'পুত্রার্থে ক্রিযতে ভার্যা'। এবা অনার্য মেয়েদেব ছিনিয়ে এনে বিয়ে কবত বলেই ভার্যাব অন্য নাম 'বধূ'। বধূ শব্দেব বুৎপত্তিগত অর্থ হল যাকে বহন করে আনা হয়েছে। অর্থাৎ বধূ হল 'Captured Lady'। আর ছিনিয়ে এনে বিবাহ হল "Marriage by Capture'। স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করার মধ্যে স্ত্রীর অনার্যত্বই প্রকাশ পায়। অনার্য রমণী আর্যসমাজভুক্ত হওযাব ফলে গৃহিণীই গৃহ হল। [গৃহিণী গৃহমুচ্যতে]। আব বর্বব আর্যজীবনে প্রভাব পড়ল সভ্য অনার্য সংস্কৃতির। এর ফলে হরপ্পার উন্নত অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘটল

বর্বর আর্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণ। এই সংশ্লেষণের ফলে গড়ে উঠেছিল হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা। আগন্তুক আর্যরা যে সংস্কৃতি এদেশে বহন করে এনেছিল, যার অনেক নমুনা আমবা ঋগ্বেদে দেখি, সে সংস্কৃতি ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। প্রাগার্য জনসমাজের অনার্য সংস্কৃতিই ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে। জনসমাজে এই সভ্যতা পরবর্তীকালে মণ্ডিত হয়েছিল আর্যদের ভারতীয় উত্তরপুরুষদের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায়। হরপ্পার অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির এই সংশ্লেষণই সৃষ্টি করে 'ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি' [Indo-Aryan Culture], উদ্ভূত হয় 'ভারতীয় আর্য-সভ্যতা' [Indo Aryan Civilization]। যার অন্য নাম 'বৈদিক সভ্যতা'।"

নর্ডিক আর্যরা যখন প্রথম এদেশে এল তখন তারা ছিল বর্বর যাযাবব জাতি। অনার্যদেব সঙ্গে তাদের বহু বছর ধরে সংঘর্ষ চলার পর সংশ্লেষণ ঘটতে থাকে আর্যরা কৃষিকাজ শিখে নিয়ে কিছুটা সভ্য হয এবং গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠীজীবন-যাপন শুরু কবে। আর্যদের গোড়ার দিকেব বৈরিতা পরবর্তীকালে আর থাকে না। পঞ্চনদ থেকে তারা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে, ততই তারা এ দেশের লোকদের সংস্পর্শে আসতে থাকে এবং এদেশের মেয়েদেব বিয়ে করতে থাকে। সংস্কৃতিব সংশ্লেষণে মুখ্য ভূমিকা নেয আর্যদের এইসব অনার্য স্ত্রীরা। ভারতীয় আর্য সভ্যতাব মূল পরোক্ষ হোতা হল এইসব নারী যারা আর্যদের 'বধূ' হযেছিল। অনার্য বমণীবা গৃহিণী হতে থাকায আর্যদেব ধর্মকর্মের উপরও তার প্রভাব পড়ে। ক্রমশঃ তারা বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবতাদের পিছনে ফেলে আর্য ও অনার্য সংশ্লেষণে সৃষ্ট দেবমণ্ডলীর পূজার পত্তন করে। তথাকথিত আর্য ব্রাহ্মণগণ এই সব পৌরাণিক দেবদেবীব পূজা-পাঠের প্রচলন করে। তবে বৈদিক সভ্যতার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'ঋগ্বেদ' এবং অন্যান্য বেদসমূহ।

এদেশের উন্নত সভ্যতাব সংস্পর্শে এসে বর্বর আর্যরা সুসভ্য হয়েছিল। এই সুসভ্য হওয়ার পিছনে আর্য 'বধূ'দের অবদান অনস্বীকার্য। ওই Captured Lady-রাই আর্যদের সুসভ্য করে তুলেছিল। ঋগ্বেদের বহু জায়গায় মেয়েদের বস্ত্র বয়নের কথা আছে। মনে করা হয়, আদিম সমাজে যেমন মেয়েরা চাষবাস করে, আর্যসমাজেও তেমনি অনার্যরমণীরা শুধু বস্ত্রবয়নই নয়, চাষবাসেরও প্রবর্তন করেছিল। হরপ্পীয় অনার্য বলতে নৃতাত্ত্বিকরা চারটি জাতির কথা বলেছেন—(১) আদি অস্ট্রেলীয়, (২) দ্রাবিড়, (৩) ভূমধ্যসাগরীয এবং (৪) আলপীয়। ডঃ অতুল সুর বলেছেন যে, আর্যবা যাদের 'অসুর' বলেছে তারা আলপীয় গোষ্ঠীর লোক, আর্যদের কথিত 'পণি'-রা হল 'ভূমধ্যসাগরীয়' গোষ্ঠীভুক্ত, আর্যরা যাদের 'দস্যু' বলেছে তারা 'দ্রাবিড়' জাতি এবং আর্যরা যাদের 'দাস' নামে অভিহিত করেছে তাবা 'নিষাদ' বা আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোক। এদের সবাইয়েরই কঙ্কাল হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত অসুর, পণি, দস্যু ও দাস — এই চারটি জাতিই হরপ্পা সভ্যতার অনার্য-জাতি।

আগেই বলেছি, 'আর্য' শব্দটি ভাষাবাচক জাতিবাচক নয়। বহু পরে অবশ্য এটি

জাতিবাচক শব্দ হয়ে যায়। ঋগ্বেদেও এটি জাতিবাচক শব্দ হিসাবেই ব্যবহৃত। আধুনিক কালে আমরা সাধারণত 'আর্য' শব্দটি জাতিবাচক (Race) অর্থে ব্যবহার করি। প্রাচীন পারসিকরা জাতি অর্থেই আর্য শব্দটি ব্যবহাব করত। পারস্য সম্রাট দাবিয়ুস খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নিজেকে আর্য এবং আর্য-বংশোদ্ভূত বলতেন। কিন্তু আধুনিক কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার, উইলিয়াম জোন্‌স প্রভৃতিব মতে 'আর্য' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর নাম। গ্রীক, ল্যাটীন, জার্মান, গথিক, কেলটিক, পারসিক ও সংস্কৃত এই ভাষাগোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত। যারা এই ভাষাগুলির মধ্যে যে কোন একটি ভাষায় কথা বলে, তাদের আর্য বলা যায। কিন্তু ভারতে যে আর্যরা এসেছিল এবং যাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে হরপ্পা সংস্কৃতিই ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল, সে আর্যরা হল ককেশীয় মহাজাতির নর্ডিক [Nordıc] জনগোষ্ঠী। বলা হয়, এবা আর্যভাষায কথা বলতো। এরা ঋগ্বেদে নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত কবেছে। আলপীয়বা আর্যভাষাভাষী হলেও আবযবিক গঠনে এবং মানসিকভাবে তারা নর্ডিক আর্যদের সম্পূর্ণ বিপবীত ছিল।

নর্ডিক আর্যদের বাসভূমি ছিল উরাল পর্বতেব দক্ষিণের শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমিতে। তবে এই সিদ্ধান্ত অনেক পণ্ডিতই মেনে নিতে পারেন নি। তাই এই যাযাবর, বর্বর আর্যদেব আদি বাসভূমি কোথায় ছিল, সে বিষযে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এ বিষযে দুটি মত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাবজিটাব, ভাবতীয পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা, ডি এস. ত্রিবেদী প্রমুখবা মনে কবেন—ভাবতই আর্যদেব আদিনিবাস। অপরদিকে অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে কবেন আর্যগণ ভারতে বহিবাগত।

আর্যরা সপ্তসিন্ধু (সিন্ধু, ইবাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা, শতদ্রু এবং সরস্বতী নদী) বিধৌত দেশকেই নিজেদেব বাসভূমি বলে বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ কবেছেন। গঙ্গনাথ ঝা-এর মতে—গঙ্গা-যমুনাব অববাহিকা অঞ্চল 'ব্রহ্মর্ষি দেশ' ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। ত্রিবেদীব মতে মূলতানেব নিকটবর্তী অঞ্চলে আর্যদেব আদিনিবাস ছিল।

বালগঙ্গাধর তিলকেব মতে, সাইবেরিয়া অঞ্চলে আর্যদের আদিনিবাস ছিল। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর শব্দভাণ্ডাবে যেসব গাছপালা, জীবজন্তুর নাম আছে সেসব প্রাচীন পৃথিবীর যে অঞ্চলে পাওয়া যেত, সেই অঞ্চলেই হবে আর্যদের আদি বাসভূমি। এই যুক্তিতে ব্রান্‌ডেনস্টাইন বলেন—'এশিযাব উরাল পর্বতেব দক্ষিণে বিস্তৃত তৃণাঞ্চল কিরঘিজস্তান ছিল আর্যদেব আদি বাসভূমি'। অধ্যাপক ব্যাসামের মতে ইউবোপেব পোল্যান্ড থেকে মধ্য এসিযা পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চলে আর্যদের আদি নিবাস ছিল। আর্যদের আদি নিবাস নিয়ে মতভেদ যাই থাক না কেন এই সিদ্ধান্তে প্রায় সবাই একমত যে আর্যরা ভাবতে ছিল বহিরাগত।

এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে আর্যরা ছিল শীতপ্রধান দেশের লোক। সেখানে তারা, শরীর গরম রাখার জন্য মাংসাশী ছিল। তারা কৃষিকাজ জানতো না। পশুপালন

করত এবং যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত ছিল। সব যাযাবর পশুপালকদের মত তারাও পশুমাংস খেত। শুধু তাই নয় আর্যরা এক সময় নরমাংসভোজী ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডের সেই কথাগুলিতে আবার আসি। সেখানে বলা হয়েছে—'প্রথমত দেবতারা একটি মানুষকে উৎসর্গ করলেন, তার উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহে প্রবেশ করলো। দেবতারা অশ্বকে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন, উৎসর্গীকৃত আত্মা অশ্বদেহ হতে পুনরায় বলীবর্দে প্রবেশ করল। বলীবর্দকে উৎসর্গ করা হলে এই আত্মা মেষদেহে প্রবিষ্ট হল, মেষ উৎসর্গীকৃত হলে, উহা ছাগদেহে প্রবিষ্ট হল। ছাগ উৎসর্গীকৃত হলে আত্মা পৃথিবীতে প্রবেশ করল। দেবতারা পৃথিবী খনন করে ধান্য ও যব আকারে ওই আত্মাকে পেলেন। সেই থেকে সকলে এখনও কর্ষণ দ্বারা ধান্যাদি পেয়ে থাকে।' পণ্ডিতেরা বলছেন শতপথ ব্রাহ্মণের এই বিবরণটা আর্যদের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত বলছে। আর্যরা প্রথমে ধান উৎপাদন করতে জানতো না। তাদের সংস্কৃতির শুরু নরমেধ যজ্ঞ দিয়ে—নরমাংস ভোজন দিয়ে। তারপর মাংস আহারের ক্রমবিবর্তনে তারা আরম্ভ করেছিল ক্রমান্বয়ে, অশ্বমেধ, গোমেধ, মেষমেধ ও ছাগমেধ। এরপরই তারা ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদনের জ্ঞানলাভ করে। নরমেধ যজ্ঞের কথা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৪তম সূক্তে শুনঃশেপের কাহিনীর মধ্যে রয়েছে। এই কাহিনী ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ ও পুরাণেও আছে। শুক্ল যজুর্বেদেও নরমেধের কথা আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা 'অতিষ্ঠা' নামে এক যজ্ঞ করত ৭০ দিন ধরে। এই যজ্ঞে নরবলি দিতে হত। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র ও যযাতি এই যজ্ঞ করেছিলেন। শিবিরাজার কাহিনীতেও তাঁর পুত্রকে রান্না করে ব্রাহ্মণকে ভোজন করতে দেওয়ার কথা আছে। মোদ্দা কথা, আর্যরা, নর, অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগ মাংস ভোজন করত। অশ্ব এবং গোমাংসের প্রতি তাদের প্রবল প্রীতির কথা আগেই বলা হয়েছে। এই মাংস প্রীতিই বলে দেয় তারা শীত প্রধান দেশের লোক। উরাল পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলে তাদের আদি নিবাস হওয়াটাই অনেকটা যুক্তিযুক্ত।

নর্ডিক আর্যগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু পশুপালন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। আলপীয়রা খাদ্যাভাবের কারণে অনেক আগেই এই অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে পারস্যে, ভারতবর্ষে। মিশে যায় সেখানের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। নর্ডিক জাতিরা অনেকটা পরে প্রায় ৪০০০ বছর আগে বেরিয়ে পড়ে আহার্যের সন্ধানে। স্ত্রীপুত্র-পরিজনদের অধিকাংশকেই ছেড়ে দিয়ে এরা বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যান্বেষণে।

পণ্ডিতদের মতে কিছু আর্য-জনগোষ্ঠী পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে ইউরোপে যায়। অপর কিছু গোষ্ঠী এশিয়া মাইনর মালভূমিতে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে তারা ইরান বা পারস্যে প্রবেশ করে। কালক্রমে পারস্যে আর্যরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু আর্য-জনগোষ্ঠী পারস্যে থেকে যায়। অন্যরা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়। তারা হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তরে ব্যাকট্রিয়া, বাল্‌খ ও আফগানিস্তান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এখান থেকেই কিছু আর্য-জনগোষ্ঠী হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে ভারতে

প্রবেশ করে। আমরা এদেরই আর্য বলি। এরা ককেশীয় মহাজাতির নর্ডিক জনগোষ্ঠী। এরাই ভারতীয় আর্য। এদেবই সংস্কৃতিব সঙ্গে হবপ্পা সংস্কৃতিব মিশ্রণে সৃষ্টি হয ভারতীয় আর্য সভ্যতা।

প্রাচীন ইরানীয় এবং প্রাচীন আর্যগণ যে কোনও এককালে একই জনগোষ্ঠীভুক্ত ছিল তার প্রমাণ দুই দেশেব প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায। প্রাচীন পাবসিকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তা এবং ভারতীয় আর্যদেব ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদেব মধ্যে ভাষা ও দেবোপাসনার দিক থেকে বেশ মিল দেখা যায। বৈদিক দেবতা সূর্য, অগ্নি, বরুণ ও মরুৎ ইরানীয় ভাষায যথাক্রমে সুরিয়স, অগ্‌নাস, বরুনাস ও মরুত্তস। উভযেবই মুখ্য দেবতাব সংখ্যা তেত্রিশ। দুই দেশেই উপনযন প্রথা, অগ্নি সাক্ষী বেখে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতবাং পণ্ডিতরা অনুমান কবেন যে, ইবানীয আর্য এবং ভাবতীয আর্যদের আদিনিবাস একই স্থানে ছিল এবং তাবা পবস্পর জ্ঞাতি। আগেই বলেছি, আলপীয জনগোষ্ঠীও আর্যভাষায কথা বলতো। এই আলপীয জনগোষ্ঠী নর্ডিক আর্যদেব অনেকটা আগেই ইবান অঞ্চলে চলে আসে। তাদের কিছু লোক ভাবতবর্ষেও এসেছিল নর্ডিক আর্যদেব আসার অনেক আগে। এই আলপীয জনগোষ্ঠীব কথা আগেই বলা হযেছে। এবা হবপ্পা সভ্যতাবও অংশীদাব ছিল দ্রাবিড়ীয ও আদি অস্ট্রেলীয জনগোষ্ঠীব সঙ্গে। আলপীযদেব সঙ্গে আর্যদেব ভাষাব মিল ছিলই। ভাবতীয আর্যদেব সঙ্গে পশ্চিম এশিযাব আর্যদেব যে সম্পর্ক ছিল সে বিষযে কিছু প্রত্ননিদর্শন পাওযা গেছে। মেসোপটেমিযা, সিবিযা, প্যালেস্টাইন অঞ্চলে অনেকগুলি লেখ আবিষ্কৃত হযেছে। এগুলি থেকে জানা যায যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দের মধ্যে পশ্চিম এসিযাব অনেক লোক আর্য, এমনকি বৈদিক আর্যদেব মধ্যে প্রচলিত নাম বাখত, যেমন—ইন্দবত্ত, দসবত্ত। পশ্চিম এসিযাব এই আর্যদেব হিট্টাইট, মিতান্নি এবং ক্যাসাইট বলা হয। মিশবেব তেল-এল-অমরনা নামে এক জাযগায কিছু সরকাবি দলিল ও চিঠি পাওয়া গেছে। এগুলিতে মিতান্নিদেব কযেকজন বাজার নাম আছে। নামগুলির সঙ্গে ভারতীয পৌবাণিক রাজাদেব নামের মিল আছে। বোঘাজকোই নামে এক জায়গায় হিট্টাইটদেব রাজধানীব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে একটি লেখ পাওয়া গেছে। লেখটিতে মিতান্নিদের বাজা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্য দেবতার নাম করেছেন। অন্য কয়েকটি লেখ থেকে জানা যায়, ক্যাসাইটদের দেবতা ছিলেন সূর্য এবং যম। এইসব দেবতাব নাম ঋগ্বেদেও পাওযা যায। এখানে যে সমযটার কথা বলা হল সে সময় ভারতীয় আর্য সভ্যতার গোড়াপত্তন হযে গেছে। ভারতবর্ষে চলছে বৈদিক যুগ। এব খানিকটা পরে শুরু হয় উপনিষদীয যুগ।

অনুমান করা হয়, প্রায় ৩৭০০/৩৮০০ বছর আগে আর্যরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এর আগে তারা কোন একটা সময়ে তুর্কিস্তান থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতীয় পুবাণে তুর্কিস্তানকে ইলাবৃতবর্ষ বলা হয়েছে। আর্যরা একেবারে সকলেই একসঙ্গে ভারতে আসেনি। বহুযুগ ধরে বিভিন্ন

দল বা গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছিল। এইজন্য দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে আর্যদের দেবতা, গোত্র ও মন্ত্র পৃথক হয়েছে। এক যুগের প্রধান দেবতা অন্য যুগে গৌণ দেবতায় পরিণত হয়েছেন। ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থের নাম "বেদ"। বেদ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। হিন্দুগণ বেদকে অপৌরুষেয় মনে করে। অর্থাৎ বেদ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এটি ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী। বেদের বাণী প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না। শিষ্যেরা গুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে শিখে নিত। এইজন্য বেদের অপর নাম "শ্রুতি"। বেদ-এর চারটি ভাগ—ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋগ্বেদে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশে রচিত ১০২৮টি সূক্ত তথা ১০৫৫২টি ঋক দশটি মণ্ডলে সঙ্কলিত হয়েছে। সামবেদে রয়েছে মূলতঃ গীত-সঙ্কলন। এর বেশ কিছু ঋক ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া। এর মন্ত্রগুলি গীতধর্মী এবং তাই মনে করা হয় সামবেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞের সময় গান হিসাবে গাওয়া হত। সামবেদে মোট ১৫৪৯ টি মন্ত্র আছে। সামবেদকে 'সামগান'-ও বলা হয়। যজ্ঞ করার জন্য যজুর্বেদের মন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হত। অথর্ববেদে মন্ত্রের সংখ্যা ৭৩১টি। অথর্ববেদে সৃষ্টির রহস্য, পৃথিবীর স্তব, চিকিৎসার মন্ত্র, শত্রু বশ ও নাশ করার মন্ত্র এবং বহু উপদেবতা ও অপদেবতার উপাসনার ইঙ্গিত আছে। এইজন্য অনেকে অথর্বকে বেদ বলে স্বীকার করে না। বস্তুবিজ্ঞান চর্চার বাহুল্য থাকায় এটাকে অনেকেই বেদ বলে মানেন না। কিন্তু এরই থেকে উৎপন্ন হয়েছে 'আয়ুর্বেদ'।

চার বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের রচনকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নিরিখে বালগঙ্গাধর তিলক স্থির করেন যে, বেদের রচনাকাল আনুমানিক ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। কিন্তু জার্মান পণ্ডিত জ্যাকোবি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের বিচারে ঋগ্বেদের রচনাকাল ধার্য করেন ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। জার্মান পণ্ডিত ভিন্টারনিৎস (Winternitz)-এর মতে সমগ্র ঋগ্বেদ এককালে রচিত হয়নি। ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি। আধুনিক ঐতিহাসিকরা প্রত্নিনিদর্শনের নিরিখে ঋগ্বেদেব রচনাকাল নির্ধারণের পক্ষপাতী। তেল-এল-অমরনা এবং বোঘাজকোই লেখ বিচারে অনুমান হয় যে, ঋগ্বেদের প্রথম রচনা খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের পরবর্তী হতে পারে না। বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, আর্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রত্ননিদর্শন ইত্যাদি সবদিক বিচার করে অধ্যাপক ব্যাসাম স্থির করেছেন যে, ঋগ্বেদ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

সুতরাং ঋগ্বেদ রচনার সময় নিয়েও নানা মুনির নানা মত। ম্যাক্সমুলার সাহেবের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল এখন থেকে প্রায় ৩,২০০ বছর আগে কিংবা তার দু-একশ বছর বেশী। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল হলো ১০০০ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। আবার পিগোট, হুইলার ইত্যাদি পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের

রচনার কাল ৩,৪০০ হতে ৩,৫০০ বছর আগের কোন সময়। শেষোক্তদের মতে আর্যরা ভারতে এসেছিল প্রায় চার হাজার বছর আগে। ভারতে বসবাস স্থাপনের পর তাদের সভ্যতাব সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিশ্রণ ঘটতে কিছুটা সময় লাগলো। তারপর এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ঋগ্বেদ রচিত হ'ল। পিগোটের ওই সিদ্ধান্তের পিছনে আরও একটি যুক্তি এই যে, উপরোক্ত যে মিতান্নি-লেখটি পাওয়া গেছে, যার আনুমানিক রচনাকাল ১৩৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে ধার্য কবা হয়েছে, তাতে কতকগুলি ঋগ্বেদীয় দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। আবার ভাষাতত্ত্ব দিযে ঋগ্বেদের বয়সের এই বিচার কিন্তু ঠিক নয়। কারণ হিসাবে বলা যায়, ঋগ্বেদের সবচেযে পুরনো অংশ 'সংহিতা' তৈরী হয়েছে কয়েকশ' বছর ধরে। তারপর বহুদিন ধরে রচিত হয়েছে ব্রাহ্মণ অংশ। সংহিতা-আকারে প্রকাশের আগে বহুশত বৎসর ধরে সূত্রগুলি বংশ-পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে বচিত হয়েছে ও অনুশীলিত হয়েছে। মুখে মুখে থাকায় তাদেব ভাষারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। আর সেই কাবণে ভাষাতত্ত্ব দিয়ে ঋগ্বেদের বযস বিচার করলে ঋগ্বেদ অনেক আধুনিক বলে প্রতীয়মান হতে বাধ্য।

তাই ঋগ্বেদেব সূক্তের মধ্যেই যাঁবা ঋগ্বেদেব বয়সকাল খুঁজে পেয়েছেন তাঁরাই অনেক বেশি প্রামাণ্য। ঋগ্বেদের ঋষিবা চন্দ্রসূর্যের গতিবিধি, নক্ষত্রেব উদয়-অস্ত ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এ ব্যাপারে আমবা বিস্ময়কব বহু তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কাবক। সূক্তগুলিব মধ্যেই পাওয়া যায, কবে কোন নক্ষত্রে সূর্য বিষুববেখায আসত, কোন্ দিকেব আকাশে কোন্ অবস্থানে কোনো নক্ষত্রকে কোনো ঋতুতে দেখা যেত ইত্যাদি। ঋগ্বেদে এই ধরনেব শতাধিক সূক্ত আছে যেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানেব তথ্য সমৃদ্ধ এবং উন্নত জ্ঞানেব পরিচাযক। এগুলিতে চন্দ্র-সূর্যেব বা নক্ষত্রেব গতিবিধি যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে, এই সংক্রান্ত সূক্তটি বচনাকালে সূর্যেব আপেক্ষিক অবস্থান। অয়নগতিব ফলে সূর্যেব বর্তমান অবস্থান জেনে জ্যোতির্বিজ্ঞানেব নিযমে এই সব সূক্তেব বচনা কাল পাওযা যায় এবং এই কাল নির্ণয যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। কাবণ মুখে মুখে প্রচলিত সূক্তগুলিব ভাষাগত রূপ বহু পরিবর্তিত হলেও নাক্ষত্রিক গতিবিধি নির্দিষ্ট নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। ফলে, এই পদ্ধতিতে হিসাব কবা বয়সকালই সঠিক বলা যেতে পাবে। কিন্তু অসুবিধা হল এই যে, এতে বহু সূক্তেব বয়স নির্ণীত হয ৬০০০ বছব কিংবা তারও বেশি। অথচ আর্যদেব এদেশে আসাব কাল ৪০০০ বছবেব বেশি হতে পাবে না এবং ঋগ্বেদ বচনাব সময এখন থেকে ৩৫০০ বছব আগে হওযাই যুক্তিযুক্ত। তা হলে যে সব সূক্ত ৬০০০ বছর বা তারও বেশি সমযকাল নির্দেশ করে, সে সূক্তগুলি ঋগ্বেদে এলো কেমন করে? এগুলি প্রাগার্য বা হরপ্পীয় অনার্যদের দ্বারা রচিত সূক্ত নয় তো? এগুলি হয়ত উভয় সংস্কৃতির সংশ্লেষণেব পব অর্থাৎ ভাবতীয় আর্য সভ্যতার সৃষ্টির পর ঋগ্বেদে গৃহীত হয়েছিল। এসব অনুমান মাত্র। হবপ্পাব লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার না হলে এই সব অনুমান কতটা সত্যি তা বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে,

হরপ্পীয়বা অঙ্কে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক সময় প্রবল ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল, এবং তা করেছিল ঋগ্বেদ রচনাকালের প্রায় ১০০০ বছর পূর্বেই। সুতরাং ঋগ্বেদের এই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত সূক্তগুলির পিছনে যে অনার্য হরপ্পীয়দের অবদান নেই— এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, আর্যরা সভ্য হয়েছিল হরপ্পার অনার্য সভ্যতা অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষে এসেই।

চাব বেদের প্রত্যেকটি আবাব চারভাগে বিভক্ত ঃ — সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আবণ্যক ও উপনিষদ। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে ছন্দে রচিত মন্ত্রের সমষ্টিকে বলা হয় 'সংহিতা'। ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত। মন্ত্র বা সংহিতার ব্যাখ্যা করাই হল ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য। এই অংশে যাগ-যজ্ঞ সম্পর্কিত বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে সেকালে প্রচলিত কিছু গল্প, কিছু পবিমাণে দর্শন, ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদের আলোচনা আছে। ব্রাহ্মণে উল্লিখিত গল্পগুলি অবলম্বনে পববর্তী যুগে পুবাণ, ইতিহাস, কাব্য, মহাকাব্য রচিত হয়েছে।

বেদেব ব্রাহ্মণ অংশের পবিশিষ্টেব নাম ''আবণ্যক''। এই অংশে কর্ম ও জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা কবা হয়েছে। আর্য ঋষিবা তাঁদেব জীবনেব তৃতীয আশ্রম বানপ্রস্থে, কোন অবণ্যে এসে বাস কবতেন। এই অরণ্যাশ্রমে বাস কবাব সময তাঁরা যাগ-যজ্ঞ বিষয়ে আলোচনা এবং দার্শনিক বিষয়ে ব্যাখ্যা কবতেন। এইসব আলোচনা আরণ্যকে সংকলিত হয়েছে। ঋষিদেব অবণ্যবাসকালে বচিত বলে এব নাম 'আবণ্যক'। বেদেব যতগুলি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণগুলিব যত শাখা, আবণ্যকও ততগুলি। ঐতবেয় ব্রাহ্মণের শেষাংশ ঐতবেয় আবণ্যক, এবং শতপথ ব্রাহ্মণেব শেযাংশ 'বৃহদাবণ্যক' নামে প্রসিদ্ধ।

আবণ্যকের অংশবিশেষকে বলা হয ''উপনিষদ''। আর্যগণের দার্শনিক চিন্তাব পূর্ণ পবিচয পাওযা যায উপনিষদে। উপনিষদগুলিকে সমগ্রভাবে 'বেদান্ত' বলা হয়। কারণ এগুলি বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা উপনিষদেব বিষয়বস্তু। ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের জন্য উপনিষদে রূপকাশ্রয়ী বহু গল্প বলা হয়েছে। প্রসিদ্ধ ভারতীয় দার্শনিক শঙ্করাচার্য ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, ঐতরেয় এবং বৃহদারণ্যক এই দশটি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন।

বেদ পাঠের জন্য এবং বিহিত ধর্মকর্ম পালনের জন্য বিশেষ শাস্ত্র রচনা কবা হয়েছে। এই শাস্ত্রগুলিকে বলা হয় বেদের অঙ্গ বা বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গের সংখ্যা ছয় — শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, কল্প ও জ্যোতিষ। এদেব মধ্যে প্রথম চারটি বেদেব পঠন-পাঠনে সাহায্য করে। যজ্ঞের পক্ষে উপযুক্ত কাল, দিন, মাস, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্র রচনা করা হয়।

বেদাঙ্গের ''কল্প'' অংশে যজ্ঞের প্রযোগবিধির আলোচনা করা হয়েছে। এগুলিকে ''সূত্র'' বলা হয়। সূত্র চার প্রকার — শ্রৌত, ধর্ম, গৃহ্য ও শুল্ব। শ্রৌত সূত্রে বৈদিক যাগযজ্ঞেব বিধান দেওয়া আছে। ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের

সামাজিক জীবনযাপনের নিয়মাবলী রচনা কবা হয়েছে। হিন্দু সমাজেব আইন বিষয়ক প্রাচীনতম বিধি হল ধর্মসূত্র। গৌতম, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব, গোভিল প্রভৃতি মুনিগণ এইসব ধর্মসূত্র রচনা কবেন। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন যে সব অনুষ্ঠান করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুল্ব সূত্রে যজ্ঞবেদির আকার, মাপ ও নির্মাণপদ্ধতি আলোচনা কবা হয়েছে। শুল্ব সূত্রে উল্লিখিত জ্যামিতি এই বিষয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম আলোচনা। তাছাড়া ছয়টি ষড়দর্শনও সূত্র সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি হল কপিলের 'সাংখ্যদর্শন', পতঞ্জলিব 'যোগদর্শন', গৌতমের 'ন্যায়দর্শন', কণাদের 'বৈশেষিকদর্শন', জৈমিনির 'পূর্ব মীমাংসা', ও ব্যাসদেবের 'উত্তর মীমাংসা',।

ভারতীয় আর্যদের সমাজব্যবস্থা ছিল পবিবারভিত্তিক। গৃহস্বামী, তার পত্নী এবং সন্তানদেব নিয়ে গড়ে উঠত পবিবাব। শাস্ত্রমতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ছিল পরিবারের ভিত্তি। পবিবাবেব বযোজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পবিবারেব কর্তা হতেন। মাতা-পিতাকে ভক্তি কবা এবং গুরুজনদেব সম্মান দেওযা ছিল সকলেব কর্তব্য। কালক্রমে একই পূর্বপুরুষেব সন্তানেবা অনেক পবিবাব সৃষ্টি কবলে সেইসব পরিবাবেব মধ্যে গড়ে উঠত একটি বংশেব 'গোত্র'। পূর্বপুরুষেব নামে এই গোত্র পরিচিত হত।

ঋগ্বেদের যুগে পবিবাব ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সেজন্য পুত্রেব আদর ছিল বেশি। তা বলে কন্যাকে অবহেলা কবা হত না। পুত্রের মত কন্যাদেবও শিক্ষা দেওযা হত। এ জন্য এইযুগে ঘোযা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববাবা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিতা নাবীব নাম পাওয়া যায়। এঁবা পুরুষ ঋষিদেব মতই মন্ত্র বচনা কবেছিলেন। ঋগ্বেদে এই বকম সাতজন নাবী-ঋষি বা ঋষিকাব বচিত সূক্ত বযেছে। এগুলিব মধ্যে ঋষিকা বাক্-এব সূক্ত 'দেবী সূক্ত' নামে বিখ্যাত। ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলের ১২৫তম এই সূক্তটিব আটটি ঋক। এই সূক্তটি ভাবতীয দর্শনে শক্তিবাদেব বীজমন্ত্র এবং এটি শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভিত্তিভূমি। ঋষিকা সূর্যাব বিখ্যাত ''বিবাহ সূক্ত'' এতো বছর পরেও সমাজ জীবনে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এটি দশম মণ্ডলেব ৮৫ তম সূক্ত। এর ঋক সংখ্যা ৪৭টি। ঋগ্বেদের এই সাতজন ঋষিকা হলেন, বাক্, সূর্যা, লোপামুদ্রা, অপালা, ঘোযা, ইন্দ্রাণী ও বিশ্ববাবা। বিশ্ববাবা শুধু ঋষিই ছিলেন না, তিনি পুবোহিত হযে যজমানের যজ্ঞ সম্পাদনও কবতেন। সাবা জীবন অবিবাহিতা ছিলেন। তবে সূর্যাব দু'জন পতি, দেবী সূক্তে শক্তিবাদেব প্রশস্তি ইত্যাদি দেখে মনে হয এগুলি প্রাগার্য তথা হরপ্পীয় অনার্য সভ্যতাব অবদান, যা ভাবতীয় আর্য সংস্কৃতিতে কিছুটা পববর্তীকালে এসে গেছে স্বমহিমায।

বৈদিক সমাজে বাল্যবিবাহের চল ছিল না। মেয়েবা নিজেদেব পছন্দমত বিবাহ কবতে পাবত। বিবাহবন্ধনকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য বলে মনে কবা হত। স্ত্রীকে স্বামীব সহধর্মিণী গণ্য করা হত। স্ত্রী বৈদিক যাগযজ্ঞে, ধর্মকর্মে অংশ নিত। বহু-বিবাহের চল বিশেষ ছিল না। বিধবা-বিবাহেরও প্রচলন ছিল। সে যুগের মেয়েরা অস্ত্রচালনা শিখত। প্রযোজন হলে যুদ্ধও করত। ইন্দ্রসেনা, বিশ্পলা প্রভৃতি নাবী তাঁদের স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। পুরুষদের মতই মেয়েরাও ব্রহ্মচর্য পালন কবতে পারত।

ঋগ্বৈদিক আর্যদেব মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। তবে বর্ণভেদ স্বীকার কবা

হত। গৌরবর্ণ আর্য এবং কৃষ্ণকায় অনার্য—দাস, নিষাদ। কিন্তু বর্ণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা বেশিদিন সম্ভব হয় নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর্য-অনার্যেব মধ্যে মিলন ও মিশ্রণ হতে থাকে। নানা ধরনের জীবিকা ও বৃত্তির উদ্ভব হয। তখন সমাজে বর্ণবিভাগের সার্থকতা থাকল না। সমাজে নতুন করে শ্রেণী বিন্যাসের দরকার হয়। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ, রাজন্য (ক্ষত্রিয়), বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের উল্লেখ আছে। সম্ভবত ঋগ্বৈদিক যুগের শেষের দিকে সমাজের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল। তবে এই বর্ণভেদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত হত না। বিভিন্ন বর্ণেব মধ্যে বিবাহ হত। ঋগ্বেদেই আছে, পিতা যজন, যাজন ও অধ্যাপনা করেন অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ, পুত্র বৈদ্য এবং কন্যা যবভর্জন-কারিণী। তাঁরা একই পরিবাবের। কিন্তু মনুর বিধান মানলে এ ক্ষেত্রে পিতা ব্রাহ্মণ, পুত্র শূদ্র এবং কন্যা বৈশ্যা। আর তাঁবা কখনই এক পরিবাবভূক্ত হতে পারবেন না। ব্রাহ্মণেব পুত্র বৈদ্য হলে তিনি সমাজে পতিত বলে গণ্য হবেন। মনুসংহিতা লেখা হযেছিল ঋগ্বেদের অনেকটা পবেই। তখন জন্মসূত্রে জাতি নির্ধাবিত হচ্ছে। ঋগ্বেদের আমলে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ ছিল কর্মভেদ অনুসারে। গীতায যেমন বলা হয়েছে—''চাতুর্ব্বর্ণ্যং মযা সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'—গুণ ও কর্মেব বিভাগ অনুসাবে আমি বর্ণ চতুষ্টয় সৃষ্টি করেছি—ঋগ্বেদীয় জাতিভেদ ছিল সেই রকমই।

আর্য সমাজে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানের চল ছিল। বিবাহের সময় যজ্ঞের আগুন জ্বেলে, অগ্নিদেবতা সাক্ষী মেনে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ কবা হত। মৃত্যুর পব পাবলৌকিক ক্রিয়াকর্মেও বেদপাঠ কবা হত। মৃতদেহ দাহ কবা হত। সমাধি বা কবর দেওযাও হত। যাগযজ্ঞের সময এক বিশেষ উৎসবে রাজা এবং ধনী গৃহস্থরা দান-ধ্যান করতেন।

রথ চালনার প্রতিযোগিতা, শিকাব, দাবা ও পাশাখেলা, নৃত্যগীত-বীণাবাদন ছিল আমোদ-প্রমোদের প্রধান অঙ্গ। জুয়া খেলার নিন্দা করা হলেও জুয়া খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল। অধ্যাপক কীথ বলছেন—নাটকের অভিনয়ও সেযুগে অজানা ছিল না।

বেশভূষায়, আহারে এবং আমোদ-প্রমোদে আর্যদের জীবনে আড়ম্বর ছিল না। সূতি, রেশম ও পশমের কাপড় এবং গহনাব ব্যবহাব ছিল। দেহের উপর অংশে উত্তরীয়' নিম্ন অংশে 'নীবি' পরা হত। এ ছাড়া অধিবাস ও পরিধেয় ব্যবহার করা হত। নারী-পুরুষ সকলেই গহনা পরত। মাথায় 'উষ্ণীষ' পরা হত। মেয়েরা নানা ছাঁদে চুল বাঁধত।

আর্য গৃহস্থ প্রতিদিন আহারের সময় আহার্যসামগ্রী দেবতাকে নিবেদন কবে তারপরে আহার কবত। যব, শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ, মাংস, খাওয়া হত। দুধ এবং দুধ দিয়ে তৈরি খাদ্য, মধু এবং পিঠা আর্যদেব খুব প্রিয় ছিল। যাগযজ্ঞ ও উৎসবে সোমরস এবং সুরা নামে মাদক পান করা হত। আর্যরা যখন প্রথম এদেশে এসেছিল তখন তাদের গোমাংস, অশ্বমাংস এবং মহিষমাংস খুবই প্রিয় ছিল। এমন কি তারা নরমাংসও খেত। পরবর্তীকালে প্রাগার্য সংস্কৃতির প্রভাবে ওই মাংস ভোজন তারা

ছেড়ে দেয়। মনুর বিধানে ওই সব মাংস নিষিদ্ধ মাংস হিসাবে চিহ্নিত হয়। হরপ্পীয়দের অনুসরণে বন্য বরাহ এবং বন্য কুক্কুট আর্যদেব ভোজন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

বৈদিক সংহিতার যুগে আর্যসভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক। ঋগ্বেদে নগরের কোন উল্লেখ নেই। 'পুর' শব্দটি দুর্গকে বোঝাত। সেযুগে যুদ্ধের সময় গ্রামের লোকরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করত। আর্যদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। তবে আর্যরা যখন প্রথম এদেশে আসে তখন পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। পরে তারা কৃষিকার্যে মন দেয়। লাঙল ও গরু দিয়ে জমি চাষ কবা হত। চাষের জন্য জলসেচ করা হত। প্রধান ফসল ছিল যব। গো-ধন ছিল আর্যদেব প্রধান সম্পদ। গৃহপালিত অন্যান্য পশুর মধ্যে ঘোড়া, ভেড়া, কুকুব প্রভৃতির উল্লেখ আছে। প্রতিটি গ্রামেই পশুচারণের জন্য একখণ্ড জমি থাকত।

সংহিতাব যুগে জমির মালিকানা সম্পর্কে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতভেদ আছে। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুবীব মতে বাস্তু এবং চাষেব জমিব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল। তবে পশুচারণক্ষেত্র গ্রামবাসীদের যৌথ অধিকাব ভুক্ত ছিল। অধ্যাপক কোশাম্বী মনে কবেন, এযুগে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। অন্যেরা বলেন, ঋগ্বৈদিক যুগের প্রথম দিকে জমি সব গ্রামবাসীর সাধাবণ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। পববর্তীকালে গ্রামেব পবিবাবগুলির মধ্যে জমি ভাগ-বাঁটোয়াবা কবে দেওযা হয। পবিবারের কর্তা হতেন জমিব মালিক।

ঋগ্বেদেব যুগে বিভিন্ন শিল্প এবং বৃত্তিব উদ্ভব হয়েছিল। জীবনযাপনেব জন্য প্রয়োজনীয জিনিসপত্র গ্রামেই উৎপন্ন হত। প্রাচীন আর্যবা কুটিরে বাস কবত। আর্যসমাজে সূত্রধর বা ছুতারমিস্ত্রীর বিশেষ সমাদব ছিল। কারণ সে চাষেব জন্য লাঙল এবং যানবাহন ও যুদ্ধের জন্য বথ তৈবি কবত। কামার, কুমোর, তাঁতী, সোনা ও ব্রোঞ্জের কারিগব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন কবত। মুচি এবং কসাই-এর বৃত্তিও ছিল। যজন-যাজনের জন্য পুবোহিত, যুদ্ধেব জন্য সৈনিক, চিকিৎসার জন্য বৈদ্য প্রভৃতি বৃত্তিও প্রচলিত ছিল। বৈদিক সভ্যতাব এই বিশাল সমাজ ব্যবস্থার অনেকটাই হরপ্পা সভ্যতার অবদান। আগেই আলোচনা কবা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে হরপ্পা-সংস্কৃতি, হবপ্পীয় সামাজিক বীতিনীতি চালু ছিল তারই অধিকাংশ বজায় ছিল বৈদিক সভ্যতার আমলেও। বৈদিক সাহিত্য যে সব সমাজ ব্যবস্থার কথা বলেছে তার অধিকাংশই ভাবতবর্ষেব সমাজজীবনে চালু ছিল হরপ্পা সভ্যতাব আমল থেকেই।

হরপ্পীযবা ছিল বণিকেব জাত। হরপ্পা সভ্যতার বমবমার মূলে ছিল তাদের বহির্বাণিজ্য লব্ধ বিপুল সম্পদ এবং উন্নত কৃষিব্যবস্থা। এই কৃষি ব্যবস্থা অনেকটাই ধ্বংস পেয়েছি ল আর্যদের হাতে এবং এদের বহির্বাণিজ্য একেবারে বন্ধই হয়ে গিযেছিল আর্যদের বর্বরতায়। কিছুকাল পবে কৃষি ব্যবস্থাব স্বাভাবিক তথা পূর্বরূপ বহুলাংশে ফিরে এলেও, বৈদিক আমলে বহির্বাণিজ্য পুরোপুবি বন্ধই হয়ে যায়। প্রখ্যাত

ভারতীয় ঐতিহাসিক অধ্যাপক ব্যাসামের মতে, ঋগ্বেদের যুগে নিয়মিত ব্যবসায়ী এবং মহাজন সম্প্রদায় ছিল না। তবে দেশের ভিতর কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বিনিময় প্রথায় ব্যবসা হত। বিনিময়ের জন্য গাইগরু এবং ষাঁড় ব্যবহৃত হত। স্থল এবং জল দুই পথেই বাণিজ্য চলত। বৈদেশিক বাণিজ্যও কিছুটা ছিল। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। পণি নামে এক সম্প্রদায় এই বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। ঋগ্বেদের যুগে রৌপ্যমুদ্রার চল ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য 'মনা' এবং 'নিষ্ক' নামে মুদ্রা অথবা স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহার করা হত। জলপথের জন্য নৌকার ব্যবহার ছিল। ঋগ্বেদে একশ দাঁড় বিশিষ্ট নৌকার উল্লেখ আছে। আকাশযানের উল্লেখও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদেব যুগেই সমাজে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ প্রকট হয়ে উঠেছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে 'ক্ষুধা' ও 'ভিক্ষু' শব্দের উল্লেখ আছে। দরিদ্রকে অন্নদানেব জন্য ধনীকে উপদেশ দেওযা হয়েছে।

ঋগ্বেদেব স্তোত্রগুলির মধ্যে বৈদিক আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের পবিচয পাওযা যায। ধর্ম ছিল সহজ ও সরল। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি ও রূপকে দেবতা কল্পনা করে তাদেব উপাসনা কবা হত। দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞ করা হত। যজ্ঞেব জন্য বিশেষ ধবনেব বেদী তৈবি করা হত। পুবোহিত মন্ত্র পাঠ কবতেন। যজ্ঞে ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, যব ও সোমবস ইত্যাদি আহুতি হিসাবে ব্যবহৃত হত। যজ্ঞেব জন্য পশুবলি দেওযা হত। ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আকাশেব দেবতা দ্যৌঃ, জলেব দেবতা বরুণ, বৃষ্টিব দেবতা পর্জন্য, বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বায়ুর দেবতা মরুৎ, আলোব দেবতা মিত্র বা সূর্য, তেজের দেবতা অগ্নি। বিদ্যার দেবী বাক্, প্রভাতেব দেবী উষা এবং পৃথিবী প্রভৃতি দেবীর উল্লেখও আছে। পানীয় সোম এবং সরস্বতী নদীকেও দেবতারূপে কল্পনা করে তাদের স্তুতিপাঠ করা হত। নানা দেবদেবীর উপাসনা কবা হলেও এই যুগে মূর্তিপূজাব চল ছিল না। কিছু নাবী দেবতা থাকলেও ঋগ্বেদে পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য।

প্রাচীন যুগে আর্যদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গ্রাম। কয়েকটি কুল নিয়ে গ্রাম গড়া হত। কুলের কর্তাকে বলা হত 'কুলপ' অর্থাৎ কুলপতি। গ্রামের কর্তাকে বলা হত 'গ্রামণী'। কযেকটি গ্রাম নিয়ে গড়া হত একটি 'বিশ' বা 'জন'। বিশ-এব কর্তাকে বলা হত 'বিশপতি' এবং জনের কর্তাকে বলা হত 'গোপ'। ঋগ্বেদে ভরত, পুরু, অনু, দ্রুহ্যু এবং দুর্বাসা এই পাঁচটি জনেব উল্লেখ আছে। জনগুলিব মধ্যে প্রাধান্য লাভেব জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হত। একটি যুদ্ধের ফলে ভরত-জন সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে এবং তাদেরই নামে দেশের নাম হয় ভারত। অনেক সময় 'জন'-এর অধিপতি গোপ 'রাজন' (রাজা)-এর পদলাভ করতেন।

সংহিতার যুগে রাজতন্ত্র ছিল প্রচলিত শাসনব্যবস্থা। তবে রাজাবিহীন শাসনব্যবস্থাও ছিল। এই রকম ব্যবস্থাকে বলা হত 'গণ'। 'গণ'-এর প্রধানকে বলা হত 'গণপতি'।

রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। রাজ্যেব বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে গড়া হত 'সভা' এবং জনগণকে নিয়ে গড়া হত 'সমিতি'। সভা-সমিতির পবামর্শ নিয়ে রাজা রাজ্যশাসন করতেন। এই সংস্থা দুটির গঠন প্রকৃতি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলেন, সভা গ্রাম্য পরিষদ এবং সমিতি জন পবিষদ। রোমিলা থাপাব মনে কবেন, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমিতিগুলি খুবই শক্তিশালী ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শক্তিশালী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পৃথিবীতে সর্ব প্রথম চালু করেছিল হরপ্পা সভ্যতাব অনার্য অধিবাসীবাই। বৈদিক সমাজ সেই ব্যবস্থা চালু রেখেছিল। আগেই বলেছি, আর্যদের মধ্যে রাজতন্ত্র ছিল না। পরবর্তীকালে 'অসুরদের' দেখে আর্যরাও রাজতন্ত্র চালু করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটাও তাদের সৃষ্টি নয়। এই ব্যবস্থা বৈদিক সভ্যতার বহু আগেই চালু কবেছিল হবপ্পাব অনার্যরা।

গ্রামণী, সেনানী ও পুবোহিত ছিলেন প্রধান বাজকর্মচাবী। সেনাবাহিনীব পদাতিক, বথী এবং অশ্বাবোহী সৈন্য থাকত। ঋগ্বেদে চলমান দুর্গেব উল্লেখ আছে। তীব-ধনুক, কুঠাব, তববাবি ও বর্শা ছিল সে যুগেব প্রধান অস্ত্রশস্ত্র।

ঋগ্বেদে কর হিসাবে 'বলি' শব্দেব উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদেব 'ধর্ম' শব্দটি আইন বা প্রচলিত প্রথাকে বোঝায়। বাজা ধর্ম অনুযায়ী বিচাব কবতেন। বিচারেব কাজে 'সভা' বাজাকে সাহায্য কবত। গ্রামে বিচাবেব কাজ কবতেন 'গ্রামবাদিন'। যিনি সালিশী বা মধ্যস্থতা কবতেন তাঁকে বলা হত 'মধ্যমাসি'। যাবা অপবাধীদেব ধবে আনত, তাদেব বলা হত 'উগ্র'। শাস্তি হিসাবে জবিমানা কবা হত।

ঋগ্বেদীয় যুগেব পববর্তীকালে সমাজ-ব্যবস্থায়, ধর্মীয় আচাব-আচবণে, কৃষিকাজে অনেক পবিবর্তন আসে। এই সময হবপ্পা সংস্কৃতি সমাজজীবনে পুনবায ফিবে আসে। উপনিষদেব মত উন্নত দার্শনিক চিন্তাধাবাব বিকাশ ঘটে এই সময। বিশ্বেব সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে উপনিষদগুলির মধ্যে। উপনিষদগুলিব অধিকাংশই এই সময়ে রচিত হয়। হবপ্পা সংস্কৃতিব সঙ্গে আর্য সংস্কৃতিব পূর্ণ সংশ্লেষণ কাল হল এই সময়টা। এব থেকে হিন্দুধর্মেব উদ্ভব হয পরিপূর্ণভাবে। এই হিন্দুধর্মেব শতকবা পঁচাত্তব ভাগ উপাদান আসে হবপ্পা সংস্কৃতি থেকে এবং বাকী পঁচিশ ভাগ নেওযা হয় আর্য সংস্কৃতি থেকে। আর্যদেব সাংস্কৃতিক পবাজয ঘটে। তাবা মেনে নিতে বাধ্য হয প্রাগার্য তথা হবপ্পা সংস্কৃতিব এই প্রাধান্য।

ঋগ্বেদের পববর্তী যুগে আর্যদেব সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, বাষ্ট্রব্যবস্থা সব কিছুতেই বেশ পবিবর্তন হয। এই যুগেব ইতিহাস বচনাব উপাদান হল সাম, যজু, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ, আবণ্যক ও উপনিষদ এবং সূত্রসাহিত্য। এই যুগেব পবিবার ছিল সমাজব্যবস্থাব ভিত্তি। দু-তিন পুরুষ একত্রে একান্নবর্তী পরিবাবে বাস কবত। পুত্র-সন্তানহীন ব্যক্তি দত্তকপুত্র নিতে পারত। মেয়েদেব শিক্ষাব অধিকার ছিল। এই যুগেও গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদূষী নারীর উল্লেখ আছে। ধর্মানুষ্ঠানে এই যুগেব নাবী পুরুষেব সহধর্মিণী হত। তবুও এই যুগে নাবীব মর্যাদা কমে গিয়েছিল। কন্যার জন্ম হলে গৃহস্থ শোক

প্রকাশ করত। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছিল। মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত।

এই যুগে বৃত্তি হিসাবে চারটি বর্ণের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্মণদের বৃত্তি হল যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি হল রাজ্য রক্ষা ও প্রজাশাসন। বৈশ্যের বৃত্তি হল কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন এবং শিল্পকর্ম। আর যুদ্ধে পরাজিত আর্য এবং অনার্য, যারা দাস রূপে সমাজে স্থান পেয়েছিল, তাদের বলা হল শূদ্র। শূদ্রের বৃত্তি হল অপর তিন বর্ণের সেবা করা।

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে জানা যায় যে, এই যুগে আর্যদের ব্যক্তি জীবন চারটি 'আশ্রম' বা পর্যায়ে বিভক্ত হত। আশ্রমগুলির নাম যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং যতি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের ছেলেদের 'উপনয়ন' হত। তারপর তারা গুরুগৃহে থাকত এবং বিদ্যাভ্যাস করত। বিদ্যাশিক্ষা শেষ হলে আর্যযুবক বিবাহ করত এবং গার্হস্থ্য আশ্রমে পরিবার প্রতিপালন করত। প্রৌঢ় বয়সে একা অথবা সস্ত্রীক বনবাসী হয়ে বানপ্রস্থ আশ্রমে তপস্বী জীবন যাপন করত। তারপর বৃদ্ধ বয়সে আর্যপুরুষ শেষ আশ্রমে যতি বা সন্ন্যাসী হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাত। কেউ-বা তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত।

ঋগ্বেদের যুগে দাসের স্থান সমাজের নিচু স্তরে ছিল কিন্তু তারা অস্পৃশ্য ছিল না। যজ্ঞের কাজে তারা অংশ নিতে পারত। কিন্তু এই যুগে বৃত্তিমূলক বর্ণভেদ ক্রমে জাতিভেদ হয়ে ওঠায় অস্পৃশ্যতার সূচনা হয়। শূদ্রকে অশুচি মনে করা হত। অগ্নি দেবতার নৈবেদ্য কোন শূদ্রকে স্পর্শ করতে দেওয়া হত না। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে ছুতারকেও অশুচি বলা হয়েছে।

এই সময়ই সংহিতাগুলি রচিত হয় বিশেষ করে 'মনু সংহিতা'। সংহিতাগুলি সামাজিক আইন-কানুন নির্ধারণ করে দিত। সংহিতাগুলির মধ্যে আদি সংহিতা হল মনু সংহিতা। এই সংহিতার বিধান ধীরে ধীরে সবারই মান্য হয়ে পড়ে। মনুর বিধানে এই সেদিনও ভারতবর্ষের সামাজিক আইন-কানুন নিয়ন্ত্রিত হত। এই আধুনিক যুগে এসেও একালের অনেক আইনে আমরা মনুর বিধান অনুসরণ করে চলেছি। এই সময় এবং এর কিছুটা পরে মোট কুড়িটি সংহিতা রচিত হয়। এগুলি হল : (১) মনু সংহিতা, (২) অত্রি সংহিতা, (৩) বিষ্ণু সংহিতা (৪) হারীত সংহিতা, (৫) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, (৬) উশনা সংহিতা (৭) আঙ্গিরা সংহিতা, (৮) যম সংহিতা (৯) আপস্তম্ব সংহিতা (১০) সম্বর্ত সংহিতা, (১১) কাত্যায়ন সংহিতা, (১২) বৃহস্পতি সংহিতা, (১৩) পরাশর সংহিতা, (১৪) ব্যাস সংহিতা, (১৫) শঙ্খ সংহিতা, (১৬) লিখিত সংহিতা, (১৭) দক্ষ সংহিতা, (১৮) গৌতম সংহিতা, (১৯) শাতাতপ সংহিতা এবং (২০) বশিষ্ঠ সংহিতা। এই কুড়িটি সংহিতার মধ্যে মনু সংহিতাই সবার আদি সংহিতা এবং সব সংহিতাই মোটামুটিভাবে মনুর বিধানগুলি মেনে নিয়েছে। উপনিষদীয় কাল থেকেই সংহিতাসমূহ হিন্দুদের তথা ভারতবর্ষের সমাজজীবন, ধর্ম

জীবন, অনুশাসন ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ করেছে ২৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

সংহিতাগুলির মধ্যে মনুসংহিতাই প্রধান। এই সংহিতার নির্দেশেই শাস্ত্রনিষ্ঠ হিন্দু মানবগোষ্ঠী তাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। মনু সংহিতাব বিধিনিষেধ ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত দেশ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, কি ধর্মেকর্মে — সর্বত্র মনুসংহিতার নির্দেশ এককালে অপরিহার্য হিসাবে স্বীকৃত ছিল। মনুসংহিতাকে বলা হয় সর্ববেদেব সার সংগ্রহ এবং বেদমূলক ধর্ম সংহিতাগুলির মধ্যে এব প্রামাণ্য সর্বাধিক। তাই প্রত্যক্ষ বেদ-বিরুদ্ধ স্মৃতি যেমন অনুসরণীয় নয়, তেমনি মনু-স্মৃতির সঙ্গে যার বিরোধ হয় সেই স্মৃতিও আদরণীয় নয়। ফলে, বাকী ১৯টি সংহিতা মোটামুটিভাবে মনুসংহিতাকেই অনুসবণ কবেছে। আর এই সংহিতাগুলিতে প্রকট হয়েছে জাতিভেদ, জন্মসূত্রে জাতিত্ব, অস্পৃশ্যতা, নারীব পবাধীনতা ও সম্পত্তিব অধিকার থেকে বঞ্চিত হওযা ইত্যাদি। মনুসংহিতার জাতিভেদ এতই কট্টব এবং হাস্যকর যে, মনু মড়াবও জাতিবিচাব কবে নগবেব কোন্ দ্বার দিয়ে কোন্ জাতেব মৃতদেহ বাইবে নিযে যাওযা হবে তাব নির্দেশ কবেছেন। জন্মসূত্রে জাতি নির্ণযেব বিধান দিয়ে কর্মানুসারে জাতি নির্ণযের সুন্দব ঋগ্বেদীয ব্যবস্থাটা তিনি নষ্ট কবে দিযেছেন। অস্পৃশ্যতাব বিধান, সমাজে নাবীব স্থানেব অবনমন ইত্যাদির মধ্য দিযে তিনি ঋগ্বেদোত্তর সমাজের অগ্রগমন যথেষ্ট ব্যাহত কবেছেন। তবে বলা হয, জাতীয জীবনকে সুসংহত, সংযত, সৎ ও সমৃদ্ধ কবে তুলতে সংহিতাব নির্দেশগুলি যথেষ্ট কার্যকব ছিল। দেশ ও কালেব ভিন্নতাতেই বচিত হযেছে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা। বেদকে 'শ্রুতি' বলা হয বলেই সংহিতাগুলিকে বলা হয 'স্মৃতি'।

ঋগ্বৈদিক যুগেব তুলনায পরবর্তী বৈদিক যুগেব অর্থনীতি বেশ উন্নত হযেছিল। আর্যবা প্রধানত গ্রামে বাস করলেও, ক্রমে ক্রমে নগব গড়ে উঠেছিল। জমিতে পাবিবাবিক মালিকানা চালু হযেছিল। ক্রমে এক অভিজাত শ্রেণীব উদ্ভব হয। তাবা জমির মালিকানা ভোগ করত, কিন্তু নিজেরা চাষ করত না। দাসদেব জমি চাষের কাজে নিযুক্ত কবত।

এই যুগে চাষের কাজে সার ও সেচের ব্যবস্থা বেড়েছিল। যব ও ধান চাষের সঙ্গে এই যুগে গমের চাষ শুরু হয়। শুক্ল যজুর্বেদে গোধূম (গম), ব্রীহি (চাল), যব, মাস, তিল, মুগ, মুসুর প্রভৃতি শস্যেব উল্লেখ আছে। লাঙলের আকার ও ওজন আগেকার তুলনায বেশি হত। এই সময় এক সঙ্গে চব্বিশটি বলদে টানা লাঙলের উল্লেখ পাওযা গেছে। অথর্ববেদে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আছে। সেচের জন্য খাল খননের উল্লেখ আছে। চাষবাসে নানাপ্রকার উপদ্রব দেখা দিত। উপনিযদে পঙ্গপালের উল্লেখ আছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি চাষের ক্ষতি করত। চাষবাসের সঙ্গে পশুপালনও জীবিকার অঙ্গ ছিল। চাষের কাজেব জন্য মহিষ এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে হাতি পোষার চল হয়। মুরগি এবং শূকর পালনও শুরু হয।

এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের বলা হত 'বণিক'।

বণিকের কাজ বংশানুক্রমিক হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 'শ্রেষ্ঠী' অর্থাৎ বড় ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। এই যুগের সাহিত্যে সমুদ্রের উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, চামড়া ও ঔষধের নাম পাওয়া যায়। সুদে টাকা খাটানো এই যুগে একটা লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছিল। শ্রেষ্ঠীরা মিলিত হয়ে 'গণ' বা 'সঙ্ঘ' গঠন কবত।

শিল্পেরও বেশ উন্নতি হয়েছিল। সোনা, তামা, ব্রোঞ্জ ছাড়াও লোহা, সীসা, টিন প্রভৃতি ধাতুব ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। শিল্প উৎপাদনে শ্রমবিভাগ প্রচলিত হয়েছিল। নানাপ্রকার বৃত্তির প্রচলন হয়েছিল। রজক, পাচক, গণৎকার, পেশাদার মল্ল প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগেব প্রথম দিকে রাজা ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক। তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। অভিষেকের সময়, রাজা শপথ নিতেন 'তিনি সকলকে পালন করবেন, ভয় হতে রক্ষা করবেন, স্বেচ্ছাচাবী হবেন না।' কিন্তু ক্রমে বাজাব ক্ষমতা বাডতে থাকে। শতপথে ব্রাহ্মণে বাজাব 'দৈব অধিকাব' (Divine Right) স্বীকার কবা হযেছে। বাজা অপরকে দণ্ড দেবেন, কিন্তু নিজে দণ্ডনীয় হবেন না। এব ফলে রাজশক্তি প্রায় নিবঙ্কুশ হয়ে যায। সভা-সমিতিব ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পায়। রাজাদের মধ্যে একবাট, সম্রাট, রাজচক্রবর্তী হওযার ঝোঁক দেখা যায। এই উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে বাজসূয, বাজপেয, এবং অশ্বমেধ যজ্ঞেব বিধান দেওযা হয। এইসব যজ্ঞ কবে বিজযী বাজা নিজেব সার্বভৌম অধিকার ঘোষণা কবতেন।

রাজ্যেব আযতন বৃদ্ধিব ফলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাব সূচনা হযেছিল। এজন্য "স্থপতি" ও "শতপতি" নামে দুই শ্রেণীব রাজকর্মচাবী নিযুক্ত হত। স্থপতিকে সীমান্ত অঞ্চলের দায়িত্ব দেওযা হত। শতপতিকে দেওয়া হত একশোটি গ্রামেব ভার। "অধিকর্তা" নামে এক গ্রামীণ কর্মচাবী নিযুক্ত হত। রাজা নিজে তাকে নিযোগ কবতেন। বৈদিক সাহিত্যে আবও কয়েকজন বাজকর্মচারীব উল্লেখ পাওযা যায। এদের মধ্যে ভাগদুখ (কব আদাযকাবী), সংগ্রহিত্রী (রাজকোষাধ্যক্ষ), অক্ষবাপ (জুয়াখেলার অধ্যক্ষ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক এই সব রীতিনীতিব বেশির ভাগই হরপ্পা সভ্যতাব অবদান। সংস্কৃতির সংশ্লেষণের ফলে এইসব রীতিনীতি বিধি-ব্যবস্থা চলে আসে ঋগ্বেদের যুগে। আর্যরাও তখন আর খাঁটি নর্ডিক নবগোষ্ঠী নেই। অনার্য 'বধূ'-দেব সঙ্গে রক্তেব সংমিশ্রণে তাদেখ উত্তবসূরিরা হারিযে ফেলেছে তাদের খাঁটি নর্ডিকত্ব তথা আর্যত্ব। উত্তর ঋগ্বেদের যুগে আর্যাবর্তেব অধিবাসীদেব আর কোনও ভাবেই আর্য বলা যায় না। তারা তখন এক মিশ্র জাতি। আর এই মিশ্র জাতি তাদের ভাবতীয় আর্য সংস্কৃতি নিয়ে প্রবল উন্নতি করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দার্শনিক চিন্তায়, রাজনীতিতে এবং প্রশাসনে।

সূত্র সাহিত্য থেকে জানা যায়, বিভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি, জনপদ ও শ্রেণীসমূহ নিজেদের

জন্য আইন প্রণয়ন করতে পাবত। গৌতমের ধর্মসূত্র থেকে জানা যায়, কৃষিজাত ফসলের উপর ছয় ভাগেব এক ভাগ থেকে দশভাগের এক ভাগ কর ধার্য কবা হত। কাবিগরেবা মাসে একদিনেব শ্রম কব হিসাবে দিত। ফলমূল, মধু, মাংস, ঘাস এবং জ্বালানী কাঠের উপব যাট ভাগেব এক ভাগ কব দিতে হত। পণ্যদ্রব্যের উপর করের পরিমাণ ছিল পাঁচ শতাংশ। গরু এবং সোনাব জন্য শতকবা দুইভাগ কর ধার্য হত।

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈদিক আর্যবা বিশেষ উন্নতি লাভ কবেছিল। জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভেষজ বিজ্ঞানে আর্যদেব কৃতিত্ব অসাধাবণ। চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়ে আর্যদেব বিশেষ জ্ঞান ছিল। আর্যদেব কালগণনা পদ্ধতি বিশদ এবং নিখুঁত। বৎসরকে বারোমাসে এবং মাসকে ত্রিশদিনে ভাগে কবা হয়েছিল। শুল্বসূত্র আর্যদেব গণিত এবং জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রবল পাবদর্শিতা প্রমাণ কবে। সেকালেব বৈদ্যরা তখনকার প্রচলিত রোগেব প্রতিকার জানতেন। নিবাময়েব জন্য জল-চিকিৎসাও কবা হত। অথর্ববেদে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা বিযয়েব উল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগেব শেষেব দিকে যাগ-যজ্ঞেব আড়ম্বব বেড়ে যায। ক্রিয়া-কর্ম জটিল হয়ে পড়ে। যজ্ঞ কবতে হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি একাধিক পুরোহিত লাগত। এব ফলে সমাজে পুবোহিতদেব প্রতিপত্তি বিশেযভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেবতাদেব প্রাধান্য এবং মর্যাদাব পবিবর্তনও এই যুগে দেখা যায। যজ্ঞকে দেবতাদেবও উপবে স্থান দেওযা হযেছিল। ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্যেব পবিবর্তে প্রজাপতি, রুদ্র এবং বিষ্ণু প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। অথর্ববেদ থেকে জানা যায—এই যুগে নাগ গন্ধর্ব, অপ্সবা প্রভৃতিব উপব দেবত্ব আবোপ কবা হয়েছিল এবং নানা উপদেবতাব উদ্ভব হযেছিল।

দার্শনিক চিন্তাব ক্ষেত্রে এই যুগে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। ঋগ্বেদেব যুগে একেশ্বব বাদের অস্পষ্ট ধাবণা ছিল। এই যুগে তা আবও স্পষ্ট হয। অবতাববাদের সূচনাও হয এই যুগে। 'কর্মফল'-এব ধাবণা এই যুগেই সৃষ্টি হয। বৃহদাবণ্যক উপনিষদে বলা হযেছে মৃত্যুর পবও আত্মাব বিনাশ হয না। 'তৎ, ত্বম্, অসি এবং আত্মা আনন্দময, ব্রহ্ম আনন্দময' উপনিষদেব এই বাণীতে মানব মনীযাব চবম মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। আগেই বলেছি, উপনিষদসমূহেব দার্শনিক ব্যঞ্জনা তুলনাহীন। পৃথিবীর সব ধর্মের যত বকম দার্শনিক চিন্তা আছে, সেগুলিব সবাব সেবা হল উপনিষদীয় দার্শনিক ভাবনা। বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হল উপনিষদেব উপদেশসমূহ। 'গীতা' হল সেই উপনিষদসমূহের সাব সংকলন। ভাবতীয় দার্শনিক চিন্তাব আত্মপ্রকাশ ঘটেছে চারটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঃ (১) প্রাকৃতিক শক্তিব ওপব দেবত্ব আবোপ, (২) একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তিরূপে গ্রহণ, (৩) জ্ঞানমার্গে মুক্তিব অন্বেষণ ও (৪) ভক্তিমার্গে মুক্তির অন্বেষণ। বেদেব সংহিতা অংশে আছে বহু দেবতাবাদ, উপনিষদে আছে সর্বেশ্ববাদ, ষড়দর্শনেব যুগে আসে জ্ঞানমার্গে মুক্তিবাদ

এবং সর্বশেষে পুরাণের যুগে আসে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে ভিত্তি করে ভক্তিবাদ। গীতা প্রচাব করে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়বাদ। বৈদিক দেবতাদের কথা বাদ দিলে বাকী তিনটি চিন্তাধারাব মূলে আছে হরপ্পার সংস্কৃতি। বিশেষ করে পৌরাণিক দেবদেবীর অধিকাংশই এসেছে হরপ্পীয় সংস্কৃতি থেকে। ভারতীয় আর্য সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল এব উপনিষদ সমূহ। উপনিষদের সংখ্যা ১০৮টি বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন উপনিষদ হল ১২টি। যথা — (১) ঈশ (২) ঐতবেয়, (৩) কৌষীতকি, (৪) তৈত্তিরীয়, (৫) বৃহদারণ্যক (৬) ছান্দোগ্য, (৭) কেন, (৮) কঠ, (৯) শ্বেতাশ্বতর, (১০) মুণ্ডক, (১১) প্রশ্ন ও (১২) মাণ্ডূক্য। উপনিষদগুলির বয়স ২৩০০ থেকে ২৮০০ বছর। এগুলির বচযিতা মহীদাস, রৈবক, শাণ্ডিল্য, সত্যকাম, জাবালি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, ভরদ্বাজ, গার্গায়ন, প্রতর্দন, বালাকি, অজাতশত্রু, বরুণ, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশই কিন্তু খাঁটি আর্য নন এবং এঁদেব মধ্যে কযেকজনেব পিতৃপরিচয পাওযা যায় না। শ্রী অববিন্দ বলেছেন, 'ভারতের অধ্যাত্ম উপলব্ধিব শেষ কথা ঋষিগণ এই উপনিষদ মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত কবেছেন। উপনিযদসমূহ বিশ্বেব সর্বকালেব সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান।'

এই সময ভারতীয় আর্যসভ্যতা ভাবতবর্ষেব অভ্যন্তবে ক্রমশ বিস্তাব লাভ কবে। যদিও অনার্য হবপ্পীয সংস্কৃতিব অনেকটাই এই যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও নবোপলীয সভ্যতাব অনেকটাই আজও রয়েছে গেছে প্রাচীন আদি-অস্ট্রেলীয়দেব উত্তবসূবিদেব মধ্যে। ভারতের সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে আর্যবা ক্রমশ ভাবতেব অভ্যন্তবে বসতি বিস্তার করতে থাকে। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীব মধ্যবর্তী অঞ্চলে আর্যবসতি বিস্তৃত হয়। আর্যবা এই অঞ্চলেব নাম দেয 'ব্রহ্মাবর্ত'। ক্রমে আর্যবা গঙ্গাযমুনাব অববাহিকায় কুরু (দিল্লি), শূরসেন (মথুবা), মৎস্য (জযপুব) এবং পাঞ্চাল (গঙ্গা যমুনাব মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল) এলাকায় বসতি বিস্তার করে। এই অঞ্চলের নাম হয় 'ব্রহ্মর্ষি দেশ'। বেদের ব্রাহ্মণ অংশ রচনার সময় আর্যসংস্কৃতিব পীঠস্থান ছিল 'মধ্যদেশ'। মনুসংহিতার মতে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে বিনশন (পাতিয়ালা) এবং পূর্বে প্রয়াগের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে মধ্যদেশ বলা হত। কালক্রমে কোশল (অযোধ্যা), বৎস (প্রযাগ), কাশী (বারাণসী) এবং বিদেহ (উত্তব বিহার) আর্যদের অধিকারভুক্ত হয়। মগধ (দক্ষিণ বিহার) এবং বঙ্গদেশে আর্যরা বহুকাল পরে প্রবেশ করে।

অঙ্গিরা, কণ্ব, গৌতম, ভৃগু, মেধাতিথি প্রভৃতি বহু বৈদিক ঋষি পূর্বদেশীয় ছিলেন। মহাভাবতের যুগে আর্যসভ্যতা হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমগ্র অঞ্চল 'আর্যাবর্ত' নামে পরিচিত হয়। তবে মহাভারতের ঘটনা-কাল নিয়ে বিতর্ক আছে। এই ঘটনাকে অনেকে প্রাগার্য যুগের ঘটনা বলে নির্দেশ করেছেন।

রামাযণে দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক

যুগের শেষের দিকে আর্যরা পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম) এবং দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভ (বেরার), চেদী (বুন্দেল খণ্ড), অশ্মক ও মূলক (গোদাববী অববাহিকা) অঞ্চলে প্রবেশ করে। ঐতিহাসিক যুগে দক্ষিণ ভাবত আর্যদেব ধর্ম, ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করে।

দীর্ঘকাল ধবে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তাব হলেও ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যেবা বিলুপ্ত হয়নি। বহু অনার্য গোষ্ঠী আর্যসমাজে মিশে গেলেও, অন্য অনেক আদিবাসী নিজেদেব স্বাতন্ত্র্য বজায বেখেছে। বিন্ধ্য ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পুলিন্দ ও নিষাদ জাতির বংশধবেবা আজও বাস করে। পূর্বাঞ্চলে অনার্য আদিবাসীদেব বংশধব কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডারা আজও আছে। এরা আজও আর্য সভ্যতাব গণ্ডীর বাইবে বযেছে। এদেব প্রাচীন সংস্কৃতি কিন্তু এখানকাব মত এতো নিম্নমানেব ছিল না। পূর্বাঞ্চলেব বাঙলাব আদি অধিবাসীদের দিকে চোখ ফেবালে তা অনুভূত হয। নৃতাত্ত্বিকদেব মতে, বাঙলাব আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ভাযাভাষী আদি-অস্ট্রালদেব বংশধব হচ্ছে সাঁওতাল, লোধা, হো, জুযাং, শবর, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ। প্রাচীনকালে এদেব সভ্যতা যে এখনকাব মত নিম্নমানেব ছিল, তা নয। এটা গত চাবশ' বছবেব মধ্যে আমেবিকাব মাযা জাতিব ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা থেকে আমবা বুঝতে পাবি। স্পেনীযদেব হাতে যখন মাযা জাতি বিজিত হয়, তখন সমসামযিক ইউবোপীয সভ্যতাব তুলনায মাযা জাতিব সভ্যতা সমৃদ্ধিশালী ও বিস্ময়কব ছিল। তাবা প্রস্তবনির্মিত সৌধ ও সোপান বিশিষ্ট ত্রিতল মন্দিব তৈবি করত। তাদেব সুলিখিত সাহিত্য ছিল, এবং গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যায তাবা বিশেষ পাবদর্শী ছিল। কিন্তু মাযাজাতিব যেসব লোক স্পেনীযদেব অধীনতা স্বীকাব কবেনি এবং বনে-জঙ্গলে গিযে আশ্রয নিয়েছিল, তারা বর্তমানে দারিদ্র্যেব চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে দীর্ণ কুঁড়েঘব বাস কবে ও মাত্র ঘটপূজা কবে। অনুরূপভাবে প্রাচীনকালে 'মুণ্ডা' সভ্যতা এতো প্রভাবশালী ছিল যে আজকেব দিনেও ব্রাহ্মণ-শাসিত বাঙালি সমাজ সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পাবেনি। দুর্গাপূজাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নবপত্রিকার পূজা ও শববোৎসব, চড়ক, গাজন, লক্ষ্মীপূজাব ঝাঁপি, বৃক্ষপূজা, বৃযষষ্ঠ, আনুষ্ঠানিক কর্মে চাউল, কলা, হবিতকী, হলুদ, পান, সুপাবি, সিঁদুব, ঘট, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, আলপনা, গোময় প্রভৃতিব ব্যবহাব মুণ্ডা সংস্কৃতিব দান। এ প্রসঙ্গে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন,

"বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিযাদ গঠিত হয়েছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রাল, দ্রাবিড় ভাষাভাষী দ্রাবিড ও আর্য ভাষাভাষী আলপীয নবগোষ্ঠীদেব নিয়ে। এরা সকলেই বৈদিক আর্যগণেব পঞ্চনদের উপত্যকায় আসবাব আগেকার লোক। অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি অস্ট্রালরাই হচ্ছে বাঙলার আদিম অধিবাসী। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হ্যাডন (Hadon) বলেন যে, এক সময় তাদেব ব্যাপ্তি ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরেব সুদূরে ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। নৃতত্ত্ববিদগণ বলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩০,০০০ বৎসর সময়কালে আদি-অস্ট্রালবা সমুদ্রপথে ভাবত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে যায।

(কিভাবে তারা সমুদ্রপথে যেত, সে সম্বন্ধে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'নেচার' দেখুন ও হেয়েরডাহলের 'কন-টিকি' অভিযান তুলনা করুন)। বাঙলার পরে দ্রাবিড় ও আলপীয়রা এসে তাদের (আদি-অস্ট্রালদেব) সঙ্গে মিশে যায়। সুতরাং বাঙালি এক মিশ্র জাতি, যেরূপ মিশ্র জাতি হচ্ছে জগতেব আব সব জাতি। নৃতত্ত্ববিদগণ বলেন যে সারা জগতে একমাত্র একটি জাতিই বক্তেব বিশুদ্ধতা বহন কবে এবং তারা হচ্ছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীবা।"

সুতরাং পূর্বাঞ্চলের কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডারা আজ সভ্যতাব গণ্ডীর বাইবে থাকলেও ভারতীয় আর্য সভ্যতা তথা বৈদিক সভ্যতার আমলে এদেব কৃষ্টি এমন ছিল না। হরপ্পীয় সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের কৃষ্টি মিলন ঘটে বৈদিক সভ্যতার সৃষ্টি হলেও, এবা সম্ভবত এদের প্রাচীন কৃষ্টিই আঁকড়ে থাকে। নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে নানা কারণে তাল মেলাতে অসমর্থ হয়। তবে অন্যান্য কারণে এবা নিজেদেব প্রাচীন কৃষ্টিও সঠিকভাবে ধবে বাখতে পারে নি। যদিও এদেব প্রাচীন সংস্কৃতি বহুলাংশে সমৃদ্ধ কবেছে ভাবতীয় আর্যসভ্যতাকে, তবু এদেব সংস্কৃতির মান ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হয়েছে। যেমনটি হযেছে মায়াদের ক্ষেত্রে যারা বনে-জঙ্গলে পালিযে গিযেছিল খ্রীষ্টান সংস্কৃতি গ্রহণ কবার ভযে।

ভাবতীয় আর্য সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল লোহাব ব্যবহার। লোহা কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল কিংবা কে বা কাবা আবিষ্কাব করেছিল তা অজানা। তবে পণ্ডিতদেব মত হল, এই সময়ই ভারতবর্ষে লোহাব ব্যবহাব চালু হয। এই সমযটা ৩০০০ বছরের কিছুটা পূর্বে। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদেব মতে তাম্র-প্রস্তবযুগেব পব মানবসভ্যতায লৌহযুগেব সূচনা হয। মিতান্নিব আর্য বাজাবা লোহা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈবি কবাতেন। মিতান্নিদেব পবে হিট্টাইটবা লোহা উৎপাদনেব কৌশল শিখে নেয। মিতান্নিব আর্যদেব সঙ্গে বৈদিক আর্যদের কোন না কোন বকম সম্পর্ক ছিল। সুতবাং অনুমান করা যায, মিতান্নির আর্যদেব মাধ্যমে বৈদিক আর্যবাও লোহাব সঙ্গে পবিচিত হয়েছিলেন।

কিন্তু ঋগ্বেদেব যুগে লোহাব প্রচলন ছিল কি না সে বিযযে ঐতিহাসিকেবা একমত হতে পারেন নি। ঋগ্বেদে 'অয়স' নামে এক ধাতুব উল্লেখ আছে। সংস্কৃত ভাযায "অয়স" বলতে লোহা বোঝায়। সুতরাং সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, ঋগ্বেদের যুগে লোহার ব্যবহার ছিল। অপর পক্ষে অধ্যাপক ব্যাসাম প্রমুখেরা মনে করেন, ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'অয়স' ধাতু লৌহ নয়, ব্রোঞ্জ। তবে যজুর্বেদে "কৃষ্ণ অযস"-এর উল্লেখ আছে, সেই ধাতুটিকে লোহা বলে স্বীকার কবা যায়। অথর্ব বেদে উল্লিখিত তথ্যেব উপর নির্ভর করে ভারতীয ঐতিহাসিকেরা বলেন, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে উত্তর ভাবতে লোহার ব্যবহার ছিল। উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের নিকটবর্তী স্থানে এবং পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবি খনন কবে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকের নিকটবর্তী সময়ে লোহা ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

লোহার আবিষ্কার ও লোহার হাতিয়াব ব্যবহার শুরু হওয়ায় মানবসভ্যতাব

অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। লোহার হাতিয়ার দিয়ে বনজঙ্গল কেটে বসত ও কৃষিজমি হাসিল করা সহজ হয়েছিল। লোহার লাঙল দিয়ে জমি চাষেরও সুবিধা হয়েছিল। এর ফলে পশুচারণভিত্তিক মানবসমাজ কৃষিভিত্তিক সমাজে পবিণত হতে পেবেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে লোহা ব্যবহারের ফলে পূর্বভাবতে মানবজীবনে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায, ঋগ্বেদেব অন্তত তিনটি সূক্তে লৌহ ব্যবহারের কথা আছে। যেমন ঃ 'হে অগ্নি। আমরা রুশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করেছি। এবং জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে যাগার্থে প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহ কলসও গ্রহণ কবেছি।'' [৫ম মণ্ডল ঃ ৩০তম সূক্ত ঃ ১৫তম ঋক] এখানে 'রুশম' হল কান জনপদের বাসিন্দা। সায়ন তাঁর ব্যাখ্যায তেমনই বলেছেন। এই কান জনপদ সম্ভবত অনার্য তথা প্রাগার্যদের জনপদ এবং হরপ্পা সভ্যতাব কোন নগব। তাবা লোহার ব্যবহাব জানতো। ঋগ্বেদীয় আর্যরা তাদেব চাব হাজাব ধেনুই ছিনিযে নেয নি, তাদেব লৌহ কলসও নিয়ে নিয়েছে। এমনও হতে পাবে, হবপ্পা সভ্যতাব লোকজনেবা তাম্রাশ্ম সভ্যতাব শেষ পর্বে লোহাব ব্যবহাব শিখে ফেলেছিল এবং তাদেব কাছ থেকে লোহাব ব্যবহাব শিখেছিল আদি-আর্যবা। ঋগ্বেদে অন্ততঃ তিন জাযগায লৌহময় নগরের কথা আছে। এই নগবগুলি নিঃসন্দেহে হবপ্পা সভ্যতাব নগব। সুতবাং হবপ্পীযরা নিশ্চযই লোহাব ব্যবহার জেনেছিল, তা না হলে তাবা লৌহময নগব বানালো কী কবে। এটা একেবারে নির্জলা সত্যি যে, ঋগ্বেদেব আমলে আগন্তুক বর্বব আর্যবা নগব বা পুবী নির্মাণ করতে জানতো না। আগেই বলেছি 'পুবী' শব্দটা দ্রাবিড়ভাষাব শব্দ। সংস্কৃতে এব কোন প্রতিশব্দ নাই। পুবী, পুব, কূট ইত্যাদি নগববাচক শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকেই আর্যভাষায় এসেছে।

ঋগ্বেদ বলছে ঃ ''বাণ নিক্ষেপকাব যেরূপ নিজ বাণ নিক্ষেপ কবে, সেরূপ সে অগ্নি নিজ জ্বালাসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেন এবং যোদ্ধা যেরূপ লৌহময অস্ত্রেব ধাব শানিত করে, সেরূপ শিখা নিক্ষেপ সময়ে নিজ দীপ্তি সুতীক্ষ্ণ করেন এবং বৃক্ষের উপর অবস্থিত লঘুপতনসমর্থ পদবিশিষ্ট পক্ষীব ন্যায বিচিত্রভাবে গমন কবে বাত্রি অতিক্রম করেন অর্থাৎ ধীবে ধীবে অন্ধকার দূব কবেন।'' [৬ষ্ঠ মণ্ডল ঃ ৩য় সূক্ত ৫ম ঋক]।

আবার, ''হে ইন্দ্র! তুমি আমাকে সুখী কব। আমাব জীবন বৃদ্ধি করতে প্রসন্ন হও। লৌহময খড়্গ ধাবার ন্যায আমাব বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ কব। তোমাকে প্রসন্ন কবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমি যা কিছু উচ্চাবণ করছি সে সকল গ্রহণ কর। দেবগণ যেন আমাকে রক্ষা করেন। [৬ষ্ঠ মণ্ডল ঃ ৪৭তম সূক্ত ঃ ১০ম ঋক]।

লৌহময় পুরীর কথা ঋগ্বেদেব যে তিনটি সূক্তে বলা হয়েছে সেগুলি হল ঃ

'' হে অগ্নি! আমরা যেরূপ গব্য ও ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা তোমাদের স্বাহা দান করব, হে অগ্নি! তুমিও সেরূপ সে অমিত তেজবলে অপরিমিত অয়োনির্মিত [লৌহ

নির্মিত] নগরী দ্বারা আমাদের রক্ষা কর।" [৭ম মণ্ডল ঃ ৩য় সূক্ত ঃ ৭ম ঋক]।

"তুমি অপ্রতিধর্ষণীয়, এক্ষণে তুমি আমাদের নরগণের রক্ষার্থে মহতী অয়োনির্মিত [লৌহ নির্মিত] শতগুণাপুরী হও।" [৭ম মণ্ডল ঃ ১৫তম সূক্ত ঃ ১৪তম ঋক]।

"এ সরস্বতী অয়োনির্মিত [লৌহ নির্মিত] পুরীর ন্যায় ধারয়িত্রী হয়ে ধারক উদকের সাথে প্রবাহিতা হচ্ছেন। তিনি অন্য সমস্ত স্যন্দনশীল জলকে মহিমাদ্বারা বাধা প্রদান করে পথের ন্যায় গমন করছেন।" [৭ম মণ্ডল ঃ ৯৫ তম সূক্ত ঃ ১ম ঋক]। আর্যরা হরপ্পীয়দের লৌহময় পুরী ধ্বংস করেছিল। তারা পুরী নির্মাণ জানতো না যখন তারা এদেশে আসে। হরপ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লেষণের পর কয়েকশো বছর পরে উপনিষদীয় আমলের শেষের দিকে তারা নগর নির্মাণ শুরু করে। তখন আর তারা বিশুদ্ধ নর্ডিক আর্য নেই। অনার্য 'বধূ'-দের মহতী অবদানে তখন তারা এক মিশ্র জাতি, যদিও মনু এই সময়টায় তৈরি তাঁর সংহিতাতে জাতিভেদের নানা কচকচি করে অনর্থক ভেদাভেদির প্রাচীর তুলেছেন।

আবারো নতুন করে হরপ্পা ও আর্য সভ্যতার আলোচনায় ফেরা যাক। আর্য সভ্যতা নর্ডিক গোষ্ঠীর সভ্যতা। হরপ্পা সভ্যতা ছিল অত্যন্ত উন্নত অনার্য সভ্যতা। আর্য সভ্যতা তার তুলনায় ছিল অতি নিকৃষ্ট মানের। আর্যরা ছিল যাযাবর, বর্বর, ধ্বংসকারী ও অত্যাচারী। তবুও অনেকে বলেন যে, হরপ্পা সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা অভিন্ন। আগেই বিস্তৃত করে বলেছি যে, এটা এক ভ্রান্ত মত এবং সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা দুই সভ্যতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ও তাদের বাহকদের আবয়বিক নৃতাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। এই দুই সভ্যতার মূলগত পার্থক্যগুলি আবারও নিচে দেওয়া হল ঃ

"১। হরপ্পা সভ্যতার বাহকরা যে আর্য নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে আর্যভাষাভাষী বৈদিক নর্ডিক (Nordic) নরগোষ্ঠীর কঙ্কালের অভাব। যে সকল নরগোষ্ঠীর কঙ্কাল হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি হচ্ছে (১) মেডিটেরেনিয়ান (২) প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (৩) মঙ্গোলয়েড ও (৪) আলপীয়ান গোষ্ঠীর লোকদের। এসব কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে——লোথাল, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান ও রূপারে। এরা সবাই ছিল ভারতের প্রাগার্য অধিবাসী।

২। হরপ্পা সভ্যতার বাহকরা ছিল নগরবাসী। আর্যরা নগর নির্মাণ করত না। তারা নগর ধ্বংস করত। সেজন্য তারা দেবতা ইন্দ্রের নাম রেখেছিল 'পুরন্দর'। 'পুর' (বা নগর) শব্দটাও দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। দ্রাবিড়রাই পুরী বা নগর নির্মাণ করত। এ থেকে হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে দ্রাবিড়দের প্রাধান্যই সূচিত হয়।

৩। হরপ্পা সভ্যতার বাহকরা শিশ্ন-উপাসক ছিল ও মাতৃকাদেবীর আরাধনা করত। আর্যরা শিশ্ন-উপাসক ছিল না। তারা শিশ্ন-উপাসকদের ঘৃণা ও নিন্দা করত। লিঙ্গ -উপাসনা ভারতে নবোপলীয় যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া

যায়। আর, মাতৃকাদেবীর পূজাব কোন আভাসই আমরা ঋগ্বেদে পাই না। আর্যরা পুরুষ দেবতাগণের উদ্দেশেই স্তোত্র রচনা ও যজ্ঞ সম্পাদন করত। তাদেব যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত কোন দ্রব্য বা উপকবণ হরপ্পা সভ্যতাব কোন কেন্দ্রে পাওয়া যায় না। হরপ্পা সভ্যতায় ছিল স্ত্রী-দেবতাদেব প্রাধান্য, কিন্তু আর্যদেব বৈদিক সাহিত্যে পুরুষ দেবতাদেব প্রাধান্যই পবিলক্ষিত হয়।

৪। আর্যদেব কাছে ঘোড়াই ছিল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জন্তু। হবপ্পা সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে ঘোড়াব কোন কঙ্কালই পাওয়া যায়নি। হবপ্পা সভ্যতাব বাহকদেব কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্তু ছিল। এটা সীলমোহরসমূহেব ওপব পুনঃ পুনঃ বলীবর্দেব প্রতিকৃতি খোদন থেকে বুঝতে পাবা যায়। পশুপতি শিব আবাধনাব প্রমাণ মহেঞ্জোদাবো থেকে পাওয়া গিয়েছে। বলীবর্দ শিবেবই বাহন। সুতবাং হবপ্পা সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে বলীবর্দেব প্রাধান্য সহজেই অনুমেয। 'শিব' শব্দটা দ্রাবিড় ভাষাব শব্দ। দ্রাবিড ভাষায 'শিব' শব্দেব অর্থ হচ্ছে 'রুদ্রবর্ণ'। মনে কবা হয, পববর্তীকালে বৈদিক সমাজে রুদ্রেব আবাধনা অনার্য শিব থেকেই এসেছিল।

৫। আর্যবা মৃতকে দাহ কবত। হবপ্পা সভ্যতাব ধারকবা মৃতকে সমাধিস্থ কবত। এটা হবপ্পা সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহে সমাধিস্থানেব অস্তিত্ব থেকে বুঝতে পাবা যায়।

৬। আর্যদেব মধ্যে লিখন-প্রণালীব প্রচলন ছিল না। কিন্তু হবপ্পা সভ্যতাব ধাবকদেব মধ্যে লিখন-প্রণালী সুপ্রচিলত ছিল। আর্যবা সাহিত্য কণ্ঠস্থ কবত, লিখত না।

৭। হবপ্পা সভ্যতা যে আর্য সভ্যতা নয, তাব সবচেয়ে বড প্রমাণ হচ্ছে মৃৎপাত্র। কুরু পাঞ্চাল দেশ, তাব মানে যেখানে আর্য সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, সেখানকাব বৈশিষ্টমূলক মৃৎপাত্রেব বঙ ছিল ধূসববর্ণ। হবপ্পা সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহ থেকে যে সব মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলিব বঙ হচ্ছে 'কালো-লাল' (Black and Red ware) বা লাল রঙেব মৃৎপাত্রেব ওপব কালো বঙের চিত্রণ।

৮। হবপ্পা সভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকেব জাত। আর্যবা ছিল যোদ্ধাব জাত।

৯। হরপ্পা সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা প্রথমে কৃষিকর্ম জানত না। অনেকটা পবে তাবা কৃষিকর্ম শেখে। তারা ছিল যাযাবব জাতি এবং সম্ভবত তাদের আদিম বাসস্থান ছিল কোন শীতপ্রধান দেশে। সেখানে শবীবকে গবম রাখবাব জন্য তাবা মাংসাশী ছিল। সেখানে উৎসর্গীকৃত প্রাণীসমূহেব মাংস তাবা ভক্ষণ করত। ভাবতে আসার পর অশ্বমেধই তাদেব প্রধান যজ্ঞ ছিল। শুধু অশ্ব নয়; মহিষ, বৃষ, গাভী ও গোবৎসও তাদেব প্রিয খাদ্য ছিল (ঋগ্বেদ ৬/১৭/১২, ১০/৮৬/১৩, ১০/৮৬/১৪)। অতিথি এলে তাবা গরুর মাংস বান্না কবে খাওযাতো। এই জন্য অতিথির এক নাম ছিল 'গোঘ্ন'। হবপ্পা সভ্যতার ধারকরা গো-মাংস খেত না। তাছাড়া হবপ্পা সভ্যতার লোকরা মৎস্যভোজী ছিল। আর্যরা মৎস্য ভক্ষণ কবত না।

১০। হরপ্পা সভ্যতার লোকরা কুক্কুট, মৎস্য, কচ্ছপ ও ববাহেব মাংস ভক্ষণ করত। কিন্তু আর্যরা তা করত না।

১১। হরপ্পা সভ্যতার লোকবা হাতীর সঙ্গে বেশ সুপরিচিত ছিল। আর্যরা হাতী চিনত না। তাই তাবা হাতীকে বলত 'হস্তবিশিষ্ট মৃগ'। আর্যরা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে বা সে অঞ্চলে হাতী ছিল না।''

এই সব কথা আগে একবাব আলোচনা করা হয়েছে। আবারও বলা হল শুধু এটাই বোঝাতে যে, হবপ্পা সভ্যতা বর্বর 'নর্ডিক' আর্যদের সভ্যতা নয়। সারা পৃথিবীর বহু স্থানে নানা সময়ে তাদেব বর্ববতাব প্রকাশ ঘটেছে নানা ধ্বংস এবং অত্যাচাবেব মধ্য দিয়ে।

ভারতীয় আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল হল উপনিষদসমূহ। দার্শনিক চিন্তার অতুলনীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উপনিষদগুলিতে। মানব সভ্যতা যতদিন থাকবে উপনিষদের এই গভীব দার্শনিক জ্ঞান ততদিন সমাদৃত হবে। ডয়সন বলেছেন উপনিযদ-এর অর্থ হল রহস্যগত জ্ঞান। ম্যাক্সমুলাব বলেছেন, উপনিষদ হল গুরুব নিকট বসে দার্শনিক বিদ্যা আযত্ত কবা। বৈদিক সভ্যতাব সেই শ্রেষ্ঠ ফসল উপনিষদ নিযে সামান্য আলোচনা কবে শেষ কবা যাক ভাবতীয় আর্য সভ্যতাব কথা।

ডঃ হিবণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায বলেছেন, ''বৈদিক যুগের শেষ ভাগে বেদকে আশ্রয করে উপনিষদগুলি ধীবে ধীবে গড়ে উঠেছিল। বেদেব সংহিতা অংশে তাব জন্ম, আবণ্যক অংশে তাব পবিবর্ধন। বেদেব যজ্ঞকে কেন্দ্র কবে যে আনুষ্ঠানিক পর্ব গড়ে উঠেছিল তা থেকে উপনিষদকে পৃথক কববাব জন্য তাকে কর্মকাণ্ড বলে সূচিত করে উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হযেছে। বেদেব মধ্যেই যেন দুটি ধারা পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল—একটি বৈদিক দেবদেবীব স্তুতি নিবেদনে ব্যাপৃত, অন্যটি বিশ্ব রহস্যকে ভেদ কববাব আকুতি হতে সঞ্জাত তীব্র জ্ঞানতৃষ্ণা। এই জ্ঞানতৃষ্ণাই পরবর্তী কালে আরণ্যকের যুগে প্রাধান্য পেযেছিল এবং বিশুদ্ধ দার্শনিক জ্ঞানেব অন্বেষণে সম্পূর্ণ আত্মনিযোগ কবেছিল। তাবই পরিণতি হল উপনিযদ।'' উপনিষদের রচনাকালে ভাবতের জনগোষ্ঠীতে দ্রাবিড, আল্পীয, আদি-অস্ট্রেলীয় ও নর্ডিক জাতি-সমূহেব প্রবল মিশ্রণ ঘটেছিল। উপনিযদেব বচযিতাবা ওই মিশ্র জাতিব লোক। এব বচনাব সব কৃতিত্ব ওই মিশ্র জাতিব, কোনভাবেই আর্যদের নয। কারণ, এই সময় ভারতে খাঁটি নর্ডিক আর্য ছিল না। প্রায ৭০০/৮০০ বছবের মিশ্রণে আর্যরা তাদেব আর্যত্ব হারিযে দ্রাবিড় ইত্যাদিব সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাই উপনিষদগুলি সেই মিশ্র জাতিব বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তাব তুলনাহীন ফসল। পৃথিবীব সর্বকালেব সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান এই উপনিষদ।

কঠোপনিযদের দ্বিতীয় অধ্যাযেব তৃতীয বল্লীব ১৭তম শ্লোকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যম নচিকেতাকে যে উপদেশ দিযেছেন তা এই উপনিষদের সার-সংগ্রহ। শুধু তাই নয়, বারোখানি উপনিষদেই আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে যে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার অনেকটাই বলা হয়েছে ওই শ্লোকটিতে। কঠোপনিষদের ২।৩।১৭ শ্লোকটি বলেছে ঃ

(১) সকল মানুষেব হৃদয়ে যে অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন তিনি এক, তিনি পুরুষ অর্থাৎ সমস্ত পূর্ণ কবে বর্তমান। এক আত্মাই জীবের হৃদয়ে এবং সমগ্র বিশ্বে স্থিত।

(২) ধানের খোসার মধ্যে ইষীকা [মধ্যের ডগা] যেমন গোপনভাবে অবস্থান করে, সেরূপ জীবের আত্মা দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াব দ্বাবা আবৃত হয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন। লোকে যেমন ধানের খোসা ছাড়িয়ে তার সারাংশকে পৃথক করে, সেরূপ মুমুক্ষু পুরুষও দেহ হতে আত্মাকে পৃথক জ্ঞানে, দেহের কোন শক্তি বা ক্রিয়াকে আত্মা বলে ভুল করেন না। তিনি মনে কবেন—এই দেহ আমাব আত্মা নয়, আমি দেহ নই, আমিই আত্মা, অপরপক্ষে অজ্ঞানী জীব দেহকেই আত্মা মনে করে—দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণা সে করতে পাবে না।

(৩) জীবের অন্তঃস্থ এই আত্মাই স্বরূপতঃ পরমাত্মা। ইনি শুদ্ধ, জ্যোতিস্বরূপ। ইনি অমৃত, দেশকালের অতীত। এঁর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই।

(৪) মরণশীল মানুষ স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ বলে সম্যক উপলব্ধি করলে তাঁব স্বভাবের পরিশুদ্ধিব মধ্য দিয়ে তিনি অমৃত হন এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব উপলব্ধি কবেন।

ঈশোপনিষদেব প্রতিটি মন্ত্র গভীব তাৎপর্যময। আঠাবোটি মন্ত্র নিয়ে ঈশোপনিষদ। প্রতিটি মন্ত্রই অত্যন্ত গভীব অধ্যাত্ম চিন্তাব কথা বলে। অসীম থেকে অসীম বেব কবে নিলে অসীমই অবশিষ্ট থাকে। এমন কথা সম্ভবত ঈশোপনিষদই সর্বপ্রথম বলেছে।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

এব অর্থ হল ঃ "উহা [পবব্রহ্ম] পূর্ণ, ইহা [নামরূপে স্থিত ব্রহ্মাণ্ড] পূর্ণ, এই সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ পবিপূর্ণ ব্রহ্ম থেকে উদ্‌গত বা অভিব্যক্ত হয়েছে, আব সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্ম থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণই অর্থাৎ পবব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। অদ্বৈত বেদান্তের মূল কথাই এই মন্ত্রে রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন ঃ "মানুয স্বভাবতই পূর্ণ স্বভাব, কিন্তু স্বপ্রকাশ সূর্য যেমন মেঘের দ্বারা আবৃত থাকে, মানুষের স্বপ্রকাশ আত্মাও তেমনি অবিদ্যারূপ মেঘেব দ্বাবা আচ্ছন্ন থাকে। যার দ্বারা মানুষের এই পূর্ণতার প্রকাশ হয় তাব নাম শিক্ষা।' তাঁর মতে ঃ "Education is the manifestation of the perfection already in man." সুতরাং আমাদেব আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা আজও ওই উপনিষদগুলিকে ঘিবেই আবর্তিত হচ্ছে। যেন সব কথাই এরা বলে দিয়েছে, নতুন করে আব কাবও কিছু বলার নেই।

বিবেকানন্দ উপনিষদেব অদ্বৈতবাদের উপব নতুন আলোকপাত কবেছিলেন। শিখিয়েছিলেন বেদান্ত তথা উপনিষদকে ব্যবহারিক জীবনে কী ভাবে প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ আড়াই হাজার বছরের আগের চিন্তা আজও সমানভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগযোগ্য। বিবেকানন্দের মতে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ ধর্মসাধনার তিনটি স্তর, আর 'তত্ত্বমসি' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-ই উপলব্ধির শেষ কথা। এইখানেই স্বামীজির সঙ্গে বৈষ্ণব সম্প্রদাযের পার্থক্য। বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী।

তাঁরা বলেন, উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে কখনও পরিপূর্ণ অভেদ হতে পারে না। কিন্তু উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বলে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই—পার্থক্য নেই। উপনিষদ বলে 'অভীঃ' — ভয়শূন্য হও। বলে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই সমুদয়ই ব্রহ্ম। বলে, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—'তোমরা উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও, তোমরা মোহনিদ্রা হতে জাগ্রত হও, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের নিকট গিয়ে আত্মার সম্যক জ্ঞান লাভ কর'।

উপনিষদের ঋষিরাই বলেছেন, 'তুমি যদি ঈশ্বর না হও তবে জগতে অন্য কোথাও অন্য কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই।' বলেছেন, 'নচিকেতা, তুমিই সেই'। বলেছেন, 'আমি সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে জেনেছি। আর একমাত্র তাঁকে জেনেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে।' ঘোষণা করেছেন মানুষ 'অমৃতের পুত্র'। উপনিষদের এই উদাত্ত মননশীলতা এযুগেও সমানভাবে আকর্ষণীয়, সমানভাবে প্রযোজ্য। উপনিষদের ওই মৃত্যুজয়ের ঘোষণা, অমৃতের পুত্রদের জন্য তার দিব্যানুভূতির ব্যাপক প্রচার রবীন্দ্রনাথকেও আলোড়িত করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"একদা ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ,
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।"

উপনিষদগুলি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতের ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টিতে যে সব সত্য একদিন উদ্ভাসিত হয়েছিল, প্রামাণ্য উপনিষদগুলিতে সেই সব সত্যই বিধৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঋষিদের হৃদয় নিঃসৃত সেই সব বাণীর উপর নিজস্ব ভঙ্গিমায় নতুন করে আলোকপাত করেছেন। ব্রহ্ম একদিকে সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, অপরদিকে আনন্দস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ। প্রকৃতিতে তিনি নিয়মরূপে প্রকাশিত, তিনিই আবার মানুষের আত্মায় আনন্দরূপে উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন "ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায়, সেই দিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।" উপনিষদ তাই অনন্য, অতুলনীয়। আজও সব মানুষের কাছে সমানভাবে প্রয়োজনীয় —এই আড়াই-তিন হাজার বছর পরেও।

উপনিষদীয় যুগ পেরিয়ে আসে মহাকাব্যের যুগ। এই সময় রচিত হয় দুই বিখ্যাত মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত। এখানে 'বচিত' না বলে 'লিখিত' বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ এই দুই মহাকাব্যেব কাহিনীকাল অতি প্রাচীন। এ দুটির কাহিনী লোকমুখে লোকগাথা হয়েই ফিরতো বহুকাল ধরে। তারপর মহাকাব্যের যুগে এসে এরা লিখিত রূপ নেয়। পণ্ডিতেরা বলছেন, রামায়ণে যাদের বানর ও রাক্ষস অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তারা ভারতের প্রাগার্য জাতিসমূহ ব্যতীত আব কেউ নয। রাবণের প্রাসাদপুরী, তার প্রাকারবেষ্টিত সুরক্ষিত লঙ্কানগরী আমাদের হরপ্পা যুগের নগরসমূহের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বালী সুগ্রীব প্রভৃতিকে বানর বলাও মহাকবি বাল্মীকির কল্পনাপ্রসূত। কারণ তাদের পিতা সুষেণই ছিল সে যুগের একজন দক্ষ শল্য-চিকিৎসক। রামায়ণে অনার্যদের অত্যন্ত হেয় ভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। আবারো বলি, রামাযণ ও মহাভারত উপনিষদীয় যুগের পরবর্তীকালে মহাকাব্যীয় যুগে লিখিত রূপ নেয, যদিও এই দুই মহাকাব্যের কাহিনী লোকগাথা হয়ে হরপ্পীয অনার্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মহাকাব্যের যুগে বামায়ণ লেখাব সময অনার্যদের অনেকটাই হেয় করে চিত্রিত করা হয়। কাহিনীর বিন্যাস এমন করে দেখানো হয় যে, রামায়ণ পড়লে প্রাথমিকভাবে সবারই মনে হয়, দক্ষিণ ভারতে আর্য-বিজয়ের কাহিনী এতে চিত্রিত হযেছে। কিন্তু অনার্য তথা প্রাগার্য যুগের লোকগাথা রামায়ণের কাহিনী কেমন ছিল তার সঠিক হদিশ পাওয়া এখন মুশকিল। বামাযণ লেখা হয়েছিল মহাকাব্যীয় যুগের সেই সময়ে যখন আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সংস্কৃতির সংশ্লেষণের প্রারম্ভিক অবস্থা। এই মহাকাব্যে তাই চিত্রিত হয়েছে আর্য-রামের দাক্ষিণাত্য বিজয় কাহিনী। তবে রামের গায়ের রংয়ের কথা রামায়ণে যে ভাবে বর্ণিত হযেছে তাতে রাম যে নর্ডিক আর্য ছিলেন না তা সহজেই অনুমেয়। রামের গাত্রবর্ণ ছিল 'নব দূর্বাদল শ্যাম'। আর এই রং কখনই নর্ডিক আর্যদের গাত্রবর্ণ নয়। রামায়ণ যখন লেখা হয়, তখনও উত্তর ভারতের আর্যরা দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হয় নি। বাল্মীকির রামায়ণে তাই দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে অনেক অসঙ্গতি দেখা যায়। আবাবো বলি, রামায়ণ-মহাভারত লেখা হয়েছিল মহাকাব্যীয় যুগে। রামায়ণ লেখা হয় আগে এবং এমন একটা সময় যখন আর্য ও হরপ্পীয় অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণের প্রাথমিক অবস্থা চলছিল। মহাভারত লেখা হয় কিছুটা পরে, যখন এই সংশ্লেষণ অনেকটাই এগিযে গেছে। তাই রামায়ণে অনার্যদের যতটা হেয় করে দেখানো হয়েছে, মহাভাবতে ততটা নয়। মোদ্দা কথা, রামায়ণ-মহাভারত উপনিষদীয় আমলের অনেকটা পরে লেখা হলেও এদের কাহিনীকাল বহু প্রাচীন। এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে এমন সব উপাদান আছে, যা অনার্য সমাজের এবং বৈদিক আর্যদেব এ দেশে আসবার বহু পূর্ববর্তীকালের। কৃষ্ণ কিংবা রাম অবয়বগতভাবে কেউই আর্য তথা নর্ডিক আর্য ছিলেন না। কৃষ্ণ তো বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে মহাভারতে বলা হয়েছে। এই কাহিনী সম্ভবত আর্য পরবর্তীকালে মহাভারতে এসেছে। কারণ, আর্য পূর্ববর্তী হরপ্পীয়দের আমলে মহাভারতীয় কাহিনীতে নিশ্চয়ই ইন্দ্র

পূজার কাহিনী ছিল না। ইন্দ্র এসেছেন আর্যদের সঙ্গে। প্রাগার্য আমলে ভারতবর্ষে ইন্দ্র ছিলেন না কোনওভাবেই।

এই দুই মহাকাব্যের যুগেই আর্য-অনার্য সংস্কৃতিব সংশ্লেষণের বীজ প্রোথিত হয়েছিল। এই সংশ্লেষণের পরিণতি ঘটেছিল পৌরাণিক যুগে। সে সময় বৈদিক দেব-দেবীরা পিছনে চলে যায় এবং একদল নতুন দেবদেবীর পত্তন ঘটে। এই দেবদেবীরা আসে অনার্য হরপ্পীয় সংস্কৃতির থেকে। অনার্য সমাজের মাতৃদেবীর প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এই সময়ে। এই পৌরাণিক মাতৃদেবীর কল্পনায় হিন্দুসভ্যতার এক নতুনরূপ দেখা যায়। সে রূপ আর্য ও অনার্য চিন্তাধারার সম্মিলিত রূপ। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম ও পরে বহিবাগত ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সংঘাতে হিন্দু সভ্যতা ক্রমাগতই ঝুঁকে পড়ে অনার্য সংস্কৃতির দিকে। পৌরাণিক যুগেই হিন্দু সভ্যতা পুবোপুরি অনার্য সংস্কৃতিপন্থী হযে পড়ে। আজ আমরা যে হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি দেখছি, তার তিন-চতুর্থাংশ উপাদানই অনার্য সংস্কৃতি এবং মাত্র এক চতুর্থাংশ আর্য-সংস্কৃতি। পৌবাণিক যুগেব কথায় আসার আগে মহাকাব্যীয যুগের কথা আব একটু বলে নেওযা যাক। রামায়ণেব কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিযে নানা সন্দেহ থাকলেও মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নিযে আজ আর দ্বিমত নেই। হরপ্পীয় যুগের সত্য ঘটনা অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল মহাভাবতেব কাহিনী। মহর্ষি ব্যাসদেব গণেশকে দিযে মহাভাবত লেখানোব সময এর অনেক পরিবর্তন কবেন। মহাভারত সে সময ২৪,০০০ শ্লোকে বচিত হয। পবে বহু প্রক্ষিপ্ত এসে মহাভাবতেব কলেবর চাবগুণেবও বেশি বৃদ্ধি করে। বর্তমানে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ১,০৭,৩৯০টি।

মহাকাব্য 'মহাভারত'-এব ঐতিহাসিক ভিত্তি নিযে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু কবে ববীন্দ্রনাথ পেবিযে আধুনিককালে বহু মনীষীই স্বীকাব করেছেন যে, মহাভারত লেখা হয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাব প্রেক্ষাপটে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থে কৃষ্ণ তথা মহাভাবতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মহাভাবত মাত্র মহাকাব্য নয, এটা আমাদের জাতীয় ইতিহাস। ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইতিহাস নহে, ইহা একটা জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন, 'মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানব সমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ... হয়ত কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানব সমাজের মহাবিপ্লবেব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের, ধর্মের সহিত অধর্মেব মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।' এইভাবে বহু মনীষীই মহাভারতের ঐতিহাসিকতার সপক্ষেই রায় দিয়ে গেছেন। মহাভারতকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন নানা দিক থেকে নানা ভাবে।

প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল এখন থেকে প্রায় ৫১০২ বছব আগের কোনও সময়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে মহাভারত রচিত হয়েছে প্রায়

২৫০০ বছর আগে। বঙ্কিমচন্দ্র হিসাব কষে দেখিয়েছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০৩ বা ১৪৩০ অব্দ। তিলক এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেছেন এই মহাযুদ্ধের কাল হল ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ডঃ অতুল সুব কিন্তু বলেছেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল ২৪৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায ৪৪৫০ বছর আগে। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহিবেব 'বৃহৎ সংহিতা'-ও বহুকাল আগে বলেছিল যে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিবের বাজ্যাভিযেক হযেছিল ৬৫৩ কল্যাব্দে। হিসাব করলে সমযটা ২৪৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দই পাওযা যায়। ডঃ সুব তাঁব 'মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা' বইটিতে লিখেছেন যে, 'আর্যগবিমা' তত্ত্বের বশীভূত হযে আমাদের ঐতিহাসিকবা সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কাবের পূর্বে ভারতের ইতিহাস আরম্ভ করতেন বৈদিক সভ্যতা হতে। পবে সিন্ধুসভ্যতা প্রথম স্থান পায় এবং বৈদিক সভ্যতা দ্বিতীয় স্থানে আসে। আগে বৈদিক সভ্যতাব পরেব যুগেব সভ্যতাকে মহাকাব্য-যুগেব সভ্যতা বলা হত। এখনও তাই বলা হয। মহাকাব্য দুটিব অন্যতম হল মহাভাবত। ডঃ সুর বলছেন, 'মহাভাবতীয যুগেব সভ্যতা প্রাক-বৈদিক এবং এই সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতাব সমকালীন বা তাব পূর্বেব, আমি এই মতেব প্রবল সমর্থক এবং মনে কবি যে, ভাবতীয সভ্যতা, তথা হিন্দু সভ্যতাব সূচনা হযেছিল মহাভাবতীয যুগে। আর সে যুগ ছিল বর্বব আর্যদেব ভাবতবর্ষে আসাব বহুকাল আগের যুগ।' অসভ্য আর্যবা ভাবতে প্রবেশ কবেছিল ৪০০০ বছব থেকে ৩৫০০ বছব আগে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হযেছিল প্রায ৪৫০০ বছব পূর্বে এবং মহাভাবতীয সভ্যতা যে সমযেব কথা বলে তাব বিস্তাব ২৫০০ থেকে ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা ৪৫০০ থেকে ৫৫০০ বছব আগেকাব কাল জুড়ে। ডঃ সুবেব অভিমতে আর্যবা মহাভাবতেব মহাযুদ্ধে জড়িত ছিল না। ডঃ সুব যুধিষ্ঠিরেব বাজ্যাভিষেকেব কাল হিসাব কবতে সাহায্য নিযেছেন ফ্রেডবিক ইডেন পার্জিটাবেব বিখ্যাত লেখা 'পুবাণ টেকসট্স্ অব দি ডাইন্যাস্টিজ অব দি কলি এজ্' গ্রন্থটিব।

আবাব D. W. Davenport-এব মত আমিও মনে কবি যে, মহাভাবতেব মহাযুদ্ধ ছিল 'পারমাণবিক যুদ্ধ' (Atomic War)। আমার লেখা 'ভাবতীয দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান' বইটিতে আমি দেখাবাব চেষ্টা করেছি, একালেব প্রায় সব চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বহুকাল আগে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের পুনরাবিষ্কার মাত্র। এটা অবিশ্বাস্য কিছু নয়। কাবণ বিজ্ঞান তথা সভ্যতাব ক্রমবিকাশেব গতি কেবলমাত্র একমুখী বা বৈখিক নয। আসলে, সভ্যতাব বিকাশ, উন্নতি ইত্যাদি সবই কিন্তু তবঙ্গেব মত। তবঙ্গ যেমন একবাব উঠে, একবাব নামে, তেমনি সভ্যতাও একবাব তাব উন্নতিব চরমে উঠে এবং তারপর তার পতন ঘটে। সমস্ত ক্রমবিকাশেরই ক্রমসঙ্কোচন অবশ্যই আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবলেব 'সম্প্রসারণশীল বিশ্বতত্ত্ব' ছেড়ে বিজ্ঞানীবা এখন 'স্পন্দনশীল বিশ্বতত্ত্ব'-কে মানতে বাধ্য হয়েছেন। এটা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীনকালের দার্শনিক ব্যঞ্জনার 'দোলন তত্ত্ব'-এর সঙ্গে হুবহু এক। একালের নলজাতক, রোবট,

মহাকাশ স্টেশন ইত্যাদির বর্ণনা যদি মহাভারতে থাকে, তবে সেগুলিকে অলৌকিক বলে উড়িয়ে দেন তাঁরাই, যাঁরা কট্টরভাবে বিশ্বাস করেন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে একমুখী ধারায় এবং সভ্যতার চরম উন্নতি ঘটেছে বা ঘটছে আমাদের কালেই। মহাভারতীয় সভ্যতা এখনকার সভ্যতার চেয়ে নিকৃষ্টতর ছিল—এমন ধারণা তাঁরাই করেন, যাঁরা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধভাবে বিশ্বাস করেন, কেবল ক্রমপ্রসারণই আছে, ক্রমসংকোচন বলে কিছু নেই!

মহাভারতের বহু তথাকথিত অলৌকিক কাহিনী একালের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সত্য বলে প্রতিপন্ন করছে। মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধাস্ত্রগুলির অনেকগুলিই এখন পুনরাবিষ্কৃত। বেশ কয়েকটি পুনরাবিষ্কারের পথে। রাজা শাল্বের যুদ্ধ-বিমান, দ্রোণ-কৃপ-কৃপী-দুর্যোধনদের নলজাতক হয়ে জন্ম হওয়া কিংবা 'মাংসপিণ্ড' থেকে 'ক্লোনিং' করে জন্ম দেওয়া, ইন্দ্রপ্রস্থের আকাশে ভাসমান সচিবালয়, শরশয্যায 'ভীষ্মের ভূগর্ভস্থ জলপানের ঘটনা' ইত্যাদি আজ আর অলৌকিক কোনও ব্যাপার নয়। তবু মহাভারতে বেশ কিছু প্রক্ষিপ্ত আছে, যেগুলি খুঁজে বের করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থটিতে এই সব প্রক্ষিপ্ত নির্ণয়ের যেসব পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি অনুসরণ করে। আদি মহাভারত রচিত হয়েছিল প্রায় ২৪,০০০ শ্লোকে। মহাভারতেব বর্তমান শ্লোক সংখ্যা ১,০৭,৩৯০। সুতরাং বহু প্রক্ষিপ্ত সমন্বিত মহাভারতে বিপরীত কুম্ভীলকদের (Plagiarist) অবদানে উত্তম, মধ্যম, অধম রচনা মিশে আছে। রাজশেখব বসু বলেছেন, " . কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ত্ব উপলব্ধি কবতে কোনও বাধা হয় না।"

মহাভাবত লিখিত রূপ কবে পেযেছিল তা নিযে নানা মুনির নানা মত। ২৫০০ বছর আগে লেখা হ'য়ে থাকলে কোন্ লিপিতে তা লেখা হয়েছিল তা অজানা। 'আধা-আর্য' কৃষ্ণ-দ্বৈপাযন ব্যাস এবং লিপিকব 'অনার্য' গণেশ মিলে মহাভারত লেখালেখিব যে গল্প আমরা জানি তাব থেকে অনুমান করা যায যে, বিজযী বর্বর আর্যজাতি এ দেশ জয় করাব পর তাদের সঙ্গে প্রাগার্য সংস্কৃতির যখন সংশ্লেষণ ঘটছিল সেই রকম একটা সময়ে লেখা হয়েছিল মহাভারত। বৈদিক আর্যদের কোন লিখন-প্রণালী ছিল না। কিন্তু প্রাগার্য সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতার নিজস্ব লিপি ও লিখন রীতি ছিল। মহাভারতের রচনাকাল এবং তার আদি কাহিনীর কাল এক নয়। আদি কাহিনী এর রচিত বা লিখিত হওয়ার সময়ের চেয়ে অন্ততঃ ২০০০ বছর বা তার চেয়ে বেশি পুরাতন। অর্থাৎ মহাভারতের রচয়িতা আদি মহাভারত রচনা করেছিলেন তাঁর সময়ের চেয়ে অন্ততঃ দুই হাজার বছরের পুরাতন এক প্রচলিত কাহিনী থেকে। এখন থেকে এই আদি কাহিনীর সময়কাল ৪৫০০ বছর কিংবা তার চেয়েও পুরাতন হতে পারে। সম্ভবত মহাভারতের কাহিনী লোকগাথা হয়ে কয়েক হাজার বছর চালু থাকার পর তা আদি মহাভারতে লিপিবদ্ধ হয়। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই আদি মহাভারতের রচয়িতা কিনা এ নিয়েও আজকাল সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং বলা

হচ্ছে, ব্যাসদেব আদি মহাভারতের রচয়িতা নন।

মহাভারতের একেবারে শুরুতে আদিপর্বে সৌতি বলছেন, "... কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। ..." সুতরাং ব্যাসদেব আদি মহাভারতের বচয়িতা নন। ব্যাসদেব যখন গণেশকে দিয়ে মহাভারত লেখাতে শুরু করেন তখন তাঁর কাছে মাত্র ৮,৮০০টি কূটশ্লোক ছিল, যার অর্থ কেবল তিনি এবং তাঁর পুত্র শুকদেব বুঝতেন। এই ৮,৮০০-টি শ্লোক নিয়ে ব্যাসদেব গণেশকে দিয়ে যে মহাভারত লিখিয়ে ফেললেন তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ালো ২৪,০০০-টি। পণ্ডিতেরা বলছেন সেটিই ব্যাসদেবের প্রকৃত মহাভারত। সেই মহাভারতের স্বরূপ আজকের এক লক্ষ সাত হাজার শ্লোকের মহাভারত থেকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতের বহু প্রক্ষিপ্ত বাতিল করে বাসুদেব কৃষ্ণকে আদর্শ মানব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থটিতে। কিন্তু সব প্রক্ষিপ্ত বাছাই করে কেবল ২৪,০০০ শ্লোকের সেই আদি ব্যাসদেবীয় মহাভারতকে নির্দিষ্ট কবা প্রায় অসম্ভব। আর সে কারণেই ব্যাসদেব তথা মহাভারতের প্রকৃত বক্তব্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব। তাই মহাভারতকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রক্ষিপ্তসহ এই বিশাল মহীরুহের শাখা-প্রশাখা-ফুল-ফল-পাতার অতি-বৈচিত্র্যময়তা নানা জনের কাছে নানারূপে প্রতিভাত হয়।

বিদগ্ধজনেরা বলছেন, 'মহাভারত অনার্য কবিব দ্বারা বচিত অনার্যদের জীবন সঙ্গীত।' এ মত সঠিক। কারণ বৈদিক আর্যবা এদেশে আসার বহু আগেই 'মহাভারত' রচিত হয় এবং তা লোকগাথা হিসাবে প্রচারিত ছিল। বৈদিক আর্যরা বা নর্ডিক গোষ্ঠীর আর্যরা এদেশে আসার কিছুটা পরে মহাভারত লিখিত হয়। আধা-আর্য ব্যাসদেব সে মহাভারতের প্রণেতা। একালের কেউ কেউ অবশ্য ব্যাসদেবকে পুরোপুরি 'অনার্য' বলেছেন। আবারও বলি, মহাভারতের কাহিনী প্রাগার্যকালের এবং তার আদি রচনাও প্রাগার্য কোনও কবির। সে হিসাবে মহাভারত সত্যি সত্যিই অনার্য বা প্রাগার্যদের জীবন সঙ্গীত।

কোন বিশেষ জাতির সংস্কৃতি যখন কোন বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়, তাকেই বলা হয় সভ্যতা। সুতরাং বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হিন্দু জাতির সংস্কৃতিই 'হিন্দু সভ্যতা'। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, হিন্দু জাতি বলতে কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীকে [Racial Group] বুঝায় না। হিন্দু জাতি এক মিশ্রিত নরগোষ্ঠী। হিন্দু জাতিতে রয়েছে নর্ডিক, আলপীয়, দিনাবিক, আদি-অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মিশ্রণ। এই ছয় রকম জনগোষ্ঠীব রক্তের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছে হিন্দুজাতি। এই জাতি তাই মিশ্র জাতি। এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে নবম পরিচ্ছেদে। আজ যাকে হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু সমাজ বলে অভিহিত করছি তার বিকাশ ঘটেছিল পৌরাণিক যুগে ভাবতীয় আর্য সভ্যতার তথা বৈদিক সভ্যতার অন্তিম কালে। মহাকাব্যের যুগের পরে এসেছিল পৌরাণিক যুগ।

ভারতের জনসংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যায়, উচ্চকোটির মানুষ তথা ব্রাহ্মণদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশ কম। ভারতে চিরকালই নিম্নকোটির লোকদের সংখ্যা খুবই বেশি। এই নিম্নকোটির লোকরাই প্রাগ্‌বৈদিক জনগণের বংশধর। বৈদিক আর্যদের সঙ্গে তাদের বহুকাল ধরে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ ঘটার পর তাদের সংস্কৃতির অর্থাৎ হরপ্পীয় অনার্য সংস্কৃতিরই জয় হয়েছিল। এই জয় সম্পূর্ণ হয় পৌরাণিক যুগে। পরবর্তীকালের হিন্দু সভ্যতার বিবর্তন ও বিকাশে এদের অবদানই সবচেয়ে বেশি। জাতিভেদ, গোত্রবিভাগ, বিবাহে লৌকিক আচার অনুসরণ, যজ্ঞের বদলে পূজাব প্রবর্তন, দেবতাদের জন্য মন্দির নির্মাণ ও নানান শৈল্পিক রীতিনীতি—এ সবই অনার্য সমাজের দান। বিবাহে লৌকিক আচার অনুসরণ, আপদে বিপদে আভিচারিক ক্রিয়া-কলাপাদিব অনুষ্ঠান, পরিবহনের জন্য গরুর গাড়ীর ব্যবহার, জ্বালানীর জন্য গোবব থেকে ঘুঁটে বানানো—এই সবই আজও আমরা করে চলেছি হরপ্পীয় অনার্যদেব অনুসরণে।

ডঃ অতুল সুব তাঁব 'নৃতত্ত্ব ও হিন্দুসভ্যতা' নিবন্ধে লিখেছেন, "লোকে এখন আব বৈদিক প্রথা অনুযায়ী সূর্যেব উপসনা করে না। বিহাবের লোকেবা মহা-ধূমধাম কবে সেই প্রাগার্যযুগের 'ছট' পূজাই করে। বাঙলাব মেয়েবা 'ইতু' পূজাই করে। বসন্ত বোগাক্রান্ত হলে, শীতলার ওপবই নির্ভর কবে। ওলাওঠা হলেও ওলাইচণ্ডীব 'স্থানে' পূজাদান কবে। অনুর্বব সধবাবা গাছে ঢিল বেঁধে সন্তান কামনা কবে। এসবেব সঙ্গে বৈদিক আর্যধর্মেব কোন সম্পর্ক নেই।" মৃত্যুর পব আত্মাব অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তিব প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিযা ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতিব সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, শিব ও লিঙ্গ পূজা, কুমারী পূজা, অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ পূজা, সর্পপূজা, টোটেমের [Totem] প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, দেবদেবীর বাহনের কল্পনা, পশুপূজা, গ্রাম-নদী-বৃক্ষ-অবণ্য-পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তিব পূজা, মানুষেব ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেতদ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস, বিবিধ নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপক অনুশাসন, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ধর্ম-কর্ম, নবপত্রিকাব পূজা, শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, ঘেঁটুপূজা, চড়ক, গাজন, মনসা, শীতলা, কালী, করালী, ছিন্নমস্তা, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা, দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ও লিখন-প্রণালী, দশাবতার প্রভৃতি আমরা প্রাগার্যদের অর্থাৎ অনার্য হরপ্পীয়দের কাছ থেকেই পেয়েছি।

ভাবতীয় আর্যসভ্যতার তথা হিন্দু সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটলো পৌরাণিক যুগে বৈদিক, উপনিষদীয় এবং মহাকাব্যীয় যুগ পেরিয়ে। 'হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' গ্রন্থে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন ঃ "আজ আমরা যাকে হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সমাজ নামে অভিহিত করি, তার অভ্যুত্থান ঘটেছিল পৌরাণিক যুগে। পুরাণগুলির মধ্যে প্রাচীন আখ্যান, প্রাচীন কাহিনী ইত্যাদি অনেক কিছু অবরুদ্ধ আছে। কিন্তু এগুলি রচিত হয়েছিল অনেক পরে — ভারতের ইতিহাসের গুপ্তযুগে। বেদ-উপনিষদের

চর্চা তখনও চলছিল বটে, কিন্তু তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উচ্চকোটির লোকের [Elites] মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। পুরাণগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদেব সর্বজনীনত্ব। বৈদিক ধর্মকে পিছনে হটে যেতে হয়েছিল—পৌরাণিক ধর্মকে স্থান করে দেবার জন্য। দুই ধর্মের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। বৈদিক ধর্ম ছিল যজ্ঞসম্পাদনের ধর্ম, পৌরাণিক ধর্ম ছিল পূজা-অনুষ্ঠান সম্পাদনের ধর্ম। যজ্ঞসমূহ ব্যযসাপেক্ষ অনুষ্ঠান ছিল। সে জন্য মাত্র উচ্চকোটির লোকদেব পক্ষেই তা সম্পাদন করা সম্ভবপব ছিল। পূজা-অনুষ্ঠান সম্পাদনার ব্যয় ছিল স্বল্প, সে জন্য সাধাবণ লোক তা সম্পাদন করতে পাবত। সেইজন্য পৌরাণিক ধর্ম সমাজেব সকলকেই আকৃষ্ট কবেছিল।''

ডঃ সুরের মতে, পৌরাণিক ধর্মেব উদ্ভব ঘটেছিল হিন্দু সমাজেব ওপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিঘাতের ফলে। অশোকেব আমল থেকে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা অবধি প্রায় ৬০০ বছব ধবে সাবা ভাবতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। গুপ্ত বাজাবা যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তখন তাঁবা হিন্দুধর্মকে এক নতুন ছাঁদে ঢেলে সাজালেন। সমাজেব সংহতি বক্ষাব জন্য সব সঙ্কর ও অন্ত্যজ জাতিকে টেনে আনা হল সমাজ ব্যবস্থাব মধ্যে। আর্য সমাজে প্রবেশ কবল প্রাচীন অনার্য লৌকিক দেবদেবীবা। এই দেবদেবীরা নিম্নকোটিব লোকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। অনেক নাবী দেবতা এলো পুরুষ দেবতাব স্ত্রী হিসাবে। তাছাড়া এলো দেবদেবীব বাহন। এগুলি এলো হবপ্পীয় অনার্য সংস্কৃতি থেকেই। বৈদিক দেবতাবা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেবল বিষ্ণু এবং শ্রী বা লক্ষ্মী থেকে গেলেন এই নতুন দেবমণ্ডলীতে। ইন্দ্র তাঁব দেবত্ব হাবিযে লোকপাল হয়েই কোনবকমে তাঁব নিজেব অস্তিত্ব বাঁচিয়ে বাখলেন। এই পৌরাণিক যুগে সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে পূজা পেতে লাগলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বব। তবে ব্যাপকভাবে পূজিত হতে থাকলেন বিষ্ণু এবং মহেশ্বব। বিষ্ণু আর্যদেবতা, আব মহেশ্বর হলেন শিব — যিনি হবপ্পীযদেব অনার্য দেবতা। এইভাবে আর্য এবং অনার্য দেবতার মধ্যে ঘটল মহা সম্মিলন। এই সম্মিলন আবও ঘনীভূত হয় হবিহব মূর্তিব কল্পনায।

ডঃ সুর লিখেছেন, ''এঁদেব নিযে পুবনো যুগেব অনেক আখ্যান ও উপকাহিনী স্থান পেল পুবাণসমূহে। যেহেতু এই সংশ্লেষণ ঘটল আর্যপুবোহিত সম্প্রদাযের অধীনে সেজন্য বিষ্ণুকেই স্থান দেওয়া হল সর্বোচ্চ স্বর্গে বৈকুণ্ঠে, আব শিবকে স্থান দেওযা হল মর্ত্যেব সর্বোচ্চ পাহাড়ে কৈলাসে। বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হলেন বিষ্ণুপ্রিযা হিসাবে লক্ষ্মী। আর কৈলাসে শিবজাযা হিসাবে দুর্গা।'' সত্যি কথা বলতে কি, পৌবাণিক যুগে যখন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির চরম সংশ্লেষণ ঘটেছিল, তখন নর্ডিক আর্য জাতিও তাদের আর্যত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। তখন হিন্দুজাতি হযে গেছে এক মিশ্রজাতি। নর্ডিক, আলপীয়, দিনারিক, আদি-অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয জাতিসমূহ তখন মিলেমিশে এক হযে গেছে। সৃষ্টি কবেছে হিন্দুজাতি।

হিন্দুদের মধ্যেও নানা ভেদ। কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ সৌর, কেউ গাণপত্য, কেউ তান্ত্রিক, কেউ বৈষ্ণব ইত্যাদি। ভারত সব বিষয়েই এক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দেশ। এতো বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের মধ্যে একটা সাধারণ ধারা আমরা প্রবাহিত হতে দেখি। এই সাধারণ ধারাই হিন্দুসভ্যতাকে দিয়েছে সনাতন রূপ। বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে এই সনাতন ধর্ম, দান করেছে হিন্দুসভ্যতার সংহতি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আর্যগরিমার ভ্রান্তি

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ২০ বছর অবধি বৃটিশ এবং জার্মান পণ্ডিতেরা সমস্বরে প্রচার করলেন আর্য-গরিমা। তাঁরা নানাভাবে প্রমাণ করে দেখালেন যে, আর্যজাতি পৃথিবীর সেরা সভ্য জাতি, তারাই পৃথিবীকে প্রথম সভ্যতার আলো দেখিয়েছে এবং তারাই বহু প্রাচীনকালে ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যত্র সব অসভ্য অনার্যদেব সভ্য করে তুলেছে। এই আর্যজাতি হল ইউরোপিঅয়েড বা ককাসয়েড (Caucasoid) মহাজাতির নর্ডিক (Nordic) নরগোষ্ঠী। উনবিংশ শতাব্দীর ওই পণ্ডিতবর্গ প্রায় স্থির কবেই ফেললেন যে, জার্মানজাতি নিঃসন্দেহে ওই আর্যজাতির নির্ভেজাল উত্তরসূরি এবং বৃটিশ ইংরেজরাও তাই। এই সময় ইংবেজদের উপনিবেশ সারা পৃথিবীব অর্ধেকটারও বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বলা হত যে, বৃটিশ বাজত্বে তখন সূর্য অস্ত যেত না। জার্মান এবং বৃটিশ মনীষীদেব এই ব্যাখ্যায় বৃটিশ শাসকবা খুবই উৎসাহিত হল। তাবা প্রচাব করতে লাগলো যে, আর্যজাতিব সভ্য করা নরগোষ্ঠীকে শাসন কবাব অধিকার তাদেব আছে, যেহেতু তারা আর্যজাতির উত্তরসূরী। এইভাবে জাতিতত্ত্ব দিয়ে তাবা সমর্থন করল তাদেব ঔপনিবেশিকতা। ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য পবাধীন দেশকে বৃটিশরা তাদের কব্জায় রাখার জন্য তারা খাড়া করল আর্যজাতি তত্ত্ব। দিকে দিকে প্রচারিত হল আর্যগরিমা। সারা পৃথিবীর বহু মানুষ সে সময় প্রায় বিশ্বাস কবেই নিল যে, আর্যজাতিই আবহমান কাল ধরে সেরা সভ্য জাতি। তারাই বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে সভ্য করে তুলেছে। জার্মান ও ইংরেজরা সেই আর্যজাতিরই মহান উত্তরসূবি। তাই তারা তাদের অধীনস্থ দেশগুলি শাসন করবে এটাই স্বাভাবিক। সে সময় সবাই ধরে নিল নর্ডিক গোষ্ঠীর মানুষেরা সবাব সেরা। অতএব পৃথিবী জুড়ে বৃটিশদেব শাসন চলাটাই যুক্তিযুক্ত এবং তাদের দ্বারা সভ্য হওয়া মানুষের অভিপ্রেতও যে, তাদের উপব ইংরেজ শাসন কায়েম হয়ে থাকুক। অনেক মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু কবল যে, ইংবেজদের অধীনে থাকাই তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। এইভাবে আর্যগবিমা প্রচাবের মাধ্যমে বহু পরাধীন দেশে শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্তিমিত করে দেওয়া হয়। তখনও হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় নি। এমনি এক প্রেক্ষাপটে ১৯২১-২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করলেন মহেঞ্জোদারো। আবিষ্কৃত হল হবপ্পা সভ্যতা। স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে আরও নানা উৎখনন এবং পরবর্তীকালে নানা অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল প্রাচীন ভারতের প্রায়

১৫ লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল হরপ্পা সভ্যতা। অত্যুন্নত এই সভ্যতা পৃথিবীকে দেখিয়েছিল সভ্যতার প্রথম আলো। এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতা তার উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল প্রায় ৪৬০০ বছর আগে। আর আর্যরা এ দেশে এসেছিল এর প্রায় ১০০০ বছর পরে।

হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পরেই আর্যগরিমার ভ্রান্ত কাহিনী শেষ হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দেই প্রখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. গর্ডন চাইল্ড বলেন যে, আর্যদের বর্ববতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাদেব কার্যকলাপে। জগতের যেখানেই গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা সেখানকার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। গত ৭০/৮০ বছব ধরে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতাসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পণ্ডিতসমাজ এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আর্যবা ছিল এক বর্বব জাতি। আর্যদেব সম্বন্ধে যখনই কিছু এখন লেখা হয়, তখনই তাদেব বর্বব জাতি বলেই অভিহিত কবা হয। সর্বত্রই তাবা ধ্বংস করেছে উন্নতমানের প্রাগার্য সভ্যতাকে। প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদেব হীন ও বর্বব সভ্যতা। সুতবাং গর্ডন চাইল্ডের ওই মন্তব্য পরবর্তীকালে সত্য বলে প্রমাণিত হযেছে। তবে এক জাযগায আর্যদেব এই প্রযাস ব্যর্থ হয়েছিল। সে জায়গাটা হল ভাবতবর্ষ। আর্যবা ভারতে এসে উন্নতমানেব সভ্যতার সম্মুখীন হযেছিল। হবপ্পীযদেব সঙ্গে তাবা অবিবাম সংগ্রাম কবেছিল। আর্যাবর্ত নামেব বিস্তৃত উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা কবেও হবপ্পা-সংস্কৃতিব কাছে তাবা মাথা নত করেছিল। সৃষ্টি হযেছিল ভাবতীয আর্য-সভ্যতা— যাব চাব-ভাগেব তিন-ভাগ উপাদানই হবপ্পা সভ্যতাব। আব হিন্দু সভ্যতাব মূল উপাদানসমূহই এই সিন্ধু সভ্যতা তথা হরপ্পা সভ্যতাব অবদান।

আর্য গবিমাব ভ্রান্ত ধারণা কেমন কবে সৃষ্টি হল সে কথায আসা যাক। বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস রবার্ট ডাবউইন (Charles Robert Darwin) (১৮০৯-১৮৮২) তাঁব বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Origin of Species' প্রকাশ কবেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। 'প্রজাতির উৎপত্তি' সংক্রান্ত তাঁব এই গবেষণা গ্রন্থে তিনি প্রচার করলেন তাঁব অতি বিখ্যাত 'অভিব্যক্তিবাদ' (Theory of Evolution)। ডারউইন ছিলেন বৃটিশ প্রকৃতি- বিজ্ঞানী। তাঁর এই অভিব্যক্তিবাদকে পণ্ডিতেবা বলছেন, এটি 'নিযন্ত্রণবাদ' (Determinism)-এর ফসল। তাঁর এই তত্ত্ব কিন্তু পণ্ডিতমহলে প্রবল আলোড়ন তোলে। আব এই তত্ত্ব কিছু পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আজও সবাইযেব কাছে যথেষ্ট সমাদৃত। যাইহোক, জীবেব অভিব্যক্তিবাদেব এই তত্ত্ব সে সময খুবই সমাদৃত হয। মার্কসবাদেব প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস এই তত্ত্বের ঘোরতর সমর্থন করেছিলেন।

সে যাইহোক, এরই সমসাময়িক কালে বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) (১৮২০-১৯০৩) চারটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন, ডারউইনের 'On the Origin of Species' প্রকাশের আগেই। এই চারটি নিবন্ধ হল : 'The Development Hypothesis' (১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ), 'Theory of Population'

(১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ), 'Progress—its Law and Cause' (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং 'Recent Astronomical and Nebular Hypothesis' (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এই চারটি নিবন্ধেই স্পেনসার অদ্ভুতভাবে ডারউইন তত্ত্বের সমর্থন করেছেন, অথচ ডারউইনের তত্ত্ব তখনও ছেপে বের হয় নি। ডারউইনের 'On the Origin of Species by Means of Natural Selection' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির নাম বেশ লম্বা-চওড়া। তবে সংক্ষেপ এটি 'Origin of Species' নামেই বিখ্যাত। বইটি প্রকাশিত হওয়ার অনেকটা আগেই সম্ভবত স্পেনসার ডারউইনের কাছ থেকেই জেনেছিলেন তাঁর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের কথা। কারণ ডারউইন এবং স্পেনসার, পরস্পর পরিচিত ছিলেন। স্পেনসারের পিতা উইলিয়াম জর্জ স্পেনসার ডারউইনের পিতামহ এরাসমাস ডারউইন (Erasmus Darwin) প্রতিষ্ঠিত 'Derby Philosophical Association'-এর সম্পাদক ছিলেন বহু বছর। সুতরাং ডারউইনের সঙ্গে স্পেনসারের আলাপ-পরিচয় না থাকার কোন কারণ নেই। স্পেনসার যেমন ছিলেন বিখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক, তেমনি ডারউইনও ছিলেন বিখ্যাত বৃটিশ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। উভয়ের মধ্যে নিজ নিজ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হওয়া বিচিত্র নয়। তাই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ বই আকারে বের হওয়ার কিছুটা আগেই সম্ভবত স্পেনসার ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের কথা জেনে ফেলেছিলেন ডারউইনের কাছ থেকে। আর তা না হলে মেনে নিতে হয় বিজ্ঞান চিরকাল দর্শনকে অনুসরণ করে।

যাইহোক, দার্শনিক স্পেনসারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিজ্ঞানী ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আশ্চর্য হল, স্পেনসার ১৮৫৮ সালের মধ্যে যেগুলি বললেন, তার অনেকগুলি চলে এল ডারউইনের তত্ত্বে। অথচ একজন দার্শনিক, অন্যজন বিজ্ঞানী। স্পেনসার তাঁর দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন জেরেমি বেনথাম (Jeremy Bentham)-এর উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism) এবং ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের অনেকগুলি ধারণার মিশ্রণে। ডারউইন বলেছেন, অভিব্যক্তিতে জীব 'গুণোত্তর অনুপাতে' (Geometrical Ratio) বংশ বিস্তার করে। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য এদের রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম নিজেদের মধ্যে কিংবা অন্য প্রজাতির সঙ্গে অথবা পরিবেশের সঙ্গে। এই সংগ্রামকে স্পেনসার বলেছিলেন, "Struggle for Existence"। তিনি আরও বলেছিলেন, এই সংগ্রামে তারাই টিকে থাকে, যারা সবচেয়ে উপযুক্ত। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন 'Survival of the Fittest' বা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'।

এই সময় ১৮৫৪ সালে এক ফরাসী লেখক একটা বই প্রকাশ করলেন। কাউন্ট জোসেফ আর্থার দ্য গোবিনিউ (Count Joseph Arthur de Gobineau) তাঁর এই বইয়ে দেখালেন যে, সাদা চামড়ার জনজাতি অন্যদের তুলনায় সেরা এবং সাদা চামড়ার জাতিদের মধ্যে আর্যরা সবার সেরা। তিনি এও বলেন যে, 'টিউট্যান'-এর (Teutons) বা জার্মান ভাষাগোষ্ঠীর যে কোনটি যাদের মাতৃভাষা তারাই

বর্তমানে সবচেয়ে নির্ভেজাল আর্যজাতি। জার্মানি এই তত্ত্বকে সাদরে গ্রহণ করল। তারা নিজেদের আর্যজাতির প্রকৃত উত্তরসূরি বলে ধরে নিল। আর্যগরিমা প্রচারের জন্য এই সময় ম্যাক্সমুলার, পল ডয়সেন প্রমুখ জার্মান পণ্ডিতরা আদাজল খেয়ে লাগলেন। ভারতীয়-আর্যসভ্যতার (Indo-Aryan Civilization) সেরা ফসল বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি নিয়ে গভীরভাবে চর্চা শুরু করলেন। প্রমাণ করে ছাড়লেন, আর্যরা পৃথিবীর সেরা সভ্য জাতি, যারা ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যত্র 'অসভ্য' (!) অনার্যদের সভ্য করে তুলেছিল। পৃথিবী জুড়ে তা গৃহীত হল। কারণ, তখনও ভারতের হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় নি। ১৯২২ সালে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকদের মত বদলে গেল। একের পর এক ঐতিহাসিক বললেন, আর্যরা ছিল এক অসভ্য বর্বর জাতি। পৃথিবীর যেখানে গেছে সেখানেই আর্যরা ধ্বংস করেছে। আগেই বলেছি, এ সম্বন্ধে প্রথম মন্তব্য প্রকাশ করেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. গার্ডন চাইলড্ (V. Gordon Childe)। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'দি আরিয়ানস্' (The Aryans) গ্রন্থে বলেছিলেন যে আর্যদের বর্বরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো তাদের কার্যকলাপে। জগতের যেখানই গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিল সেখানেই তারা সেখানকার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল। চাইলড্-এর এই মন্তব্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাগার্য সভ্যতা-সমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, বিদগ্ধজনরা আজ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখন আর্যদের সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়, তখনই তাদের বর্বর জাতি বলে অভিহিত কবা হয়। সর্বত্রই তারা উন্নতমানের প্রাগার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল নিজেদের হীন ও বর্বর সভ্যতা।

যাইহোক, আর্যগরিমা প্রচারের জন্য ম্যাক্সমুলাররা যখন বেদ, উপনিষদ ইত্যাদির চর্চা শুরু করেন, তখন হরপ্পা সভ্যতার কথা অজানাই ছিল। আর্যগরিমা প্রচার করতে গিয়ে এঁদের এই গবেষণা নিঃসন্দেহে ভারতবাসীদের অনেক উপকার করেছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদ চর্চার নতুন জোয়ার এসেছিল। সে সময় ভারতবাসী নিজেদের আর্যগরিমার অংশীদার ভেবে প্রবল গর্ববোধ করত। তারা তখন জানতো না আর্যগরিমা ব্যাপারটা গালগল্প—একটা Myth মাত্র। আর্যরা যখন ভারতে এসেছিল তখন তারা ছিল বর্বর, যাযাবর। এখানে এসে তাদের বর্বর সংস্কৃতি মিশ্রিত হল হরপ্পার অত্যুন্নত সংস্কৃতিব সঙ্গে। সৃষ্টি হল 'ভারতীয় আর্য সভ্যতা'। সেই নতুন সভ্যতার অবদান হল বেদ-উপনিষদ-পুরাণ ইত্যাদি। এ সব কথা আগে অনেকবারই বলা হয়েছে। সুতরাং গরিমা যদি কারও প্রচার করতে হয় তা করতে হবে হরপ্পার অনার্য গরিমার।

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু ম্যাক্সমুলার ও পল ডয়সেনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ম্যাক্সমুলার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"আর ভারতের উপর তাঁহার কি অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা

ততোধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ সকল তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে রঙ ধরাইয়া দিয়াছে।

ম্যাক্সমুলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিক বেদান্তেরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সুরের ভিতর উহার প্রকৃত তানকে ধরিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যাহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে আলোকিত করিতেছে, উহা সেই এক তত্ত্ব, সমুদয় ধর্মই যাহার কার্যে পরিণত রূপমাত্র। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ছিলেন? তিনি এই প্রাচীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্বাভাস—তাঁহার ভিতর দিযাই সকল জাতি আধ্যাত্মিক আলোক লাভ করিতেছে। চলিত কথায় আছে, জহুরীই জহর চেনে। তাই বলি, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নতুন নক্ষত্র উদিত হইলেই, ভারতবাসিগণ উহার মহত্ত্ব বুঝিবার পূর্বেই এই পাশ্চাত্য ঋষি উহাব প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন!"

স্বামীজি ম্যাক্সমুলারকে বলেছেন 'ভারতবন্ধু'। আর্যগরিমা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ম্যাক্সমুলার বেদ-চর্চা শুরু করায় ভারতে বেদ এবং উপনিষদাদির চর্চা নতুন করে নতুনভাবে শুরু হয়। যে ভাবেই হোক ম্যাক্সমুলারের তথা অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বেদ-উপনিষদ চর্চা ভারতের উপকারই করেছিল।

যাইহোক, আর্যগরিমার তত্ত্ব জার্মানির জনগণকে খুবই উৎসাহিত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই তারা ভাবতে শুরু করে যে, তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা জাতি। তারাই একমাত্র সারা পৃথিবী শাসনের অধিকারী। জার্মানির বিখ্যাত সুরকার রিচার্ড ভাগনার (Richard Wagner) সহ বহু নামীদামী জার্মান এটা ভাবতে শুরু করে যে, তারাই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আর্যজাতির খাঁটি উত্তরাধিকারী এবং তারাই পৃথিবী শাসনের সবচেয়ে উপযুক্ত জাতি। ইতিহাস বলছে ঃ

"In a book published in 1854 the French writer Count Joseph Arthur de Gobineau gave a racial meaning to Aryan. De Gobineau held the white race to be superior to all others and Aryan race to be supreme among whites. He identified Teutons as the purest modern representatives of the Aryans. This theory aroused interest in Germany and was espoused by the composer Richard Wagner among others. In the 20th century it was taken up by the German dictator Adolf Hitler, who equated Aryan with Nordic race and used the theory to justify his persecution of Jews. Modern anthropologists reject the theory that there are 'pure' or inherently superior human groups."

ঐতিহাসিকরা বলছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল 'ভার্সাই চুক্তি'র মধ্যেই। 'ভার্সাই শান্তি চুক্তি' (Peace Treaty of Versailles) স্বাক্ষরিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর। সেবার বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় জার্মানির পবাজয়ের মধ্য দিয়েই। এবপব কিছুদিন জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে থাকে। চরম মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারী অ্যাডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) জার্মানির 'চ্যানসেলার' (Chancellor) নির্বাচিত হন। ধীরে ধীরে তিনি 'ন্যাৎসি' (Nazi) বাহিনীর সহায়তায় দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালের ২ আগস্ট তিনি নিজেকে জার্মানির 'ফুযেরার' (Fuhrer) বা সর্বাধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থাব প্রভূত উন্নতি হয। ১৯৩৭ সালের মধ্যেই জার্মানিব অর্থনীতি চরম উন্নতি লাভ করে। একনায়কতন্ত্রেব সুফলগুলি ফলতে থাকে। অত্যন্ত দ্রুত চরম উন্নতি হয় জার্মানির। এই ব্যবস্থাপনাব খারাপ ফলগুলি দেখা শুরু হয ১৯৩৯ সাল থেকে।

এবই মধ্যে হিটলার তাঁর 'গেস্টাপো' (Gestapo) বাহিনীব সাহায্যে ইহুদি নিধনযজ্ঞ শুরু কবেন। ১৯৩৫ সালে 'নুবেমবার্গ আইন' (Nuremberg Law) পাশ কবানো হয়। এই আইনে ইহুদিদের জার্মান নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয। অন্য জাতি কিংবা জার্মান জাতির সঙ্গে ইহুদিদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয। ইহুদিদেব দেশ থেকে তাড়ানো শুরু হয়। পাশাপাশি গেস্টাপো বাহিনীব সাহায্যে গণ-ইহুদিহত্যাও চলতে থাকে তাঁব 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি'-তে (Concentration Camps)। হিটলাব ১৯৪৫ সাল অবধি এইভাবে প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করান। এই হত্যার পিছনে তাঁর একমাত্র আদর্শ ছিল যে, তিনি খাঁটি আর্য অর্থাৎ পৃথিবীব সব জাতিব মধ্যে সেবা জাতি, আব ইহুদিরা অনার্য— তাই তারা নিকৃষ্ট জাতি। তিনি ভাবতেন, যোগ্যতমেব উদ্‌বর্তন নিয়ম মেনে জার্মানরাই পৃথিবী শাসন করবে, বেঁচেবর্তে থাকবে, ইহুদিদের বাঁচার অধিকাব নেই—বিশেষ করে জার্মানিতে। আর্য গরিমার 'ভূত' তাঁর ঘাড়ে চেপেছিল বলেই ৬০ লক্ষ ইহুদিকে অকারণে বলি হতে হয়েছিল তাঁর হাতে। এই নৃশংসতা, বর্বরতা, অত্যাচার আর্যদেরই সাজে। আর সে কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি খাঁটি আর্য এবং শতকরা একশো ভাগ খাঁটি 'নর্ডিক' (Nordic) গোষ্ঠীর লোক। এমন অত্যাচার, বর্বরতা, হত্যা, ধ্বংস নর্ডিক আর্যদের পক্ষেই সম্ভব। খাঁটি আর্য (!) হিটলার তাঁর আর্যগরিমা প্রকাশ করেছেন গণ-ইহুদিহত্যার মাধ্যমে। নর্ডিক-আর্য হিটলার 'জাতির নামে' যে ভীষণ 'বজ্জাতি' করেছেন তার তুলনা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানোব পিছনে ভার্সাই চুক্তি অনেকটাই দায়ী এবং হিটলার সেখানে নিমিত্তমাত্র বলে মেনে নেওয়া গেলেও তাঁর ইহুদি নিধনের পিছনে যে উন্মত্ত বর্বরতা কাজ করেছে তা আদিম আর্যদের প্রাচীনকালের ধ্বংস ও বর্বরতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসের, অসংখ্য হত্যার, অতুলনীয় ক্ষয়-ক্ষতির কথা প্রায় সকলের জানা। কয়েক লক্ষ লোকের মৃত্যু, অভাবনীয় ধ্বংস এবং অতুলনীয়

ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়ে ১৯৪৫ সালে শেষ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের এই বিশাল ধ্বংস ও ক্ষয়-ক্ষতির জন্য হিটলার নিশ্চযই আংশিকভাবে দায়ী। কিন্তু 'একহাতে তালি বাজে না'-র মত, হিটলাব একাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী হতে পারেন না। এ সব মেনে নিলেও ৬০লক্ষ ইহুদি নিধনেব নর্ডিক-বর্বরতা ক্ষমার অযোগ্য নারকীয় অপরাধ। হিটলারের এই গণ-হত্যা আধুনিক যুগে ভ্রান্ত আর্যগরিমাব নৃশংসতম ফসল। আর্যগরিমার ভ্রান্তি দূর না হলে একবিংশ শতাব্দীতেও এ ধরনের বর্বর নৃশংসতা যে ঘটবে না এমন কথা নিশ্চিত কবে বলা যায় না।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus) পৃথিবীতে এসেছিল প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগে। প্রকৃত মানুষ (Homo Sapiens) এবং অস্ট্রালোপিথেকাসেব মধ্যবর্তী সময়ে মানবজাতীয় জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল বিশ থেকে দশ লক্ষ বছব পূর্বে। পাঁচ লক্ষ বছর আগে ঋজুভাবে চলাফেরা কবতে সমর্থ (Homo Erectus) এমন মানবদেব অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল তা প্রমাণিত হযেছে। এব পববর্তী পর্যাযে এসেছে নিযানডারথাল জাতির মানুষ (Neanderthal Man)। প্রায চল্লিশ হাজাব বছব আগে নিয়ানডাবথাল মানবেবা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয। তাব জাযগাব আসে ক্রোম্যানিয়ন (Cromagnon) জাতিব মানুষ। এই ক্রোম্যানিয়ন জাতিব মানুষ থেকেই নাকি পৃথিবীব বর্তমান জাতিসমূহেব উদ্ভব।

প্রসঙ্গত একটা প্রশ্ন এসেই যায। সে প্রশ্ন ভীমবেটকাব মানুষদেব নিযে। মধ্যপ্রদেশেব রাজধানী শহব ভোপাল থেকে প্রায ৪২ কিলোমিটাব দূরে ভীমবেটকাব অবস্থান। এখানে জঙ্গলেব মধ্যে পাহাডেব গায বযেছে ৭৬০টিরও বেশি গুহা। এই গুহাগুলিতে নাকি এক লক্ষ বছব কিংবা তাবও আগে থেকে বাস কবেছে মানুষ। সেই সব আদিম মানবের বিবর্তন ঘটেছে এখানেই। আদি প্রস্তব যুগ, মধ্য প্রস্তব যুগ এবং নব্য প্রস্তর যুগ পার হয়ে তাবা চলে এসেছে অশোকেব আমলেব সভ্যতায। ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ বছব আগে তাবা তাদেব গুহায এঁকেছে দেওযাল-চিত্র। সাতশোব অধিক দেওয়াল-চিত্র সম্বলিত গুহা বযেছে ভীমবেটকায। এইসব চিত্রে তাবা ব্যবহাব কবেছে সাদা, লাল, সবুজ ও হলুদ বং। বড কথা হল, একই মানুষ বিবর্তিত হযে অশোকেব আমলেব সভ্যতায চলে এল ভীমবেটকায এবং সে মানুষেব পূর্ব-পুরুষ এক লক্ষ বছব কিংবা তাবও বেশি প্রাচীন। সুতবাং ভীমবেটকায মাত্র ৪০,০০০ বছরেব প্রাচীন ক্রোম্যানিযন মানুষেব ভূমিকা কী? আদৌ কোন ভূমিকা আছে কি? ভীমবেটকাব রহস্য আজও অনুদ্ঘাটিত। নৃতাত্ত্বিকবা এখনও এব পবিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পাবেন নি। লক্ষাধিক বৎসবেব প্রাচীন এই মানবগোষ্ঠী কাবা? ভীমবেটকার এই মানুষেবা নিশ্চযই 'ক্রোম্যানিযন' নয়। তবে এরা কাবা এবং ক্রোম্যানিযনদের বহু আগেই কী ভাবে এবা সৃষ্ট হল বা উদ্ভূত হল? এসব প্রশ্নেব উত্তব আজও অজানা। সুতবাং এটা মেনে নিতে দ্বিধা থাকছেই যে, ক্রোম্যানিয়ন জাতিব মানুষ হতেই পৃথিবীর বর্তমান জাতিসমূহেব উদ্ভব হযেছে।

ইদানীং এই ক্রোম্যানিযন তত্ত্বেব সত্যতার বিরুদ্ধে আবও দুটি ঘটনা জানা গেছে।

সেগুলি এখনও যথাযথভাবে প্রমাণিত হয় নি ঠিকই, কিন্তু এই দুটি ঘটনা আজ বহু পণ্ডিতকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই ঘটনা দুটি হল দুটি আবিষ্কার, যে আবিষ্কারগুলি সম্ভব হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই অর্থাৎ ২০০১ এবং ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে। এই আবিষ্কার দুটির বয়স যা বলা হচ্ছে, তা যদি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় এবং সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করে, তবে শুধু যে ক্রোম্যানিয়ন-তত্ত্ব নস্যাৎ হবে তাই নয়, আর্যগরিমা তত্ত্বও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে অনার্যগরিমাই পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর্যগরিমার ভ্রান্তি আরও জোরদারভাবে প্রমাণিত হবে। খুব সংক্ষেপে এই দুটি আবিষ্কারের কথা বলে নেওয়া যাক।

২০০১ খ্রীষ্টাব্দের আবিষ্কারটি হল গুজরাটের ক্যাম্বে উপসাগরের (Gulf of Cambay) জলের তলায় পাওয়া এক অতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ। গুজরাট উপকূল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ক্যাম্বে উপসাগরের জলের তলায় কিছু সমুদ্র-বিশারদ এই অতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। উপসাগরের প্রায় ৪০ মিটার (১৩১ ফুট) জলের তলায় প্রায় নয় কিলোমিটার লম্বা এক বিশাল প্রাচীন নগরীর ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হযেছে সমুদ্রেব তলায লুপ্ত হওয়া এক অতি প্রাচীন নদীগর্ভে। ওখান থেকে ২০০০-এর বেশি প্রত্নদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। একখণ্ড কাঠ এবং অন্যান্য কিছু প্রত্নদ্রব্য পরীক্ষাব পর বলা হচ্ছে, এই নিমজ্জিত নগরীর বয়স প্রায় ৯,৫০০ বছর। প্রত্নদ্রব্যগুলিব সব কটি পরীক্ষা করা হয়ে গেলে এই নিমজ্জিত নগরীর সঠিক বয়স হয়তো পাওযা যাবে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এর বয়স যা নির্ণীত হয়েছে তা হল ৭,৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

যে সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা ওই নিমজ্জিত নগবীর ছবি তুলেছেন তাঁরা পবীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলছেন যে, ওই নগরী লম্বায় প্রায নয় কিলোমিটার দীর্ঘ ছিল। নগরের দুর্গ ছিল, ১৭৩ মিটার (৫৬৭ ফুট) লম্বা শস্যাগারও ছিল। মহেঞ্জোদারোর মত স্নানাগারও দেখা গেছে এই নিমজ্জিত শহরে। হরপ্পার মত ২০০ মিটার (৬৫৬ ফুট) লম্বা এবং ৪৫ মিটার (১৪৮ ফুট) চওড়া প্ল্যাটফরম বা বেদীও পাওয়া গেছে জলের তলার ওই প্রাচীন নগরে। এই আবিষ্কারটি হঠাৎই হয়েছে। National Institue of Ocean Technology [NIOT]-এর কিছু সমুদ্র-বিজ্ঞানী ক্যাম্বে উপসাগরের দূষণ নিয়ে গবেষণা করছিলেন কিছুদিন ধরে। এঁরাই হঠাৎই এই নিমজ্জিত নগরীর সন্ধান পান। জলের তলায় অবস্থিত এই নগরীর বহু ছবি তোলেন এবং এখান থেকে প্রায় ২০০০ প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন। ছবি ও প্রত্নবস্তুগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা এখনও চলছে। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে, এই নগর প্রায় ৯,৫০০ বছরের পুরাতন। এর গঠনশৈলী হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর অনুরূপ। অনেকে মনে করছেন, এই নিমজ্জিত নগরই বলে দেবে নবোপলীয় আমলের শেষে যে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল তার থেকে অতি দ্রুত কীভাবে নগরভিত্তিক হরপ্পা সভ্যতার সৃষ্টি হল তার সঠিক হদিশ। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের (Archaeological Survey of India) প্রাক্তন মহানির্দেশক

এই আবিষ্কার সম্বন্ধে বলেছেন, "It could provide the missing links in understanding the rise of cities." এই মহানির্দেশক হলেন শ্রীজগৎপতি যোশী।

শ্রী যোশী আরও বলেছেন, "Historians have little evidence to show how a predominantly farming community in the Indian subcontinent took that giant leap forward in imagination and built some of the most well-designed cities in the world during the Indus period. ... Cambay opens for us the horizon of early settlements in the Neolithic Age in India that were hitherto known to exist in West Asia which may have powered the phenomenal transformation." প্রসঙ্গত বলা যায়, বালুচিস্তানের মেহেরগড়ে ৯,৫০০ বছরেব পুরাতন কৃষিভিত্তিক জনবসতির সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানের 'বোলান' (Bolan) নদীর শুষ্কখাতে। আব প্যালেস্টাইনের জেরিকোতে (Jericho) পাওয়া গেছে ১০ একব জমির উপর এক দুর্গ, যাব চারিদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, পরিখাবেষ্টিত ছিল। এই দুর্গে ছিল নিবীক্ষণ স্তম্ভ (Watch Tower)। এই ছোট্ট দুর্গ শহরটির বয়স নির্ণীত হয়েছে ৯,০০০ বছব। ক্যাম্বে উপসাগরের জলের তলায় যে নগর' পাওয়া গেছে তাও দুর্গ-নগব, কিন্তু বিশাল তার আযতন, আর বযসও তার বেশি— প্রায় ৯,৫০০ বছব। এই বযসটা সঠিক হলে এটিই হবে পৃথিবীর প্রাচীনতম নগব এবং এটি হবে হবপ্পা-মহেঞ্জোদাবোর পূর্বসূবি। একটা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা হঠাৎই কী কবে হবপ্পা-মহেঞ্জোদারোব পরিণত নগর সভ্যতায রূপান্তবিত হল তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে জলের তলায় নিমজ্জিত এই নগবটির ধ্বংসাবশেষ থেকে।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালযের প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক, যিনি হরপ্পা সভ্যতার অনেকগুলি কেন্দ্রের উৎখনন করেছেন, সেই গ্রেগবি পোসেল (Gregory Possehl) ক্যাম্বে উপসাগরের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, "There is no scientific reason to believe that the fossilised wood piece that was dated back to 7,500 B C, is linked to the ruins in the sea bed. Given the strong tidal movement of the region it could easily have been swept from elsewhwere." এই সমস্যার সমাধান হতে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আরও কিছুটা সময় দবকাব।

ক্যাম্বে উপসাগরের জলের তলার ওই শহরের বয়স যদি ৯,৫০০ বছর নাও হয়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। এই বযসটা ৫০০০ বছবেব থেকে ৪০০/৫০০ বছর বেশি হলেই হরপ্পা সভ্যতার হঠাৎ নগর-ভিত্তিক সভ্যতা হওয়ার 'মিসিং লিংক' (Missing Link) খুঁজে পাওয়া যায়। যাইহোক না কেন, ওই নিমজ্জিত নগরী হরপ্পা সভ্যতাকেই গৌরবান্বিত করবে। বাড়বে হরপ্পাব অনার্য সভ্যতার গরিমা। এখন কেবল প্রত্নবস্তুগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কিছুদিনের উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

দ্বিতীয় আবিষ্কারটির কথা জানা গেছে এই অক্টোবর মাসেই (২০০২ খ্রীষ্টাব্দ)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মহাকাশ সংস্থা হল 'নাসা' (NASA)। সেই নাসার এক উপগ্রহ পক্‌প্রণালীর কয়েকটা ছবি তুলেছে। পক্‌প্রণালী হল ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী সমুদ্র, যা বঙ্গোপসাগরের অংশ বিশেষ। ওই ছবিগুলিতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রের নিচে রয়েছে এক যোজক। এই যোজক এখন সমুদ্রের জলের নিচে। এই যোজক যোগ কবেছে ভারতবর্ষ ও শ্রীলঙ্কাকে। নাসা বলছে, এই যোজকটি লম্বায় প্রায় ৩০ মাইল। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠের বেশ কিছুটা নিচে। এর উপর দিয়ে বয়ে চলেছে সমুদ্র। নাসা তাদের এই ছবিগুলি ব্যাখ্যা করে আশ্চর্য কিছু কথা বলেছে। এই কথাগুলি কেবল আশ্চর্যই নয়, কিছুটা অবিশ্বাস্যও। নাসা বলছে যে, ওই সমুদ্রতলস্থ যোজকটি মানুষেরই বানানো এবং ওটি বানানো হয়েছিল সাড়ে সতেরো লক্ষ বছর আগে। প্রশ্ন হল, ১৭,৫০,০০০ বছর আগে সমুদ্রের উপর ৩০ মাইল লম্বা সেতু নির্মাণ করার মত মানুষ পৃথিবীতে ছিল কি? নৃতাত্ত্বিকদেব মতে পৃথিবীতে অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus) এসেছিল বিশলক্ষ বছব আগে। অর্থাৎ সাড়ে সতেবো লক্ষ বছব আগে যে সব মানুয ভারতবর্যে কিংবা শ্রীলঙ্কায বাস কবতো তাবা অস্ট্রালোপিথেকাসদেরই বংশধর। এরা ঠিক মানুষ ছিল না, ছিল মানুযেব পূর্ববর্তী পুরুষ মাত্র। এখন ওই প্রাগৈতিহাসিক যোজকটিব বয়স যদি সাড়ে সতেবো লক্ষ বছব সত্যিই হয়ে থাকে, তা হলে ওটিকে নির্মাণ কবল কাবা তা অজানা। কাবণ অস্ট্রালোপিথেকাসদেব পক্ষে ৩০ মাইল লম্বা ওই যোজক বানানো অসম্ভব। যে মানুষেবা ওই যোজকটি বানিয়েছিল তাবা নিশ্চযই ক্রোম্যানিযনদেব চেযে অনেক বেশি কিংবা তাদেব মতই বুদ্ধিমান ছিল। সাড়ে সতেবো লক্ষ বছর আগে এমন বুদ্ধিমান মানুযেব অস্তিত্ব বর্তমানেব ক্রোম্যানিয়ন-তত্ত্বকে নাকচ কবেই দেয। ওই যোজকটির বযস যদি সত্যিই ১৭,৫০,০০০ বছর হয়, তবে নৃতত্ত্ববিদদেব নতুন কবে লিখতে হবে মানব সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য।

যাইহোক, এখনকার নৃতত্ত্ববিদগণ একমত যে পৃথিবীতে বর্তমানে যত জাতি বিদ্যমান, তাবা সবাই ক্রোম্যানিয়ন থেকেই উদ্ভূত। ভীমবেটকাব কথা তাঁবা বলেন নি। অবশ্য ভীমবেটকার আবিষ্কাবও হযেছে বহু পবে। তাঁদের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানুয একই বর্গ (Genus) ও প্রজাতি (Species) হতে উদ্ভূত। তবে তাদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্যমূলক আবযবিক পার্থক্য আছে, তার জন্য তাদের বিভিন্ন জাতি পর্যায়ের লোক বলা হয (Races)। মোটামুটি তাদের তিনটি পর্যায়ভুক্ত কবা হয়েছে· যথা (১) ককাসযেড (Caucasoid), (২) মঙ্গোলয়েড (Mongoloid) ও (৩) নিগ্রযেড (Negroid)। এদেব আবাব বিভিন্নগোষ্ঠীতে ভাগ কবা হযেছে। নিচের সাবণিতে তা দেখানে হল।

ককাসয়েড	মঙ্গোলয়েড	নিগ্রয়েড
(ক) নর্ডিক	(ক) এশিয়াটিক	(ক) আফ্রিকান
(খ) মেডিটেরেনিয়ান	(খ) ওশিয়ানিক	(খ) ওশিয়ানিক
(গ) আলপাইন	(গ) আমেরিকান ইন্ডিয়ান	(গ) নিগ্রিটো

যে কারণে এই সকল নরগোষ্ঠীর মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য ঘটেছে, তা হচ্ছে— (১) Gene Mutation বা জীনঘটিত পরিব্যক্তি, (২) Natural Selection বা প্রাকৃতিক নির্বাচন, (৩) Genetic Drift বা জীনের নিস্ক্রিয়তা, (৪) Environmental Influence বা পরিবেশের প্রভাব, ও (৫) Population Mixture বা জন-মিশ্রণ। তবে উপরের এই নবগোষ্ঠীব বিভাগ নিযে নানা মতভেদ আছে। মোটামুটিভাবে উপরেব বিভাজনটি বেশিব ভাগ পণ্ডিতই মেনে নিয়েছেন। এ নিযে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা একটু পরেই করা হচ্ছে।

উপরের জাতি বিভাগে ভারতের 'অনুঅস্ট্রালয়েড বা 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড'-দের কথা নেই। কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ 'ব্লাড গ্রুপ' (Blood group) ভেদেব ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলেছেন। তাঁরা ব্লাড গ্রুপে 'জিন' বন্টনের শতকরা মাত্রা দেখে মানবজাতিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ কবেন। যেমন ঃ ককেশীয় বা ককাসযেড ('শ্বেত') নিগ্রোয়েড ('কৃষ্ণ'), মঙ্গোলযেড ('পীত'), আমেবিকাব 'বেড ইন্ডিযান' এবং 'অস্ট্রালযেড'। ভারতেব আদিম অধিবাসী সম্পর্কে ডাঃ অতুল সুব তাঁর 'মানব সভ্যতাব নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইটিতে লিখেছেন ঃ

"দক্ষিণে মঙ্গোলযেডরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিযা ও ইন্দোনেশিয়াব দিকে অগ্রসর হয়ে, দেশজ অস্ট্রালযেডদেব সঙ্গে মিশ্রিত হযে, পূর্বদিকে নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদেব সঙ্গে মিশ্রিত হয। এখানে আমবা অস্ট্রালযেডদেব উল্লেখ কবেছি। ভারতেব দেশজ অধিবাসীদের অনু-অস্ট্রালযেড বা 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' বলা হয়। তাদেব গায়েব বঙ কালো, এবং তা থেকে লোক সহজেই ভুল কবতে পাবে যে তাদেব মধ্যে নিগ্রো বক্তেব সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু তা নয়। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে কবেন যে, তারা প্রত্ন-ককাসযেড (Palae-Caucasoid) জাতিব সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ই অ্যাডামসন হোযেবেল (E. Adamson Hoebel) বলেছেন—

'The fact that the dark-brown Australoids are called black fellows, leads us to the easy error of thinking of them as Negros. They decidedly are not. Their hairiness of head and body and the waviness of their hair indicate a strong probability of archaic Caucasoid relation such as predominant in the Ainus.'

ভারতের আদিম অধিবাসীদেব 'প্রোটো-অস্ট্রালযেড বা অনু-অস্ট্রালয়েড' বলবাব উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্ট্রেলিযার আদিম অধিবাসীদেব সঙ্গে তাদের রক্তের মিল আছে। মানুষের বক্তকে সাধারণত চাব শ্রেণীতে বর্গীকৃত করা হয়, যথা 'O', 'A', 'B' ও 'AB'। ভারতের 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, এই উভয়ের রক্তেই 'A_2' এগ্লুটিনোজেন-এর (A_2Agglutinogen) শতকরা হার খুব বেশি। তা থেকে উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোঝা যায়। হোয়েবেল আবার বলেছেন—

'It is significant "A" blood occuring in American Indians, Asiat-

ics, Pacific Islanders and Australia is all "A_2" This fact reinforces the idea of their common ancestry'.

এক সময আদি-অস্ট্রালদেব ব্যাপ্তি উত্তব ভাবত থেকে প্রশান্ত মহাসাগবেব ইস্টাব দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে কবেন যে, আনুমানিক ৩০,০০০ বৎসব পূর্বে তাবা ভাবত থেকে অস্ট্রেলিযা মহাদেশে গিযে প্রথম পৌঁছায। সেটা অন্তিম প্রত্নোপলীয যুগেব ব্যাপাব।"

সোভিযেত নৃতত্ত্ববিদবা বলেছেন পৃথিবীব ৫৩ ভাগ মানুষই ককাসযেড বা ইউবোপিঅযেড মহাজাতিব অন্তর্ভুক্ত। তাঁদেব মতে ভাবতেব অধিকাংশ মানুষই ইউবোপিঅযেড মহাজাতিব অন্তর্ভূত। তাঁবা ১৯৬৪, ১৯৬৬ এবং ১৯৭১ সালে ভাবতে এ নিযে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা চালান। ভাবতেব (?) তথাকথিত প্রগতিশীল (?) নৃতত্ত্ববিদদেব সঙ্গে একমত হযে তাঁবা ঘোষণা কবেন যে, ভাবতেব অধিকাংশ লোকই ককাসযেড বা ইউবোপিঅযেড মহাজাতিব আন্তর্ভুক্ত। এটা অনেকটা যেন ম্যাক্সমুলাব মহোদযগণেব আর্যগবিমা প্রচাব কবাব মত ব্যাপাব বলেই মনে হয। তাঁবা ইউবোপিঅযেডদেব বা ককাসযেড-দেব বর্ণনায বলেছেন ঃ

"ইউবোপিঅয়েড জাতিব স্বকীয চাবিত্র্য-লক্ষণ ঃ গাঢ হালকা থেকে গাঢ বর্ণেব এমন কি বাদামী, মুখমণ্ডল বক্তিম অথবা মৃদু বক্তিম আভাকীর্ণ, কেশ কোমল, কেশ তবঙ্গিত (কখনো সবল), হালকা থেকে নানা পর্যাযেব গাঢবর্ণেব, দেহবোম পর্যাপ্ত অথবা মধ্যমঘন, মুখমণ্ডল সুগঠিত, কপাল সমতল বা ঈষৎ ঢালু।

মুখেব মধ্যভাগ (নাসামূল থেকে ওষ্ঠদ্বযেব মধ্য বিন্দু অবধি) তীক্ষ্ণভাবে উত্থিত কিন্তু গণ্ডাস্থি ও চোযাল অপ্রকট, মুখমণ্ডল সাধাবণভাবে অনুদ্গত (অর্থাৎ প্রকট অভিক্ষেপহীন অথবা অভিক্ষিপ্ত অংশবিহীন), চক্ষুকোণদ্বয একই সমতলে অবস্থিত এবং অক্ষিপুটেব ভাঁজ স্বল্প উদ্ভিন্ন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চক্ষু বাদামী বর্ণ, কিন্তু ইউবোপেব উত্তবাঞ্চলীয বহু লোকেব চোখ ধূসব অথবা হালকা থেকে গাঢ নীল, নাসা সংকীর্ণ, নাসাযোজক যথেষ্ট উঁচু, নাসাবন্ধ্রেব লম্বাক্ষ সামনে থেকে পেছনে প্রায সবল বৈখিক (একে নাসাব তীবাবস্থান বলে), ঠোঁট পাতলা অথবা মধ্যম স্থূল কিন্তু প্রবর্ধিত নয। অপ্রলম্ব ওষ্ঠ, চিবুক মধ্যম অথবা প্রকটভাবে উদ্ভিন্ন, মুণ্ডেব আকৃতি বিবিধ এবং তিন প্রকাব মুণ্ডই বহুব্যাপ্ত।"

এই দেহ বৈশিষ্ট্যগুলি বেশিব ভাগ ভাবতীযদেব মধ্যে প্রকট নয। তাই অধিকাংশ ভাবতীয ককাসযেড বা ইউবোপিঅযেড মহাজাতিব অন্তর্ভুক্ত বলে সম্ভবত মানা যায না। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ বিচার্ড গোলডস্বি (Richard A Goldsby) এবং সমগোত্রীয পণ্ডিতবা মঙ্গোলয়েড, ককাসয়েড ও নিগ্রোযেড ছাডা ভাবতীয উপমহাদেশের জনগণেব অধিকাংশকে এক বিশেষ মহাজাতিব অন্তর্ভুক্ত বলে মনে কবেন। গোলডস্বি তাঁব 'Race and Races' বইয়ে ভাবতীয় উপমহাদেশেব মানবজাতি সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

"Races of the Indian Subcontinent : Skin colour in these groups

ranges from light through medium brown to black. The hair is straight or wavy and black. Eyes are brown to black, lips thin to medium full, and cheekbones distinct. Although some populations within this racial aggregate are tall, particularly those of northern India, most of the people inhabiting the subcontinent are of medium height. Two major populations can be recongnized :

(a) Indian—most of India and Pakistan and Bangladesh.

(b) Southern Indian—southern India and Sri Lanka (Ceylon)."

ভারতীয় উপমহাদেশেব অধিকাংশ মানুষই আদি-অস্ট্রেলীয় এবং দ্রাবিড় জাতি থেকে উদ্ভুত। এখন অবশ্য ভারতীয়রা এক মিশ্র জাতি। এদের মধ্যে রয়েছে আদি-অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড়, আলপীয়, দিনারিক, নর্ডিক ও মঙ্গোলীয় নবগোষ্ঠী এবং তাদের মিশ্রণে উদ্ভুত মানুষজন।

ককাসয়েড বা ইউবোপিঅয়েডদেব সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি একটু আগেই বলা হয়েছে। এদের নর্ডিক গোষ্ঠীকে সহজেই চিনিয়ে দেয তাদের নীল বা কটা বংয়ের চোখ। আর্যরা ছিল এই নর্ডিক গোষ্ঠীর লোক একথা অনেকবাবই বলা হয়েছে। আর হিটলার নিজেকে আর্যদের খাঁটি উত্তরপুরুষ ধবে নিযে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নিশ্চিহ্ন কবে দিযেছেন। নৃতত্ত্ববিদবা ককাসযেড বা ইউরোপিঅযেডদেব সম্পর্ক বলেছেন :

"The Caucasoid Racial Groups : The Caucasoid groups have a wide range of skin colour, varying from the pale, translucent, alabaster white frequent among Scandinavians, through the Mediterranean light brown common among Greeks, to the darker brown typical of Arabs. Similarly, the Caucasoid groups have a wide range of eye colour, from the blue frequent in Sweden to the dark brown characteristic in Greece.

The hair of Caucasoids—yellow, red, brown, black—is usually straight or wavy. Although the structure of the nose varies greatly, ranging from high and narrow to broad and snub, the lips usually are thin. Many male Caucasoids can grow heavy beards, and both sexes have a relatively large amount of body hair. Caucasoid body builds vary considerably, from the medium stature of Mediterranean peoples to the tall dingy built characteristic of Scandinavians"

এদের গড় উচ্চতা ১৭০ সেন্টিমিটার। তীক্ষ্ণ নাসা, নীল বা কটা চোখ, ফ্যাকাশে থেকে গাঢ় বাদামী গাত্রবর্ণ, কোঁকড়ানো চুল ইত্যাদি হল ককাসযেড়দের বৈশিষ্ট্য। এদের একালে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

"The four major Caucasoid racial groups are :

(a) Northwest European.
(b) Northeast European.
(c) Alpine—along a mountainous belt from France eastward through the Balkans.
(d) Mediterranean—both sides of the Mediterranean and eastward to Arabia and Iran."

একালে কিছু নৃতত্ত্ববিদ আবার ভাবতসহ শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দ্রাবিড় ও অনুরূপ নর গোষ্ঠীর গঠন সাদৃশ্য ইত্যাদি দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এরা নিগ্রোয়েড-অস্ট্রালয়েড। আগেই বলেছি, ভারতের দেশজ অধিবাসীরা হল প্রোটো অস্ট্রালযেড বা আদি-অস্ট্রেলীয (Proto-Australoid) এবং তারপর এখানে উদ্ভূত হয়েছে দ্রাবিড়রা। এরা সম্ভবত উদ্ভূত হযেছিল আদি-অস্ট্রেলীযদেব সঙ্গে ভূমধ্যসাগবীয় নরগোষ্ঠীব মিশ্রণে কিংবা অস্ট্রেলীয়দেব বিবর্তনে। আন্দামান অঞ্চলকে বাদ দিলে ভাবতের অধিবাসীবা এখন যে ছয়টি জাতিব মিশ্রণ সেগুলি হল— আদি অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড়, দিনাবিক, আলপীয, মঙ্গোলীয এবং নর্ডিক। আন্দামানের অধিবাসীরা নিগ্রোযেড। দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে নিগ্রোযেডদের কোন সম্পর্ক নেই। এদেব সম্পর্ক আছে ভূমধ্যসাগবীয (Mediterranean) এবং আদি-অস্ট্রেলীযদেব সঙ্গে। দ্রাবিড় নবগোষ্ঠী আদি-অস্ট্রেলীয়দেব বিবর্তনে উদ্ভূত হযেছে বলে অনেক পণ্ডিতেব ধাবণা। যাইহোক না কেন, এই দ্রাবিড জাতিই হবপ্পা সভ্যতাব মুখ্য স্থপতি। আদি-অস্ট্রেলীযরা হবপ্পা সভ্যতার সৃষ্টিতে দ্রাবিড়দেবই প্রধান সহযোগী। নর্ডিক আর্যবা প্রথমে এদেশে এসে কেবল ধ্বংসই করেছে, তাবপব মিশে গেছে হবপ্পীযদেব সঙ্গে, গ্রহণ কবেছে হবপ্পীয সংস্কৃতি। সৃষ্টি হযেছে ভাবতীয় আর্য-সভ্যতা।

আবারো বলি, ক্রোম্যানিযন মানুযের উদ্ভব হয চল্লিশ হাজাব বছর আগে। বলা হচ্ছে, এই ক্রোম্যানিযন মানুয থেকেই নাকি মহাজাতিগুলিব উদ্ভব। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। মাত্র ৪০,০০০ বছব আগে পৃথিবীতে এসে এই ক্রোম্যানিয়ন মানুষ এতো দ্রুত বিবর্তিত হয়ে মহাজাতিগুলিতে রূপান্তরিত হলোই বা কী করে? একটা মহাজাতির সঙ্গে অন্যটির হাজারো পার্থক্য। এমন কি জিনগত পার্থক্যও বিদ্যমান। কবি বলতে পারেন 'শ্বেত পীত কালো করিযা সৃজিলে মানবে সে তব সাধ/আমরা যে কালো তুমি জানো ভালো নহে তাহা অপরাধ', কিন্তু বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় ঘাটতি বয়েই যাচ্ছে। ক্রোম্যানিযন মানুষ থেকে মহাজাতিগুলির উৎপত্তি হলে তাদের মধ্যে আকৃতিগত, বর্ণগত, বৈশিষ্ট্যগত হাজারো পার্থক্য কেমন করে এলো, যার অনেকগুলিই জিনের গুণাবলীর পরিবর্তন বা পরিব্যক্তি (Mutation) ছাড়া অসম্ভব? এতো দ্রুত পরিবর্তনই বা কী ভাবে ঘটল? এগুলির যথেষ্ট সদুত্তর নৃতত্ত্ববিদ বা বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেন নি।

১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো দুটি সম্মেলন করে জাতি সমস্যার জীবতাত্ত্বিক প্রত্যয় নিয়ে। সে দুটিতে যে ঘোষণাপত্র নৃতাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানীদের স্বাক্ষরিত হয়ে বের হয় তাতে বংশগত বৈশিষ্ট্য ও বংশগতির বুনিয়াদের উপর পরিবেশগত প্রভাবের

বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জৈবিক প্রভেদ হয় বলে বলা হয়েছে। ক্রোম্যানিয়ন মানুষের মধ্যে জিনের পরিব্যক্তি বা মিউটেশন কী ভাবে ঘটল, কেন ঘটল তা অজানা। ধরা হয়, তা ঘটেছিল এবং তার ফলেই বংশগতি এলো। একই ধরনের মানুষ তিনটি কিংবা চারটি মহাজাতিতে ভাগ হয়ে গেল। এটা মেনে নিলেও জিনের পরিব্যক্তির কারণে তাদেব গুণাবলীর পবিবর্তনের সঙ্গে মানসিক পরিবর্তন ঘটেনি এটা মেনে নেওয়া যায় না। মননশীলতাব, মানসিকতার পার্থক্য অবশ্যই ঘটেছে। তা না হলে শুধু পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে হরপ্পার লোকেরা পৃথিবীতে সবার আগে সভ্য হয়েছে, কিংবা ভীমবেটকাব মানুষেরা সবাব আগে গুহা-চিত্র এঁকে ফেলেছে অথবা ক্যাম্বে উপসাগরের জলেব তলায পাওয়া প্রাচীন নগর ৯৫০০ বছর আগে নির্মাণ করেছে, কিংবা পকপ্রণালীব জলেব তলায় পাওয়া সেতু সাড়ে সতেরো লক্ষ বছর আগে বানিয়ে ফেলেছে— এ তত্ত্ব মেনে নেওযা মুশকিল। আবারও বলি, ভীমবেটকাব মানুষবা কাবা তাব ব্যাখ্যা নৃতত্ত্ববিদবা আজও কবে উঠতে পাবেন নি। প্রায এক লক্ষ বছর ধবে একই জাযগায তাদেব বিবর্তন হওযা, ৩০,০০০ বছব আগে তাদেব গুহাচিত্র অঙ্কন ইত্যাদি ক্রোম্যানিযন মানুষদেব থেকে তাদেব উদ্ভব হওযার তত্ত্ব কোনও ভাবেই সমর্থন কবে না। ভীমবেটকাব প্রাচীন মানবদেব বিবর্তনের সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলে ক্রোম্যানিযন মানুষদেব থেকে আধুনিক মানুষেব উৎপত্তির তত্ত্ব সঠিক নাও হতে পাবে। এই ক্রোম্যানিয়ন তত্ত্বকে সঠিক ধবে নিযে আর্যগবিমাব ভ্রান্তি নিয়ে আবও আলোচনায আসা যাক। মানসিক গঠনে এই আর্য তথা নর্ডিক নবগোষ্ঠীর লোকবা ৪০০০ বছর আগেও বর্বব ও ধ্বংসকামী ছিল। ভি গর্ডন চাইল্ড থেকে শুরু করে একালেব অধিকাংশ ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক একবাক্যে মেনে নিয়েছে যে, আর্যরা ছিল বর্বর এবং তাবা পৃথিবীব যেখানেই গেছে সেখানেই তারা ধ্বংস করেছে সেখানকার উন্নতমানেব সভ্যতা এবং সংস্কৃতি। সুতরাং আর্যগরিমা বলতে কিছু ছিল না। এটা একটা গালগল্প বা 'মিথ' (Myth) মাত্র।

যাইহোক, জিনেব পবিব্যক্তির ফলে ক্রোম্যানিয়নদেব শারীবিক এবং মানসিক উভয়বিধ পরিবর্তন ঘটেছিল। পরিবেশও কিছুটা তাতে সাহায্য করেছিল। এর ফলেই মহাজাতির উদ্ভব হল। কিন্তু জিনেব পবিব্যক্তি কী ভাবে কখন হল তা অজানা। তবে এটা ঠিক জিনেব পরিব্যক্তি না হলে শারীরিক, মানসিক গঠনের এই হাজারো পার্থক্য থাকতো না তিন বা চার মহাজাতিব মধ্যে। ইউনেস্কোব সম্মেলন অবশ্য তিন মহাজাতির কথা বলেছে। তারা অস্ট্রালযেড বা প্রোটো-অস্ট্রালযেডদেব মহাজাতি হিসাবে গণ্য করেনি। যদিও ভারতের দ্রাবিড়রা এবং এই উপমহাদেশেব বেশিবভাগ মানুষই প্রোটো-অস্ট্রালয়েড এবং দ্রাবিড়গোষ্ঠীর লোক। যাইহোক, ক্রোম্যানিয়ন মানুষ থেকে মহাজাতি উদ্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতিব মানুষের শাবীবিক ও মানসিক গঠনশৈলীব বহু পার্থক্য হয়েছে। এখন সে পার্থক্য অগুনতি, অসংখ্য। আব এই পার্থক্য ঘটেছে মূলত জিনগত পার্থক্যের কারণেই। পরিবেশগত কাবণ সামান্য কিছুটা হয়ত আছে তবে তা

মুখ্য নয। মানসিক পবিবর্তনও ঘটেছে জিনেব পবিব্যক্তিব কাবণে। মানসিকতাব প্রভেদই কাউকে ধ্বংসাত্মক কবেছে, কেউ হযেছে গঠনশীল। কেউ ব্যবসা পছন্দ কবে, কেউ অধ্যাপনা, কেউ পছন্দ কবে যুদ্ধ, কেউ বা শান্তি। মানুষে মানুষে মানসিকতাব এই পার্থক্য জিনগত পার্থক্যেব কাবণেই ঘটেছে। তা ঘটিযেছে ক্রোম্যানিযন মানবদেব জিনেব পবিব্যক্তি। এবই ফলে অর্থাৎ মানসিকতাব পার্থক্যেব ফলেই বিবর্তনেব পথে কেউ কেউ আগে সভ্য হযেছে, কেউ কেউ পবে। ভাবতবর্ষে ২৫০০ বছব আগে বুদ্ধদেব যখন অহিংসাব বাণী প্রচাব কবে বেডাচ্ছেন তখনও ইংলন্ডেব স্যাকসনবা (Saxons) বাস কবছে গাছেব উপব। তাবা তখনও অসভ্য এবং মাটিতে নামেনি। সুতবাং মহাজাতিগুলিব মধ্যে শাবীবিক এবং মানসিক পার্থক্যেব সৃষ্টি হয ক্রোম্যানিযন মানবেব মহাজাতিব বিভিন্নতায ৰূপান্তবণেব সময থেকেই। ককাসযেড মহাজাতিব নর্ডিকবা তাব ফলে যে মানসিকতাব অধিকাবী হয তা ধ্বংসেব, অত্যাচাবেব ও বর্ববতাব। তাদেব পবিবেশও পববর্তীকালে এই ব্যাপাবে মদত যোগায।

সুতবাং আর্যদেব মানসিকতাতেই ছিল ধ্বংস, অত্যাচাব ও বর্ববতা। তাবা সভ্যতাব অগ্রগতি ব্যাহত কবেছে তাদেব ওই ধ্বংসকামী মানসিকতায। ভাবতে প্রাগার্যদেব সঙ্গে মিশ্রণেব ফলে তাদেব জিনগত পবিবর্তন হয। জিনেব পবিবর্তনেব সঙ্গে মানসিকতাও যায বদলে। ২০০/৩০০ বছবেব মধ্যেই তাদেব ধ্বংসাত্মক মানসিকতা যায বদলে। বচিত হয বেদ, উপনিষদ, বামাযণ, মহাভাবত, পুবাণ ইত্যাদি। এগুলিব বচযিতাবা অধিকাংশই ছিলেন অনার্য। তাছাডা আর্যদেব কোনও লিপি ছিল না। তাই সমস্ত লেখাব কাজ কবেছেন অনার্য লিপিকববাই। গণেশ এই লিপিকবদেব অন্যতম। আব বেদ বিভাজনকর্তা, মহাভাবত বচযিতা ব্যাসদেব নিজেও ছিলেন অনার্য। তাঁব পিতা পবাশব মুনিব গাযে বং ছিল কালো—তিনি ছিলেন 'অসিত'। তাঁব মা ছিলেন ধীবব বমণী বা অনার্য বমণী। ব্যাসদেবেব নিজেব গাযেব বঙও ছিল ঘনকৃষ্ণবর্ণ। এঁবা কেউই গৌববর্ণ আর্য ছিলেন না। মহর্ষি বাল্মীকিও ছিলেন অনার্য। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ডাকাত বা দস্যু। আর্যবা এদেশীয আদি-অধিবাসীদেব বলতো 'দস্যু'। পবে তিনি ৰূপান্তবিত হন মহর্ষিতে। তাঁব মানসিক পবিবর্তন ঘটেছিল, শাবীবিক নয। মূলতঃ তিনি ছিলেন অনার্য। উপনিষদ বচনাকাবদেব অধিকাংশই ছিলেন অনার্য কিংবা আর্য-অনার্যেব মিশ্রণ। পূর্ববর্তী পবিচ্ছেদে বলা হযেছে যে, প্রায ৭০০ বছবেব মিশ্রণে আর্যবা তাদেব আর্যত্ব তথা বর্ববতা হাবিযে মিশে যায প্রাগার্য ভাবতীযদেব সঙ্গে অর্থাৎ অনার্যদেব সঙ্গে। উপনিষদগুলি সেই মিশ্রজাতিব বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তাব ফসল। এগুলিতে অনার্যদেব অবদানও কম ছিল না। সুতবাং আর্যগবিমা প্রচাবেব জন্য ম্যাক্সমুলাব সাহেববা যে বেদ-উপনিষদ বামায়ণ-মহাভাবত-পুবাণ ইত্যাদি আর্যদেব বচিত বলে প্রচাব কবেছিলেন সে প্রচাব একদম ঠিক নয। এগুলিব বচনায এবং লেখনে অনার্যদেবই অবদান সর্বাধিক, আর্যদেব নয। যে গবিমাব গৌবব ম্যাক্সমুলাব সাহেববা এক সময আর্যদেব প্রাপ্য বলে প্রমাণ কবেছিলেন, সে গৌবব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাওযা উচিত প্রাগার্য বা অনার্য জাতিদেব,

যারা হরপ্পা সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল। ম্যাক্সমুলার সাহেবরা যখন আর্যগরিমা প্রমাণ করেন তখনও হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় নি। হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর আর্যগরিমা অস্তিত্বহীন, ভ্রান্তিমাত্র। সব গৌরব প্রাপ্য হচ্ছে প্রাগার্যদের বা অনার্য ভারতীয়দের। ভারতীয় আর্য সভ্যতায় প্রকাশ ঘটেছে ভারতীয় অনার্য গরিমার।

হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা ছিল অনার্য সভ্যতা। সেই সভ্যতার যা কিছু গৌরব সবই অনার্যদের প্রাপ্য আর্যদের নয়। সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে ম্যাক্সমুলার সাহেবদের অনুসরণে আমরা আর্যদের মাথায় তুলে ছিলাম। আর্যগরিমার গৌরবের অংশীদার হয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করতাম। চমৎকৃত হয়ে ভাবতাম, উরাল পর্বতের দক্ষিণ থেকে আসা এক দল গৌরবর্ণ, কটা বা নীল চোখওয়ালা দীর্ঘদেহী লোক ইরাণ ও ইরাক বা মেসোপটেমিয়া এবং ভারতবর্ষকে এক উন্নত সভ্যতা দান করেছিল। একটা প্রশ্ন মনে আসত স্বাভাবিকভাবেই। সেটা হল, তথাকথিত সভ্য এবং উন্নত আর্যদের খাদ্যাভাব হয়েছিল কেমন করে! এখন অবশ্য সবাই জানে আর্যরা ছিল যাযাবর ও বর্বর পশুপালক জাতি মাত্র। তারা যেখানেই গেছে সেখানেই তারা উন্নতমানের সভ্যতাকে ধ্বংস করে নিজেদের হীন সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতবর্ষে তাবা অনার্যদের পরাজিত কবলেও অনার্যদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে তারা মাথা নত কবেছে। সভ্যতার গরিমা যদি কাবও থেকে থাকে তবে তা অনার্যদেবই। আর্যগরিমা ছিল একটা ভ্রান্তিমাত্র।

ডঃ অতুল সুর তাঁব 'হিন্দুসভ্যতার উৎস' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "গ্রেগবী পশেল (Gregory Possehl) হচ্ছেন আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালযেব পুরাতত্ত্বেব একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক। সম্প্রতি তিনি সুনাম অর্জন করেছেন 'এনসিযেন্ট সিটিজ্ অভ্ দি ইন্ডাস' (Ancient Cities of the Indus) নামক একখানি বই সম্পাদন করে। পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে তিনি জগতের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের তুলনামূলক অনুশীলন করেছেন। তিনি বলেন যে, চীন, সুমের ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহেব তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই জগতের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন এক বিস্তৃত অঞ্চলে শতাধিক স্থানে পাওয়া গিয়েছে এবং এটা ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এই সিন্ধুসভ্যতাই ছিল হিন্দুসভ্যতার উৎস।

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশক পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে হিন্দুসভ্যতা আগন্তুক আর্যগণ কর্তৃক উদ্ভূত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে দাস, দস্যু, অসুর, পণি, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি, যে সকল দেশজ অনার্য জাতিসমূহের উল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই, তারা সবাই বর্বর ও অসভ্য জাতি ছিল। সেই যুক্তির ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে উদ্ভূত হিন্দুসভ্যতা আর্যগণ কর্তৃক সৃষ্ট সভ্যতা বলে গৃহীত হয়েছিল। এই ধারণাই পণ্ডিতমহলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই ধারণাকে এক নিমিষেই নস্যাৎ করে দেয় বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে আবিষ্কৃত যুগান্তকারী সিন্ধুসভ্যতা।"

তিনি আরও লিখেছেন ঃ "পণ্ডিতমহলে এটা প্রায় সর্ববাদীসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে, আগন্তুক আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে কোন সময় ভারতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার প্রাদুর্ভাবকাল নির্ণীত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর থেকে ১৯০০ বছর পর্যন্ত। সিন্ধুসভ্যতার এই প্রাদুর্ভাবকাল রেডিয়োকার্বন-১৪ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি। প্রথম, সিন্ধুসভ্যতা আগন্তুক আর্যসভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন, এবং দ্বিতীয়ত সে সভ্যতার বাহকরা বর্বর অসভ্য জাতি ছিল না। বস্তুতঃ যে সকল অনার্যজাতিব উল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই, তাদের সভ্যতাব তুলনায় আর্যসভ্যতা অনেক বর্বর সভ্যতা ছিল। এটা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পাবব, যদি আমরা স্মরণে রাখি যে আর্যসভ্যতা ছিল গ্রামীণ সভ্যতা, আব সিন্ধুসভ্যতা ছিল নাগবিক সভ্যতা। বৈষয়িক ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই সিন্ধু সভ্যতাব বাহকরা আর্যগণ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। যদিও বৈদিক সাহিত্যে তাদেব প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি কবা হযে থাকে, তাব একমাত্র কাবণ দুই সভ্যতাব বৈপবীত্য।"

অতএব আর্যগরিমা ব্যাপাবটাই একটা Myth বা ভ্রান্তি। বর্বব আর্যদেব যেটুকু হীন সভ্যতা ছিল কিংবা যে সব সংস্কৃতি ভাবতে আসবাব পথে মেসোপটেমিয়াব জনগণের কাছে তাবা শিখেছিল, তাব অধিকাংশেবই বিলুপ্তি ঘটেছিল হবপ্পা সংস্কৃতিব প্রভাবে। মৌলিক আর্য সভ্যতাব ক্রমবিলুপ্তি ঘটেছিল এবং মৌলিক অনার্য তথা প্রাগার্য সভ্যতারই বিকাশ ঘটেছিল হিন্দু সভ্যতাব মধ্যে।

আগেই বলেছি, আর্যসভ্যতা কোন বিশেষ যুগেব সভ্যতা নয। বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা আর্যসভ্যতার যে চিত্র পাই সেটা হচ্ছে কালক্রমিক সভ্যতাব চিত্র। যে সময়কালের মধ্যে ওই সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল, তা হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ বছর থেকে ৫০০ বছর পর্যন্ত। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে সবচেযে প্রাচীন হচ্ছে ঋগ্বেদ। তারপব সামবেদ ও যজুর্বেদ। সবশেযে রচিত হয়েছিল অথর্ববেদ। অথর্ববেদ রচনার আনুমানিক সময় হচ্ছে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সুতবাং ঋগ্বেদের সভ্যতা থেকে অথর্ববেদের সভ্যতার মধ্যে সময়কালের ব্যবধান ছিল কমবেশি এক হাজার বছব। এর মধ্যে এবং পরে রচিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদসমূহ। ঋগ্বেদের প্রায় সাতটি কালস্তর আছে। কালক্রমিক গ্রন্থ বলে এতে কোনও বিশেষ সময়ের সামাজিক কিংবা নৃতাত্ত্বিক চিত্র নাই। তাই বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার, বীতিনীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞেব চিত্র এর মধ্যে স্থান পেযেছে। এমন কি আর্যবা ভারতবর্ষে আসার আগে তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার কেমন ছিল তাবও কিছু হদিশ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

সিন্ধুসভ্যতা ছিল নগরভিত্তিক সভ্যতা। সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার যে সকল লক্ষণ, তার সবই বর্তমান ছিল সিন্ধুসভ্যতার নগরসমূহে। অপরপক্ষে বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামভিত্তিক সভ্যতা। আর্যরা ছিল যোদ্ধার জাত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকের জাত। এই বণিকদের ঐশ্বর্য ও ধনদৌলত আর্যদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার

করেছিল। সেজন্যই আর্য গ্রামবাসীরা সিন্ধুসভ্যতার নগবসমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। নগরসমূহকে ধ্বংস কবে বিজয়গৌববেব উন্মত্ততায তাবা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম বেখেছিল 'পুবন্দব'। এই ধ্বংসই প্রমাণ করে আর্যগরিমা নয়, আর্য বর্বরতা। ঋগ্বেদ থেকেই আমবা পাই আর্যদেব বর্বরতার নানা চিত্র। বেশ কিছু তেমন চিত্র-সম্বলিত সূক্ত আগেই উদ্ধৃত করা হযেছে। আবাবও বলা যায, আর্যগরিমা এক ভ্রান্তিমাত্র।

আর্যদের কোনও লিপি ছিল না। হবপ্পীয়দেব সুন্দব ও বলিষ্ঠ লিপিমালা ছিল। বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত প্রথমে সম্ভবত হরপ্পীয় লিপিমালায লিখিত হয। 'সম্ভবত' বলা হচ্ছে এই জন্য যে এগুলি কোন্ লিপিতে প্রথম লেখা হযেছিল তা আজও অজানা। যেহেতু অনার্য লিপিকর গণেশকে মহাভাবত লিখতে ডাকা হয়েছিল তাই অনুমান করা হয এই সব গ্রন্থ প্রথমে অনার্য হবপ্পীয লিপিতেই লেখা হযেছিল। আর্যদের লিপি ছিল না, তাই তাবা অনার্য তথা হবপ্পীয লিপি বিশাবদ অনার্য গণেশকেই এই সব গ্রন্থ, বিশেষ কবে মহাভাবত লেখাব ভাব দিযেছিল। সুতবাং বেদ উপনিষদ ইত্যাদি লেখাব কৃতিত্বটা অনার্যদেবই পুবোপুবি প্রাপ্য, আর্যদেব নয। আগেই দেখিযেছি যে, এগুলিব বচযিতাদেব অধিকাংশই অনার্য কিংবা মিশ্রিত জাতিব। সুতবাং বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি রচনাব কৃতিত্বও আর্যদেব প্রাপ্য নয। আগেই বলেছি, বেদবিভাজনকাবী বেদব্যাস ছিলেন অনার্য সন্তান এবং পুবোপুরি অনার্যই। আবাব ভাবতেব অধিকাংশ লিখন প্রণালীই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। ইদানীং পণ্ডিতেবা বলছেন, আদি ব্রাহ্মী লিপিব উদ্ভব হযেছিল হবপ্পীয লিপি থেকেই। সুতবাং ভাবতেব সমস্ত লিপিরই জনক হল হবপ্পীয লিপি। এই কৃতিত্ব অনার্য হবপ্পীয়দেবই, আর্যদেব নয।

ভারতবর্ষেব শিল্প ও স্থাপত্যে আর্যদের কোন অবদান নেই বললেই চলে। এব সমস্ত কৃতিত্ব হবপ্পীয অনার্যদেবই। আমবা জানি যে, পাঞ্জাবেই আর্য-প্রভাব সবচেযে বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু ভাবতীয শিল্প ও ভাস্কর্যেব নিদর্শনসমূহেব অবস্থান পর্যালোচনা কবলে যে বিচিত্র ব্যাপার আমরা লক্ষ্য কবি তা হচ্ছে, পাঞ্জাব থেকে আমবা যতই দূরে যাই, ততই শিল্প ও ভাস্কর্য নিদর্শনেব সংখ্যা বেশি পরিমাণে দেখি। ভাবতেব শিল্প ও স্থাপত্য যে আর্য চিন্তাধাবা বা শৈল্পিক প্রযুক্তির দ্বাবা প্রভাবান্বিত নয, এটাই তাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অলংকবণের মনোহাবিত্বের জন্য ভাবতীয শিল্প ও স্থাপত্যেব যে খ্যাতি আছে, তা উত্তব ভাবতেই সবচেযে দুর্বল ও দক্ষিণ ভারতে সবচেযে সবল। এটা আমবা দক্ষিণেব অমবাবতী, কাবলা, কানহেবী ইত্যাদির ভাস্কর্যসমূহেব ছন্দ-মাধুর্য দেখেই বুঝতে পাবি। আবার তক্ষশিলায উৎখননেব ফলে আমরা জানতে পেবেছি যে গ্রীকবা আসবাব আগে অবধি ওই অঞ্চলে কোন শিল্প বা ভাস্কর্য-ধাবাই ছিল না। পাঞ্জাবেব ওই তক্ষশিলা অঞ্চলে আর্যরা সবচেয়ে বেশি দিন বাস কবেছে। তাই সেখানে কোন শিল্পধারা না গড়ে উঠার কারণই হ্বল আর্যবা স্বাভাবিকভাবেই শিল্প ও ভাস্কর্যে অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। সুতরাং ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্য যে আর্যদেব প্রতিভাব দান বলে মনে কবা হয, তা

অত্যন্ত ভুল। আর্যদের কোনও শিল্প ও স্থাপত্য কখনও কোন বিশেষ ধারা নিয়ে বর্তমান ছিল না। একটা বর্বর, খাদ্যাভাবগ্রস্ত, পশুপালক জাতি কোনভাবেই কোন শিল্প ও স্থাপত্যধারার ধাবক হতে পারে না। যাযাবর আর্যদের তাই কোন শিল্প ও স্থাপত্যধারা ছিল না। বরং তারা হরপ্পা সভ্যতার বহু সৌধ, স্থাপত্য ও শিল্পকলা ধ্বংসই করেছিল। নতুন স্থাপত্য ও শিল্পকলার ধারার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি।

কিন্তু প্রাগার্য হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি নগরে আমরা শিল্প ও স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন পাই। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর লোকেরা মূর্তি ও মন্দির দুই-ই তৈরি করত। এ ছাড়া আরও একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি। উত্তরকালে হিন্দু মন্দিরের সংলগ্ন একটা করে পুষ্করিণী খননের যে প্রথা, তা প্রাগার্যদের কাছ থেকেই পাওয়া। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতেও ঠিক তাই ছিল। মন্দিরের সংলগ্ন পবিত্র পুষ্করিণী খনন যে প্রাগার্য প্রথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। সুতরাং ভারতের বিশ্ববিখ্যাত শিল্প ও স্থাপত্য অনার্য হরপ্পীয় সভ্যতার শিল্প-স্থাপত্যেরই ধারা বহন করে চলেছে। এখানেও তথাকথিত আর্যগবিমা অনুপস্থিত।

আর্যরা মূর্তিপূজক ছিল না। ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা এসেছে, হরপ্পা সংস্কৃতিব অবদান হিসাবে। আর্যদের কোনও কৃতিত্বই নেই ভারতে মূর্তিপূজার বিপুল জনপ্রিয়তায়। এ ব্যাপারে যা কিছু গৌবব সবই অনার্য হরপ্পীয়দের প্রাপ্য। ভারতবর্ষ সযত্নে আর্যদের ঋগ্বেদীয় দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সবিতা, পূষণ, মাতবিশ্বা, মরুত, সোম ইত্যাদিব পূজা পরিহার কবেছে। আগেই বলেছি, ঋগ্বেদীয় দেবতার মধ্যে কেবলমাত্র বিষ্ণুই এখন পূজা পাচ্ছেন।'আর ঋগ্বেদের 'শ্রী' এখন হয়েছেন 'লক্ষ্মী দেবী'। 'রুদ্র' শিব হিসাবে হবপ্পীয় আমল থেকেই পূজা পান। শিব ঋগ্বেদে রুদ্র হয়ে যান, যদিও ঋগ্বেদে মাত্র তিন জায়গায় রুদ্রের কথা আছে। সুতরাং মূর্তিপূজার সমস্ত কৃতিত্ব অনার্য হরপ্পীযদেরই প্রাপ্য, আর্যদের নয়। আর্যরা মূর্তিপূজা তো করতোই না, বরং লিঙ্গ-পূজকদের তারা ঘৃণাই করতো। হরপ্পীয়রা ছিল 'শিশ্নোপাসক'। আর্যরা লিঙ্গপূজক হরপ্পীয়দের ঘৃণাই করতো। ভারতবর্ষে মূর্তিপূজার সমস্ত গৌরবই অনার্য হরপ্পীয়দের, আর্যদের নয়। এ নিয়ে আর্যগরিমার প্রচার এক মহাভ্রান্তি।

বৃক্ষকে দেবতা হিসাবে পূজা করার সমস্ত কৃতিত্বই অনার্য হরপ্পীয়দের। বৃক্ষপূজার ব্যাপারে আর্যদের কোনও অবদানই ছিল না। সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষকে হিন্দুরা বিশেষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। এর মূলে আছে সেই অনার্য হরপ্পীয় সংস্কৃতি। বৃক্ষপূজার সমস্ত গৌরবই তাই অনার্যদেরই প্রাপ্য। আর্যদের কোন ভূমিকাই এতে নেই। পণ্ডিতেবা বলছেন যে, অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করতো হরপ্পীয়রা। সে পূজা এখনও চালু রয়েছে, এমন কি এই আধুনিক কম্পিউটার-যুগেও। সবুজ বাঁচাতে আজও বৃক্ষপূজার প্রয়োজন প্রবল। এ নিয়ে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন ঃ "সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রাপ্ত সীলমোহরসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাগার্যরা অশ্বত্থ বৃক্ষের বিশেষ আরাধনা করত। সারা ভারতের প্রাগার্য ও হিন্দুগণ এখনও অশ্বত্থ বৃক্ষকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাদের

সকলেরই ধারণা যে মৃতের আত্মাসমূহ অশ্বত্থবৃক্ষে বাস করে। অথচ বৈদিক ধর্মকর্ম ও উপকথার মধ্যে বৃক্ষপূজার কোন স্থান নেই। অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা অথর্ববেদেই প্রথম লক্ষ্য করি।"

রবীন্দ্র জীবন-চর্যায় যে বৃক্ষবন্দনার সংস্কৃতি আমরা দেখি, তার উৎস কিন্তু ওই হরপ্পার অনার্য সংস্কৃতি। বৃক্ষবন্দনায় আর্য-অবদান প্রায় শূন্য। অথচ আধুনিক কালেও বৃক্ষ তথা বন-সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষপূজা তথা বৃক্ষ-বন্দনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা সংস্কৃতি।

বিষ্ণুর দশাবতারসমূহ হরপ্পা সংস্কৃতির অবদান। এখানেও কোনও আর্যগরিমা নেই। বিষ্ণু ঋগ্বেদের দেবতা হলেও সেখানে তিনি গুরুত্বহীন সাধারণ দেবতা মাত্র। পৌরাণিক যুগে এসে বিষ্ণু হয়েছেন পালনকর্তা দেবতা। পুরাণগুলিতেই বিষ্ণুর দশাবতার বিশদভাবে বর্ণিত। এই দশাবতার সংস্কৃতি অনার্য হবপ্পীযদেব অবদান। দশাবতার তত্ত্বে আর্যদের কোনও অবদান নেই। রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ— এই তিন অবতার সম্ভবত দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়ক। এবা তিনজনই কিন্তু অনার্য। বুদ্ধ এবং কৃষ্ণ—দুজনেই ঐতিহাসিক নায়ক। বামায়ণের ঘটনা যদি ঐতিহাসিক হয়, তবে বামও 'হিরো' বা নায়ক, তবে তিনি অনার্য নায়ক। এঁদের গডন ও গায়ের বং বলে দেয এঁবা কেউই আর্য নয়, অনার্য। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতাবগুলি ওই সব টোটেম (Totem) বিশিষ্ট জাতিগুলিব নায়ক বলা যেতে পারে। সুমেরীয়দের একটা কিংবদন্তী আছে যেখানে বলা হয়েছে, ওই সংস্কৃতির নায়ক 'নরমীন' রূপ ধাবণ কবে পারস্য উপসাগর সাঁতার কেটে অতিক্রম করে সুমেরুর এরিডু (Eridu) নগবে উপস্থিত হয়েছিল। এই নবমীন ভারত থেকেও গিয়ে থাকতে• পারে। সুতরাং দশাবতাবেব কল্পনা ও তার কাহিনী অনার্য গরিমাই প্রকাশ করছে, আর্যগরিমা নয়। এখানেও আর্যগরিমা অনুপস্থিত।

আর্যজাতির গৌরব তাদের আর্যভাষা, যে ভাষা থেকেই নাকি সংস্কৃত ভাষার জন্ম। পঞ্চম পরিচ্ছেদে সংস্কৃত ভাষা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, বৈদিকগণের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কোন ভাষা থেকেই সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত এবং বর্তমান সময়ের কথিত ভাষাগুলি উদ্ভূত। সংস্কৃতে বহু শব্দ আছে যা দ্রাবিড় ভাষার। মুণ্ডারি ভাষার শব্দও সংস্কৃতে রয়েছে বেশ ভাল পরিমাণেই। সংস্কৃত ভাষাটা যে পুরোপুরি আর্যভাষা থেকেই উৎপন্ন এমন কথা এখন বোধ হয় জোর দিয়ে বলা যায় না। বৈদিক আর্যরা এদেশে আসার আগে এক প্রাচীনতর ভাষা এদেশে বর্তমান ছিল। সেই ভাষা থেকেই উৎপন্ন হযেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অন্যান্য কথ্যভাষাসমূহ। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা আর্য-অবদান কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অনেক অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে আর্যগরিমার দাবী একেবারেই অচল। অবশ্য অনেক মনীষী বলেছেন,

"যদিও সিন্ধু উপত্যকায় বসবাসকারী প্রাগার্যরা বৈষয়িক অভ্যুদয়ের দিক থেকে আর্যদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল, কিন্তু প্রজ্ঞার দিক থেকে তারা আর্যদের সমকক্ষ ছিল না। আর্যদের ভাষা এত উন্নত ছিল যে, এই ভাষাতেই একমাত্র উচ্চ সূক্ষ্ম চিন্তা সম্ভবপর ছিল। ফলে, এ ভাষাতেই পরবর্তীকালের সাহিত্যসমূহ রচিত হয়েছিল।

কিন্তু সে সাহিত্য উচ্চকোটির লোকদেরই আকৃষ্ট করেছিল জনতাকে নয়।”

সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাষা। এই ভাষায় উচ্চ চিন্তা, সূক্ষ্ম চিন্তা, সবই সম্ভবপর। কিন্তু এই ভাষা যে আর্যভাষা থেকেই উদ্ভূত তা নিয়ে প্রবল বিতর্ক বিদ্যমান। পণ্ডিতেরা সকলে এ ব্যাপারে একমত নন। একদল পণ্ডিত বলেছেন, বৈদিকগণের ভাষাব থেকে প্রাচীনতর কোন ভাষা থেকেই সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত ভাষা এবং বর্তমান সময়ের কথ্যভাষাগুলি উদ্ভূত। সুতরাং ভাষা নিয়ে আর্যগরিমার ভ্রান্তি যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই মঙ্গল। বৈদিক আর্যদের ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হয় নি। তাই এ নিয়ে আর্য-গৌরব বা আর্যগবিমার প্রচার অর্থহীন। আবার, বেদ-উপনিষদ-পুরাণ ইত্যাদি লেখা এবং রচনায অনার্যদের কিংবা মিশ্রিত নবগোষ্ঠীর কৃতিত্বই সর্বাধিক। এ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আর্যগবিমার কাহিনী এখানে কল্পকাহিনীমাত্র।

ঋগ্বেদে প্রায শ'খানেক সূক্ত আছে যেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঋগ্বেদেব এই সূক্তগুলি নির্ভেজালভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানেব কথা বলে। নীহাবিকা, সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে যে বিস্ময়কব তথ্য ও তত্ত্ব ঋগ্বেদে সন্নিবেশিত হয়েছে, তা অনুধাবন করলে ঋগ্বেদেব বচয়িতাদেব প্রতি শ্রদ্ধায আমবা আপ্লুত হয়ে পড়ি। ম্যাক্সমুলাববাও হয়েছিলেন। মনীষীবা বলছেন যে, ঋগ্বেদে জ্যোতির্বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক স্তবে উন্নীত হযেছিল। ঋষিবা নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও পৃথিবী ইত্যাদিব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বই শুধু আবিষ্কাব কবেন নি, এই সব গাগনিক বস্তুর মধ্যে বস্তুব অতীত প্রাণদেবতাকে দর্শন কবেছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রেবা তাই তাঁদেব চোখে হযে ওঠে প্রাণদাতা এবং প্রাণেব প্রতীক। জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত সূক্তগুলিব অন্তত্ঃ একটিতে ৬২০০ বছব আগেব নাক্ষত্রিক অবস্থানেব কথা বলা হযেছে। আবাব ঐতরেয ব্রাহ্মণেও একটা শ্লোক আছে যেখানে ৮০০০ বছব আগেকাব কথাও বলা হযেছে, যে সময় বর্ষ শুরু হত পুনর্বসু নক্ষত্রে। একটু বিস্তৃত কবে বলা যাক।

ঋগ্বেদে যজ্ঞের নামান্তর হলো বৎসব। বৎসব কাল পবিমাপক। ঋগ্বেদের সৃষ্টির সময যে নক্ষত্রের তারায বিযুব ছিল সেই নক্ষত্র স্তবক হতে ঋগ্বেদের কাল বিধান হতো, তাই সেই নক্ষত্রস্তবকেব নাম দেওযা হয যজ্ঞপুরুষ বা কালপুরুষ (Orion)। কালপুরুষ নক্ষত্রস্তবকেব শীর্ষস্থ নক্ষত্র হলো মৃগশিরা। মৃগশিরা নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয নাম সোম, সিদ্ধান্ত অনুসারে নাম অগ্রহাযণী। হায়ণ অর্থে বৎসর, বৎসবের অগ্রসূচক বলেই ওই নক্ষত্র 'অগ্রহায়ণী'। বৈদিক বহু কথাব অর্থ কালক্রমে বিকৃত হওয়ায় তাব আসল অর্থ বুঝতে বেশ কষ্টকব অভিজ্ঞতাব সম্মুখীন হতে হয। যেমন, ওই যজ্ঞ শব্দটিব কথাই ধরা যাক। এখন আমরা যজ্ঞ বলতে বুঝি, একটি যজ্ঞ কুণ্ড, আগুন, ঘি, দীপ, ধূপ, নৈবেদ্য ও পুরোহিত ইত্যাদি। বেদে কিন্তু যজ্ঞ শব্দের অর্থ ছিল জীবনের কর্ম এবং কর্মের কাল সংবৎসর ব্যাপী। এই কারণে বৎসরের নামান্তরও 'যজ্ঞপুরুষ' বা 'কালপুরুষ'। বৈদিককালে মৃগশিরা নক্ষত্রে বৎসর শুরু হলেও এখন বৎসর শুরু হচ্ছে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রায় মাঝামাঝি থেকে। সাযনগতিব ফলে বাসন্তী বিষুবে সূর্যের

সংক্রান্তি হচ্ছে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রায় মাঝামাঝি। সে অবস্থান হ'তে, সায়নগতির ফলে সূর্যের বাৎসরিক সরণ জেনে, ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করা সম্ভব। এখন শাবদ-বিষুব, সূর্যেব বাসন্তী-বিষুবে সংক্রান্তির কালে, থাকছে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রেব প্রায় মাঝামাঝি। আমরা জানি, সূর্যের উপবৃত্তাকার সঞ্চার-পথেব সঙ্গে পৃথিবীর কক্ষপথ যে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে, তার একটি হলো বাসন্তী-বিষুব এবং অপবটি শাবদ-বিষুব। বাশিচক্রেব পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি বিষুবের বক্রীগতি অর্থাৎ এবা ঘড়িব কাঁটাব দিকে চলে। এই বাসন্তী-বিষুব মৃগশিরা নক্ষত্র হতে বোহিণীতে উপস্থিত হতে সময নেয ৯৫৫ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন। এইভাবে মৃগশিরা, রোহিণী, ভরণী, অশ্বিনী, রেবতী পেরিযে আসতে বাসন্তী বিষুবের মোট সময় লেগেছে ৫,৭৩৩ বৎসর ৪ মাস। এবপব ওই বিষুবকে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের মাঝামাঝি আসতে আবও ৪৭৭ বৎসব ৯ মাস ১০ দিন লাগে। অতএব মৃগশিরা নক্ষত্রের শুরুতে যখন বিষুব অবস্থান কবছিল তখন থেকে মোটামুটি ৬,২০০ বছব পবে বিষুব আজ উত্তবভাদ্রপদ নক্ষত্রেব মাঝামাঝি এসেছে। ঋগ্বেদের কালে মৃগশিরায় বিষুব অবস্থান করছিল, অতএব ঋগ্বেদেব বযসকাল মোটামুটি ৬,২০০ বছব। সুতরাং এখন থেকে প্রায় ৬,২০০ বছব আগে ঋগ্বেদেব সৃষ্টিব সূচনা কালে বাসন্তী বিষুবের অবস্থান ছিল মৃগশিরা নক্ষত্রে এবং তখন বছব শুরু হতো অগ্রহাযণী বা মৃগশিরা নক্ষত্রে, কিংবা বৈদিক ভাযায বললে, 'যজ্ঞসোম' নক্ষত্রে। এব আগেব কথাও ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে আছে। ঋগ্বেদের ঐতবেয ব্রাহ্মণে আছে ঃ

"একদা যজ্ঞহীন দেবতারা অদিতিকে বললেন, 'তুমি যজ্ঞ বলে দাও'। অদিতি বললেন, 'তথাস্তু, যজ্ঞেব আবর্তন আমাব শীর্ষদ্বয়ে আবম্ভ ও শেষ হোক'।" এব জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত অর্থ হলো এক সময় সায়ন বৎসরেব আবম্ভ ও শেয অদিতি বা পুনর্বসু নক্ষত্রে হতো। অর্থাৎ বিষুব তখন পুনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থান কবতো। পুনর্বসু থেকে আর্দ্রা, মৃগশিরা ইত্যাদি হয়ে বর্তমানের উত্তবভাদ্রপদ নক্ষত্রে বাসন্তী বিষুবের আসতে সাযনগতিতে সময় লেগেছে প্রায় আট হাজার বছব বা তাবও কিছু বেশি। সুতবাং ঐতবেয় ব্রাহ্মণের ওই কাহিনী প্রায় আট হাজার বছব আগেকাব কথা বলে যখন বৎসবেব শুকতে বাসন্তী বিষুব অবস্থান করতো পুনর্বসু নক্ষত্রে এবং সূর্যেবও সংক্রান্তি ঘটতো ওই বাসন্তী বিষুবে। যজ্ঞ মানে বর্ষ বা বৎসর। তখন বৎসবেব শেযও হতো ওই পুনর্বসু নক্ষত্রে। ওই সময়টা তাই এখন থেকে আট হাজার বছবের কিছুটা বেশি যখন সায়ন বৎসরের প্রারম্ভ সূচিত হতো অদিতি নক্ষত্র বা পুনর্বসু নক্ষত্রেব প্রথম অংশে।

সুতরাং উপরের সূক্ত দুটির প্রথমটি যখন রচিত হয তখন বাসন্তী বিযুব বা মহাবিযুব ছিল মৃগশিবা নক্ষত্রে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অপর সূক্তটিতে বলা হল মহাবিযুব অবস্থান কবছে অদিতি বা পুনর্বসু নক্ষত্রে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান না থাকলে মহাবিষুবেব অবস্থান নির্ণয় করা মুশকিল। ৬০০০ বা ৮০০০ বছর আগে এই জ্ঞান কী ভাবে অর্জিত হল তা বিশদভাবে জানা না গেলেও, এটি নিশ্চিত যে, এই জ্ঞান আর্যজাতির ছিল না। আর আর্যরা এদেশে এসেছিল মাত্র ৩৫০০-৪০০০ বছর আগে।

ঋগ্বেদের এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান হঠাৎই অর্জিত হয় নি। এই জ্ঞান নিশ্চয়ই এসেছে উন্নত সভ্যতার ধারক এবং বাহক হরপ্পীয়দের কাছ থেকে। কারণ এখন এটা প্রমাণিত সত্য যে, হরপ্পীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতো গভীরভাবে। এখান থেকেই এই জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চা গিয়েছিল সুমের সভ্যতার দেশে। সুমের সভ্যতার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয়েছিল হরপ্পা সভ্যতার জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চা লব্ধ জ্ঞানের প্রভাবে। তাছাড়া, ৬২০০ বছর কিংবা ৮০০০ বছর আগে এদেশে আর্যদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। তখন যারা এদেশে ছিল তারা হরপ্পীয় কিংবা প্রাক-হবপ্পীয়রা। ঋগ্বেদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত যতকিছু তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে তার অধিকাংশই হরপ্পীয়দের তথা হরপ্পা সভ্যতাব অবদান। ভাবতে আসার আগে যাযাবব আর্যরা কোনদিন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করেছে এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় নি। ভারতে এসে আর্যরা হঠাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হযে উঠল এও অবিশ্বাস্য। হরপ্পা সভ্যতায় যে নিবিড় জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হয়েছিল তাবই ফলশ্রুতি এবং প্রভাবই ঋগ্বেদ ও ঐতরেয ব্রাহ্মণেব এই শ্লোক কিংবা সূক্তগুলিব সৃষ্টি কবেছে। ঋগ্বেদেব জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত সূক্তগুলি নিঃসন্দেহে হবপ্পা সভ্যতারই অবদান। এখানেও আর্যগরিমা অনুপস্থিত। আর্যগবিমা ব্যাপাবটাই একটা ভ্রান্তি—বিরাট ভুল।

হবপ্পার গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চা নিয়ে একালে পণ্ডিতবা নানা প্রশস্তি কবেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ "গণিত বিদ্যার বিভিন্ন শাখা ও দশমিক প্রথা যে ভারত থেকেই অন্যান্য দেশে গিয়েছিল, তা অনেক আগেই পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এ সব বিদ্যা যে আর্যদেব এ দেশে আসবাব পূর্বেই ভাবতে অনুশীলিত হত, তার প্রমাণ আমরা সিন্ধু সভ্যতাব কেন্দ্রসমূহ থেকে পেয়েছি। সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের পাটিগণিত, দশমিক গণন, জ্যামিতির ও হিসাব রক্ষণের বিশেষ বকম জ্ঞান ছিল।"

হরপ্পা সভ্যতাব নগবগুলি একটা নির্দিষ্ট জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নিয়ম মেনেই নির্মিত হযেছিল। একই রকম পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, মন্দির ও দুর্গ ইত্যাদি তৈবি কবতে যেমন বাস্তুশাস্ত্রের নিবিড় জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি দবকাব জ্যোতির্বিজ্ঞানেব জ্ঞান। হবপ্পাব নগরগুলির গঠন শৈলী এবং স্থাপত্য দেখে এটা সিদ্ধান্ত করা হযেছে যে, তাবা নিবিডভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাবা প্রবল ব্যুৎপত্তিও লাভ করেছিল। তাদের এই জ্ঞান তারা ছড়িযে দিয়েছিল এবং সুমেবীয়বা হবপ্পা থেকেই এই জ্ঞান তাদেব নিজেদের দেশে নিযে গিয়েছিল। এরপব তাবাও গভীবভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতে থাকে। যাইহোক, ঋগ্বেদেব মধ্যে যে সব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্ব আছে, তার কৃতিত্ব হরপ্পীয়দেব—আর্যদের নয়।

আর্যদের প্রাচীন ইতিহাস যেভাবেই পর্যালোচনা করা হোক না কেন তাতে দেখা যায় যে, আর্যরা ছিল যাযাবর বর্বর জাতি। ভারতে আসবার সময় তাদের সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। এ দেশে এসেই তারা সভ্য হতে থাকে। সুতরাং তাদের সভ্যতার কিংবা সংস্কৃতির গৌবব বলতে কিছুই নেই। ভারতীয় আর্য সভ্যতার যে গরিমা আমরা

দেখতে পাই তার পুরো কৃতিত্বটাই হরপ্পার অনার্য সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের প্রাপ্য। সংস্কৃতির নানা আঙ্গিক পর্যালোচনা করে দেখানো হল যে, ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির ধারাটা মূলতঃ হরপ্পা সংস্কৃতিব। এই সভ্যতাব যা কিছু গৌরব, যা কিছু গরিমা, তার সবটাই হরপ্পার অনার্যদের—আর্যবা এখানে নিমিত্তমাত্র।

আগেই বলেছি, আর্যরা এদেশে যখন এল তখন তারা ছিল যাযাবর পশুপালক। কৃষিকাজটাও জানত না। শতপথ ব্রাহ্মণেব সেই বিখ্যাত উক্তি (২/৩/৭-৮), যার কথা এই বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণ হয যে, আর্যরা এদেশে এসে পশুপালন ছেড়ে ধীরে ধীরে কৃষিকাজে বপ্ত হয। গম ও যবের চাষবাস শুরু করে। সুতরাং এক যাযাবর বর্বর জাতিব দ্বাবা ভারতীয আর্য সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে—এমন ধাবণা ভুল। এই সভ্যতার অধিকাংশ অবদানই হবপ্পা সংস্কৃতির—হরপ্পা সভ্যতার। আর্যদের ধ্বংসের বহু কথা পঞ্চম পবিচ্ছেদেই বলা হয়েছে। একটা ধ্বংসকামী বর্বর জাতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে কী-ই বা দিতে পারে৷ বিজযী জাতি হিসাবে তাদেব নিকৃষ্ট কিছু সংস্কৃতি হরপ্পীয সংস্কৃতিতে আমদানি কবেছে মাত্র। তাতে ভাবতীয় সংস্কৃতি লাভবান হয নি। তবে এব ফলে হবপ্পীয় সংস্কৃতিব ধাবা কিছুটা পরিবর্তিত হযে প্রবহমান থেকেছে। সব বিভেদ দূব হযে একটা মিশ্রণ তৈবি হয়েছে সংস্কৃতিব। ববীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'বিভেদ ভুলিল জাগাযে তুলিল একটি বিবাট হিযা'। আব সত্যি সত্যিই ভাবতীয় আর্য সভ্যতা তথা বৈদিক সভ্যতাব যুগে দ্রাবিড, নর্ডিক, দিনাবিক, প্রোটো-অস্ট্রেলীয, আলপীয় ও মংগোলীয সব মিলে মিশে এক হযে গেছে। এক হয়েছে বলেই সমৃদ্ধ হবপ্পা সভ্যতার প্রভাবে সমৃদ্ধ হযে ভাবতীয আর্যসভ্যতাব গৌবব একালেও সাবা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করেছে। ম্যাক্সমুলাব সাহেববা আর্যগবিমা প্রচাব করেছিলেন। কিন্তু এই গরিমা আর্যজাতিব প্রাপ্য নয় একথা বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হল। ভারতীয় আর্য সভ্যতার যে গবিমা আমবা দেখি, যাব প্রচার ম্যাক্সমুলাব প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ অক্লান্তভাবে করেছিলেন, সে গবিমা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে গবিমাব গৌববটা তাঁবা দিয়েছিলেন আর্যজাতিকে। প্রকৃতপক্ষে, এই গৌববেব সমস্তটাই প্রাপ্য হবপ্পা সংস্কৃতির অনার্য ভারতীয়দের—ভাবতে আগত যাযাবব, পশুপালক, বর্বব আর্যদেব নয়। সুতরাং তথা কথিত ওই আর্যগরিমার কাহিনী এক গালগল্প এবং এক ভ্রান্তিমাত্র।

আর্যগরিমার ভ্রান্তি প্রসঙ্গ শেষ কবি ঋগ্বেদেব ৫ম মণ্ডলেব ৩০তম সূক্তের ৫টি ঋক (১১শ-১৫শ ঋক) উদ্ধৃত কবে। এই সূক্তেব রুশমগণ রুশম-কান জনপদেব অনার্য অধিবাসীবৃন্দ।

"১১। যখন বভ্রু সোমবস প্রদান করে ইন্দ্রেব প্রীতি উৎপাদন করলেন তখন অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্র যুদ্ধে সিংহনাদ পরিত্যাগ কবলেন ; পুবনাশক ইন্দ্র সোমরস পান কবে পুনর্বার বভ্রুকে দুগ্ধপ্রদ ধেনু সকল অর্পণ করলেন। ১২। হে অগ্নি! রুশমগণ আমাকে চারসহস্র ধেনু প্রদান করে মহৎ উপকাব কবেছে ; নেতৃগণেব অধিনায়ক ঋণঞ্চয কর্তৃক প্রদত্ত ধেনুরূপ ধন সকল আমরা গ্রহণ কবেছি। ১৩। হে অগ্নি! রুশমগণ সুদৃঢ় সুন্দর গৃহ এবং

সহস্র সহস্র ধেনু প্রদান করেছে; তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি শেষ হলে উগ্র সোমরস ইন্দ্রকে উল্লাসিত করেছিল। ১৪। রুশমগণের অধিপতি ঋণঞ্চয় উপস্থিত হলেই তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি অতিবাহিত হল; বভ্রু আহূত হয়ে বেগগামী অশ্বের ন্যায় গমনপূর্বক চার সহস্র ধেনু লাভ করলেন। ১৫। হে অগ্নি! আমরা রুশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করেছি এবং জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে যাগার্থে প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহ কলসও গ্রহণ করেছি।"

এখানেও লক্ষণীয় যে, ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'পুরনাশক'। আর্য জাতির এই নেতাটি কেবল শত শত হরপ্পীয় নগর ধ্বংসই করেন নি, লুণ্ঠন করেছেন অনার্যদের ধনসম্পদ, গোধন এবং নারী। সুতরাং লুণ্ঠনকারী, ধ্বংসকামী এই জাতিটিকে কোন মতে গৌরবের আসনে বসানো যায় না। এ সব নিয়ে পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কোনভাবেই, কোনও যুক্তিতেই আর্যগরিমা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং আর্যগরিমার ভ্রান্তিকে যাঁরা সত্য বলে মনে করেন, তাঁরা একটা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করতে চাইছেন। আর্যগরিমা এক চরম ভ্রান্তি। তথাকথিত আর্যগরিমাব সমস্ত গৌবব অনার্য হরপ্পীয়দেবই প্রাপ্য। ভারতীয় আর্য সভ্যতার যা কিছু গৌরব তার সবটাই অনার্য হবপ্পীয়দের অবদান—যাযাবর, বর্বর আর্যজাতির নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হরপ্পার অনার্য গরিমা

বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'বাঙলাব ইতিহাস' গ্রন্থেব প্রথম খণ্ডেব কিছু কথা দিযে অনার্য গবিমাব কথা শুরু কবা যাক। তিনি লিখেছেন, "আর্য্যোপনিবেশেব পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগব হইতে, বঙ্গোপসাগব পর্যন্ত স্বীয অধিকাব বিস্তাব কবিযাছিল, তাহাবাই বোধ হয ঋগ্বেদেব দস্যু এবং তাহাবাই ঐতবেয আবণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক 'পক্ষী' নামে অভিহিত হইযাছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড জাতিই বঙ্গ মগধেব আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বঙ্গবাসীগণেব নাসিকা ও মস্তক পবীক্ষা কবিযা দেখিযাছেন যে, তাঁহাবা দ্রাবিড ও মোঙ্গলীয জাতিব সংমিশ্রণে উৎপন্ন।" শুধু বাঙালীবাই দ্রাবিড জাতিব উত্তবসূবি নয, ভাবতেব বর্তমান জনবসতিব বেশিবভাগ লোকই দ্রাবিড জাতি থেকে উদ্ভূত। অনেক নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত বলছেন দ্রাবিড জাতিব উৎপত্তি হযেছে ভূমধ্যসাগবীয জনগোষ্ঠী ও আদি অস্ট্রেলীয জনগোষ্ঠীব সংমিশ্রণে। আদি অস্ট্রেলীয বা আদি অস্ত্রালবা এই ভাবতেবই আদি অধিবাসী। আগেই বলেছি, এবা প্রায ৩০,০০০ বছব আগেই মহাসাগব অতিক্রম কবে অস্ট্রেলিযা মহাদেশে চলে গিযেছিল। ভূমধ্যসাগবীয নবগোষ্ঠী সম্ভবত বহিবাগত এবং তাবা এসেছিল জলপথে। তবে অধ্যাপক হল (PR Hall) বলছেন যে, ভাবতবর্ষই দ্রাবিডজাতিব প্রাচীন বাসস্থান এবং দ্রাবিড জাতিব সঙ্গে প্রাচীন ব্যাবিলনেব সুমেবীয সভ্যতাব যে নিবিড সম্পর্ক ছিল, সে বিষযে কোনও সন্দেহই নেই। আগেই বলেছি হবপ্পা সভ্যতায যে চাবটি নবগোষ্ঠীব কঙ্কাল পাওযা গেছে সেগুলি হল : (১) দ্রাবিড, (২) আদি-অস্ত্রাল, (৩) আলপীয এবং (৪) মোঙ্গলীয। হবপ্পাব সভ্যতা ছিল বণিকদেব সভ্যতা। এব নগবগুলিতে তাই বহু জাতি বাস কবতো। নগবগুলি ছিল বহুজাতিক নগব বা Cosmopolitan City। আগেই বলেছি এই সভ্যতাব মুখ্য স্থপতি হল ওই দ্রাবিড জাতি এবং আদি অস্ত্রাল নবগোষ্ঠী। দ্রাবিডবাই ছিল এই সভ্যতাব মুখ্য ধাবক এবং বাহকও। আদি অস্ত্রালবা ছিল তাদেব সহযোগী।

'পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি' গ্রন্থেব লেখক বিখ্যাত বিনয ঘোষ লিখেছেন : "নিজেব দেশকে যেদিন থেকে চিনতে শিখেছি সেদিন থেকে মনে হযেছে ভাবততীর্থেব সেবা তীর্থ দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ। বিহাব, উডিষ্যা, ছোটনাগপুব, উত্তব বাঢ, ঝাডখণ্ড নিয়ে যে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক অঞ্চল তাব মধ্যে যে কেবল জৈন, বৌদ্ধ অথবা পববর্তী হিন্দু সংস্কৃতিব আদান-প্রদান হযেছে তা নয, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘাত প্রতিঘাতেব পবিপ্রেক্ষিতে নানাবিধ জনগোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবীদেব আনাগোনা হযেছে।

ছোটনাগপুরের ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী কিন্তু শারীরিক গঠনে আদি-অস্ত্রাল সমপর্যাযভুক্ত, অনেকটা সাঁওতালদের মতো। হিন্দুদের কিছু কিছু দেবদেবী এরা পূজা করে, আর এদের কিছু দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে ব্রাহ্মণ্যধর্মে। চণ্ডীর উল্লেখ বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতে নেই। কিন্তু পরে এই অসভ্য অনার্য দেবতা হিন্দু সমাজের সকল স্তবের লোকের আরাধ্য দেবী বলে গণ্য হয়েছেন। ওঁরাওদের মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক দেবীর অস্তিত্ব আছে।"

আগেই বলেছি এবং আবাবও বলি হরপ্পার দ্রাবিড় তথা অনার্য সংস্কৃতি সারা ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। হিন্দু সভ্যতার উপাদনগুলির চারভাগের তিনভাগই এসেছে হরপ্পা সভ্যতার সংস্কৃতিসমূহ থেকে। অর্থাৎ অনার্য সংস্কৃতিই হিন্দু সভ্যতার মূল উপাদান। হরপ্পার ওই অনার্য সংস্কৃতি আবার মূলতঃ দ্রাবিড় এবং আদি-অস্ত্রাল -সংস্কৃতির মিশ্রণ যাব বেশির ভাগটাই দ্রাবিড় সংস্কৃতি। তাই দ্রাবিড় তথা অনার্য সংস্কৃতির প্রাধান্য সাবা ভাবতবর্ষে। এই দেশে সভ্যতাব যা কিছু গৌবব তাব সবটুকুই প্রাপ্য হরপ্পার অনার্যদেব—অর্থাৎ দ্রাবিড় এবং আদি-অস্ত্রালদেব। এই গৌরবেব সিংহভাগটাই দাবী করতে পারে প্রাচীন দ্রাবিড় জাতি। আব এই দ্রাবিড় কিংবা আদি-অস্ত্রাল—এবা উভযেই অনার্য জাতি। ভাবতীয সভ্যতাব আদিজনক হল এই দুই নরগোষ্ঠী। এবাই হরপ্পা সভ্যতাব ধাবক এবং বাহক। ভাবতীয় সভ্যতাব আদি-জনক হিসাবে সমস্ত গৌবব এদেবই প্রাপ্য। গরিমা যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা হবপ্পার অনার্যদেবই—আর্যদের নয়।

আগেও বলেছি, আবাবও বলি, হবপ্পা সভ্যতাকে গৌববদান করে পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যাপক গ্রেগবি পসেল। (Gregory Possehl) বলেন যে, চীন, সুমেরু এবং মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহেব তুলনায় হবপ্পা সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা এই সভ্যতাব কেন্দ্র সমূহেই আমবা জগতেব প্রাচীনতম ইষ্টক নির্মিত পযঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয আবিষ্কাব করেছি। আগেই বলা হয়েছে, এই সভ্যতার বিস্তার ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল অঞ্চলে। প্রায় ৫০০০ বছর আগে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটে। বিশ্বসভ্যতায হবপ্পা সভ্যতার অবদান তুলনাহীন। ১৫০-টির বেশি জায়গায় আবিষ্কৃত হযেছে হরপ্পা সভ্যতাব ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর ও জনপদ। আফগানিস্তানের মুণ্ডিগাক থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডুরাজাব ঢিবি এবং গুজরাটের লোথাল থেকে হিমালয়ের শিবালিক পর্বত অবধি বিস্তৃত ছিল এই বিশাল এবং উন্নত সভ্যতা। সুসভ্য এবং সমৃদ্ধশালী সভ্যতার যে সব লক্ষণ থাকে তাব সব কটিই ছিল এই সভ্যতায়। ৫০০০ বছব কিংবা তাবও আগে এমন নগব ভিত্তিক সভ্যতাব বিকাশ অকল্পনীয হলেও সত্য। সুমেরের নগর সভ্যতায এবং বিখ্যাত মিশরীয় সভ্যতায হবপ্পা সভ্যতাব অশেষ অবদান। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা এই সভ্যতাব উন্নত রূপ অনুধাবন করে বিস্মিত। তাই তাঁরা হরপ্পার গরিমার কথাই স্বীকাব করে নিয়েছেন। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে হরপ্পা সভ্যতা এক তুলনাহীন বিকাশ। এই সভ্যতাব গরিমাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গরিমার সবটাই প্রাপ্য ভারতীয় অনার্যদের, ভারতবর্ষে বহিরাগত আর্যদের নয়।

আগেই বলেছি, দেড়শতাধিক স্থানে পাওয়া এবং ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে বিকশিত এই সভ্যতার নগরসমূহের বিশেষ কয়েকটি হচ্ছে পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এবং ভারতের কালিবঙ্গান, লোথাল ও ধোলাভিরা। এই সব নগরেব রাস্তাঘাট ছিল সুপরিকল্পিত। ঘরবাড়ি তৈরি হত পোড়া ইট, কাঁচা ইট ও পাথর দিয়ে। প্রত্যেক বাড়িতে কূপ থাকতো। বাড়ির দূষিত জল রাস্তার বাঁধানো পয়ঃপ্রণালীতে গিয়ে পড়ত। তারপর সে জল রাস্তার পাশের ঢাকা পয়ঃপ্রণালী দিয়ে চলে যেত শহরের বাইরে। উন্নত পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে নগরের দূষিত জলেব নিষ্কাশন হরপ্পা সভ্যতারই অবদান। নগরের মধ্যে থাকতো সুদৃঢ় ও উচ্চপ্রাকার বিশিষ্ট দুর্গ, শস্যাগার, মন্দির ও সমাধিস্থান। সুসংবদ্ধ নাগরিক জীবনযাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন তার প্রায় সমস্তই এই সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত ছিল। শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ছিল। পরিবহনেব জন্য নৌকা এবং গাড়ী উভয়ই ছিল। গাড়ীগুলি বলদে টানতো। দেবস্থান ছিল, ছিল মন্দিরও, লেখাপড়া ছিল, ছিল লিপি এবং পুস্তকও। আব ছিল নিবিড় আন্তর্বাণিজ্য এবং বিস্তৃত বহির্বাণিজ্য। লোথাল ছিল এই সভ্যতার বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বন্দব। সম্ভবত তাম্রলিপ্ত বন্দরও ছিল লোথালের মত প্রাচীন, এই সভ্যতার আবেক আন্তর্জাতিক বন্দর। এই তাম্রলিপ্ত ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং সেকালের ব্যস্ততম বন্দব। এখান থেকেই তামা যেত লোথাল হয়ে হবপ্পা সভ্যতাব বিভিন্ন অঞ্চলে, মিশবের সিনাইয়ে, ভূমধ্যসাগবেব ক্রীট দ্বীপে। পাণ্ডুরাজাব ঢিবিতে পাওয়া একটা 'সীল' প্রমাণ কবে যে, বাণিজ্য কবতে বাঙালিবাও ক্রীটদেশে যেত এবং সে দেশ থেকে বাণিজ্য কবতে লোকজন বাঙলায় আসতো তাম্রলিপ্ত বন্দব হয়েই। সুতবাং লোথালেব মত তাম্রলিপ্তও ছিল হরপ্পা সভ্যতাব অন্যতম বন্দর।

যাইহোক, হরপ্পার গবিমা প্রাচীন বাঙালিদের গরিমাব কথাও বলে। সে কালেব বাঙালিরা হরপ্পা সভ্যতার অংশীদাব ছিল নানাভাবে। তামা সববরাহ ছিল সে অংশীদাবীত্বেব সবচেয়ে বড় দিক। বাঙালিদেব মধ্যেও তখন ছিল আদি অস্ট্রেলীয় বা আদি অস্ত্রাল ও দ্রাবিড় জাতির প্রাধান্য, যারা হবপ্পা সভ্যতার মূল হোতা। হরপ্পা সভ্যতার অবদানে তাই বাঙালিদেরও অবদান অনেক। বাঙালিব শোর্যবীর্য, বহির্বাণিজ্যে দাপট ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও হরপ্পার তাম্রাশ্ম সভ্যতা হযত গ'ড়েই উঠতো না, বাংলাব তামা না পেলে। বাঙালিরা যে সিন্ধুসভ্যতায় উপস্থিত ছিল তার প্রমাণ পাওযা যায় চারটি সূত্র থেকে—(১) মাতৃদেবীর উপাসনা, (২) মৎস্যভক্ষণ, (৩) হাতীর সঙ্গে পরিচয় এবং (৪) ধানের ব্যবহার। মাছ খাওয়া বহুকাল ধবেই বাঙালিদের ঐতিহ্য। মহেঞ্জোদাবোতে পাওয়া গেছে বঁড়শি ও মাছ ধরাব অজস্র কাঁটা। এমনি বঁড়শি ও কাঁটা পাওয়া গেছে লোথালেও। বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরাও বাঙালি-বৈশিষ্ট্য। এটা সঞ্চারিত হয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায় বাংলাদেশ থেকেই। হরপ্পা সভ্যতায় হাতীর প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। বলা হয়, ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম হাতীকে পোষ মানান ঋষি পালকাপ্য। ইনি ছিলেন মহাভাবতের আমলের অর্থাৎ হরপ্পীয় আমলের লোক এবং বঙ্গ-দেশেব অধিবাসী। তিনি শুধু যে হাতীকে পোষ

মানিয়ে ছিলেন তা নয়, হস্তীবিদ্যা সম্পর্কে একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। বাঙলা দেশেই হাতীর আদি নিবাস। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে হাতীর উপস্থিতি বাঙলা দেশের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার সম্পর্কের কথাই বলে। চাউল বাঙালির প্রিয় খাদ্য বহুকাল ধরেই। ধানের চাষ সম্ভবত বঙ্গোপসাগরের আশেপাশের কোন জায়গাতে শুরু হয় হাজার আষ্টেক বছব আগে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা পরেশ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, ধানের চাষ বাঙলাদেশেই শুরু হয়েছিল এবং বাঙলা থেকেই ধানের চাষ গিয়েছিল চীন দেশে। সুতরাং হরপ্পার চাউল ভক্ষণ হরপ্পা সভ্যতায় বাঙালিরই অবদান। মাতৃদেবীর পূজাও বাঙলা থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আগেই বলেছি, সুমের সভ্যতায় যে মাতৃপূজার প্রভাব আমরা দেখি, সেই মাতৃপূজা বাঙলা থেকেই ওদেশে গিয়েছিল। এই মাতৃপূজা হরপ্পা সভ্যতাতেও সঞ্চারিত হয়েছিল বাঙলাদেশ থেকেই। হরপ্পায় প্রাপ্ত এক সীল মোহরের ওপর খোদিত নারীমূর্তি থেকে প্রকাশ পায় যে, মাতৃদেবীর পূজা শুরু হযেছিল ফসলেব আনুষঙ্গিক হিসাবেই। মাতৃদেবী আদিতে যে শস্যাদিব সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন তা তাঁর অন্নপূর্ণা, শাকম্ভবী ইত্যাদি নামকবণ থেকেই প্রকাশ পায়। উত্তর ভারতেব 'নয়না দেবী', সুমেরদের 'নান্নাদেবী', কামাখ্যাব 'নোনাদেবী'র সঙ্গে আমাদের অন্নপূর্ণার যথেষ্ট নৈকট্য বিদ্যমান। অর্থাৎ দেবীপূজা ফসলেব সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল। তা বাঙলা থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হরপ্পা সভ্যতায দেবীপূজার সংস্কৃতি বাঙলারই অবদান। এই সব কাবণেই হবপ্পাব অনার্যগবিমাব অনেকটা গৌববই এই বাঙলার তথা বাঙালিদেব প্রাপ্য।

হবপ্পার অনার্য গরিমার বিশদ আলোচনায় আসার আগে বাঙলার কথা আরেকটু বলে নেওয়া যাক। আগেই বলেছি, ধানেব চাষ সম্ভবত সর্ব প্রথম বাঙলাদেশেই শুরু হয়। এই চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সংস্কৃতির বিকাশও ঘটে। হরপ্পা সভ্যতার আমলে বাঙলাব কিছু সংস্কৃতি হরপ্পা সংস্কৃতিব মধ্যে স্থান পায়। হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন না বাঙলি সভ্যতা প্রাচীন এ নিয়ে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন ঃ "বৈদিক সাহিত্যে আমরা বাঙলাদেশের লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করি, যেরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ তারা প্রকাশ করত সিন্ধুসভ্যতার ধারকদের প্রতি। অথচ, বৈদিক সমাজে দু'চারজন এমন উদার মনোভাবাপন্ন লোক ছিল যারা বাঙলার মহিমান্বিত তীর্থসমূহ দর্শন করতে আসত, যদিও তাদের স্বস্থানে প্রত্যাগমনের পব পুনোষ্টম বা সর্বপৃষ্টা নামক যজ্ঞ সম্পাদন করে প্রায়শ্চিত্ত কবতে হত। এ থেকেই তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। তার মানে, বৈদিক যুগেই বাঙালির নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, দেবদেবী, মন্দির ও তীর্থস্থান ছিল, যা সাধারণ বৈদিক সমাজের লোকরা সহ্য করতে পারত না এবং সেজন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করত। যেহেতু সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক, সেই হেতু সমীকরণ করে বলা যেতে পারে যে হরপ্পা সভ্যতার সমকালে বা তৎপূর্বে বাঙালির নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, দেবদেবী, মন্দির, ও তীর্থস্থানসমূহ ছিল। এ থেকে বোঝা যাবে বাঙালি সভ্যতা কত প্রাচীন।"

প্রাচীন বাঙালিরা ছিল মূলতঃ আদি অস্ত্রাল ও দ্রাবিড় জাতি। হরপ্পীয়রাও তাই। সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতি মূলতঃ অনার্য সংস্কৃতি। আর্যদের সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক ঘটেছে অনেক পরবর্তীকালে, যখন হরপ্পীয় সংস্কৃতি ভারতীয় আর্য সভ্যতায় তাব প্রাধান্য বিস্তার করেছে। বাঙলা তথা বাঙালি ছিল হরপ্পা সভ্যতার তথা সংস্কৃতির অংশীদাব। অনেক বাঙালি সংস্কৃতি এসেছিল হরপ্পা সভ্যতায়। হরপ্পার অনার্যগরিমাব অনেক কৃতিত্ব তাই বাঙলার তথা বাঙালিদেরও প্রাপ্য। হবপ্পা সভ্যতার সব প্রত্নস্থল এবং সব প্রত্নবস্তু এখনও ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় নি, যেমনটি করা হয়েছে মিশর কিংবা সুমের সভ্যতার ক্ষেত্রে। তাই হরপ্পা সভ্যতার বিশদ বিবরণ, তার সংস্কৃতির খুঁটিনাটি আজও অজানা। তার সীলমোহরের লেখাগুলি আজও অপাঠ্য। ফলে, হরপ্পা সভ্যতা নিযে আরও বহু তথ্য জানার অবকাশ রয়ে গেছে। যেটুকু আবিষ্কার হযেছে কিংবা জানা গেছে, তার থেকেই বলা হবে হরপ্পার অনার্য গরিমার কথা। এই সভ্যতার আবও গৌবব, আরও মহিমাব কথা জানা যাবে আবও নিবিড় অনুসন্ধানেব পর এবং এর লিপিগুলি পাঠ কবাব পব। ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য মনীষীরা বলেছেন এই অসম্পূর্ণতাব কথা। বলছেন আরও অনুসন্ধানেব প্রযোজনীযতার কথা। প্রাক-হরপ্পীয সভ্যতাব থেকে নগরভিত্তিক হরপ্পা সভ্যতায উত্তবণের মধ্যে একটা 'মিসিং লিংক' মতন বয়েছে। এই 'মিসিং লিংক'টা বেব কবতে হলেও অনেক অনুসন্ধানের দরকাব। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন ঃ

"Many of the excavated sites mentioned above have yet to be fully studied and the findings published, and knowledge of the various features of the life and economy of their inhabitants remains somewhat scanty. All the evidence indicates that the subsistence base of Early Harappan economy remained much as it had already developed at Mehrgarh some two millennia earlier, cattle, sheep, and goats constituted the principal domestic animals, and wheat and barley formed the staple crops. From Kalibangan and several other sites in Bahawalpur and Punjab comes interesting evidence concerning the use of the plow. At the former site, excavators discovered what appeared to be a plowed field surface preserved beneath buildings from the mature Indus period. The pattern of criss-crossed furrows was virtually identical to that still employed in the region, the wider furrows in one direction being used for taller crops, such as peas, and the narrow perpendicular rows being used for sesame and other oil-seed plants. From Banawali and sites in the desiccated Sarasvati valley came terra-cotta models of plows, supporting the earlier interpretation of the field pattern.

The evidence for the various Early Harappan crafts and their products also calls for further publication and detail before a firm picture can be obtained. Thus far, only small number of copper tools have been found, and little can yet be confirmed regarding their sources and manufacture. A number of the settlement sites lie far from any sources of stone, and thus the regular appearance of a stone-blade industry, producing small, plain or serrated blades from prepared stone cores, implies that the raw materials must have been imported, often from considerable distances. The same assumption applies to the larger stones exployed as rubbers or grinders, but in the absence of detailed research, no firm conclusions are possible. Related evidence does indicate that some contemporary sites, such as Lewan and Tarakai Qila in the Bannu basin, were large-scale factories, producing many types of tools from carefully selected stones collected and brought in from neighbouring areas. These same sites also appear to have been centres for the manufacture of beads of various semiprecious stones."

এখন বলা হয়, চার-পাঁচ হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন কৃষি-প্রধান সভ্যতার পর হরপ্পার নগর ভিত্তিক সভ্যতা উদ্ভূত হয় ৫৩০০ বছর আগে এবং এই সভ্যতা তার উন্নতির চরম শিখরে ওঠে ৪৬০০ আগে। এই সভ্যতার অবনতি শুরু হয় ৪২০০ বছর আগে এবং এর পতন হয় ৩৭০০ বছর পূর্বে। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এই সভ্যতা ভারতের ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে নিজেকে নানাভাবে বিস্তৃত করে।

হরপ্পা সভ্যতার প্রথম গরিমা হল এই সভ্যতাটি পুরোপুরি ভারতীয় সভ্যতা। অতিবিখ্যাত মেসোপটেমিয়া সভ্যতা বা সুমের সভ্যতা হরপ্পীয়দের অবদানেই সৃষ্ট। অনেকে বলেন, হরপ্পীয়রা সুমের সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন। হরপ্পীয়রাই সুমের সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতার অবদানেই গড়ে উঠেছিল মেসোপটেমিয়ার ওই বিখ্যাত অতি প্রাচীন সভ্যতা। শুধু তাই নয়। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায়ও বহু অবদান রেখেছিল এই হরপ্পা সভ্যতা। বলা হয় :

"While the Indus (or Harappan) Civilization may be considered the culmination of a long process indigenous to the Indus Valley, a number of parallels exist between developments on the Indus and the rise of civilization in Mesopotamia. It is striking to compare the Indus with this better-known and more fully documented region and to see how closely the two coincide with respect to the emergence

of cities and of such major concomitants of civilization as writing, standardized weights and measures, and monumental architecture. Yet, nearly all the earlier writers have sensed the Indianness of the civilization, even when they were largely unable to articulate it. Thus, V. Gordon Childe wrote that ·

India confronts Egypt and Babylonia by the 3rd millennium with a thoroughly individual and independent civilization of her own, teachnically the peer of the rest. And plainly it is deeply rooted in Indian soil. The Indus Civilization represents a very perfect adjustment of human life to a specific environment. And it has endured, it is already specifically Indian and forms the basis of modern Indian culture. (New Light on the Most Ancient East. 4th edi. 1952)

হবপ্পা সভ্যতাব দ্বিতীয় গবিমা হল এই সভ্যতাব ৫০০০ বছবেব পুরাতন সংস্কৃতিই সামান্য রূপ বদল কবে আজ ভাবতেব সংস্কৃতি তথা হিন্দু সংস্কৃতি হযে বিবাজমান। ৫০০০ বছরের পুবাতন সেই সংস্কৃতিব ট্রাডিশন [Tradition] আজও সমানে চলেছে। ভাবতে বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবে তাব বহিবঙ্গেব রূপ কিছুটা পবিবর্তিত হলেও তার অন্তঃস্থলে বয়েছে সেই প্রাচীন হবপ্পীয সংস্কৃতি। তাছাড়া, এই সভ্যতাব সামাজিক, ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক অনেক বীতিনীতি আজও আমরা এই একবিংশ শতাব্দীতেও পালন কিংবা অনুসরণ কবে চলেছি। সুতবাং আমাদেব দৈনন্দিন জীবনে আজও আমবা হরপ্পা সংস্কৃতি বহন করছি। এই প্রভাব হবপ্পার অনার্য সংস্কৃতিব গৌরবময দিকের সাক্ষ্য দেয়। আমাদের জীবনে এই অনার্য সংস্কৃতিব গবিমা এখনও একটা বড়সড় অংশ জুড়ে রয়েছে। আর এইসব সংস্কৃতিব জন্য আমবা আজও গর্ববোধ কবি।

পরিকল্পিত নগব, নগব-দুর্গ, এক্কাগাড়ী, শিবলিঙ্গেব পূজা, দশমিকের হিসাব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বাটখাবা, পবিমাপ ব্যবস্থা, লিপি, পুঁথি ইত্যাদি বহুবিধ উপাদান হরপ্পার অনার্য সভ্যতাকে গৌববান্বিত কবেছে। ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, গর্ডন চাইল্ড হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা সর্বৈব সত্য। তাঁবা গর্ডন চাইল্ডেব কথার প্রতিধ্বনি করে বলছেন ঃ

"The force of Childe's words can be appreciated even without an examination of the Indus Valley script found on seals; the attention paid to domestic bathrooms, the drains, and the Great Bath at Mohenjo-daro can all be compared with elements in the later Indian civilization. The bullock carts with a framed canopy, called *ikkas*, and boats are little changed to this day. The absence of pins and the love of bangles and of elaborate nose ornaments are all peculiarly

Indian. The religion of the Indus also is replete with suggestions of traits known from later India. The significance of the bull, the tiger, and the elephant the composite animals, the seated yogi god of the seals; the tree spirits and the objects resembling the *Siva Linga* (a phallus, symbolic of the god Siva) of later times—all these are suggestive of enduring forms in later Indian civilization.

It is still impossible to do more than guess at the social organization or the political and administrative control implied by this vast area of cultural uniformity. The evidence of widespread trade in many commodities, the apparent uniformity of weights and measures, the common script, and the uniformity—almost common currency—of the seals all indicate some measure of political and economic control and point to the great cities Mohenjo-daro and Harappa as their centres. The presence of the great granaries on the citadel mounds in these cities and of the "Citadels" themselves suggests—partly on the analogies of the cities of Mesopotamia—the existence of priest-kings. or at least of a priestly oligarchy, that controlled the economy and civil government. The intellectual mechanism of this government and the striking degree of control implicit in it are still matters of speculation. Nor can scholars yet speak with any certainty regarding relations between the cities and surrounding villages. Much more research needs to be done on many such topics, before the full character of the Indus Civilization can be revealed."

সুতরাং ৫০০০ বছরের পুরাতন হরপ্পার অনার্য সংস্কৃতির অনুসরণ করাব মধ্যেই রয়েছে তার গৌরব, সে সভ্যতার গরিমা। আজও আমরা হরপ্পীযদেয বহু কিছুই অনুসরণ কিংবা পালন করে চলেছি। এই অনুসরণ বা পালনই বলে দেয় হরপ্পার গরিমার কথা। অর্থাৎ হরপ্পীয় অনার্যদের রীতি-নীতি, আবিষ্কৃত নানা ব্যবস্থা ইত্যাদি এই ৫০০০ বছব পরেও এযুগের উপযোগী। এই উপযোগিতাই বলে দেয় হরপ্পার অনার্য গরিমার কথা। এ সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক, যেগুলি হরপ্পার অনার্য গরিমার কথাই বলে।

হরপ্পার পরিকল্পিত নগর-গঠনশৈলী এই আধুনিককালেও আমরা অনুসরণ করছি। হরপ্পার নগরগুলির প্রত্যেকটিই একই রকম পরিকল্পনায় এবং স্থাপত্য-শৈলীর অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল। একালের ভারতবর্ষে এরকম পরিকল্পিত শহর তিন-চারটির বেশি নাই। যতদূর মনে পড়ছে, রাজস্থানের জয়পুরের 'পিংক সিটি' অংশ, কোচবিহার শহর,

চণ্ডীগড় শহর এবং নতুন দিল্লী এ ধরনের পরিকল্পিত শহর। হরপ্পার শহরগুলির রাস্তাসমূহ ছিল একেবারে সোজা। এতোটাই সোজা যে পণ্ডিতেরা বলছেন, এই সব রাস্তা কম্পাস ব্যবহার করেই বানানো হয়েছিল। প্রধান রাস্তাগুলি ছিল ৩০ থেকে ৩৩ ফুট চওড়া। বাস্তার দুইধারে ছিল ঢাকা দেওয়া ড্রেন বা পয়ঃ প্রণালী। প্রয়োজনে কোথাও পয়ঃপ্রণালী তৈবি করা হয়েছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে, কিন্তু তা ছিল পুরোপুরি ঢাকা দেওয়া, অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ। হরপ্পা সভ্যতার সমস্ত শহরের পয়ঃপ্রণালীগুলি ছিল মাটির নিচে ঢাকা দেওয়া ভূগর্ভস্থ।

নগরগুলির মাঝারি রাস্তাগুলি ছিল ১৩ থেকে ২৮ ফুট চওড়া। আর গলিগুলি ছিল ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি থেকে ৭ ফুট প্রশস্ত। কি গলি, কি রাজপথ সবই ছিল আশ্চর্য রকমের সোজা, যেন কম্পাস দিয়ে পরিমাপ করে বানানো। ৫০০০ বছর আগে পৃথিবীর কোথাও হবপ্পা সভ্যতার নগরগুলির মত ৩৩ ফুট চওড়া রাজপথ সমন্বিত পবিকল্পিত নগব গড়ে উঠে নি। হরপ্পা এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। সুমের সভ্যতার নগরগুলি হরপ্পার অনুকরণে পববর্তীকালে নির্মিত, সুমেরীয় নগরগুলি হরপ্পীয়দেবই অবদান। সুমেরীযরা হরপ্পীয়দেরই উত্তবসূরি। মহেঞ্জোদারো নগর সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 'In the case of Mohenjodaro, it stood alone in its time, In the planning of the city, Mahenjodaro was more modern than some of the modern towns of the world. She anticipated the modern art of town planning and laying out of the thoroughfares." সুতরাং মহেঞ্জোদাবো শহরটি ছিল আধুনিক শহরগুলিব চেয়ে অনেক উন্নত। হবপ্পা এবং এই সভ্যতার অন্যান্য শহরগুলিও কম ছিল না। বলা হয়েছে, 'As a planned city, the thoroughfares were laid with precision to compass. The deviation is so small that, that may be due to the want of a modern compass. In short distance the deviation is negligible." এই সোজা রাস্তা, এই পরিকল্পিত নগর বিন্যাস, এই উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতাকে গৌরবান্বিত করেছে— প্রচার করছে হরপ্পাব অনার্য গরিমা।

হরপ্পার নগরগুলিতে পযঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল একালের শহরগুলির চেয়েও অনেকাংশে উন্নততর। নগবের পৌবসভা এই সব পয়ঃপ্রণালী নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা কবতেন। পয়ঃপ্রণালীব বক্ষণাবেক্ষণও তাঁরা করতেন অত্যন্ত নিয়মিতভাবে। মহেঞ্জোদারোতে পাওযা গেছে তিন শ্রেণীর পয়ঃপ্রণালী। নগরের জল-নিষ্কাষণ [City- Drainage], ঘরের জল-নিষ্কাশন [House-Drainage] এবং ঘরের ছাদের জল-নিষ্কাশন [Roof-Drainage] —এই তিন রকমের জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থাই আধুনিক যুগের নিষ্কাশন ব্যবস্থার মতই উন্নত ছিল মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলিতে। চাই কি, একালের বহু শহরের চেয়ে উন্নততব ছিল ৪৫০০/৫০০০ বছরের পুরাতন ওই জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা। মহেঞ্জোদারো নগরের জল নিষ্কাশন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

" The elaborste system of drainage discovered from Mohenjodaro indicates clearly, as we have observed before, that the town was under the administration of a very strong Municipal Authority. The strong vigilance of the Municipal Authority was able to maintain the tempo of the drainage of the city at least over a period of three phases of the Indus Civilization.

It is most natural that such a highly developed Municipal Organization should be the outcome of a highly developed intellectual age and very high standard of living. The people had a very well developed notion of community life, comfort and enjoyment. The very hygienic way of the setting up of the network of the drainage system of the town indicates also that the authorities were not indifferent about the health of the citizens. They tried their utmost to preserve a health atmosphere of the city."

শহরের ড্রেনগুলি মাটিব দেড়ফুট কিংবা দুই ফুট নিচ দিয়ে নির্মিত হযেছিল। সমস্ত ড্রেনই ইট অথবা পাথরের স্ল্যাব [Slab] দিযে সুন্দবভাবে ঢাকা থাকতো। আজকাল শহরের ড্রেনগুলি যেমন বহুক্ষেত্রে মাটির নিচ দিয়ে নিযে যাওয়া হয, মহেঞ্জোদাবো নগরেও তেমন করা হযেছিল। শহবের সমস্ত ড্রেনই এমন সুন্দর করে ঢেকে হবপ্পা সভ্যতার নগরগুলি নির্মিত হযেছিল। এমন ঢাকা-পযঃপ্রণালী সমন্বিত শহব এই আধুনিক ভারতবর্ষেও বিরল। এই উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার আরেকটি গৌরবময দিক। এটি হরপ্পার অনার্য গরিমার কথাই বলছে।

সমস্ত ড্রেনই বানানো হয়েছিল পোডা-ইট দিযে। পাথবও ব্যবহৃত হযেছে কোথাও কোথাও। সরু ড্রেনগুলি ঢাকা দেওয়া হত পোড়া ইট দিয়ে। ড্রেন চওড়ায় একটু বেশি হলে তিন স্তরে ইট সাজিয়ে তাকে ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হত। 'সোক-পিট' [Soak Pit] ব্যবস্থাও ছিল জল নিষ্কাশনের এই বিস্তৃত প্রণালীতে। দু'ধরনের সোক-পিট ব্যবহৃত হত। প্রতিটি ঘরের যেমন একটা কবে সোকপিট থাকতো, তেমনি, পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেনগুলিতেও অন্য এক রকম সোক-পিট ব্যবহৃত হত। সোক-পিটগুলিও তৈরি হত পোডা ইট দিযে। পোড়ামাটির পাইপ দিযে ঘরের জল নিষ্কাশিত হত। ছাদের জলও সম্ভবত পাইপ দিয়েই নিষ্কাশন করা হত। শহরের জল-নিষ্কাশনের জন্য কোথাও কোথাও এধরনের পোড়ামাটির পাইপ ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

"Pottery drain-pipes were used for the drainage of the upper storeys, in Mohenjodaro, they were used as vertical drains in several sections,....The excavations had observed that these terracotta pipes were used both for horizontal and vertical drainage. But these

clay-pipes were so small that they were not meant for carrying the rain water from the roof." ছাদের জল নিষ্কাশনের জন্য কোন্ মাপের পাইপ ব্যবহৃত হত তা ঠিকমত জানা যায় নি। তবে পণ্ডিতেবা অনুমান করেন যে, ছাদের জল নিষ্কাশনের জন্যও হবপ্পীয়রা বিশদ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ৫০০০ বছর আগে হবপ্পা সভ্যতাব নগবগুলিতে জল নিষ্কাশনেব যে উন্নত ব্যবস্থা কবা হয়েছিল, তা হরপ্পা সভ্যতার গৌরবময দিকই প্রচাব কবে। ঘোষণা করে হরপ্পার অনার্য গরিমা।

মহেঞ্জোদারো কিংবা হবপ্পা শহরে জল সরবরাহ কবা হত নদী থেকে। নদীতে বাঁদ দিয়ে নদীর জল যেমন চাষের কাজে লাগানো হত তেমনি নাগরিকদেব বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত নদীব জল। সিন্ধু নদীব জল সরবরাহ করা হত মহেঞ্জোদারোতে এবং ইরাবতী নদীর জল হবপ্পা শহবে। বর্ষাকালে নদীব জল ঘোলা থাকতো বলে সে জল পানীয হিসাবে ব্যবহার করা হত না। নগরেব বাড়িগুলিতে জল সববরাহ করতো কূয়া বা কূপ। প্রত্যেক বাড়িতে কমপক্ষে একটা কূযা থাকতো। বড় আকারের বাড়িতে তিনটে পর্যন্ত কূপ পাওযা গেছে। বাডিব ভিতবে নদীব জল সরববাহ কবা হত না। স্নান-পানেব জন্য ব্যবহৃত হত কূপের জল। কূপগুলি সাধাবণত গোলাকার এবং তিন-চার ফুট ব্যাসযুক্ত। উপবৃত্তাকার কিছু কূপও পাওযা গেছে। মহেঞ্জোদাবোর বিখ্যাত স্নানাগারের কাছে কিছু কূপ পাওযা গেছে যাদের ব্যাস প্রায সাড়ে সাত ফুট।

ঊনবিংশ শতাব্দীব শেযে দিক অবধি খাস কলকাতা শহরে পানীয় জলের মূল উৎস ছিল কূপ। গঙ্গার থেকে জল সববরাহেব ব্যবস্থাও তখন ছিল না। ৫০০০ বছর আগে হবপ্পীযবা তাদেব নগবগুলিতে নদীর জল সববরাহেব ব্যবস্থা যেমন করেছিল, তেমনি বাড়িতে বাড়িতে কূপ খনন করে পানীয জলেব চাহিদা তারা অনায়াসেই মিটিয়ে ছিল। এ ব্যাপাবেও তাবা ছিল আধুনিক। কূয়া বা কূপগুলি তারা বানাতো একালেব মতই পোড়া ইট দিয়ে কিংবা পোড়ামাটির বড় বড বেড়ী বা রিং [Ring] দিযে। কোন কোন বাড়িব কূপেব অর্ধেকটা ঘরেব দেওয়ালেব বাইরে বের করে রাখা হত পড়শি এবং পথিকেব ব্যবহাবের জন্য। "Moreove', from some representations of the ground plan of houses among the seal inscriptions, half of the well is shown by the side of the house. The other half must have remained outside, probably for use of the other people and the pedestrians." সুতবাং গৃহস্থবা পড়শি এবং পথিকের কথা ভাবতো এবং তাদের জল সববরাহেব জন্য কূযার অর্ধেকটা দেওয়ালের বাইবে বের করে রাখতো। এই সহৃদয়তা ও সহমর্মিতাই প্রমাণ করে হরপ্পীয়রা ছিল উন্নত সংস্কৃতিব ধারক এবং বাহক। নিজের প্রতিবেশীকে নিজের মত করে ভালোবাসার এই ঐতিহ্য হরপ্পীয়-অনার্যদের আর একটি গৌরবজনক ইতিহাস।

এবার মহেঞ্জোদারো কিংবা হরপ্পার নগরশৈলীর কথায় আসা যাক। স্যার জন মারশাল লিখেছিলেন, "Any one walking for the first time through

Mohenjodaro will fancy himself surrounded by the ruins of some present-day working town of Lancashire," সত্যি কথা বলতে কি মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান, লোথাল ইত্যাদি শহরগুলির গঠনশৈলী এতোই আধুনিক ছিল যে সেগুলিব ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে যে কোনও লোকের অনুভূতি স্যার জন মার্শালের মতই হতে পারে। স্বামী শঙ্করানন্দ লিখেছেন, "The Comparison is prompted by the fact that the Archaeologist found out that the Indus Vally bricks of fourth Millennium B.C. is similar in size to the modern English bricks. Of course, the Comparison could not be pushed further. From the excavations nothing but walls of certain height and the plinths of the house could be uncovered. The uncovered walls were without windows and the ground floor was reached by a single doorway which opened to a by-lane. The presence of staircases in the ground floor rising up is a clear indication that there were upper storeys. This upper storeys might have been one or many.

The discovery of the lattice works indicates that the upper storeys were supplied with windows or 'gov ā ksas'[গবাক্ষ], the bull-eye appertures. It appears that the ground floor was seldom used as a dormitory. Most probably it was used as a kitchen, a store and a cattle pound."

হাজার হাজর বছর পেরিয়েও এই ধরনের বাড়ি আজও বানানো হয় আমাদেব এই বাঙলাদেশেই। তবে হরপ্পা সভ্যতার শহরের বাড়িগুলির দোতলায় শৌচাগাব এবং স্নানাগার দুই-ই থাকতো, যা বাঙলার ওই বাড়ীগুলিতে থাকে না। মহেঞ্জোদারোব প্রতিটি ধনীব বাড়িতে শৌচাগার এবং স্নানাগার থাকতো। এই ব্যবস্থা হরপ্পা সংস্কৃতি যে কতটা উন্নত, কতটা মার্জিত এবং কতটা রুচিশীল ছিল, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আধুনিক যুগের ঘরবাড়ির মত বাড়ির দোতলায় শৌচাগার তথা স্নানাগার হরপ্পা সভ্যতার আধুনিকতা সগৌরবে ঘোষণা করে। এই উন্নত সংস্কৃতি হরপ্পার অনার্য গরিমাব কথা বলে।

প্রাচীন ভারতে গণিতের যে শাখাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি হল জ্যামিতি। জ্যামিতি অঙ্কন প্রণালীর সারগ্রন্থ হল 'শুল্বসূত্র'। এই শুল্বসূত্রগুলি রচিত হয় বৈদিক আমলে। এগুলি হাজার তিনেক বছরের পুরাতন। এখন বহু ঐতিহাসিক বলছেন যে, শুল্বসূত্রগুলিতে এতো উন্নতমানের জ্যামিতির আলোচনা রয়েছে যে, পূর্বে কোন জ্ঞান না থাকলে এ ধরনের সূত্রগ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব। হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের আগে পণ্ডিতরা বলতেন, ভারত শুল্বসূত্রগুলি রচনা করেছিল ব্যাবিলোনীয়দের কাছ

থেকে জ্যামিতির জ্ঞান ধার করে। কিন্তু হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কারের পর জানা গেছে যে, হরপ্পা সভ্যতায় জ্যামিতিচর্চা ব্যাপকভাবেই ছিল। শুল্বসূত্রগুলি হরপ্পীয় জ্যামিতিক জ্ঞানের উত্তরকালীন বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ভারতবর্ষকে শুল্বসূত্রগুলি লেখার জন্য বাইরের কোনও দেশের জ্ঞান ধার করতে হয়নি। হরপ্পা সভ্যতার জ্যামিতিক জ্ঞানই পরবর্তী কালে শুল্বসূত্রগুলির রচনায় সাহায্য করেছে। এখন বলা হচ্ছে, হরপ্পার জ্যামিতিক জ্ঞান ধার করেছিল সুমের তথা ব্যাবিলন এবং মিশর সভ্যতা। তবে ব্যাবিলন বা মিশরীয়দের মতো গাণিতিক তত্ত্ব ও তথ্য সংরক্ষণ করার অভ্যাস ভারতীয়দের মধ্যে ছিল না। বৈদিককালে যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজনে এই সংরক্ষণ শুরু হয়। কোন্ দিন কী তিথি ইত্যাদির জন্য পঞ্জিকা তৈরি করা হয় এবং এর থেকে এদেশে ব্যাপকভাবে জ্যামিতি, গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাব শুরু হয়। আর এই চর্চা শুরু হয়েছিল হরপ্পা সভ্যতার প্রাথমিক কাল থেকে এবং ৫০০০ বছরেরও বেশি আগে।

হরপ্পা সভ্যতাব অধিবাসীদের পরিমিতি এবং জ্যামিতির জ্ঞান ছিল। পণ্ডিতরা বলছেন, π-এর স্থূল মান এবং বৃত্তের বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন জ্যামিতিক অঙ্কন হরপ্পীয়রা জানতো। পীথাগোরাসের উপপাদ্য এবং সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কনও তাদের অজানা ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, দৈর্ঘ্য মাপার মাপকাঠিতে যে সব দাগকাটি আছে তা প্রমাণ করে যে, হরপ্পীয়রা দশমিকেব হিসাব জানতো। হরপ্পার স্কেলের এই দাগকাটায় যে ত্রুটি পাওয়া গেছে তা অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষুদ্র, মাত্র .০০৭৬২ সেন্টিমিটার, যা বাস্তবে ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। আবার এই মাপদণ্ডগুলি এমন জিনিষের তৈরি যে, বিভিন্ন তাপমাত্রায় এর দৈর্ঘ্যের পবিবর্তন হয না। বৃত্ত আঁকতে হরপ্পীয়রা এক রকম যন্ত্রের সাহায্য নিতেন। সিঁড়ি তৈরি কবতে যে জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন তা হরপ্পীয়দের অত্যন্ত নিখুঁতভাবেই ছিল এবং এই জ্ঞান ৫০০০ বছর আগে থাকাটা অবাক বিস্ময়ের।

হরপ্পা সভ্যতার সীলমোহরগুলি থেকে জানা যায়, হরপ্পীয়দের ঋজুরেখ চিত্র ইত্যাদির বেশ ভালো জ্ঞান ছিল। স্যার জন মার্শালের বিখ্যাত বই 'Mahenjodaro and the Indus Civilization' -এর ১১৩ নম্বর ছবিতে দেখা যায়, একটি আয়তক্ষেত্রকে সমান চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ওই প্লেটেই আবার একটি আয়তক্ষেত্রকে সমান ১২ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার রম্বসকে সমান চারটি রম্বসে বিভক্ত করার কথাও বলা হয়েছে। তেমনি ১১৪ নম্বর প্লেটে এক কেন্দ্রিক চারটি বর্গক্ষেত্র আঁকা রয়েছে। এই সব শীলমোহর দেখে পন্তিতরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হরপ্পীয়রা অঙ্কশাস্ত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতেন ঃ

(১) বর্গক্ষেত্রের কর্ণ বা আযতক্ষেত্রের কর্ণ এটিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে;

(২) বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের কর্ণগুলি সমান;

(৩) বর্গক্ষেত্রের বাহু-সমদ্বিখণ্ডকগুলি পরস্পর লম্ব।

হরপ্পীয়রা নিঃসন্দেহে আঁকতে পারতো ঃ

(১) প্রদত্ত সরলরেখাকে সমান দুটি অংশে ভাগ করা;

(২) প্রদত্ত সরলরেখাকে সমান দৈর্ঘ্যে বহু খণ্ডে বিভক্ত করা;

(৩) প্রদত্ত সরলরেখাকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে বিভক্ত করা;

(৪) প্রদত্ত দৈর্ঘ্যে এবং একটি সঠিক সমকোণের সাহায্যে বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র অঙ্কন

(৫) রম্বসকে কতকগুলি ক্ষুদ্র রম্বসে বিভক্ত করা,

(৬) সমান্তরাল সরল বেখা অঙ্কন করা।

ডঃ টি. এ. সরস্বতী আম্মা [T. A. Saraswati Amma] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ, 'Geometry in Ancient and Medieval India"-তে লিখেছেন ঃ

"The branch of mathematics which received the earliest attention was also geometry. The Sulvasutras (5th to 8th century B.C.) is a manual of Geometrial constructions. A geometrical knowledge of this level could not have come into existence overnight. The absence of earlier records has led many scholars to posit large-scale indebtedness to foreign countries, chiefly Babylonia. This is not warranted, though exchange of ideas could have and must have occurred. Even the scant remnants of the Indus Valley Civilisation excavated at Harappa and Mohenjo-daro reval some acquaintance with gemoetry In the words of E J.H. Mackay, 'It is surprising to find that an instrument was actually used for this purpose (i.e. for drawing circles) in the Indus Valley as early as 2500 B C Hence it seems more probable that Indian geometry developed gradually into the **sulvasutra** stage with the intervening links buried in the sands of time. (India's sands were never so kind to her records as Babylonia's sands have been to her clay tablets.) Even the Sulvasutras may have preserved only a part of the mathematical knowledge of those days, the part that was necessary for constructing the sacrificial altars and for computing the calendar to regulate the performance of sacrifices."

প্রাচীন ভারত জ্যোতির্বিজ্ঞানেও প্রভূত উন্নতি করেছিল। কোন্ দিনে কোন্ তিথি নির্ণয়ে যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান জড়িত, তেমনি নগরগুলির অবস্থান, রাস্তা ঘাটের সঠিক দিকে অবস্থান ইত্যাদিতেও হরপ্পীয়রা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছিল। সারা পৃথিবীতে অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে বিশাল ব্যুৎপত্তি হরপ্পীয়রা অর্জন করেছিল তার তুলনা কেবল তারা নিজেরাই। সুমের, মিশর এবং মায়াদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের অনেকটাই সম্ভবত হরপ্পীয়দের অবদান।

সুতরাং প্রাচীন ভারতে গণিত-চর্চার পথিকৃৎ হ'ল হরপ্পীয়রা। শুধু আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র নয়, বৃত্ত নিয়েও তাদের সম্যক জ্ঞান ছিল। π-এর কথা তারা ভালো করেই জানতো। ৫০০০ বছর আগে অঙ্কশাস্ত্রে হরপ্পীয়দের এই জ্ঞান আমাদের আশ্চর্যান্বিত করে। হরপ্পা তার এই জ্ঞান দিয়েছিল মিশর এবং সুমের সভ্যতাকে। অঙ্কশাস্ত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানে সুমেরদের যে ব্যুৎপত্তির কথা পণ্ডিতরা বলছেন, তা কিন্তু হবপ্পীয়দেরই অবদান। হরপ্পীয়দের অঙ্কশাস্ত্রে এই বিশাল ব্যুৎপত্তি তাদের গৌরবময় দিকেব কথাই বলে। আর এই গরিমা নিঃসন্দেহে হরপ্পার অনার্য গরিমা।

বৃত্ত সম্পর্কে হরপ্পীয়রা যে সব তত্ত্ব জানতো সেগুলিও কোন অংশে কম যায় না। সেগুলির কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক। হবপ্পার বিভিন্ন পাত্রেব গায়ে পরস্পরছেদী একগুচ্ছ বৃত্তের অঙ্কন দেখা যায়। এধরনের বহু পাত্র পাওয়া গেছে হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলিতে। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আর্নেস্ট ম্যাকের [Ernest Mackay] লেখা 'Early Indus Civilisation' গ্রন্থের ১৭ নম্বর প্লেটে দেখা যায় একটি বৃত্তকে দুটি ব্যাসের সাহায্যে চারিটি সমান অংশে ভাগ করা হযেছে। ১৮ নম্বর প্লেটে একটি বৃত্তে চাবিটি পাপড়ি আঁকা আছে। এটি করতে গেলে বৃত্তের পরিধিকে সমান ১২ টি অংশে ভাগ করতে হবে। ঐ একই প্লেটে বৃত্তের মধ্যে আটটি পাপড়ি আঁকা আছে, যা করতে গেলে বৃত্তের পবিধিকে সমান ২৪ টি অংশে ভাগ করতে হয়।

এ থেকে পণ্ডিতেরা মনে কবেন সেই সময সিন্ধুব অধিবাসীবা বৃত্তেব নিম্নলিখিত ধর্মগুলি জানতেন ঃ

(ক) প্রদত্ত ব্যাসেব সাহায্যে বৃত্ত অঙ্কন এবং এক কেন্দ্রিক কতকগুলি বৃত্ত অঙ্কন।

(খ) ব্যাসেব সাহায্যে বৃত্তকে সমান বহু অংশে বিভক্ত কবা যায যা থেকে বলা যায সিন্ধুবাসীরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি জানাতো।

(i) প্রদত্ত বিন্দু থেকে একটি সবলরেখাব উপর লম্ব অঙ্কন।

(ii) কোন সরলবেখাকে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কম্পাসেব সাহায্যে বিভক্ত কবা।

(iii) প্রদত্ত কোণকে বিভক্ত করা।

(iv) যদি কোন বৃত্তেব ব্যাসার্ধ জানা থাকে তাহলে সেই বৃত্তেব পবিধিকে সমান ছয়টি অংশে ভাগ কবা যায়।

(v) একটি কোণকে সমান দুইভাগে ভাগ করা যায।

(vi) একটি বৃত্তের মধ্যে সর্ববৃহৎ বর্গক্ষেত্র বা ষডভুজ অথবা যুগ্ম বা অযুগ্ম সংখ্যক সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যে কোন চিত্র অঙ্কন কবাব পদ্ধতি।

মার্শাল সাহেব যে সমস্ত প্লেট দেখিয়েছেন তা থেকে স্পষ্ট বলা যায দুটি বিন্দুব মধ্য দিয়ে বৃত্ত অঙ্কন, বৃত্তের স্পর্শক অঙ্কন ইত্যাদি মহেঞ্জোদাবো এবং হবপ্পাব অধিবাসীরা জানতো। তাছাড়া বৃত্তের প্রতিটি স্পর্শক ব্যাসার্ধের উপর লম্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা এখানকার অধিবাসীদের ছিল।

বহু পণ্ডিত অনুমান করেন, সিন্ধুবাসীরা ঘনক, গোলক, স্তম্বক প্রভৃতিব আয়তনেব সূত্র জানতো। এমনকি পীথাগোরাসের সূত্রটি সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল।

সুতরাং অঙ্কশাস্ত্রে তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রায় ৫০০০ বছর আগে হরপ্পীয়দের এই বিপুল বুৎপত্তি আরও একবার অনার্যগরিমার তত্ত্ব প্রচার করে। এটা ঠিক, হরপ্পীয়দের এই বিপুল ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে বহু সময় লেগেছিল। এই প্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস আজও আমাদের অনাবিষ্কৃত। তবে, ৪৭০০ বছর আগে তারা যে এই সব বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। আগেই বলেছি, হরপ্পাই ছিল এ ব্যাপারে সব প্রাচীন সভ্যতার পথিকৃৎ।

হরপ্পার আরেকটি গৌরবময় দিক হল এর পরিমাপ ব্যবস্থা। কি দৈর্ঘ্য-পরিমাপ, কি ওজন পরিমাপ—দুটোতেই ব্যবহৃত হয়েছে দশমিক প্রথা। দৈর্ঘ্য মাপার মাপকাটিতে ৬·৭ মিলিমিটার অন্তর দাগ দেওয়া আছে। দশমিক প্রথা ব্যবহৃত হয়েছে স্কেলের দাগগুলি কাটায়। হরপ্পা সভ্যতার ধারকরা খাড়া [Vertical] ও অনুভূমিক [Horizontal] রেখার দাগ দিয়েই সংখ্যা গণনা করত। এই সভ্যতার কোটি কোটি ইটের মাপের ঐক্য থেকেও বুঝতে পারা যায় হরপ্পীয়রা গণিতবিদ্যাটি কত ভালো জানতো। পাশা খেলার ঘুঁটিতেও এক থেকে ছয় পর্যন্ত সংখ্যাবাচক দাগ কাটা থাকতো।

ওজনের জন্য পাথরের তৈরি বহু বাটখারা পাওয়া গেছে। একই মাপের দুটি বাটখারা নিখুঁত ভাবে সম-ওজনসম্পন্ন। একরকম ছোট বাটখারা পাওয়া গেছে যেগুলি ঘনকাকৃতি। এই ঘনকাকৃতিব যে সব বাটখারা পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভারীটির ওজন হল ২৭৪·৯ গ্রাম। আর এক রকম গোলাকার ভারী ওজনের বাটখারা পাওয়া গেছে যার সব চেয়ে ভারীটির ওজন ১১কিলোগ্রাম। ওজন প্রথা ০.৮৫৬৫ গ্রাম এককের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ একক ছিল একালের ০.৮৫৬৫ গ্রাম। এরই ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০, ১৬০০, ৩২০০, ৬৪০০, ৮০০০, ১২৮০০ গুণিতকে বাটখারাগুলি নির্মিত হত। বাটখারাগুলি তৈরি হত সাধারণ চুণাপাথর, স্ফটিকশিলা [Schist], ক্যালসেডোনির [Chalcedony] মত মূল্যবান পাথর দিয়ে। আরও নানা ধরনের পাথর ব্যবহার করা হত বাটখারা বানাতে। এগুলি বানানো হত খুব সুন্দর পালিশ করে। আর প্রতিটি বাটখারা বানানো হত অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে এবং নিখুঁতমাপে। একই ওজনের বাটখারাগুলির প্রত্যেকটিই নিখুঁতভাবে সমপরিমাপসম্পন্ন করে বানানো হত। রৈখিক পরিমাপে এবং ওজনের মানে দশমিকের ব্যবহার মানব সভ্যতায় হরপ্পীয়দেরই দান। এ ব্যাপারেও হরপ্পা সভ্যতা গৌরব দাবী করতে পারে। আর এই গৌরব, এই গরিমা হরপ্পার অনার্যদেরই প্রাপ্য। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দশমিকের হিসাব চালু করেছিল হরপ্পার অনার্যরাই।

ডঃ বামগোপাল চ্যাটার্জী লিখেছেন ঃ "Weights have also been found at Harappa, Chanhudaro and other related sites. They are made of chert, limestone, gueiss, steatite, slate, chalcedony, schist, and are well finished. Scales made of metal or pottery scales have been found. A bronze or copper bar thought to have been part of a scale beam was also found.

A definite standard of weight was in vogue then, the lower denomination is binary, with the usual Indian ratio 16 as the unit. In the higher denomination the system was decimal, with fractional weights in thirds. Standard of measurement of length, probably cubits, were in vogue then, for the length of the main walls of the Harappan granaries was 30 cubits = 51 ft. 9 in. main halls 10 cubits = 17 ft. 3 in. This well defined standardisation particulary of weights is so unlike any other in the contemporary world."

দশমিক প্রথা এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে স্বামী শঙ্করানন্দও লিখেছেন :

".... it is obvious that Indus Valley specimen of the scale was the earliest. Egypt could not develop her decimal system before 1500 B.C, during the twelfth Dynasty. According to Prof. Langdon, the decimal system were used in Jamdet Nasr. It also appeared in the proto-Elmmite Tables. But all these people developed the decimal system long after the Indus Vally people were already proficient in the science. From the discovery of the Trade relation of the Indus Valley with cities on the Euphrates and the Nile, it is reasonable to assume, that all these people learned the system from Indus Valley mariners, who frequented these places for the exchange of merchandise."

সুতবাং হবপ্পার অনার্যরাই প্রথম দশমিক পদ্ধতির আবিষ্কাব করে। তারপব এই পদ্ধতি তারা বাণিজ্য উপলক্ষে সুমেরে গিয়ে তাদের শেখায এবং কিছুটা পরে প্রায় ৩৫০০ বছব আগে মিশর এই পদ্ধতি রপ্ত কবে। কি বৈখিক মাপে, কি ওজন পরিমাপে দশমিক পদ্ধতিব প্রথম ব্যবহার হরপ্পীয় অনার্যদেরই এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

হবপ্পা সভ্যতাব লোকজনরা মৃৎশিল্পেও প্রবল উন্নতি করেছিল। অত্যুন্নত মানের মৃত্তিকা-নির্মিত তৈজসপত্র বানানোয় আশ্চর্য রকমের ব্যুৎপত্তি অর্জন কবেছিল হরপ্পীয়রা। সমসাময়িক কালে অন্য কোন সভ্যতা, অন্য কোন দেশ এমন বিপুল ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে নি। এরা চীনামাটির পাত্র, নল ইত্যাদি সুচারুভাবে বানাতো। চীনামাটির পাত্রেব ভিতবের দিকে কাঁচের মত চকচকে কবতে এমন একটা প্রলেপ লাগাতো যে, পাত্রের মধ্যে রাখা কোনও তরল কোনওভাবেই পাত্রের গাযে শোষিত হতে পারতো না। মার্শাল সাহেব বলছেন যে, পাত্রেব ভিতরের ওই প্রলেপ বহুদিক থেকে কাচই বলে মনে হয। এই সব চীনামাটির পাত্রের সঙ্গে ৩৫০০ বছর আগের মিশরীয় পাত্রগুলির সাদৃশ্য রয়েছে। পণ্ডিতেরা হরপ্পার চীনামাটির এবং ওই লেইয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে মিশর দেশেব এতাদৃশ পাত্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। কাচ অথবা কাচের মত পদার্থ হরপ্পীয়রাই প্রথম বানিয়েছিল। এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। অনেকে

মনে করেন, মিশরই খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ নাগাদ প্রথম কাচের ব্যবহার শুরু করে। অথচ উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলার কোপিয়া [Kopia]-তে উৎখনন করে পাওয়া গেছে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাচ এবং কাচ তৈরির কারখানার ধ্বংসাবশেষ।

ডঃ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় হরপ্পা সভ্যতার ধারকদের রসায়ন সংক্রান্ত জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে লিখেছেন ঃ "The ordinary articles of faience (চিত্রিত ও চকচকে মাটির পাত্র) are composed of a white or grey paste coated with a glaze. Faience is a vitreous substance with a glazed surface often coloured by the addition of suitable mineral matter. From external examination two of the faience objects appeared to have been moulded from a siliceous material resembling the faience of ancient Egypt

Some vessels are made of faience and vitreous paste in order to prevent their contents soaking into the substance of the jar. According to Marshall the vitreous paste resembles glass in many respects. It has a smooth fracture and when examined through a magnifying glass shows a number of air or blow holes. It is opaque therefore not a variety of porcelain. It shows no evidence of admixture as would be the case if a paste had been mixed with an ordinary adhesive to strengthen it.

On analysis its percentage composition is found to be :

SiO_2	88.12
Al_2O_3	3.2
Fe_2O_3	1.82
CaO	1.26
Alkali Oxides	5.04
CuO	0.46

The percentage composition of faience is fou^d to be :

SiO_3	57.99
Al_2O_3 / Fe_2O_3	4.85
CaO	4.31
MgO	27.20
Alkali Oxides	3.54
CuO	1.09
Loss on ignition	1.01

These data compared favourably with the percentage composition of some typical glass found in Egypt in 1400 B.C. A dark transparent fragment was found to contain :

SiO_2	61.7
Al_2O_3	2.45
Fe_2O_3	0.72
CaO	10.05
MgO	5.14
Alkali Oxides	19.21
CuO	0.32
Mn_2O_3	0.47

Another light yellow translucent fragment was found to contain:

SiO_2	62.71
Al_2O_3	1.47
Fe_2O_3	0.96
CaO	9.16
MgO	4.52
Alkali Oxides	20.26
SO_2	0.92

সুতরাং কাচের মত চকচকে উজ্জ্বল প্রলেপটি কাচই হওয়া সম্ভব। এই কাচ বহুল উৎপাদিত হয় ৩৫০০ বছর আগে মিশরে। তার অন্ততঃ এক হাজার বছর আগেই কাচ আবিষ্কার করে হরপ্পীয়রা। কোপিয়ার প্রাচীন কাচ কারখানার ধ্বংসাবশেষ সেই কথাই বলে, কারণ এর বয়স নির্ণয় করা হয়েছে প্রায় ৪৫০০ বছর। ঐতিহাসিকরা প্রায় স্বীকার করেই নিয়েছেন যে, প্রায় ৪৫০০ বছর আগে হরপ্পীয় অনার্যরাই সর্বপ্রথম কাচ বানিয়েছে। এই কাচ শিল্প ২৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম দেখা যায় ভারতের বাইরে প্রসারিত হয়েছে। সুমের সভ্যতার 'উর' [Ur] শহরের এক সমাধিস্থানে ৪৪৫০ বছর বয়সের একখণ্ড কাচ পাওয়া গেছে। তার অনেকটা পরে মিশরীয়রা কাচ ব্যবহার করতে শুরু করে ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। এ নিয়ে আবার ডঃ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের কথায় ফিরে আসা যাক।

"Glass specimens and glass factory have been unearthed at Kopia in Ballia District in Uttar Pradesh. These are belived to be 4500 years old. In Sanskrit Language the word Kacha denotes glass, indicating that glass was known to the ancients whose Language was Sanskrit. Kautilya mentioned of glass in connection

with some ornamental work with gold. Pliny has mentioned of Indian glass as superior to all others. Marshall has referred to glass tiles used in Taxilla. Should we then consider the original home of glass to be Egypt which became the chief centre of glass manufacture in 1400 B. C. or consider that the credit of making glass or glass like material goes to the Indus Valley people whose art in pottery, brick, clay and firing in kilns and fusing silicates were indubitably of high order?"

সুতরা হরপ্পীয়রাই সর্বাগ্রে কাচ তৈরি করতে শিখেছিল। তাদের কাছ থেকে কাচ বানাতে শেখে সুমেরীয়রা। তার অনেকটা পরে মিশরীয়রা কাচ বানাতে শুরু করে। কাচ এবং চীনামাটি শিল্পে হরপ্পাই সকলের পথিকৃৎ। এ গৌরব হরপ্পার গৌরব! হরপ্পার অনার্য সভ্যতার গৌরব!

মহেঞ্জোদারোতে কিছু রঙীন কাপড়েব টুকরো পাওয়া গেছে। এগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, হবপ্পা সভ্যতার লোকজন তুলার চাষ করতো। সেই তুলা থেকে তারা বস্ত্র বয়ন করতো। এই সব কাপড় সাধারণ মানেরই শুধু হত না, উন্নত মানেব বস্ত্রের নমুনাও পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদারো থেকে। রূপোর পাত্রের মধ্যে পাওযা একটি টুকবো কাপড় পবীক্ষা-নিরীক্ষার করে জানা গেছে এটি ভারতীয় তুলা থেকে বয়ন করা। এর ওজন দুই আউন্স প্রতি বর্গ গজে। অর্থাৎ এখানকাব একটা দশহাত কাপড়েব আয়তনে হরপ্পার কাপড়ের ওজন ছিল প্রায ৫০০ গ্রাম। যে টুকবোটি পবীক্ষা কবা হযেছিল তার টানা [Warp] ছিল সংখ্যায় ৩১ টি এবং পোড়েন [Weft] ছিল সংখ্যায় ৩৪টি। টানার সুতার সংখ্যা ছিল প্রতি ইঞ্চিতে ২০টি এবং পোড়েনের প্রতি ইঞ্চিতে ৬০টি। মুশকিল হল, বস্ত্র বয়নের যন্ত্রপাতির কোনও ভগ্নাবশেষ হরপ্পা সভ্যতাব নগরগুলিতে পাওয়া যায় নি। কেবল কযেক টুকরো বস্ত্র পাওয়া গেছে যেগুলির বয়স ৪৫০০-৫০০০ বছর। বঙীন কাপড়ের টুকরো বলছে, হরপ্পীয়রা সুতা এবং কাপড় দুটোই রং করে ব্যবহাব করতে জানতো। রঙীন কাপড়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে নগরেব লোকেরা ঝলমলে পোষাক পরতো এবং বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতো। কাপড়ের টুকরোগুলি ভাগ্যক্রমেই পাওয়া গেছে। কারণ চার পাঁচ হাজার বছর ধরে কাপড়ের টিকে থাকার কথা নয়, বিশেষ করে মাটির নিচে। তবে মহেঞ্জোদারোতে রঙীন কাপড়ের টুকবোটি পাওয়া গেছে একটা রূপার পাত্রের [Silver Vase] ভিতরে। অন্য একটা কাপড়ের টুকরো পাওয়া গেছে একটা ভাঙা ছুরির সঙ্গে। আরেকটি বস্ত্রখণ্ড পাওয়া গেছে তামার তৈরি একটা ক্ষুরের [Razor] সঙ্গে।

সুতরাং সাড়ে চার কিংবা পাঁচ হাজার বছর আগে হরপ্পীয়রা তুলার চাষ করতো। এবং সে তুলা থেকে তারা উন্নত মানের বস্ত্রও বয়ন করতো। সে বস্ত্র রঙীন করাও হত। আর এ সবই হরপ্পীয়রা করেছিল অন্য সব সভ্যতার আগেই। বস্ত্র বয়নের উন্নত

কলাকৌশলের আবিষ্কর্তা হয়প্পীয়রাই। এ ব্যাপারেও হরপ্পার অনার্যরাই পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে ভারতীয় বস্ত্রের যে প্রবল চাহিদা পশ্চিমের দেশগুলিতে ছিল, সম্ভবত তার শুরু হরপ্পীয়দের আমল থেকেই। বলা হয়েছে ঃ

"Further excavations at Mahenjodaro has brought out the remnant of textile materials which were sufficient to enhance our knowledge about the textiles used by the people. These specimens were made to live by the metallic salts created in the damp areas in which those textiles were kept. These portions of the woven materials were preserved in the same manner as the previous one found in the silver vase.

Most of the textile fibres have been proved to be cotton, but there are some specimens which have been recognized as bast fibre. The flax (শণ) fibre was conspicuous by its absence, while it was the main material from which fibres were spun for weaving in ancient Egypt, Crete and Mesopotamia "

সুতবাং মিশব ও ব্যাবিলন যখন শণ বা পাট থেকে বস্ত্র বয়ন করছে, হবপ্পীয়রা তখন তুলাব চাষ করে সে তুলায় পরিধেয় বানাচ্ছে। পৃথিবীতে প্রথম কার্পাস তুলার সুতায় বস্ত্রবয়ন হরপ্পাব অনার্য গবিমাব আরও একটা দিক।

হবপ্পা-মহেঞ্জোদাবোব বিলাসবহুল নাগবিক জীবনে নানা খনিজ ব্যবহৃত হত। দামীদামী পাথবগুলি আসতো নানান দেশ থেকে। এগুলির অধিকাংশ ব্যবহৃত হত অলঙ্কাব নির্মাণে। এই তাম্রাশ্ম সভ্যতায় তামা সববরাহ হত তাম্রলিপ্ত থেকে। ব্রোঞ্জ বানানোব জন্য প্রয়োজনীয় টিন [Tin] ধাতুটি সম্ভবত থাইল্যাণ্ড থেকে সংগৃহীত হত বাঙালি বণিকদেব মাধ্যমে। বাঙালি বণিকবাই থাইল্যাণ্ড থেকে টিন সংগ্রহ কবে তামার সঙ্গে টিনও সববরাহ কবতো হবপ্পাব নগবগুলিতে। প্রসাধন দ্রব্যও ব্যবহাব করত হরপ্পা সভ্যতাব অনার্যজাতি। আর্যরা এসব জানতো না। ভারতবর্ষে এসেই তাবা প্রসাধনের ব্যবহাব শিখতে শুরু কবে। হরপ্পার দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য সম্বন্ধে ডঃ বামগোপাল চ্যাটার্জী লিখেছেন ঃ

"The Indus valley people used a large number of minerals, such as lapis lazuli, torquoise, rock crystals, limestone, alabaster, amethyst, Jasper, Jade Chalcedony, onyx, slate, bitumen, steatite. sodalite, lollingite, arsenical pyrites, haematite, cinnabar etc, Most of them are used as gems for ornamental beads or pendants. Cerrusite and cinnabar have been found at Mohenjodaro. They might have been used as cosmetics. Galena has been used for eye salves, white lead for hair washes.

It seems that bitumen, steatite and alabaster were obtained

from Baluchistan, torquoise and lapis lazuli from Afghanistan or Persia, haematite from Persia. Agate, carnelian, onyx and chalcedony, rock crystal were obtained from Kathiawar, slate, jasper, steatite, chalcedony might have been imported from Rajputana.

Implements, such as knives, daggers, arrowheads, lanceheads, axeheads, utensils, sickles etc. made of copper and bronze have been found in plenty at Mohenjodaro and Harappa.

It might be concluded that copper and bronze were the chief metals for the Indus Valley people for manufacturing tools and weapons. Copper and bronze have also been used for making ornaments, bangles, finger rings, earrings, amulets, statuettes and also for rods and wires. Bronze being harder, was preferred for making weapons with sharpened edge. It contained a high percentage of tin.

Chisel—	Copper	87.42
	Tin	10.45
	Arsenic	1.1
	Lead	0.52
	Iron	0.34
	Nickel	0.17

It is highly probable that the ancients used bronze without knowing that they were using an alloy of copper and tin. Tin and copper ores are often found together, a mixture of them might have been smelted to produce bronze, A high percentage of tin, (e.g.10.45 per cent as above) in a sample of bronze would indicate most probably mixing of tin ore to make the copper hard for making cutting tools. For making sharp edged hard weapons, an alloy of copper and arsenic has also been used.

Axe-head—	Copper	98.37
	Arsenic	1.40
	Tin	0.09
	Nickel	0.10
	Lead	0.11
	Iron	0.02

It is difficult to say whether the arsenic was added purposely to make a hard alloy of copper and arsenic or the alloy was made

accidently by extracting metal from a copper ore bearing arsenic. Lollingite, a natural mineral composed of arsenic and iron occurs in India. It was found in Mohenjodaro. Was the mineral intended for the preparation of this alloy? A similar alloy was also in use in Egypt."

হঠাৎই আবিষ্কৃত হোক কিংবা বুদ্ধি করে বানানো হোক, হরপ্পীয়রাই তাম্রাশ্ম সভ্যতার জনক এবং তামাকে শক্ত করার জন্য তাবা তার সঙ্গে আর্সেনিক মেশাতে শিখেছিল। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জও সর্ব প্রথম বানিয়েছিল। তামাকে শক্ত করার পদ্ধতি শেখার ফলে দৈনন্দিন জীবনে তামার ব্যবহার অনেক বেড়ে গিয়ে ছিল এবং সভ্যতার অগ্রগমনও সম্ভব হয়েছিল শক্ত তামা ব্যবহারের ফলে। 'লোলিংগাইট' আকরিক ব্যবহার করলেও হরপ্পীয়রা লোহার ব্যবহার জানতো কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

হরপ্পীয় অনার্যবা যে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতো তা বোঝা যায় দামী দামী পাথরেব অলঙ্কাব ব্যবহাবে, সোনা-রূপা-ব্রোঞ্জ-তামাব অঢেল বন্দোবস্তে, সুসভ্য উন্নত নাগরিক জীবনযাপনেব মধ্যে।

"The Indus valley people used gold and silver for jewellery. Gold was imported from South India. An analysis of silver showed that it was associated with lead and copper; the possible source was, therefore, cerussite, found in Baluchistan. The nearest source for lead ore would appear to be Ajmeer in Rajputana".

হবপ্পীয়বা সভ্যজীবনেব অধিকাংশ উপাদান নিজেরা বানিয়ে নিয়েছিলো। প্রায় অধিকাংশ ব্যাপাবেই তাবা ছিল পথিকৃৎ। হরপ্পার অনার্যজাতিই সভ্যতার অগ্রগমনে প্রথম পথপ্রদর্শক। সভ্য নাগরিক জীবন সৃষ্টির সমস্ত গৌরব হরপ্পার অনার্যজাতির। পৃথিবীব মানুষকে প্রথম সভ্য নাগরিক জীবন দেওয়ার কৃতিত্ব হরপ্পাবাসীদের। পুরো ব্যাপাবটাই হবপ্পার অনার্য গবিমাব তত্ত্বই প্রচার করে।

হরপ্পাব নগবগুলিতে লক্ষ লক্ষ পোড়া ইট ব্যবহৃত হয়েছে। সে সব ইট এমনভাবে গাঁথা হয়েছে যে, ৫০০০ বছর পবেও ভগ্নাবশেষের দেওয়াল কিংবা ড্রেনের দুটো ইটের মাঝখানে একটা ভিজিটিং কার্ড ঢোকানোর মত ফাঁকও নেই। এমনি শক্ত গাঁথুনি হরপ্পার নগরগুলির অধিকাংশ সৌধেব যে বিস্মিত হতে হয়। এই সব ইটের গাঁথুনিতে যে মর্টার [Mortar] ব্যবহৃত হয়েছে তাব উপাদান হল এই রকম ঃ

"The Indus valley people used mud as mortar. Proofs are there that they used also gypsum cement for pointing walls of buildings. The mortar contained gypsum, lime and sand. A sample of mortar used in the construction of drains contained. :

Gypsum	56.73
Carbonate of Lime	27.87

Sand	16.64
Moisture	1.0 per cent,

Another sample of mortar contained no gypsum but a high percentage of lime.

Carbonate of Lime	69.58
Sand	21.71
Alkaline Salts	5.44
Moisture	3.27

মিশরের পিরামিডগুলির বিশাল বিশাল পাথরেব গাঁথনি যেমন বিস্ময়করভাবে করা হয়েছে, তেমনি সুনিপুণভাবে লক্ষ কোটি ইট গেঁথেছে হরপ্পা সভ্যতার স্থপতিরা। আগেই বলা হয়েছে, মহেঞ্জোদারো নগরের গঠনশৈলী পৃথিবীর একালের বহু নগরের চেয়েও উন্নততর ছিল। সুতরাং স্থাপত্যের বিচারে হরপ্পা সভ্যতাব স্থপতি ও কারিগরেরা এখনকার বহু স্থপতি এবং কারিগরের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল, অনেক আধুনিক ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, তাদেব ৫০০০ বছবেব প্রাচীন সৃষ্টি আজকেব স্থপতিদেব সৃষ্টিব সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিচ্ছে। এ কালের অনেক যান্ত্রিক সুবিধা হবপ্পীযদেব ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদেব নগর পরিকল্পনা, নগবের গঠন, জল সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল একেবারে আধুনিক। রাস্তা-ঘাট, পযঃপ্রণালী সবই ছিল একালের মত আধুনিক। হরপ্পা সভ্যতাব এই গবিমা তাব অনার্য অধিবাসীদেবই গবিমা—অনার্য জাতিবই গৌবব।

প্রয়োজনই আবিষ্কারেব জননী। নিজেদেব বক্ষাব প্রযোজনে এবং জ্ঞান সঞ্চযেব তৃষ্ণায় হরপ্পীয়রা তাদেব এমন একটা পর্যাযে উন্নত করেছিল যে, তাদের সভ্যতাব বহু উপাদানই আজও যথেষ্ট আধুনিক। ঐতিহাসিকদের ভাষায় এ সব কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে এর বিস্তৃতির কথা, বিভিন্ন স্তরের কথা, মিশর এবং সুমের সভ্যতার সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা এবং হবপ্পার শেষ পর্বের কথা, যখন ঝুকার [Jhukar] লোকেরা দখল করে নিয়েছে চানহুদারো এবং হরপ্পীয়রা পরিত্যাগ করেছে এই নগর। হরপ্পীয়রা তাদের নগরগুলি কেন পরিত্যাগ করেছিল তা আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আবার হরপ্পা কিংবা মহেঞ্জোদাবোতে এতোগুলি স্তরের কারণও অনেকটাই অজানা। ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ

"Necessity is the mother of invention. The urge for self protection and thirst for knowledge are both responsible for the birth and progress of science, cumulative effect of which represent march of civilization, The excavations at Mohenjodaro have unravelled evidence of the skill of the ancient Indians in the teachique of glazed pottery, brick making and in the extraction and working of metals.

The earliest evidence of chemical knowledge of the ancient Indians in the prehistoric age had been obtained from the the excavations in Baluchistan, Sind and the Punjab. The excavations revealed the existence of a culture at Mohenjodaro in Sind and at Harappa in the Punjab. The culture has some affinity to the Sumerian culture of Mesopotamia and the Nile valley civilization of Egypt.

It has been revealed that Indus culture was spread well over sixty sites along the Indus axis between Rupar (foot of Simla hills) and Sutkagendor(300miles W. Karachi). It extended far down the west coast, giving the Indus people about forty sites in Saurastra, Bhagatrav on the Kim-estuary, nearly 500 miles S.E. Mohenjodaro, and also at Alamgirpur (Ukhlina) 600 miles E. from Mohenjodaro. It seems, therefore, that the Indus civilization circumvented the Thar desert on both sides, Some eighty miles south of Mohenjodaro and about half a mile south of the village Jamal-Kirio, near Sakrand, there adjacent mounds constitute Chanhu-daro. Since the term Indus culture was used, three entirely different cultures had been unearthed and named after the places at which they were found, namely Amri, Jhukar, Jhangar. Amri culture is considered to be earlier than Harappa culture and the Jhukar and Jhangar cultures followed the Harappa culture after a long time. It is thought that the Jhukar people occupied the Chanhu-daro mound after it had been deserted by the Harappa people."

প্রাক-হরপ্পা, হরপ্পা এবং উত্তর-হরপ্পা—এই তিন সংস্কৃতির তথা সভ্যতার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাই ছিল সবার সেরা, সবচেয়ে উন্নত। প্রাক-হরপ্পা সভ্যতা নাগরিক সভ্যতা ছিল না। কিন্তু উত্তর হরপ্পা সভ্যতার অবনতির সঠিক কারণ আজও জানা নেই। অনেকে মনে করেন, বর্বর আর্যদের আক্রমণই হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসেব তথা অবনতির সম্ভাব্য সঠিক কারণ। হরপ্পার নাগরিক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেলেও তার সংস্কৃতি কিন্তু কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্য সভ্যতায় চলে আসে। এ নিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে৷ যাইহোক না কেন, হরপ্পার গৌরবময় সভ্যতা অনেকাংশে ধ্বংস হয় বর্বর আর্যদের হাতে। হরপ্পার অনার্য গরিমার মূল ধ্বংসকারী হল যাযাবর, বর্বর আর্যজাতি।

হরপ্পার অনার্য গরিমার কথা শেষ করবো হরপ্পার লোকজনদের আরেকটি গৌরবেব কাহিনী দিয়ে। এই গৌরবগাথার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে হরপ্পার লিপিমালা। আগেই বলেছি, হরপ্পা সভ্যতার একটা নিজস্ব লিপি এবং লিখন পদ্ধতি ছিল। উৎখননেব ফলে কয়েকশ' সীলমোহর পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি সীলমোহরে রয়েছে সুগঠিত বর্ণমালার লিপিসমূহ। কিন্তু এগুলির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। পণ্ডিতরা বলছেন এই লিপি পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি। সুমেরদের কীলকাক্ষর লিপি [Cuneiform Script] এবং মিশরীয়দের হাইয়ারোগ্লিফ [Hieroglyph] লিপির উদ্ভবের অনেকটা আগেই হরপ্পীয়রা তাদের এই সুগঠিত বর্ণমালা তথা লিপির ব্যবহার শুরু করে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। বড় কথা হল, পৃথিবীর কোন সভ্যদেশ যখন লিখতে শেখে নি, তখন হরপ্পীয়রা তাদের সুগঠিত বর্ণমালা দিয়ে লিখতে শিখে গেছে। এই লিপির ব্যবহার থেকে পণ্ডিতরা বলছেন যে, হরপ্পীয়দের মধ্যে যে শুধু উন্নত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তা নয়, তাদের মধ্যে শিক্ষারও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। হরপ্পাব অনার্য অধিবাসীদের এটা একটা গৌরবময় দিক যে, তারাই পৃথিবীকে সর্ব প্রথম লিপি উপহার দিয়েছিল। হরপ্পা-লিপিই পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি। প্রসঙ্গত এ কথা মনে করিয়ে দিই যে, আর্যদের কোনও লিপি ছিল না। ভারতে আসার বহুকাল পরেও লেখাব কাজে তারা হরপ্পীয় লিপিই ব্যবহাব করেছে।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃত অঞ্চল এক অভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্ভূত ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। বাণিজ্যেব আদান-প্রদান ছিল বলেই হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃত অঞ্চলে ওজন মাপের ঐক্য ছিল। সম্ভবত পণ্য-বিনিময়েব মাধ্যমে কেনা-বেচা হত। কাজ-কারবারের লেনদেন লিখে রাখা হত। যে সীলমোহরগুলি পাওযা গেছে সেগুলি দিয়ে মনে হয় মাটির উপর ছাপ দিয়ে লেবেল তৈরি কবে, লেবেলগুলি বাণিজ্যেব পণ্য-পূর্ণ ঝুড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। সীলমোহরগুলিতে একটা জন্তুর প্রতিকৃতি ও তার উপর-ভাগে একছত্র লেখা আছে। পণ্ডিতরা মনে করেন, লেখাগুলি ব্যক্তিবিশেষের নাম এবং জন্তুর চেহারাগুলি 'টোটেম' বা 'গোষ্ঠি' বা 'সংঘ'বাচক। হরপ্পার অনার্যবা বহির্বাণিজ্যে অত্যন্ত দক্ষ ছিল। বাণিজ্য হত সমুদ্র পথে এবং শকটে করে বা উটেব পিঠে করে স্থলপথেও। সমস্ত পণ্যের ঝুড়িতে লাগানো থাকতো সীলমোহর বা সীলমোহর থেকে বানানো মাটির লেবেল। এই বহির্বাণিজ্যে বাঙালির অবদানও কম ছিল না।

কিছু তামার পাতের উপরেও লিপি খোদিত আছে। এই তামার পাতগুলি সম্ভবত জ্যোতিষিক কাজে কিংবা তাবিজ হিসাবে ব্যবহৃত হত। সম্প্রতি রুশী পণ্ডিতেরাও এই মত সমর্থন করেছেন। তবে হরপ্পা সভ্যতার এই লিপি আজও অপঠিত রয়ে গেছে। ১৯২৩ সাল থেকেই এই লিপির পাঠোদ্ধার করার চেষ্টা চলেছে। এই বছর স্বরূপ বিষ্ণু ১৯টি চিহ্নের ধ্বনিমূল্য নির্ণয় করে, তিনটি সীলমোহরের পাঠোদ্ধার করেন।

১৯২৫ সালে এল. এ. ওয়াডেল প্রমাণ করাব চেষ্টা করেন হরপ্পা লিপি কীলকাক্ষর ছাড়া আর কিছুই নয়। পরে অবশ্য এই তথ্য ভুল বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৩১ সালে প্রাণনাথ বিলাতের বযেল এশিয়াটিক সোসাইটিব পত্রিকায় এই লিপি সম্পর্কে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন যে, প্রাচীন সুমেরীয় ও প্রাক-বৈদিক আর্যরা অভিন্ন। প্রাক-বৈদিক আর্যরা মোটেই আর্য ছিল না। তারা ছিল হরপ্পার অনার্য জাতি। এই অনার্যরাই ছিল সুমেব সভ্যতা এবং হরপ্পা সভ্যতার ধাবক এবং বাহক।

স্যার জন মার্শাল-এব গ্রন্থের একটা অধ্যাযে সি জে গাড মন্তব্য করেছিলেন যে, সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরসমূহের (১) লিখন ডান দিক থেকে বাম দিকে পাঠ করতে হবে, (২) লেখাগুলি সিল্যাব্‌লঘটিত, (৩) লেখা নামবাচক এবং (৪) নামগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় লিখিত। ওই বইয়ের অন্য এক অধ্যাযে এস. ল্যাংগডন বলেছেন যে, পরবর্তীকালেব ব্রাহ্মী লিপিব জনক হল সিন্ধুলিপি।

হবপ্পার লিপি সমূহেব পাঠ নিযে আগেই দীর্ঘ আলোচনা কবা হযেছে। আবারো বলি, ১৯৩৪ সালে জি আব হান্টার তাঁব পি এইচ. ডি থিসিসে যে মতবাদ প্রকাশ কবেছিলেন সেগুলি হল ঃ (১) সিন্ধু সভ্যতাব ধাবকবা আর্য নয় অনার্য, (২) সিন্ধুলিপি হতেই ব্রাহ্মীলিপিব উদ্ভব, (৩) সিন্ধুলিপি ধ্বনিমূলক, (৪) সিন্ধুলিপির উদ্ভব ৩০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের অর্থাৎ ৫০০০ বছবেবও আগে হযেছিল; (৫) মিশরীয় লিপি থেকে কিছু অনুকরণ কবাও হতে পাবে বা ক্রীটদেশীয় লিপিব সঙ্গে এর সম্পর্কও থাকতে পারে, এবং (৬) এব লিখনবীতি ছিল ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই সিদ্ধান্তগুলির পাঁচ নম্ববটি অবশ্য পরবর্তীকালেব পণ্ডিতবা মানেন না। তাঁদেব মতে সিন্ধুলিপিব উদ্ভব হযেছিল অন্য কোনও লিপিব অনুকবণ বা অনুসরণ কবে নয়, এব উদ্ভব হয়েছিল এই ভারতবর্ষেই স্বাভাবিক নিয়েমেই এবং এর অনুসরণ বা অনুকরণ করেছিল সুমের এবং মিশরীয় লিপিসমূহ। আগেই বলেছি, হবপ্পা সভ্যতার চারটি নগব থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরের মোট সংখ্যা প্রায ২৫০০টি। তবে এগুলির সঠিকপাঠ আজও সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় পবিচ্ছেদেই বলা হযেছে, এই লিপি সম্পর্কে আধুনিক রুশী পণ্ডিতদের গবেষণার ফলাফল। আবারো একটু বলে নিই। কম্পিউটারের সাহায্যে রুশী গবেষকরা হরপ্পা-লিপির চিহ্নগুলিকে প্রথমে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। তারপর তাঁরা ওই লিপির বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সংস্কৃত, সুমেরীয়, ব্রাহুই, দ্রাবিড়, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্যের তুলনা করেছেন। এরপর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হরপ্পা-লিপির ভাষা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা।

সুতরাং হরপ্পা-লিপিতে যে লেখাগুলি পাওযা গেছে তার ভাষা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর। অর্থাৎ অনার্য দ্রাবিড়দের ভাষা লেখা হয়েছে হরপ্পার লিপিগুলিতে। তবে লিপিগুলি আজও অপঠিত। পাঠ করা গেলে সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্কে আরও বহু অজানা কথা জানতে পারবো। রুশ গবেষকরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হরপ্পার লোকদের ভাষা ছিল অনার্য দ্রাবিড়গোষ্ঠীর। আর এই লিপি হল অনার্যদেরই লিপি। এই লিপির আবিষ্কার হরপ্পার অনার্য গরিমাই প্রচার করে।

হরপ্পা সভ্যতার নানা গৌরবময় দিকের কয়েকটির কথাই মাত্র বলা হল। আরও নানা দিক আছে। মানব সভ্যতার বহু উপাদানই আবিষ্কার করেছে হরপ্পার অনার্যরা। জগৎ সভ্যতায় ভারতের অবদানের যে সব কথা আমরা বলি, তার অধিকাংশই ভারতের হরপ্পা সভ্যতার অবদান। আর হরপ্পা সভ্যতা হল অনার্য সভ্যতা। সুতরাং জগৎ সভ্যতায় হরপ্পার অনার্য সভ্যতা, তথা হরপ্পা সংস্কৃতির অতুলনীয় অবদান গৌরবান্বিত করেছে প্রাচীন ভারতের অনার্য জাতিকে—প্রচার করছে হরপ্পার অনার্য গরিমা।

নবম পরিচ্ছেদ

হিন্দু সভ্যতা

'হিন্দু' শব্দটির উৎপত্তি এবং অর্থ নিয়ে নানা মতামত, তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। রাজশেখর বসুর অভিধান 'চলন্তিকা'-য় 'হিন্দু' হল সনাতনপন্থী ভাবতীয় জাতি। ফাবসী শব্দ 'হিন্দ' মানে 'ভারত' এবং 'হিন্দুস্থান' বা 'হিন্দুস্তান' হল 'ভারতবর্ষ'। হিন্দু শব্দটাব সঙ্গে হিন্দ শব্দটির একটা সম্পর্ক আছে। অনেকে মনে কবেন, ওই হিন্দ শব্দটি থেকে হিন্দু শব্দটি এসে থাকতেও পাবে। 'চলন্তিকা' এও বলেছে যে, হিন্দু মানে ভারতজাত-ধর্মাবলম্বী, অর্থাৎ জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, শিখ ও সনাতনপন্থী। সুতবাং চলন্তিকা-ব মতে হিন্দু সনাতনপন্থী ভারতীয় জাতি এবং জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্ম-শিখ ধর্মাবলম্বীরাও হিন্দু।

সুবল মিত্র মহাশয় তাঁর 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'-এ হিন্দু শব্দেব অর্থ বলতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "ভারতীয় আর্য্যজাতি। কেহ কেহ বলেন, হিমালয় ও বিন্দু (সরোবর বিশেষ) এই দুই শব্দেব যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত্য অংশগ্রহণ কবিযা 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কাবণ উত্তবে হিমালয হইতে দক্ষিণে বিন্দু সবোবব পর্যন্ত তাবৎ ভূভাগই হিন্দুদিগেব বাসস্থান। অপর একদল বলেন, আর্য্যেবা প্রথমতঃ মধ্য এসিয়ায বাস করিতেন। কালক্রমে উহাদেব বংশবৃদ্ধি হেতু স্থান ও খাদ্যেব অভাব ঘটিতে থাকায তাঁহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় নতুন বাসস্থানের অন্বেষণে বহির্গত হন। এক সম্প্রদায় পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ইউবোপে বসতি স্থাপন কবেন এবং অপব সম্প্রদায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পাঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হন। এই স্থানে দ্বিতীয় সম্প্রদায় আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল পারস্যে গমন কবেন এবং অপর দল হিমালযের উত্তর পশ্চিমের গিরিসঙ্কট দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই শেষোক্ত দল প্রথমতঃ পাঞ্জাব প্রদেশের সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পাবসীকেবা 'সিন্ধু' কথাটিকে 'হিন্দু' এইরূপ উচ্চারণ করিত, এই জন্য সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণও তাহাদেব দ্বাবা 'হিন্দু' নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে 'আর্য্য' নামেব পরিবর্তে ওই হিন্দু নামই সাধাবণের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ হিন্দুস্থান বলিলে সমস্ত ভাবতবর্ষকে বুঝায়। কিন্তু মুসলমানেরা এই শব্দটিকে ভারতের উত্তব-পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ জ্ঞাপক করিযা ব্যবহার করেন।"

মিত্র মহাশয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' প্রকাশ করেন তখন আর্যগবিমার যুগ চলছে। ফলে, তিনি হিন্দু বলতে ভারতীয় আর্যজাতিকে বুঝিয়েছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে 'জাতি' বলতে এক বিশেষ নরগোষ্ঠীকে (Racial Group) বোঝায়।

গত ১০০ বছরের নানা গবেষণার পর পণ্ডিতমহল এক বাক্যে বলছেন যে, আর্যজাতি হল ককাসয়েড মহাজাতির নর্ডিক (Nordic) নরগোষ্ঠী। এরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন এরা ছিল যাযাবর বর্বর জাতি। এ নিয়ে বহু আলোচনা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে নানাভাবে করা হয়েছে। হিন্দু জাতি কোন বিশেষ নরগোষ্ঠী নয়। বহু নরগোষ্ঠী বা জাতির মিশ্রণ হল হিন্দুজাতি। তাদের মধ্যে রয়েছে, আদি-অস্ত্রাল, দ্রাবিড়, দিনারিক, আলপীয়, মংগোলীয় ও নর্ডিক ইত্যাদি জাতির মিশ্রণ। সুতরাং হিন্দু জাতি না বলে 'হিন্দু সমাজ' বলাই যুক্তিযুক্ত। আর সে হিন্দু সমাজও বহুজাতিক কেবল মাত্র আর্যজাতি নয়। আবার আগেই বলেছি 'আর্য' শব্দটা জাতিবাচক নয় ভাষাবাচক। আর্যজাতি তাই সেই সব জাতি যারা আর্যভাষায় কথা বলত এবং আর্যভাষাভাষী জাতিগণের মধ্যে কোনরকম নৃতাত্ত্বিক এবং আবয়বিক সাদৃশ্য ছিল না। এনিয়ে আগেও আলোচনা করা হয়েছে, পরেও করা হবে। সুতরাং মিত্র মহাশয় হিন্দু শব্দের যে আভিধানিক অর্থ বলেছেন তা যথাযথ নয়।

তাছাড়া আর্যদেব ভারতে আগমন, এখান থেকে পারস্য দেশে তথা মেসোপটেমিয়ায় যাওয়া ইত্যাদি বক্তব্য একালে আর কেউ মানেন না। এমন কি 'সিন্ধু' শব্দ থেকে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি নিয়েও বহু মতভেদ আছে। হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর এটা জানা গেছে সিন্ধু অঞ্চলের ৫০০০ বছরের প্রাচীন সভ্যতাই একালের হিন্দু সভ্যতার মধ্যে এসে গেছে। হিন্দু সভ্যতার চাব ভাগের তিনভাগ উপাদানই হবপ্পা সভ্যতাব থেকে নেওয়া। অতএব সিন্ধু সভ্যতাই যদি হিন্দু সভ্যতা হয় তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আপত্তি থাকে, যখন বলা হয় আর্যরাই হিন্দু কিংবা হিন্দুরা আর্য এবং হিন্দু সভ্যতা হল আর্য সভ্যতা। মিত্র মহাশয় প্রায় ১০০ বছর আগে 'হিন্দু' শব্দেব যে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা বহুলাংশে যথাযথ নয়। তার প্রধান কারণ হল, তখনও হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় নি এবং তখন চলেছে আর্যগরিমাব যুগ, যে আর্যগরিমার ভ্রান্তি নিয়ে আমরা এই বইয়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করেছি।

'সভ্যতা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল সমাজ বা জীবনযাত্রার উৎকর্ষ। সভ্যতা হল সংস্কৃতির সমাহার। আর সংস্কৃতি হল কোন জাতি কিংবা সমাজের জীবনচর্যা। বাংলায় 'সংস্কৃতি' শব্দটা বহুল ব্যবহৃত। হিন্দু-সংস্কৃতি হল হিন্দুদের তথা হিন্দু সমাজের জীবনচর্যা। হিন্দু সমাজেব এই জীবনচর্যার জন্য ছিল বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাপনাই হিন্দু ধর্ম এবং যে সব শাস্ত্র দ্বারা বিধান-ব্যবস্থাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হত, সেগুলি হল ধর্মশাস্ত্র। হিন্দুর সংস্কৃতি হল তার ধর্মের অনুশীলন। হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নীতির ভিত্তিতে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামাজিক ও মানসিক উন্নতি ও সংস্কার সাধনের জন্যই নীতির প্রয়োজন ছিল এবং হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রগুলি সেই নীতিগত সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করেছিল। সুতরাং হিন্দু সভ্যতা হল হিন্দু সমাজের সংস্কৃতির সমাহার। আর সেই সংস্কৃতির অন্য নামেই হিন্দুধর্ম, যে ধর্মের বিধান রয়েছে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রসমূহে।

ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী 'সভ্যতা' (Civilization)

শব্দটি প্রায়শই ব্যবহার করেন। সভ্যতার অর্থ ব্যাখ্যা করে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকনেইল (William II. McNeill) লিখেছেন যে, সভ্যতার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া খুবই মুশকিল। তাঁর ভাষায় ঃ

"Three distinct meanings of the term "civilization" are in common use. Sometimes it refers to the state of being civilized, that is, to the possession of good manners and self-control, as in the phrase "a thoroughly civilized man." This was the original meaning of the term when it was introduced, first into French, during the 18th century by writers like Voltaire.

From this meaning, writers of the 19th century expanded the term "civilization" to mean the growth through time of knowledge and skills that encouraged or allowed men to attain "civilized" behavior. Lewis Henry Morgan, for example, put his central thesis into the title of his book : *Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery Through Barbarism to Civilization* (1877). Karl Marx accepted Morgan's thesis, and many Marxists today defend it as the only correct picture of the human past.

The third meaning of "civilization" came into English usage from German. Johann Gottfried von Herder and other writers of the 18th century took great pains to rescue the German language and style of thought from the borrowed finery of French. In so doing, they stressed the uniqueness of their own nation and the differences of its culture from that of any other folk. By generalizing this idea, civilization of course becomes plural. A writer ought to speak, not of the progress of civilization in general (as the French did), but of the rise and fall of separate German, Roman, Hebrew, Chinese, or Egyptian civilizations.

In the 20th century the anthropological concept of culture as the sum of learned (as distinct from instinctive) behavior fitted into and reinforced this way of using the term "civilization." Robert Redfield, for example, viewed civilizations as the learned behavior of men who belonged to unusually changeable and complex societies. He therefore contrasted civilization to the "culture" acquired by members of simpler, more stable "folk" societies. A different distinction was made by Oswald Spengler, who used the word *Kultur* to refer to the spiritual state of youthful, organic, and still-growing societies,

and reserved the term "civilization" to describe older, more rigid, and decaying communities. But Spengler's terminology involved such a conflict with the 19th century equation of civilization with the highest stage of human progress that it never gained much currency in English.

Writers who use "civilization" in the second sense, as meaning a general stage in human development, have to decide what marks civilized societies off from those that do not deserve the name. Morgan's theory was soon discredited by the fact that pastoralism, which he equated with barbarism, does not seem to have antedated agriculture, as he believed had been the case. Moreover, simple Neolithic villages were certainly based on agriculture, and by Morgan's theory therefore should count as civilized. But to regard them as such ran counter to the generally accepted connotations of the term.

By the end of the 19th century, therefore, archaeologists commonly equated the dawn of civilisation with the appearance of metal tools in their excavations. Others preferred to date it from the invention of writing and the transition from prehistory to history. Still others argued that the combination of metallurgy, writing, and large-scale building was the hallmark of civilization."

সুতরাং ধাতুর ব্যবহার শুরু বা লেখন-রীতির আবিষ্কার করা কিংবা বিশাল ইমারত-সমূহ তৈরি করার দিন থেকেই মানুষ সভ্য হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তখন থেকেই তার উত্তরণ ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে। ধাতুর ব্যবহার, মানুষের সভ্যতার লক্ষণ। আর এই তিনটিই অত্যন্ত উন্নতভাবেই ছিল হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের মধ্যে। হরপ্পা সভ্যতা তাই ছিল এক উন্নত সংস্কৃতির উন্নত সভ্যতা। সমসাময়িক সভ্যতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সেরা সভ্যতা ছিল হরপ্পা সভ্যতা।

আগেই বলেছি, গ্রেগরী পশেল (Gregory Possehl) হচ্ছেন আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের একজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক। তিনি বলেন যে, চীন, সুমের ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের তুলনায় সিন্ধুসভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। কেননা, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহেই জগতের প্রাচীনতম পয়ঃপ্রণালী ও পোতাশ্রয় আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন এক বিস্তৃত অঞ্চলে শতাধিক স্থানে পাওয়া গিয়েছে এবং এটা ১৫ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এই সিন্ধুসভ্যতাই হিন্দুসভ্যতার উৎস। সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিগুলি কী ভাবে হিন্দু সভ্যতায় এসেছে সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। তবু সংক্ষেপে আর একবার সে কথাগুলি বলে নিই।

ভারতবর্ষ জুড়ে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে, হিন্দু সভ্যতা বলতে এদেশে আগন্তুক আর্য-সভ্যতাকেই বুঝায়। এটা একেবারে ভুল। ডঃ অতুল সুর বলছেন ঃ

"তাদের এই ধারণা অনুযায়ী আর্যরা এদেশে আসবার পূর্বে এদেশে বর্বর ও হীন জাতিসমূহ বাস করত, এবং আগন্তুক আর্যরা এসেই তাদের সুসভ্য করে তুলেছিল। এখন আমাদের এবং অন্যান্য দেশে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে, এবং আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহের যে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাগার্যজাতিসমূহ আর্যজাতির তুলনায় কোন অংশে হীন বা বর্বর ছিল না, বরং তাদের তুলনায় আর্যরাই বর্বর জাতি ছিল। বস্তুত, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রাগার্যসভ্যতা আর্যসভ্যতার চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। বৈদিক আর্যরা যাদের দস্যু, দাস, অনার্য, অসুর, পণি প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক শব্দের দ্বারা অভিহিত করত, তারা এক বিশাল নাগরিক সভ্যতাব বাহক ছিল, এবং তাদের ওই সভ্যতার নিদর্শন আমরা পশ্চিমে সিন্ধু সৌবীর থেকে শুরু করে পূর্বে বাঙ্গলাদেশের বিভিন্নস্থানে আবিষ্কাব কবেছি। এদেশে আগমনের সময় থেকেই বৈদিক আর্যবা এদেশেব অধিবাসীগণের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিন্তু পরে আর্যরা বাধ্য হয়েছিল তাদেরই মেয়েদের বিয়ে করতে, এবং তাব ফলে যে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ঘটেছিল, তা-ই পরবর্তীকালে হিন্দুসভ্যতা নামে পবিচিত হযেছিল।"

তিনি আবেক জায়গায় লিখেছেন ঃ "বর্তমান শতাব্দীর বিশেব দশক পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে হিন্দুসভ্যতা আগন্তুক আর্যগণ কর্তৃক উদ্ভূত হযেছিল। তখন পর্যন্ত আমাদেব ধাবণা ছিল যে, দাস, দস্যু, অসুর, পণি, কিরাত, নিযাদ প্রভৃতি যে সকল দেশজ অনার্য জাতিসমূহের উল্লেখ আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই, তাবা সবাই বর্বর ও অসভ্য জাতি ছিল। সেই যুক্তিব ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে উদ্ভূত হিন্দুসভ্যতা আর্যগণ কর্তৃক সৃষ্ট সভ্যতা বলে গৃহীত হয়েছিল। এই ধারণাই পণ্ডিতমহলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই ধাবণাকে এক নিমিষেই নস্যাৎ করে দেয় বর্তমান শতাব্দীর বিশেব দশকে আবিষ্কৃত যুগান্তকারী সিন্ধুসভ্যতা।

পণ্ডিতমহলে এটা প্রায সর্ববাদিসম্মতক্রমে স্বীকৃত হয়েছে যে, আগন্তুক আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে কোন সময় ভারতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার প্রাদুর্ভাবকাল রেডিয়োকারবন—১৪ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা স্থিবীকৃত হযেছে। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি। প্রথম, সিন্ধুসভ্যতা আগন্তুক আর্যসভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন, এবং দ্বিতীয়ত, সে সভ্যতার বাহকরা বর্বব অসভ্য জাতি ছিল না। বৈষয়িক ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই সিন্ধুসভ্যতার বাহকবা আর্যগণ অনেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল।

আর্যরা ছিল যোদ্ধারা জাত, আর সিন্ধুসভ্যতার বাহকরা ছিল বণিকের জাত। এই বণিকদের ঐশ্বর্য ও ধনদৌলত আর্যদের মনে ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল। সেজন্যই আর্য গ্রামবাসীরা সিন্ধুসভ্যতার নগরসমূহকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। নগবসমূহকে ধ্বংস করে বিজয়গৌরবের উন্মত্ততায় তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম রেখেছিল 'পুরন্দর'।

আমি অন্যত্র অনেকবারই বলেছি যে আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল খুব কম। ইন্দ্রের কাছে আর্যদের পুনঃপুন স্ত্রীধন পাবার প্রার্থনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে আর্যরা যে বিপর্যয়ের প্রতিঘাতে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল, তাতে তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি যথাযথ সংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে আসা। সেজন্যই এদেশের নারীদের ওপর তাদের অত্যন্ত লোভ ছিল, এবং তাদের পাবার জন্যই তারা ইন্দ্রের কাছে পুনঃপুন প্রার্থনা করত। এখানে একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। 'পত্নী' অর্থে 'বধূ' শব্দের প্রয়োগ। সামগায়নের উনাদিসূত্র (১/৮৫) অনুযায়ী 'বধূ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে যাকে বহন করে আনা হয়েছে। বহ্ + উ—র্ম্ম, 'হ' শব্দ থেকে 'ধ' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। তার মানে যাকে কেড়ে আনা হয়েছে। নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে 'ম্যারেজ বাই ক্যাপচার' বলা হয়। এটাই হচ্ছে 'বধূ' শব্দের সবচেয়ে প্রাচীনতম ব্যুৎপত্তি ; পরবর্তীকালে লৌকিক প্রথা অনুযায়ী এটা 'বন্ধ' ধাতু থেকে উৎপন্ন করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীনকালে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলা হত। এরূপ সম্বোধন সে যুগেরই প্রতিধ্বনি করে যে-যুগে স্বামী আর্য হতেন, আর স্ত্রী অনার্য হত, এবং স্ত্রী গৌরবার্থে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করত। মহাভারতে বিবৃত ভিক্ষায় বেরিয়ে ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্র রমণী গ্রহণও বৈদিক যুগের আর্য-অনার্য যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত করে। অনার্য রমণী যখন আর্য গৃহিণী হল, তখন অনার্য ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রা আর্য জীবনচর্যাকে প্রভাবান্বিত করল, এমন কি আর্য দেবতামণ্ডলীরও পবিবর্তন ঘটল।

বৈদিক দেবতাগণেব স্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে তাদের কোন আধিপত্য ছিল না। কিন্তু পৌরাণিক যুগে তারাই হলেন পুরুষ দেবতার শক্তির উৎস। শিবজায়া দুর্গা এগিয়ে এলেন 'দেবী' হিসাবে দেবতামণ্ডলীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে। তাঁর আঁচল ধরে এলেন অনার্য সমাজের সেই সমস্ত দেবী, যাঁরা আগে লুকিয়েছিলেন গাছতলায়, ঝোপজঙ্গলে ও পর্বতকন্দরে। সেইসব দেবী সমপর্যায় লাভ করলেন 'দেবী'র সঙ্গে। বৈদিক যুগের আর্যরা যাঁদের ঘৃণার চোখে দেখতেন ও যাঁদের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্যন্ত সেই অনার্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহেরই জয় হল। দুই সভ্যতার এক সংশ্লেষণ ঘটল।"

তবে বৈদিক যুগ থেকেই এই সংশ্লেষণ শুরু হয়েছিল। এমন কি ঋগ্বেদের মধ্যেও এই সংশ্লেষণ নজরে আসে। এ নিয়ে কিছুটা পরেই আলোচনা করা হচ্ছে। আবারও বলি, যখন কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীর জীবনচর্যা কোন এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয়, তখন আমরা তাকে সেই জাতির 'সভ্যতা' বলি। সুতরাং হিন্দুসভ্যতা বলতে আমবা বিশেষ খাতে প্রবাহিত হিন্দুসমাজের জীবনচর্যা বুঝি। যেহেতু সমাজ কোন এক বিশেষ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না এবং কালের আবর্তনের সঙ্গে তার বিবর্তন ঘটে, সেইহেতু ওই বিবর্তনের সঙ্গে তার জীবনচর্যারও বিবর্তন ঘটে। তার মানে, হিন্দুসভ্যতা Static নয়, Dynamic। হিন্দুসমাজের এই সচলতাই হিন্দুসমাজকে তার সংহতি দান করেছে।

এটা লক্ষণীয় যে, আমরা 'হিন্দুজাতি' বলছি না, 'হিন্দুসমাজ' বলছি। তার কারণ, নৃতত্ত্ববিদ্গণ 'জাতি' বলতে এক বিশেষ নরগোষ্ঠীকে (Racial Group) বোঝান। এরূপ নরগোষ্ঠীর কতকগুলি বিশেষ আবয়বিক ও অন্যান্য সাদৃশ্য থাকে। যেমন 'আর্যজাতি' শব্দটা কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীবাচক শব্দ নয়। এটা একটা ভাষাবাচক শব্দ মাত্র। যারা আর্যভাষায় কথা বলত, তাদেরই আমরা 'আর্যজাতি' বলি। আর্য ভাষাভাষী জাতিগণের মধ্যে কোনরূপ নৃতাত্ত্বিক ও আবয়বিক সাদৃশ্য ছিল না। আবয়বিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই উভয় শ্রেণীই অন্য দেশ থেকে ভারতে এসেছিল। তারা যখন এখানে এসেছিল তখন ভারত জনমানবহীন দেশ ছিল না। তখন এখানে অন্য জাতির অর্থাৎ নরগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, এবং তাদেরও এক বিশেষ সমাজ বা জীবনচর্যা ছিল। তাদের জীবনচর্যার সঙ্গে আর্যজাতির জীবনচর্যার কোন সাদৃশ্য ছিল না। মাত্র জীবনচর্যাব বৈষম্য নয়, তাদের আবয়বিক বৈষম্যও ছিল। এটা আমরা আর্যদের রচিত ঋগ্বেদ পড়লেই আমরা বুঝতে পারি।

আবয়বিক ও জীবনচর্যার বৈষম্যযুক্ত দুই নরগোষ্ঠী যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের মধ্যে বাধে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষ। আর্যদের রচিত ঋগ্বেদ উলঙ্গভাবে প্রকটিত করেছে সেই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্ষের ইতিহাস। ঋগ্বেদের সাতটি কালস্তরেব শেষের দিকে রচিত সূক্তসমূহ থেকে জানা যায়, অনার্য রমণীরা আর্যস্বামীদের সংসারের দায়-দায়িত্ব তুলে নিয়েছে। তখন হবপ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতির মিশ্রণ শুরু হয়েছে। এই মিশ্রণের ফলে শুধু ধর্ম ও উপাসনা-পদ্ধতির দিক থেকেই যে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, তা নয়, সমাজগঠনের দিক থেকেও এক বিরাট পবিবর্তন ঘটেছিল। সমাজের ন্যূনতম সংস্থা হচ্ছে পবিবার। পরিবারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয বিবাহ দ্বাবা। বৈদিকযুগে মাত্র এক রকমের বিবাহপদ্ধতি ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অনার্যজাতিসমূহের সঙ্গে মিশ্রিত হবার পর, আমরা যে নতুন সমাজের পরিচয় পাই তাতে বর্ণভেদ ও বিভিন্ন বিবাহপদ্ধতির প্রচলন লক্ষ্য করি। ন্যূনপক্ষে আট রকম বিবাহপদ্ধতির কথা শাস্ত্রগুলিতে বলা হয়েছে। এ সকল বিবাহপদ্ধতির নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তখন হিন্দুসমাজের মধ্যে অনার্য সমাজের বিবাহপদ্ধতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

উভয় সংস্কৃতির সংশ্লেষণের ফলে হরপ্পার উন্নততর সংস্কৃতির অধিকাংশই পুরোভাগে চলে আসে। বৈদিক সংস্কৃতির দেব-দেবীরা বিদায় নেয়। হিন্দুসভ্যতার সমস্ত উপাদানের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ আসে হরপ্পার সংস্কৃতি থেকে এবং বাকী পঁচিশ ভাগ আসে আগন্তুক আর্যদের কাছ থেকে। আগেই বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিবিধ ইন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা ; শিব ও লিঙ্গ পূজা ; কুমারী পূজা ; অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ পূজা ; সর্প পূজা টোটেমের প্রভৃতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ; দেবদেবীর বাহনের কল্পনা ; জন্তু পূজা ; গ্রাম, নদী, বৃক্ষ অরণ্য, পর্বত ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস ; বিবিধ নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক অনুশাসন

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে লোকাচাব , নবপত্রিকাব পূজা , শববোৎসব , নবান্ন পৌষপার্বণ , হোলি, ঘেঁটু পূজা , চড়ক গাজন , মনসা, শীতলা, কালী, কবালী, ছিন্নমস্তা, পর্ণশববী প্রভৃতিব পূজা , দেবতাব জন্য মন্দিব নির্মাণ , চিত্রাঙ্কন ও লিখন-প্রণালী দশাবতাববাদ প্রভৃতি আমাদেব প্রাগার্যদেব কাছ থেকেই নেওযা।

হিন্দু সভ্যতায এখন বৈদিক দেবদেবীব পূজা হয না বললেই চলে। ঋগ্বেদেব ৩৩টি দেবতাব মধ্যে কেবলমাত্র বিষ্ণুই পূজা পাচ্ছেন। 'শ্রী'-কে লক্ষ্মীদেবী হিসাবে মেনে নিলে ঋগ্বেদীয এই দেবীও একালে পূজা পান। বাকী বৈদিক দেবদেবীবা পৌবাণিককাল থেকেই সমাজে বাতিল হযে গেছেন। 'পুবন্দব' ইন্দ্রেব পূজাতো কবেই বন্ধ কবে দিযেছেন স্বযং শ্রীকৃষ্ণ। যাইহোক, আবাবও বলি সেই পুবাতন কথা। হিন্দু সভ্যতা কোন বিশেষ জাতিব সংস্কৃতি নয, যদিও আমবা বলি যে, বিশেষ ধাবায প্রবাহিত হিন্দুজাতিব সংস্কৃতিই 'হিন্দুসভ্যতা'। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কবলে দেখতে পাওযা যাবে যে, হিন্দু জাতি বলতে কোন বিশেয নবগোষ্ঠীকে (Racial Group) বোঝায না। হিন্দুজাতিব মধ্যে নানা নবগোষ্ঠীব মিলন ঘটেছে। এ সব নবগোষ্ঠী হচ্ছে—নর্ডিক, আলপীয, দিনাবিক, আদি-অস্ট্রাল, দ্রাবিড ও মঙ্গোলীয। যদিও ভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চলে এদেব একেব সঙ্গে অপবেব বক্তেব মিলন ঘটেছে তা হলেও নৃতত্ত্ববিদ্গণ এদেব চিনে বেব কবতে কোনৰূপ কষ্ট পান না।

আবাবো ডঃ অতুল সুবেব কথায ফিবে আসি। বৈদিক আর্যধর্মেব সঙ্গে হিন্দু ধর্মেব তথা হিন্দু সভ্যতাব সম্পর্ক খুবই কম। একটু আগে যেমন অনেকগুলি হিন্দু সংস্কৃতিব কথা বলা হল, যেগুলি হবপ্পীয বা প্রাগার্যদেব কাছ থেকে ধাব কবা, তেমনি আবও বহু উপাদান আছে, যেগুলি নেওযা হযেছে ওদেবই কাছ থেকে। প্রাগার্যদেব ওই সংস্কৃতিই বৈদিক যুগেব শেষেব দিকে এসে হযেছে হিন্দু সভ্যতাব মুখ্য উপাদান। আর্য-সংস্কৃতিব কিছু উপাদান ওতে থাকলেও হিন্দুসভ্যতাব বর্তমান ভিত্তি হবপ্পাব সংস্কৃতি। বর্বব আর্যদেব যেটুকু সংস্কৃতি, তা তাবা লাভ কবেছিল ভাবতে আসাব পথে মেসোপটেমিযা অঞ্চল থেকে। ডঃ সুব লিখেছেন ঃ "ভাবতেব জনসংখ্যাব দিকে তাকালে দেখতে পাওযা যাবে যে উচ্চকোটিব লোকদেব (ব্রাহ্মণদেব) সংখ্যা সমগ্র জনসমুদ্রেব মধ্যে অতি নগণ্য। এক কথায ভাবত নিম্নকোটিব লোকদেবই দেশ। এই নিম্নকোটিব লোকবাই হচ্ছে প্রাগ্বৈদিক জনগণেব বংশধব। যদিও বৈদিক আর্যগণেব সঙ্গে বেশ কিছুকাল তাদেব দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সংঘর্য চলেছিল, পবিণতিতে কিন্তু অনার্য সংস্কৃতিবই জয হযেছিল। পববর্তীকালেব হিন্দুসভ্যতাব বিবর্তন ও বিকাশে এদেব অবদানই সবচেযে বেশি। জাতিভেদ, গোত্রবিভাগ, বিবাহে লৌকিক আচাব অনুসবণ, যজ্ঞেব পবিবর্তে পূজাব প্রবর্তন, দেবতাব জন্য মন্দিব নির্মাণ ও নানাৰূপ শৈল্পিক বীতিনীতি, এ সবই অনার্য সমাজেব দান। আজ এই বিংশ শতাব্দীব যান্ত্রিক সভ্যতাব যুগেও আমবা প্রাগার্যসমাজেব অবদানসমূহেব ক্রমিকতা লক্ষ্য কবি। বিবাহে লৌকিক আচাবেব অনুসবণ, আপদ-বিপদে আভিচাবিক ক্রিযাকলাপাদিব আশ্রয গ্রহণ, পবিবহনেব জন্য গোশকটেব

ব্যবহার, জ্বালানীর জন্য গোময়পিষ্টিকা প্রস্তুত ইত্যাদি সেই ক্রমিকতারই সজীব দৃষ্টান্ত। হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে হাজার হাজার এ রকম নিদর্শন পাওয়া যাবে। লোকে এখন আর বৈদিক প্রথা অনুযায়ী সূর্যের উপাসনা করে না। বিহারের লোকেরা সেই প্রাগার্যযুগের 'ছট' পূজাই করে। বাঙলার মেয়েরা ইতু পূজাই করে। বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে, শীতলার ওপরই নির্ভর করে। ওলাওঠা হলেও ওলাইচণ্ডীর 'স্থানে' পূজা দান করে। অনুর্বর সধবারা গাছে ঢিল বেঁধে সন্তান কামনা করে। এ সবেব সঙ্গে বৈদিক আর্যধর্মেব কোন সম্পর্ক নেই।"

মাতৃদেবীর পূজা, আদি শিবের উপাসনা, লিঙ্গ-যোনি পূজা, সূর্যপূজা, নাগপূজা, অশ্বত্থবৃক্ষ পূজা, মূর্তিপূজা—এগুলি প্রাগার্য হরপ্পীয় সংস্কৃতি থেকেই হিন্দু সভ্যতায় এসেছে। দশাবতারের তত্ত্ব, শিল্প ও স্থাপত্য, লিপিমালা, গণিতবিদ্যা এবং ভাষা-সাহিত্য হিন্দু সভ্যতায এসেছে হবপ্পীয়দেব কাছ থেকেই।

সিন্ধুসভ্যতাব শেষেব দিকটায আর্যদের প্রথম দল ভাবতে এসেছিল। সময়টা বোধহয ২০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অন্তর্বর্তী কোন কাল হবে। আর্যরাই সিন্ধুসভ্যতাব পতন ঘটিয়েছিল। তবে এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দবকাব। সেটা হচ্ছে এই যে, সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিকসভ্যতা অভিন্ন—এটা ভ্রান্ত মতবাদ। এ মতবাদটা যে সম্পূর্ণ ভুল, তার প্রমাণ আগেই দিযেছি। আবারও বলি, প্রথম প্রমাণ হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ। সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রগুলি থেকে যে কঙ্কালাস্থি পাওযা গিয়েছে, তাব সংখ্যা হচ্ছে ৩২৫—মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত ৪১টি কঙ্কাল, হবপ্পা থেকে প্রাপ্ত ২৬০টি কঙ্কাল, লোথাল থেকে প্রাপ্ত ২১টি কঙ্কাল ও কালিবঙ্গান থেকে প্রাপ্ত বাকী কঙ্কাল পবীক্ষা-নিবীক্ষাব পর এই কঙ্কালাস্থিসমূহ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ্গণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন, তা হচ্ছে—হবপ্পা, মহেঞ্জোদাবো ও লোথালের লোকেবা অধিকাংশই দীর্ঘশিবস্ক, বিস্তৃত নাসা ও আকাবে লম্বা ছিল। কিন্তু হবপ্পা যুগে গুজবাটে ও সিন্ধুপ্রদেশে বিস্তৃতশিরস্ক জাতিব বিদ্যমানতাও লক্ষিত হযেছে। তার মানে সিন্ধুসভ্যতাব কেন্দ্রগুলিতে প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয প্রাগ্‌দ্রাবিড় জাতিবাই বাস করত। তবে আলপীযবাও সেখানে ছিল। যদি সিন্ধুসভ্যতা বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক সৃষ্ট হযে থাকত তা হলে আমরা সিন্ধু-সভ্যতাব কেন্দ্রগুলিতে নিশ্চয়ই নর্ডিক বা বৈদিক আর্যগণেব কঙ্কালাস্থি পেতাম। দ্বিতীয়ত, এটা সর্ববাদিসম্মত যে আর্যরা ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল ও নানারূপ কাজে তারা অশ্বকে ব্যবহার করত। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে অশ্বেব অস্থি পাওযা যায়নি। তৃতীয়ত, সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপেব সঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত বৈদিক আর্যসভ্যতাব স্বরূপের সম্পূর্ণ পার্থক্য ছিল। সিন্ধুসভ্যতাব স্রষ্টাগণ নাগবিক জীবনযাপন করতো ও তারা নগর নির্মাণে দক্ষ ছিল। বৈদিক আর্যবা গ্রাম-কেন্দ্রিক গোষ্ঠী জীবনযাপন করতো। আদিতে তারা যে নগর নির্মাণ করতো, তার কোন আভাসই ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। বরং তারা নগরধ্বংসকারী হিসাবে নিজেদের গৌরব পুনঃপুন প্রকাশ করেছে। সে কারণে তারা ইন্দ্রকে 'পুরন্দর' আখ্যা দিয়েছিলো। এছাডা, সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে প্রতীকোপসনা, মূর্তি-পূজা, লিঙ্গ-পূজা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। প্রত্ন-শিব ও

মহাশক্তিরূপিণী জগন্মাতাও তথায় পূজিত হতেন। বৈদিক ধর্মে মূর্তিপূজা অজ্ঞাত, ও দেবদেবীরূপে শিবশক্তি অখ্যাত এবং লিঙ্গপূজা নিন্দিত। সুতরাং বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে, দুটি সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। বস্তুত দুই সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষের বহু বিবরণ ঋগ্বেদে আছে। এর কিছু বিবরণ এই বইয়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

তবে শুরুতে আর্যদের সঙ্গে হরপ্পীয়দের যে বৈরিতা ছিল তা ক্রমশঃ কমতে থাকে। পঞ্চনদ থেকে তারা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হল, ততই তারা এ-দেশের লোকের সংস্পর্শে আসতে থাকে। তারা এ-দেশের মেয়েদের বিয়ে করতে থাকে। যখন অনার্য রমণী গৃহিণী হল তখন তাদের ধর্মকর্মের উপর তার প্রভাব পড়ল। ক্রমশ তারা বৈদিক যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবতাগণকে পশ্চাতে অপসারণ করলেন। আর্য ও অনার্যদের সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি হল, এবং তথাকথিত আর্য ব্রাহ্মণগণ এই সকল নতুন দেবতার পূজার পত্তন করলো।

হিন্দু সংস্কৃতিই মূলতঃ হিন্দু ধর্ম। এই ধর্মের আভিধানিক ব্যাখ্যায় খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, হিন্দুবা চরমে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্ম অর্থাৎ পবমেশ্বব স্বীকাব করেন। তিনি পুরুষোত্তমও। কিন্তু 'বিশ্বের সমস্তই তাঁহাব অংশ' এই জ্ঞানে হিন্দুরা অসংখ্য দেবদেবীর আরাধনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সাকার উপাসনাই এখনকার হিন্দুদের মুখ্যধর্ম। এঁরা বলেন, যতমত তত পথ। সাকার উপসনাব দ্বারা মনঃশুদ্ধি হলে জ্ঞানযোগ হয এবং সেই জ্ঞানযোগ ছাড়া নিরাকাব ব্রহ্মকে মনোমধ্যে ধারণা বা তাঁব উপাসনা করার যোগ্য হতে পারা যায না। হিন্দুদেব মধ্যে মানুযরা নানা জাতিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এই ধর্মের প্রধান শাস্ত্র হল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। দেবার্চনা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ ভোজন করানো, তীর্থদর্শন, দান ইত্যাদি অনুষ্ঠান এব অঙ্গ। কালভেদে হিন্দুদের মধ্যে নানা মতভেদ সৃষ্ট হয়। এব ফলে উৎপতি হয় সম্প্রদাযের। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব এই তিনটিই প্রধান।

বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলেও হিন্দু সংস্কৃতিতে বেদেব রীতিনীতির, বৈদিক দেবদেবীর অধিকাংশই আজ অপাংক্তেয়। অথচ ঋগ্বেদ আজও হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মশাস্ত্র। হিন্দু সংস্কৃতি তথা হিন্দু সভ্যতার ধারক সেই ঋগ্বেদের কথায় আসি।

ঋক শব্দটির অর্থ হলো স্তুতি বা পূজা। যার দ্বারা দেবতাদিগের স্তুতি করা যায়, তাই ঋক। আবার বেদ কথাটির উৎপত্তি বিদ্ ধাতু থেকে, যার অর্থ 'জানা'। ঋগ্বেদে তাই ঋষিদের জ্ঞান স্তবগান বা স্তুতি হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিস্ময়, রহস্যপুঞ্জ প্রাচীনকালের মানুষদের মনে দেবমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ধরা পড়ত। তাঁদের অনুসন্ধিৎসু মনে এই স্তবগানগুলি এতো সত্য হয়ে অনুভূত হত যে, তাঁরা এই স্তবগান বা ঋকগুলি যেন দেখতে পেতেন এবং সেই দর্শন থেকেই ঋকগুলির উৎপত্তি বা রচনা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত হত এই সব ঋক। 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং...' যেমন নিঃসৃত হয়েছিল মহর্ষি বাল্মীকির ব্যথাদীর্ণ অন্তর থেকে, অনেকটা তেমনি ভাবেই রচিত হত ঋক। ঋকের রচয়িতারা ঋষি। আর ঋষিরা তাই মন্ত্রদ্রষ্টা।

ঋগ্বেদ তার চার রকমের ভাগ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্র এবং দশটি মণ্ডল, ১০২৮টি সূক্ত ও ১০৫৫২টি ঋকের শাখা-প্রশাখা নিয়ে এক বিশাল মহীরুহ। ঋগ্বেদ সভ্যজগতের আদি গ্রন্থ। পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন এই গ্রন্থের সূক্ত-সম্বলিত মূল অংশকে বলা হয় সংহিতা। পরবর্তীকালে অন্য অংশ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। শুধু ঋগ্বেদ সংহিতাতে ১০,৫৫২টি ঋক বা স্তুতি ১০২৮টি সূক্তের রূপ নিয়ে দশ-দশটি মণ্ডল জুড়ে সৃষ্টি করেছে ঋগ্বেদ সংহিতা। ঋগ্বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন অবশ্য অষ্টম মণ্ডলের ৮০টি ঋক নিয়ে তৈরি ১১টি সূক্তকে ঋগ্বেদের অংশ বলে মনে করেন না। এই সূক্তগুলি 'বালখিল্য সূক্ত' নামে খ্যাত। সায়নের মত মেনে নিয়ে বালখিল্য সূক্তগুলিকে বাদ দিলে ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা দাঁড়ায় ১০১৭ এবং ঋক সংখ্যা ১০৪৭২টি। এর প্রাচীনত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে মোক্ষমুলর (Max Mueller) সাহেব লিখেছেন ঃ "One thing is certain : there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rigveda."

ঋগ্বেদ সংহিতায় দশটি মণ্ডল। প্রতিটি মণ্ডল আবার কতকগুলি সূক্তেব সমষ্টি। প্রত্যেকটি সূক্ত কতকগুলি ঋক নিয়ে তৈরি। ঋক সমষ্টি হলো স্তোত্র বা সূক্ত। প্রত্যেকটি সূক্তেরই কোন-না-কোনও দেবতা আছেন যাঁর উদ্দেশ্যে সূক্তটি নিবেদিত। কোনও কোনও সূক্তে আবার একাধিক দেবতাও আছেন। সূক্তটি যিনি দর্শন বা রচনা কবেছেন তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। কোনও কোনও সূক্তের আবাব একাধিক ঋষিও আছেন। অর্থাৎ সেই সূক্তেব বিভিন্ন ঋক বিভিন্ন ঋষির রচনা। ঋগ্বেদের সবচেয়ে পুরানো অংশ হলো সংহিতা। তাবপর সৃষ্টি হয়েছিলো ব্রাহ্মণ অংশ। এই গ্রন্থের মন্ত্রগুলিতে পাওযা যায অতি প্রাচীনকালের পূর্বসূরিদের ধর্ম, বিশ্বাস, আচাব, আচবণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমাজজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধে এক একটি বাস্তব চিত্র এবং নানান তথ্য। ভাবতীয় হিন্দুবা নিজেদের মনে করে বৈদিক ঋষির বংশধর এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা সেই বহু পূর্ববর্তী বৈদিক যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের একটা ধারাবাহিক যোগসূত্র খুঁজে পায।

ঋগ্বেদে যে শুধু পূর্বসূরিদের ধর্ম, বিশ্বাস, আচার, আচরণ, সমাজজীবন সম্বন্ধে বলা হযেছে তা নয়, ঋগ্বেদ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূল। ঋগ্বেদে অন্ততঃ শ'খানেব ঋক আছে যেগুলি নির্ভেজালভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাই বলেছে। নীহারিকা, সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে যে বিস্ময়কর তথ্য ও তত্ত্ব ঋগ্বেদে সন্নিবেশিত হযেছে তা অনুধাবন করলে সেই প্রাচীন ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধায আপ্লুত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ঋগ্বেদে জ্যোতির্বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক স্তবে উন্নীত হয়েছিল। ঋষিরা নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও পৃথিবী ইত্যাদির জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বই শুধু আবিষ্কার করেন নি, এই সব গাগনিক বস্তুর মধ্যে বস্তুর অতীত প্রাণদেবতাকে দর্শন করেছিলেন। গ্রহ নক্ষত্রেরা তাই হয়ে ওঠে প্রাণদাতা এবং প্রাণেব প্রতীক। আগেই বলেছি, ঋগ্বেদের এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তথ্য সবই এসেছে হরপ্পীয়দের কাছ থেকেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গণনায় জানা যায় ঋগ্বেদ সংহিতা প্রায় ৬২০০ বছর আগে লিপিবদ্ধ হতে আরম্ভ করে এবং প্রায় ২০০০ বছর আগের কোন কোন ঋক এতে সন্নিবেশিত। এই চার হাজার বছরের মধ্যে কম করে আঠারোজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পাওযা যায়, যদিও এঁদের রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র আজ বিলুপ্ত কিংবা দুষ্প্রাপ্য। এঁরা হলেন ব্রহ্মা, সূর্য, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, মরীচি, অগস্ত্য, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলস্ত্য, অত্রি, নারদ, গর্গ, সোম, পরাশর, ব্যাস, বাল্মীকি, ময় ও যবন। প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্রহ্মা, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতির সিদ্ধান্তকে বলা হয় দৈব সিদ্ধান্ত ; পরাশর, যবন, গর্গ ইত্যাদির সিদ্ধান্তকে আর্য সিদ্ধান্ত, এবং আর্যভট, ভাস্করাদির সিদ্ধান্ত মানব সিদ্ধান্ত হিসাবে নির্দিষ্ট। মানব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হতে পারে, আর্য সিদ্ধান্তে নতুন সংযোজন হতে পারে, কিন্তু দৈব সিদ্ধান্তকে অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা হ'ত।

ঋগ্বেদেব বয়সকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত। মোক্ষমুলর (Max Mueller) সাহেবেব মতে ঋগ্বেদের বচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক বা তার কিছু বেশি। ভারততত্ত্ববিদ্ এফ. ই. পার্জিটার, ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ১০০০ হতে ৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। আবার পিগোটের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০-১৫০০ শতাব্দী। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে তাঁর যুক্তি এই যে, একটি মিটানিয়ান নথী পাওযা গেছে যাব আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দ বলে ধার্য করা হযেছে এবং তাতে কতকগুলি ঋগ্বেদীয় দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের সংহিতা অংশ সবচেয়ে পুরানো। তাবপর বহুদিন ধরে তৈরি হয়েছে ব্রাহ্মণ অংশ। আবার সংহিতা অংশের সূক্তগুলি বেশ কয়েকশ' বছর ধবে রচিত। সংহিতা আকারে প্রকাশের আগে থেকেই বহুশত বছর ধরে সূক্তগুলি বংশপরম্পরাক্রমে মুখে মুখে রক্ষিত হযেছে। মুখে মুখে থাকায় তাব ভাযাবও পবিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। আর সেই কারণে ভাষাতত্ত্ব দিয়ে ঋগ্বেদেব বয়স নির্ণয় করলে ঋগ্বেদকে অনেক আধুনিক বলে প্রতীয়মান হতে পাবে। তাই ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় প্রামাণ্য হতে পারে না। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিব মধ্যেই যাঁরা ঋগ্বেদের বয়সকাল খুঁজে পেয়েছেন তাঁরাই অনেক বেশি প্রামাণ্য। ঋগ্বেদের ঋষিরা চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধি নক্ষত্রের উদয়-অস্ত ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। সূক্তগুলির মধ্যেই পাওয়া যায় কবে কোন্ নক্ষত্রে সূর্য বিষুবরেখায় আসত, কোন্ দিকের আকাশে কোন্ নক্ষত্রকে কোন্ ঋতুতে দেখা যেত ইত্যাদি। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈদিক ঋষিরা আশ্চর্যরকমভাবে পারদর্শী ছিলেন বলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেকানেক তথ্য এবং তত্ত্ব নির্ভুলভাবে ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে পাওয়া যায। ঋগ্বেদে এ ধরনের শতাধিক সূক্ত আছে। এগুলিতে চন্দ্র-সূর্যের বা নক্ষত্রের গতিবিধি যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি পাওয়া যাচ্ছে এই সংক্রান্ত কোন সূক্তের রচনাকালে সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান। অয়নগতির ফলে সূর্যের বর্তমান অবস্থান জেনে ওইসব সূক্ত থেকে তাদের রচনাকাল জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিযমে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব এবং

তা বাস্তবসম্মতও বটে। কারণ মুখে মুখে প্রচলিত সূক্তগুলির ভাষাগত রূপ বহু পরিবর্তিত হলেও নাক্ষত্রিক গতিবিধি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে নির্ণয় করা ঋগ্বেদ সংহিতার বয়সকালই সঠিক বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

জার্মান অধ্যাপক হেরম্যান জাকোবির মতে বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর। অনেকের মতে, লোকমান্য তিলক ও পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মত গ্রহণ করাই উপরোক্ত কারণে সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত, যদিও এঁদের নির্ণীত ঋগ্বেদের বয়সকাল অনেকটাই প্রাচীনতর। এঁরা উভয়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে ঋগ্বেদের বয়সকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। লোকমান্য তিলকের মতে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ রচনা করা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ছয় থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে। দ্বিতীয়ভাগ হচ্ছে 'ওরায়ন পিরিয়ড' বা কালপুরুষ পর্ব। এই পর্বের সময় খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ থেকে চার হাজার বছর। এটাই ঋগ্বেদের প্রধান যুগ। বেশির ভাগ সূক্তই এই সময়ে রচিত এবং সামবেদের মাধ্যমে গীত। তৃতীয় যুগ হলো খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর থেকে এক হাজার চারশ' বছর। বেদান্ত জ্যোতিষ এই সময়ের শেষভাগে রচিত। এই সময়েই আগের রচনাগুলি এতো প্রাচীন হয়ে পড়েছে যে, ব্রহ্মবাদীরা তাদের অর্থ ইত্যাদির পুনরুদ্ধার করছেন এবং পুরাতন কাহিনীগুলির ব্যাখ্যার চেষ্টা করছেন। সম্ভবত এই সময়েই সূক্ত বা ঋকগুলির গ্রন্থনা করে তাকে সংহিতারূপে প্রকাশ করা হয়। চতুর্থ ও শেষ পর্ব অনেক আধুনিক। এর সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশ' বছর অবধি ধরা যেতে পারে। এই সময়েই দার্শনিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ঋষিদের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে এবং তা প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং ঋগ্বেদ পুরোপুরি নর্ডিক আর্যদের অবদান বলে মানা যায় না। কারণ, এই আর্যরা ভারতে এসেছে খুব বেশি হলে ৪০০০ বছর আগে। তার বহুকাল আগে রচিত অনেক সূক্তই কিন্তু ঋগ্বেদে স্থান পেয়েছে।

পণ্ডিতপ্রবর যোগেশচন্দ্রের মতে ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সময় খ্রীষ্টপূর্ব আট-নয় হাজার বছর। তখন অঙ্গিরস, অথর্বন, ভৃগু প্রভৃতি পরবর্তীকালে পিতৃনামধেয় পূর্বপুরুষগণ পঞ্চনদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রথম যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। ছয় হাজার পাঁচশত হতে খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজাব পাঁচশত বা তিন হাজার পাঁচশত অব্দ উত্তীর্ণ হয়ে শেষে খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার পাঁচশত অব্দ পর্যন্ত এসে থেমেছে ঋগ্বেদের এই ধারা। এখানেই ঋগ্বেদের শেষ যুগ বলা যেতে পারে। তিলকের কাল হিসাবের সঙ্গে এই কাল হিসাবের কিছুটা গরমিল থাকলেও মোটামুটি বলা যায় ঋগ্বেদের প্রারম্ভিক সময়কাল আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর। ছয় থেকে আট হাজার বছরের মধ্যেই ঋগ্বেদের সংহিতার বেশির ভাগ অংশ রচিত এবং তা লিপিবদ্ধ হতে শুরু করে এখন থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। অর্থাৎ ঋগ্বেদের সূক্তগুলি যে সামাজিক জীবন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম, বিশ্বাস ইত্যাদির সাক্ষ্য দেয় সেগুলি আজ থেকে প্রায় ছয়-আট হাজার বছরের পুরাতন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা অবশ্য ঋগ্বেদের এত প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না নানা কারণে।

এটা মনে রাখা দরকার যাযাবর আর্যরা এদেশে এসেছিল ১৫০০ থেকে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে। তাদের না ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান, তারা না জানতো গণিতবিদ্যা। তা হলে তাদের রচিত ঋগ্বেদে ৬০০০ বছর কিংবা তারও চেয়ে অনেক পুরানো নাক্ষত্রিক অবস্থানের কথা সূক্তাকারে লিপিবদ্ধ হল কি করে? ঋগ্বেদের বয়স নিয়ে যে তর্ক-বিতর্ক তারও অবসান হয়, যদি ধরে নেওয়া হয় যে ওই সব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথা গাণিতিক সম্পর্কযুক্ত সূক্তগুলির তথ্য নেওয়া হয়েছে হরপ্পীয়দের কাছ থেকে। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তেই ঘটেছে আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণ, যদিও বেশির ভাগ সূক্তেই রয়েছে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের তথা হরপ্পা সভ্যতার লোকজনদের সংঘর্ষ, সংগ্রাম, যুদ্ধ এবং অবশেষে হরপ্পীয়দের পরাজয়েব কাহিনী। ঋগ্বেদের রচনাকাল ৩৬০০/৩৭০০ বছর আগে হলেও এর কিছু সূক্তে আছে কমবেশি ৬০০০ বছর আগেকার কথা, যখন চলছিল প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতার কাল। হবপ্পীয়দেব জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছিল ঋগ্বেদের ওই সব সূক্তে। মনে বাখতে হবে, বেদ বিভাজন কবেছিলেন 'বেদব্যাস', যিনি ছিলেন অনার্য—একেবাবে খাঁটি অনার্য। কৃষ্ণকায় পরাশর ঋষি তাঁর পিতা এবং ধীবর কন্যা সত্যকালী বা সত্যবতী তাঁর মাতা।

আগেই বলেছি, ঋগ্বেদে মোট সাতটি কালস্তর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই কালস্তরের শেষেব দিকে অনার্য সংস্কৃতি ও আর্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ঘটতে থাকে। আগন্তুক আর্যদের সঙ্গে হরপ্পীযদেব বৈরিতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। অনার্য বমণীবা আর্য ঘরণী হয়ে তাদের সংসারের হাল ধরে। ঐতিহাসিকদের মতে ঃ

"ঋগ্বেদের সূক্তগুলির অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে বুঝতে পাবা যায় যে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল। এমন কি এর মধ্যে এমন অনেক সূক্ত আছে যা আর্যরা এদেশে আসার আগেই তাদেব আদিম বাসস্থানে রচিত হয়েছিল। তাছাড়া, সূক্তগুলি একাধিক পুরুষ (Generatıons) কর্তৃক বচিত হয়েছিল। সেজন্য পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের মধ্যে অন্তত সাতটি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। দশম মণ্ডল অন্য সব মণ্ডলের চেয়ে আধুনিক। আর অষ্টম মণ্ডলে ১১টি সূক্ত আছে, যেগুলিকে 'বালখিল্য' সূক্ত বলা হয়। সায়ন ঋগ্বেদের টীকা লিখেছেন, কিন্তু এই ১১টি সূক্তের টীকা লেখেননি। সেজন্য এগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে সূক্তগুলি একত্রিত করে ঋগ্বেদের সংকলন করেছিলেন সেগুলি নানা সময়ে রচিত।

পূর্ব অনুচ্ছেদে যে সকল কথা বলা হল, তা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঋগ্বেদে কোন বিশেষ সময়ের সামাজিক বা নৃতাত্ত্বিক চিত্র নেই। বিভিন্ন যুগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞের চিত্রই এতে পাওয়া যায়। এমন কি আর্যরা এদেশে আসবার আগেকার রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের সন্ধানও এতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্‌টা কোন্ যুগের সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ অনুশীলন হয়নি।...

ন্যূনপক্ষে ঋগ্বেদের সাতটি কাল-স্তর আছে। সুতরাং শেষের দিকে রচিত সূক্তসমূহ

থেকে আমরা জানতে পারি যে এদেশের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা বর্বর জাতি থেকে সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এটা ঘটেছিল পরবর্তীকালে আর্যরা যখন এদেশেব মেয়েদের বিবাহ কবেছিল। এই সকল মেয়েদের প্রভাবই আর্যদের সুসভ্য করে তুলেছিল।"

আবার ডঃ অতুল সুর তাঁর 'হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইটিতে লিখেছেন ঃ "আর্যরা যখন পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তারা সেখানে চারি জাতির বিদ্যমানতা লক্ষ্য করেছিল। ঋগ্বেদের বহু স্থানে তাদের নামের উল্লেখ আছে। এই চারি জাতি হচ্ছে অসুর, পণি, দস্যু ও দাস। আমি অন্যত্র নৃতত্ত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী এদের সনাক্ত করবার চেষ্টা করেছি। অসুবদের আমি বলেছি 'আলপীয়'-গোষ্ঠীভুক্ত ; পণিদের 'ভূমধ্য-সাগরীয়'-গোষ্ঠীভুক্ত, দস্যুদেরও 'ভূমধ্য-সাগরীয়'-গোষ্ঠীভুক্ত লোক, দ্রাবিড় জাতি, ও দাসেদের ভাবতেব দেশজ নিষাদ বা 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড'-গোষ্ঠীভুক্ত লোক। এই তিন জাতিবই কঙ্কাল আমবা সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রসমূহে পেয়েছি। যাঁরা ঋগ্বেদের অনুবাদ করেছেন বা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন, তাঁরা গোষ্ঠী নির্বিশেষে 'অসুর' শব্দটি আর্যগণেব শত্রু অনার্যগণেব সঙ্গে সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পববর্তীকালেও 'অসুব' শব্দটি 'দানব', 'দৈত্য' ইত্যাদি নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। ('অস্' ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ, অতএব সায়ন 'অসুর' শব্দের অর্থ 'অনিষ্টক্ষেপণশীল' করেছেন)। দেবাসুবেব সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানই তার স্বাক্ষব বহন করছে। আমি অন্যত্র বলেছি যে, 'অসুব' শব্দটা আর্যভাযাভাষী এক নরগোষ্ঠীরই নাম।

পণি, দস্যু, দাস—এবা ছিল অনার্য ভাষাভাষী জাতি। পণিদেব কাছেই আর্যরা দূতী সরমাকে পাঠিয়েছিলেন গোধন সন্ধান করতে তাদের গোধন চুরি করবার জন্য (১।৬।৫ ১।৩২।১৫ ; ১০।১০৮।১), আর দস্যু ও দাসদের আর্যরা ঘৃণা করেছে নগরবাসী, শিশ্নোপাসক ও যজ্ঞ-বিবোধী বলে। অথচ এদের মেয়েদেরই আর্যরা বিয়ে করেছিল, এবং তার ফলে যে সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ঘটেছিল, তা-ই পরবর্তীকালে হিন্দুসভ্যতা নামে পরিচিত হয়েছিল। সুতরাং হিন্দুসভ্যতার যে একটা নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি আছে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষণ ঘটেছিল সেখানে, যেটাকে আগে আমরা বলতাম 'মধ্যদেশ। তার মানে কাশী, কোশল, বিদেহ ইত্যাদি দেশে। সেখানে আর্যদের আপোস করতে হয়েছিল অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও লোকযাত্রার সঙ্গে। এটা বিবর্তনের ক্রমিক ধারাবাহিকতার ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল পৌরাণিক যুগে। এই সংশ্লেষণের পর আমরা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বৈদিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক : লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার স্তুতি গান করে না। বৈদিক যজ্ঞও সম্পাদন করে না। নতুন দেবতামণ্ডলীর পত্তন ঘটায়, যজ্ঞের পরিবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা। বৈদিক আত্মকেন্দ্রিক স্তুতিগানের পরিবর্তে আসে ভক্তি। এর ওপর প্রাগার্য তান্ত্রিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে।

আর্য চিন্তাধারার দ্বারা মণ্ডিত হয়ে, অনার্য দেবতাসমূহ পৌরাণিক যুগে সামনে এসে হাজির হয়। আর বৈদিক দেবতাসমূহ পশ্চাদ্‌ভূমিতে চলে যায়। বৈদিক ইন্দ্র তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে মাত্র পূর্বদিকের একজন দিকপালে পর্যবসিত হয়। নতুন দেবতামণ্ডলীর মধ্যে আসে ব্রহ্মা (যার উল্লেখ ঋগ্বেদে নেই), বিষ্ণু, শিব (যাকে আমরা সিন্ধুসভ্যতায় পাই), দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী (ঋগ্বেদে নদী হিসাবে স্তুত হত), শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা—আরও কত। অবতারবাদের সৃষ্টি হয়। তাতে বুদ্ধও স্থান পান।"

আদিম আর্যরা তাঁদের উপাস্যকে দেবতা বা অসুব দুই নামেই স্তব করতেন। 'অসুর' কথাটি তাঁদের কাছে পরম শক্তিবাচক এবং 'দেব' কথাটি প্রকৃতির নানা শক্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত দেবসত্তাবাচক ছিল। পববর্তীকালে 'দেব' ও 'অসুর' এই সাধারণ নাম দুটি পরস্পরের কাছে নিন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ঋগ্বেদের প্রতিটি সূক্তে এক-একটি দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে। দেবতা সেখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। তার অর্থ হলো বিষয়বস্তু। এই অর্থে প্রস্তর, ধনুক, অশ্ব বা মণ্ডূক ইত্যাদি দেবতা হিসাবে চিহ্নিত। আবেক ধরনেব দেবতা আছেন যাঁরা পরে সৃষ্ট হয়েছেন বলে নাসদীয় সূক্ত (১০।১২৯।৭) বলছে এবং পুরুষ সূক্তে (১০।৯০।১৫) যাঁদেব স্বর্গবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের স্বর্গবাসী দেবতা বলা যেতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর দেবতারা হলেন বিশেষ শক্তির আধার, যাঁদেব উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয়, হবি নিবেদন কবা হয়, প্রার্থনা জানানো হয়। এঁরা প্রাকৃত দেবতা। ঋগ্বেদে দেবতাব সংখ্যা বলতে গিযে কোথাও বলা হযেছে ৩৩টি আবাব কোথাও ৩৩৩৯টি। তবে ঋগ্বেদেব সূক্তগুলিতে উল্লিখিত দেবতার সংখ্যা গণনা করলে দেবতার সংখ্যা ৩৩টি বলেই মনে হয।

ডঃ হিরন্ময বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি প্রধানতঃ আর্ত এবং অর্থার্থী মনোভাব নিয়ে রচিত। শত্রু, রোগ ও বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে বা বৈষযিক সমৃদ্ধি কামনা করেই বেশির ভাগ সূক্ত রচিত এবং সূক্তগুলিতে পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ বা দ্যুলোকের এমন কিছু প্রাকৃতিক বিষয়বস্তু রয়েছে যাদের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা তাদের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। যেখানেই শক্তির প্রকাশ সেখানেই প্রার্থনা জানানো হয়েছে সেই শক্তিতে দেবত্ব আরোপিত করে। ফলে প্রাকৃতিক সেই শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপহেতু তাঁরা দেবতা বলে কল্পিত। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নিচের ২৭টি দেবতাই ঋগ্বেদেব প্রকৃত দেবতা ঃ

অগ্নি, মিত্র, বরুণ, মরুৎগণ, বৃহস্পতি, পূষণ, আদিত্যগণ, ব্রহ্মণস্পতি, দ্যৌ, রাত্রি, রুদ্র, বায়ু, সবিতা, অদিতি, যম, অশ্বিদ্বয়, ভগ, ত্বষ্টা, সোম, বিষ্ণু, ঊষা, অর্জমা, সূর্য, পৃথিবী, অপগণ, পর্জন্য ও সরস্বতী (নদী)।

এই তালিকায় বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে কারণ তাঁদের উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলি দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় পরিপূর্ণ। আবার ইন্দ্র যিনি ঋগ্বেদের আড়াইশোরও বেশি সূক্তে স্তুত হয়েছেন তিনিও এই তালিকায় অনুপস্থিত। ইন্দ্র ঋগ্বেদে দুর্দমনীয় যোদ্ধারূপে পরিকল্পিত এবং তাঁর উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলি পড়লে তাঁকে অন্তরীক্ষ স্থানেব

বাসিন্দা বলেই মনে হয়। অবস্থানুসারে মূল দেবতাদের আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তবে কতকগুলি দেবতার এইভাবে বিভাগ করা শক্ত।

মোট উনিশটি দেবতার এই অবস্থানগত শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। যেমন, পৃথিবী স্থান ঃ অগ্নি, পৃথিবী, অপ, সোম। অন্তরীক্ষ স্থান ঃ ইন্দ্র, রুদ্র, পর্জন্য। দ্যুলোক স্থান ঃ সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, দ্যু, পূষা, অশ্বিযুগল, ঊষা, রাত্রি, যম, বৃহস্পতি।

সূক্ত-সংখ্যা দিয়ে হিসাব করলে ইন্দ্র আসেন প্রথম স্থানে। তাঁর উদ্দেশে রচিত সূক্তের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। এরপরে আসেন অগ্নি। তাঁর উদ্দেশে, রচিত সূক্ত-সংখ্যা প্রায দুশো। তারপর আসেন সোম। তাঁর উদ্দেশে, রচিত সূক্ত-সংখ্যা ১২০টি। তবে সোম বলতে মূলতঃ মুঞ্জবান পর্বতের এক বিশেষ ধরনের লতা, যা অধুনালুপ্ত, তাকে বোঝালেও সোম অনেক সময় চন্দ্র কিংবা ঐ নামধারী ব্যক্তি বা দেবতা বিশেষকেও বুঝিয়েছে।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি রচিত হয়েছে মূলতঃ দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, গুণকীর্তন ও প্রার্থনা জানানোর জন্য। আবার কিছু সূক্ত আছে যেগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানেব তথ্য বা তত্ত্ব সম্বলিত। তবে কিছু কিছু সূক্ত আছে যেগুলি দার্শনিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ এবং যেগুলিব প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ ছাড়াও কিছু সূক্ত আছে যেগুলি দেবতাদেব উদ্দেশে বচিত নয বা তাতে কোনও দার্শনিক ব্যঞ্জনাও নেই। এইভাবে সূক্তগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কবা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সেইসব সূক্ত যেগুলি এক বা একাধিক দেবতার নিকট শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও প্রার্থনা নিবেদনের জন্য রচিত। এগুলির সংখ্যা ঋগ্বেদের মোট ঋক-সংখ্যাব প্রায় নব্বই ভাগ। দ্বিতীয় শ্রেণীব সূক্তগুলি সংখ্যায় কম হলেও এগুলি দার্শনিক তত্ত্ব-সম্বলিত। পরবর্তীকালে উপনিষদগুলির মধ্যে যে মহান দার্শনিক চিন্তাব বিকাশ দেখি তাব বীজ হ'ল এইসব দার্শনিক তত্ত্ব ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ ঋগ্বেদীয সূক্তগুলি। আর তৃতীয শ্রেণীতে পড়ে বাকী সূক্তগুলি যেগুলি দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ নয় বা যেগুলি বৈদিক দেবতার স্তুতিও নয়। এগুলি মিশ্র শ্রেণীর। এগুলিতে দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে অক্ষ, মণ্ডুক, অশ্ব, প্রস্তর ইত্যাদি। এখানে দেবতা ও বিষয়বস্তু সমার্থক। অর্থাৎ সূক্তের বিষয়বস্তু এগুলির দেবতা বলে উল্লিখিত। এগুলি মিশ্র শ্রেণীর সূক্ত এইজন্য যে বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু আছে এই রকম বিভিন্ন সূক্তে। এগুলিতে কোথাও কথোপকথন আছে, কোথাও রাজার সম্বন্ধে আলোচনা আছে, কোথাও অক্ষক্রীড়ার নিন্দা আছে, কোথাও বা অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা আছে। ধর্মের সঙ্গে বা দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে এগুলির যোগ নেই। কোনটিতে যেমন বিবাহের বর্ণনা আছে, কোনওটিতে তেমনি আছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। আবার দানের সুখ্যাতি করেও কিছু সূক্ত আছে যা এই শ্রেণীভুক্ত। এছাড়া জাদুবিদ্যা, গর্ভনাশ, যক্ষ্মা রোগ নিরাময় ইত্যাদি সংক্রান্ত মন্ত্র বা সূক্তও আছে ঋগ্বেদে যা এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হতে পারে।

ঋগ্বেদের মোট তিনটি শাখা—শাকল, বাষ্কল ও শাংখ্যায়ন। অনেকের মতে এই শাখা-সংখ্যা নাকি পাঁচটি ছিল। দুটি হারিয়ে গেছে। মণ্ডল ও সূক্তে ভাগের ব্যাপারটা শাকল শাখার অন্তর্গত। বাষ্কল তাঁর শাখায় এগুলিকে অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গে ভাগ

করেছেন। বাষ্কল বালখিল্য সূক্তগুলি বাদ দিয়েছেন বলে তাঁর শাখায় ঋগ্বেদে মোট ৮টি অষ্টক, ১০১৭টি সূক্ত, ২০০৬টি বর্গ ও ১০৪৭২টি ঋক। তবে শাকল শাখার বিভাগ বেশি জনপ্রিয়। শাকল শাখার বিন্যাসও অনেকটা স্বাভাবিক। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডলের সূক্তগুলির যাঁরা ঋষি তাঁরা বিভিন্ন বংশজাত হলেও অন্য ছয়টি মণ্ডল কিন্তু স্বতন্ত্র। এই ছয়টি মণ্ডলের এক-একটি প্রধানতঃ এক-একটি ঋষিবংশের রচিত। যেমন, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪৩টি সূক্তের ৪০টি সূক্তের ঋষি হলেন গৃৎসমদ। কেবল ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সূক্তের ঋষি ভৃগুপুত্র সোমাহুতি। তৃতীয় মণ্ডলের মোট ৬২টি সূক্তের অধিকাংশই ঋষি বিশ্বামিত্র রচিত। তাছাড়া তাঁর পিতা গাথি ও তাঁর পুত্র প্রজাপতি, ঋষভ, কত ও কতের পুত্র উৎকীল প্রভৃতিদের সূক্তও স্থান পেয়েছে এই মণ্ডলে। চতুর্থ মণ্ডলের সূক্ত-সংখ্যা ৫৮টি। তিনটি বাদে সবগুলিই বামদেব ঋষির রচনা। ৪২তম সূক্তের ঋষি ত্রসদস্যু এবং ৪৩ ও ৪৪তম সূক্ত যথাক্রমে পুরুমীলহ ও আজমীলহ রচিত। তেমনি ৫ম মণ্ডলের ৮৭টি সূক্তের সবগুলিই ঋষি অত্রি এবং তাঁর বংশধবদের দ্বারা বচিত। এমনকি ঋষি ও ঋত্বিক বিশ্ববারারও একটি সূক্ত এই মণ্ডলে স্থান পেয়েছে। আবার ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫টি সূক্তই ঋষি বৃহস্পতির বংশধরগণ রচনা করেছেন। সপ্তম মণ্ডলে ১০৪টি ঋকের একটি ছাড়া আর সমস্তগুলিই ঋষি বশিষ্ঠ বিরচিত। কেবল ৪৩তম ঋকটি ঋষি বশিষ্ঠ নিজে ও তাঁর পুত্রগণ বচনা করেছেন। সুতবাং সপ্তম মণ্ডলটি পুরোপুরিই ঋষি বশিষ্ঠ ও তাঁর বংশধরগণের রচনা। ঋগ্বেদের অধিকাংশ মণ্ডলই তাই বিশেষ বিশেষ ঋষির বংশেব লোকদের দ্বারা বিবচিত বলা হঁয। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেব সূক্তগুলি বয়সে নবীন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় পবিপূর্ণ। এগুলিই পববর্তীকালে বেদান্তেব জন্মদাতা। এতে রয়েছে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণের কিছু কথাও। হিন্দুধর্মের প্রধান অঙ্গ হল তার প্রধান ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ। সেই ঋগ্বেদ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক্ তার দুটি বিখ্যাত সূক্তের বাংলা অনুবাদ এবং তাদেব সামান্য ব্যাখ্যা দিয়ে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তটির রচয়িতা মহর্ষি অম্ভৃনের কন্যা ব্রহ্মবাদিনী বাক্। 'সূক্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো সু-বচ্ ধাতু + ক্ত অর্থাৎ যাহা শোভনভাবে কথিত হয়। বৈদিক স্তোত্র সূক্ত নামে অভিহিত। প্রত্যেকটি সূক্ত কয়েকটি ঋকের সমষ্টি। আবার কতকগুলো সূক্ত নিয়ে এক-একটি মণ্ডল। আগেই বলেছি, ঋগ্বেদে মোট দশটি মণ্ডল, ১০২৮টি সূক্ত এবং ১০৫৫২টি ঋক্। এই বিশাল গ্রন্থে যে সাতজন মহিলা ঋষি আছেন ব্রহ্মবাদিনী বাক্ তাঁদের অন্যতমা। শুধু তাই নয়, তাঁর রচিত সূক্তের গুরুত্ববিচারে তাঁকে মহিলা ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিতে বাধা নেই। আর ঋগ্বেদের পুরুষ ও মহিলা ঋষিদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলা চলে।

ঋগ্বেদে ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা বা রচয়িতা। 'যাঁর বাক্য তিনিই ঋষি'—এই হিসাবে যিনি সূক্তটি রচনা করেন তিনি সেই সূক্তের ঋষি। হিন্দুদের বিশ্বাস, ঋষিরা মন্ত্র রচনা করতেন না, দর্শন করতেন অর্থাৎ তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা। যাঁর উদ্দেশে সূক্তটি নিবেদিত হ'ত

তিনিই সেই সূক্তের দেবতা। আগেই বলেছি ঋগ্বেদের সূক্তগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে সেই সূক্তগুলো যেগুলো বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশে রচিত। ঋগ্বেদের মোট সূক্তের শতকরা নব্বই ভাগই এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সেইসব সূক্ত যেগুলিতে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত। এই সূক্তগুলির বেশির ভাগই আছে দশম মণ্ডলে। উপনিষদীয় ভাবনার ব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ ও পরবর্তীকালের শক্তিবাদ এই সূক্তগুলি থেকেই জন্ম নিয়েছে। এইসব সূক্ত সংখ্যায় অধিক নয় বটে, কিন্তু তাদেরই বিবর্তনে উৎপত্তি হয়েছে পরবর্তী যুগের বিশ্বখ্যাত কালজয়ী দার্শনিক চিন্তাসমূহ। এই সূক্তগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূক্তগুলি হল—প্রথম মণ্ডলের ১৬৪তম সূক্ত যেখানে পাওয়া যায় 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি', অষ্টম মণ্ডলের ৫৮তম সূক্ত যেখানে আছে, 'একং বা ইদং বি ভুব সর্বম্' এবং দশম মণ্ডলের ৯০তম, ১২১তম, ১২৫তম ও ১২৯তম সূক্ত চারটি। ঋগ্বেদের তৃতীয় শ্রেণীর সূক্ত মিশ্র শ্রেণীর যাদের বিষয়বস্তু দেবতাও নয় আবাব দার্শনিক চিন্তাও নয়। সুতরাং দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার সীমিতসংখ্যক বিখ্যাত সূক্তগুলির মধ্যে দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্তটি অন্যতম। এর রচয়িত্রী মহিলা ঋষি ব্রহ্মবাদিনী বাক্, তিনি মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা এবং মন্ত্রদ্রষ্ট্রী।

এই সূক্তটির দেবতা পরমাত্মা, ঋষি বাক্ এবং এটি ত্রিষ্টুপ জগতী ছন্দে রচিত। বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে দেবতা নিজেব বিষয়ে নিজেই বলেছেন। সাধাবণত ঋষিবাই দেবতাদেব উদ্দেশে মন্ত্র রচনা করেন। এখানে তা হয়নি। তবু বাক্ এ সূক্তেব বক্তা বা ঋষি বলে নির্দেশিত। সূক্তেব ভিতর কোথাও কোনও নিদর্শন নেই যাতে বলা যায় ঋষি বাক্ এ সূক্তের বক্তা। বক্তা এখানে নিজেকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্বনির্মাতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। ফলে বক্তা এখানে একমাত্র ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয় অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর। ঋষি ও দেবতা এখানে এক হয়ে গেছেন। ঋষি বাক্ নিজেকেই ঈশ্বর হিসাবে ঘোষণা করেছেন এই সূক্তে। বেদ-ভাষ্যকার সায়নাচার্য এর ব্যাখ্যায় বলেন, "মহর্ষি অম্ভৃনের কন্যা সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বগত পরমাত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য অর্থাৎ নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি করে সমস্ত জগৎরূপে ও সকলের আশ্রয়রূপে আমিই সকল হযেছি—এইভাবেই স্বীয় আত্মাকেই স্তব করেছেন (স্বাত্মানম্ অস্তৌৎ)।" এখানে সর্বশ্বরবাদের বীজ নিহিত আছে। দেবতা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম পরিশুদ্ধ আধার ব্রহ্মবিদূষী বাক্‌কে যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে তাঁর ভিতর দিয়ে স্বয়ং আত্মস্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। বাক্ সূক্তের আটটি ঋকের বাংলা অনুবাদ এই রকম ঃ

"আমি রুদ্রগণ ও বসুগণরূপে বিচরণ করি ; আমি আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কেই ধারণ করি ; আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি (ঋক্-১)। আমি শত্রুনাশকারী সোমদেবকে ধারণ করি। আমি ত্বষ্টা, পুষা এবং ভগদেবকে ধারণ করি। হবি-সমন্বিত, দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী এবং সোমরস-প্রস্তুতকারী যজমানকে আমি যজ্ঞ ফল প্রদান করে থাকি (ঋক্-২)।

আমি জগদীশ্বরী, ধনদায়িনী, পরব্রহ্মজ্ঞানবতী এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরূপে আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তব, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি (ঋক্-৩)। যিনি দর্শন করেন, প্রাণ ধারণ কবেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতেই সে-সকল কার্য কবেন। আমাকে যারা মানে না তাবা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান! শোন, আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য (ঋক্-৪) । দেবতাবা এবং মনুষ্যেবা যাঁর শবণাগত হয়, তাঁর বিষয়েই আমি উপদেশ দিই। যাকে ইচ্ছা আমি বলবান অথবা স্তোতা অথবা ঋষি অথবা উত্তম প্রজ্ঞাশালী করতে পারি (ঋক্-৫)। ব্রহ্মদ্বেষী হিংসক অসুরবধেব নিমিত্ত আমি রুদ্রের ধনুকে জ্যা সংযোগ করি। সজ্জনের রক্ষণার্থ আমি সংগ্রাম করি। আমি দ্যুলোক ও ভূলোকে আবিষ্ট হযে আছি (ঋক্-৬)। আমি এই ভূলোকেব উপরে অবস্থিত দ্যুলোককে প্রসব করেছি। পরমাত্মাতে ব্যাপনশীল বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থিত যে ব্রহ্মচৈতন্য তাহাই আমার কাবণ অর্থাৎ প্রকাশস্থান। সেইহেতু আমি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হযে বিবিধরূপে বর্তমান আছি। অধিকন্তু নিজদেহদ্বাবা আমি ওই দ্যুলোককে স্পর্শ কবে আছি (ঋক্-৭)। আমিই সমস্ত ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর ন্যায বহমান হই। আমার মহিমা এরূপ বিশাল হয়েছে যে, তা দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম কবেছে (ঋক্-৮)।

ঋগ্বেদেব যুগে নারী ও পুরুযের একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন কবাব অধিকাব ছিল। এইজন্য পুরুযের জন্য পববর্তীকালে যে দশটি সংস্কার নির্দিষ্ট করা হয় সেগুলিব ব্যবস্থা ঋগ্বেদীয় যুগের নাবীদেব জন্যও নির্দেশিত ছিল বলে অনুমান কবা হয়। অর্থাৎ নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল ঋগ্বেদের আমলে। সংস্কৃতে 'আচার্যা' শব্দের অর্থ, যে মহিলা নিজে বেদমন্ত্রেব ব্যাখ্যা করেন। বেদ ব্যাখ্যার জন্য নারীকে বিদুষী হতে হবে। আর তার জন্যই নারীর উপনয়ন ও সমাবর্তন এই উভয় সংস্কার ব্যবস্থা সে-যুগে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। মনুস্মৃতির একটি শ্লোক এ ব্যাপাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

"পুরাকল্পে কুমারীনাং মৌঞ্জী বন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা।।"

অর্থাৎ প্রাচীনকালে মেয়েদের জন্য মৌঞ্জীবন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। এই মৌঞ্জীবন্ধন আর উপনয়ন মূলতঃ এক। সেকালে মেয়েরা অধ্যাপনা এবং সাবিত্রীমন্ত্র জপও করতে পারতেন। একালের মত মেয়েদের শুধু একটিমাত্র সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ সংস্কারই ছিল না। গুরুর কাছে শিক্ষার জন্য মৌঞ্জীবন্ধন বা উপনয়ন তো ছিলই উপরন্তু অন্যান্য নয়টি সংস্কারেও নারীর সমানাধিকার ছিল ঋগ্বেদের কালে এটা সহজেই অনুমেয়। পঞ্চম মণ্ডলের ২৮তম সূক্ত পড়লে এটা বোঝা যায় যে, মহিলা ঋষি বিশ্ববারা নিজেই ঋত্বিকের কার্য সম্পাদন করছেন। সুতরাং ওই আমলে পুরুষদের মত নারীরাও দশবিধ সংস্কারের অধিকারিণী ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী বাক্‌ও চিরকুমারী থেকে ব্রহ্মত্ব লাভের সাধনা করে গেছেন। পুরুষ ঋষিদের ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্য যে যে সংস্কার ও সাধনার প্রয়োজন

মহিলা ঋষি বাক্‌ও সেই সেই সংস্কার ও সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্রহ্মর্ষি কবে তুলেছিলেন এবং পরিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ তথা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে তিনি নিজেই ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। তাঁব বিখ্যাত এই সূক্তটির বক্তব্য তাই একদিকে যেমন তাঁব নিজের, অন্যদিকে ঈশ্বরের। তিনি এবং ঈশ্বর এখানে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। অর্থাৎ ঋষি ও দেবতা এক হয়ে গেছেন যেহেতু ঋষি ব্রহ্মানুভূতি লাভের পর নিজেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হয়েছেন। ঋষি বাক্ তাই ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মবাদিনী ও ব্রহ্মস্বরূপিণী।

সর্বেশ্বরবাদের মহান দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ এই অতি বিখ্যাত সূক্তটি শক্তিবাদেব মূল উৎস। এই সূক্তটি 'দেবীসূক্ত' নামে খ্যাত। সূক্তটি 'বাক্‌সূক্ত' নামেও প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা বিশ্বব্যাপিনী শক্তি যদিও মূলতঃ অভেদ তবুও সেই অভেদে ভেদ কল্পনা কবে শক্তিকে একটা স্বতন্ত্র সত্তায় মহিমান্বিত করার বীজ নিহিত ছিল এই সূক্তে। শক্তির মহিমা কীর্তন কবে শক্তিমানকে মহিমাময কবাই ছিল এই সূক্তেব উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে ঈশ্ববেব থেকে তাঁব শক্তিকে পৃথক কবে নিযে সেই শক্তিতে একটা পৃথক সত্তার আবোপ কবা হ'ল। ফলে শক্তিমান ও শক্তিকে পৃথক সত্তায় প্রতিষ্ঠা করে পববর্তীকালে শাক্তধর্ম ও শাক্তদর্শনেব উদ্ভব ঘটল। ভারতীয় দর্শনে শক্তিবাদের বীজমন্ত্র হ'ল এই দেবীসূক্ত, যা শ্রীশ্রীচণ্ডীব ভিত্তিভূমি।

এই সূক্ত উপনিষদীয ভাবনায শক্তিবাদ সৃষ্টি কবেছিল। ঋগ্বেদেব 'বাত্রিসূক্তে' বা অথর্ব বেদেব 'পৃথিবীসূক্তে' এর প্রভাব দেখা যায। ঋগ্বেদেব বাত্রিসূক্তে, অথর্ব বেদের পৃথিবীসূক্তেও ইন্দ্র-জননী হিসাবে সর্বভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্তুতি কবা হযেছে। অথর্ব বেদের ৬ষ্ঠ কাণ্ডেব ৪র্থ অনুবাকেব চতুর্থ সূক্তে দেবীকে সর্বব্যাপিনী এবং ইন্দ্র-জননী হিসাবে বর্ণনা করা হযেছে। এঁর সঙ্গে মার্কণ্ডেয পুরাণেব দেবীমাহাত্ম্যের শক্তিরূপিণী চণ্ডীব অনেকানেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। অথর্ব বেদের দ্বাদশ কাণ্ডেব প্রথম অনুবাকেব পৃথিবী সূক্তটিতে এই শক্তি বিশ্বজননী দেবীরূপে বন্দিত হ'যেছেন। তবে মার্কণ্ডেয পুবাণেব শক্তিরূপিণী চণ্ডীর সঙ্গে অবয়বগত সাদৃশ্য আছে নিচেব সূক্তটিতে বর্ণিত দেবীব সঙ্গে।

"সিংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকৌত্বিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা।।১
যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে ত্বিষিরপ্সু গোষু যা পুরুষেষু।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা।।২
বথে অক্ষেষ্বৃষভস্য বাজে বাতে পর্জন্যে বরুণস্যশুষ্মে
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা।।৩
রাজন্যে দুন্দুভাবায়তায়ামশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মাযৌ।
ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান সা ন ঐতু বর্চসা সংবিদানা।।৪

(অথর্ব বেদ • ৬ষ্ঠ কাণ্ড • ৪র্থ অনুবাক • সূক্ত ৪।১-৪)

সূক্তটিব বাংলা অনুবাদ কবলে দাঁড়ায় ঃ

"যে দেবী সিংহে, ব্যাঘ্রে এবং যে দেবী সর্পের ভিতরে, দীপ্তি যিনি অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে, ইন্দ্রকে জন্ম দিয়েছেন যে সুভগাদেবী, তেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে আসুন। যিনি হস্তীতে, দ্বীপীতে, যিনি হিরণ্যে, দীপ্তি যিনি জলরাশিতে, গো-সমূহে, পুরুষসমূহে, ইন্দ্রকে যিনি জন্ম দিয়ছেন সেই দেবী আমাদের ঈপ্সিত তেজের সাথে এক হ'য়ে আমাদের নিকটে আসুন। রথ ও তার চাকাগুলিতে, বৃষের গতিতে, বায়ু, বৃষ্টিপ্রদ মেঘ ও বরুণের শক্তিতে যে সুভগাদেবী যিনি ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছেন তিনি আমাদের কাছে আসুন। যিনি রাজন্যের দুন্দুভিতে, যিনি অশ্বের গতিতে, পুরুষের গর্জনে, ইন্দ্রকে জন্ম দিয়েছেন যিনি সেই সুভগাদেবী তেজোদীপ্তা হ'য়ে আমাদের কাছে আসুন।"

শক্তিকে ঈশ্বরের থেকে আলাদা সত্তা ভেবে নিয়ে সেই শক্তির উপাসনা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান দেবীপূজার রূপ নিয়েছে। রূপ নিয়েছে বর্তমান শক্তিসাধনা আর তন্ত্র-পুরাণ ইত্যাদির শক্তিবাদ। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে উপনিষদ-সংখ্যা দুশোরও বেশি। তবে এখনও পর্যন্ত লিখিতভাবে মোট একশ' কুড়িখানা উপনিষদ পাওয়া গেছে। বহু গবেষণার পর বিদ্বজ্জনেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মূল বা প্রাচীন উপনিষদ সংখ্যায় মাত্র দশটি—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। অনেকে এই দশটির সঙ্গে কৌষীতকি, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়নীয় উপনিষদ তিনটির নাম যোগ করেন। এগুলি নিলে মোট তেরোটি মূল উপনিষদ বলে ধরা হয়। এই উপনিষদগুলিতে দেবীসূক্তের প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই প্রভাব নিয়ে সামান্য আলোচনা কবলেই উপনিষদীয় ভাবনায় শক্তিবাদের রূপরেখার মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায়। অম্ভৃণ-কন্যা ব্রহ্মবাদিনী বাকের এই ছোট্ট সূক্তটির অবদান যে কতটা এবং তাব প্রভাব যে কত সুদূর প্রসারী তা সহজেই অনুধাবন করা যায় স্বল্প পরিসবের এই সামান্য আলোচনায়।

হিন্দু সভ্যতাব আদিকালে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করতেন। ব্রহ্মবাদিনী বাক্ সাতজন বৈদিক ঋষিকা বা নারীঋষির অন্যতমা। তিনি সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কোন সামাজিক বা পরিবারিক প্রতিবন্ধকতাব সম্মুখীন হন নি। ঋগ্বেদের আদিকালে এমনই ছিল নারী-প্রগতি, সামাজিক অগ্রসরতা। এবার ঋগ্বেদের আরেকটি সূক্তের কথা বলি, যে সূক্তটি 'নাসদীয় সূক্ত' নামে পরিচিত। যেমন, বাক্-সূক্তটি 'দেবী সূক্ত' নামে বিখ্যাত, তেমনি নাসদীয় সূক্তটি তার ওই নামে সারা পৃথিবীর পণ্ডিতদের কাছে রীতিমত গুরুত্ব সহকারে আদৃত। সূক্তটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ তম সূক্তটি 'নাসদীয় সূক্ত' নামে বিশ্ববিখ্যাত। এই সূক্তে সৃষ্টির ইতিহাস এমন সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞানও তার কাছে হার মেনে যায়। গত ছয় হাজার বছরে সৃষ্টি সম্পর্কে এর চেয়ে সুন্দরতম বক্তব্য আর কেউ কোনদিন রাখে নি। নাসদীয় সূক্তটি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাংলা অনুবাদে এই রকম রূপ নেয় ঃ

"তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না। অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কী ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছু ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকাব আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি-কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তুব উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ্বদিকে বিস্তাবিত হইল, নিম্ন দিকে স্বধা রহিল, প্রয়তি ঊর্ধ্ব দিকে রহিলেন। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সব নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, তাহা কেই বা জানে? এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিযাছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহাব প্রভু স্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পাবেন।" (ঋগ্বেদ • দশম মণ্ডল • ১২৯তম সূক্ত)

নাসদীয় সূক্তের ঋষিরা যে ধবনেব কথা বলেছেন, তার কিছু কিছু বলছেন এ কালের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্সেব (Quantum Physics) লোকেরা। সৃষ্টির আগে ছিল এক অদ্ভুত মহাশূন্য অবস্থা। মহাশূন্য ও শূন্যের মধ্যে তফাৎটা ঋষিরা জানতেন এবং বুঝতেন। তাই বলছেন বস্তু বা অবস্তু কিছুই সে সময় অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিল না। ছিল না আকাশ অর্থাৎ স্পন্দনশীল শূন্য (Void)। ছিল না দেশ (Space), কাল (Time) ও নিমিত্ত (কার্য-কাবণ সম্পর্ক)। তখন এক অবিদ্যমান বস্তুই ছিল। সে জীবিত ছিল বিনা বায়ুতে, আত্মশক্তির দ্বারা।

নাসদীয় সূক্তের ওই অন্ধকাব আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানের Blackhole বা কৃষ্ণ গহ্বর। অবিদ্যমান বস্তু হল অক্রিযাশীল শক্তি। এই অক্রিয়াশীল শক্তি, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় Entropy, ওই মহাশূন্যতাব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বরূপ। শক্তি ঘনীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয় ইচ্ছায়। ইচ্ছা বিস্ফোরিত হয়ে সৃষ্টি হয় আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তি থেকে তৈরি হয দেশ-কাল-নিমিত্ত। নাসদীয় সূক্তের আলো হল জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের 'Whitehole'। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার। স্বধা বা স্বয়ংক্রিয় শক্তি নিচে ছিল মানে গোলাকার বিশ্বের অভ্যন্তরে ছিল। প্রয়তি বা ইচ্ছা ছিল ঊর্ধ্বে। ইচ্ছার পরিণতিই প্রয়তির ঊর্ধ্বে থাকা। সৃষ্টির আদি ক্রিয়ার সময় দর্শক কেউ ছিল না। সুতরাং সৃষ্টির আদি ক্রিয়া সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারে না। তবে যে অবিদ্যমান

বস্তু বা একমাত্র বস্তু কিংবা মহা-মানস থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি তিনি হয়ত বলতে পারেন সৃষ্টির আদি ক্রিয়ার রূপ কেমন ছিল। ঋষিরা অবশ্য এমন সন্দেহ প্রকাশও কবেছেন যে, সেই মহামানসও সৃষ্টির আদি ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু নাও জানতে পারেন। এই মহান সত্য একমাত্র হৃদয়ে অনুভব করা যায় ব্যাখ্যা করা যায় না। দর্শন এই স্তরে এসে অনুভূতির কথা বলে, বলে হৃদয় দিয়ে অনুভবের কথা। বুদ্ধি বা জ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না, যুক্তি তথ্য সবই নিষ্ফল হয়ে যায়। অবিদ্যমান ওই বস্তুকে কিছুটা পরবর্তীকালে উপনিষদের যুগে বলা হয়েছে 'অব্যক্ত'। এই অব্যক্তেই অবস্থান করে সৃষ্টি-পূর্বের প্রকৃতি-পুরুষ, সাংখ্যের প্রকৃতি এবং পুরুষ।

ভাবতে অবাক লাগে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে দার্শনিক ঋষিরা এই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেন কেমন করে! জগতের আদি, অব্যক্ত মূল তত্ত্বের এমন সুন্দর, গভীর মূলস্পর্শী বিচার ও বর্ণনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানেব কোনও বইযেও এমন বর্ণনা নেই, বিশ্বসৃষ্টি ও তাব ক্রমবিকাশ সম্পর্কে। বিশ্বসৃষ্টিব পূর্বাবস্থা ও সৃষ্টির আদিক্রিয়া সম্পর্কে পৃথিবীর সব সময়ের সব গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতম বর্ণনা দিয়েছে ঋগ্বেদের এই অতিবিখ্যাত 'নাসদীয় সূক্ত'। এই জ্ঞানেব উদয় হয়েছিল এই ভাবতবর্ষে প্রায সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, যখন সমস্ত আধুনিক জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ছিল বর্বর অসভ্য বৃক্ষবাসী। কিছু মনীষী অবশ্য এই সময়টাকে আরও হাজার দেড়েক বছর পিছিয়ে দেন। নাসদীয সূক্তের এই জ্ঞান, এই অন্তর্দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রদ্ধা কেড়ে নেয়। সূক্তটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আরও নানাভাবে ব্যাখ্যা কবা হযেছে। বিজ্ঞানেব আধুনিকতম আবিষ্কারের কিছু কিছুর মূল সূত্র এই সূক্তে নিহিত আছে। এটাই আশ্চর্যের, মন্ত্র মুগ্ধকব বিস্ময়ের।

এই সূক্ত রচনার সময় সম্ভবত আর্য-অনার্য সংস্কৃতিব সংশ্লেষণ ঘটে গেছে। অনার্য হরপ্পীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশালজ্ঞান ভাণ্ডাব চলে এসেছে ভাবতীয় আর্য সভ্যতাব সংস্কৃতিতে। ঋগ্বেদে প্রবেশ কবেছে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ সূক্ত। বৈদিক যুগের শেষেব দিকে ২৮০০/৩০০০ বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল উপনিষদসমূহ। এগুলি প্রকাশ কবেছে বিশ্বসেরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি। মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উপনিষদগুলিতে।

উপনিষদ বিশ্বাস করে, এই জগৎ-প্রপঞ্চে এমন কোন বস্তু-জড় বা পদার্থ নাই যার সঙ্গে চৈতন্যসত্তার যোগ নেই বা চৈতন্য জড়িয়ে নেই। সব কিছুর মধ্যে চৈতন্য বিরাজমান, কোথাও তা কম প্রকাশিত, কোথাও বা বেশি। উপনিষদ আরও বলে আমরা যাকে জড় বলি তার অস্তিত্ব নাই, তা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থা মাত্র। চৈতন্যবিহীন জড়, যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই, কোনদিনই শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। আবার ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে দর্শনের কোনও বিরোধ নেই। ক্রমবিকাশ ঠিকই আছে। আর তা আছে বলেই ক্রমসংকোচন প্রক্রিয়াটি মেনে নিতে হয় যা

বিজ্ঞান বিশ্বসৃষ্টির ক্ষেত্রে আজকাল মানতে শুরু করেছে। দর্শন বলে 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াতে বা কমাতে পাবা যায় না।' তাহলে চৈতন্য বা জ্ঞানবাশি এলোই বা কোথা থেকে এবং তাব অভিব্যক্তি ঘটলই বা কীভাবে যদি চৈতন্য আগেই না থেকে থাকে। সুতরাং সৃষ্টিব আদিতে শুধু 'কসমিক এগ' (Cosmic Egg)-টাই ছিল না, তাব সঙ্গে চৈতন্যও ছিল। ক্রমসংকুচিত চৈতন্য নিজেকে অভিব্যক্ত করছে এখন এবং পূর্ণতম মানব রূপেব অভিব্যক্তিতে শেষ হবে এই ক্রমবিস্তার। বিজ্ঞান কসমিক-এগটা মানে চৈতন্য মানে না। উপনিষদ বলে ক্রমবিস্তার থাকলে ক্রমসংকোচনও অবশ্য থাকবে। ঘটবে ক্রমসংকোচন। "আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসংকুচিত হযেছিলেন। আবার তিনিই নিজেকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করছেন (বিবেকানন্দ)।" বিজ্ঞান এই ক্রমবিকশিত চৈতন্যসত্তাকে বা জ্ঞানবাশি নিহিত আছে যে সত্তায তাকে স্বীকার করে না। উপনিষদ এই সর্বব্যাপী চৈতন্য সত্তাব নাম দিযেছে 'ঈশ্বব'। প্রকৃতি বিজড়িত পরব্রহ্মই 'ঈশ্বব' বা 'চৈতন্যময কসমিক এগ'কেই আমরা 'ঈশ্বর' বলতে পাবি।

হিন্দুসভ্যতা নিযে আলোচনার পবিধি অতি বিশাল। হিন্দু সংস্কৃতির উপাদানও অজস্র। বেদ-উপনিষদ ছাড়া অন্য যেসব ধর্মগ্রন্থ হিন্দু সংস্কৃতি তথা হিন্দুসভ্যতার নিয়ন্ত্রক সেগুলি হল বামাযণ, মহাভাবত, সংহিতাসমূহ, স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এবং সিদ্ধান্ত-সমূহ। বামাযণ ও মহাভাবত এই দুই মহাকাব্য হিন্দুদেব সংস্কৃতিকে তথা হিন্দু সভ্যতাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত কবে। আব সংহিতাগুলিব মধ্যে 'মনুসংহিতা' হল সবাব সেরা এবং হিন্দুসমাজে বহুল প্রচলিত। হিন্দুদের সামাজিক, বাজনৈতিক ও ধর্মীয জীবন প্রায় ২৮০০ বছব ধবে মনুসংহিতাব বিধানগুলিব দ্বাবা নিযন্ত্রিত হযেছে। এমনকি এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমবা বহু সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলেছি মনুসংহিতার বিধানগুলি অনুসরণ কবে। স্মৃতিশাস্ত্রগুলি আজও নিয়ন্ত্রণ করছে হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি, আচাব-ব্যবহাব। আব সিদ্ধান্তগুলি নিযন্ত্রণ করছে পূজা-পার্বণ, উপাসনাব সময ও গ্রহ-নক্ষত্রেব বিচাব এবং ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি।

দুই মহাকাব্য বামাযণ ও মহাভারতেব রচনাকাল ও কাহিনীকাল এক নয। উভয় ঘটনাব মধ্যে বহু শতকেব ব্যবধান। মহাভারতেব কাহিনীকালেব একটা নির্দেশ পাওয়া যায় ববাহমিহিবের 'বৃহৎসংহিতা' থেকে। বৃহৎসংহিতা বলছে, যুধিষ্ঠির মহাভারতীয় মহাযুদ্ধেব পব বাজা হযেছিলেন ৬৫৩ কল্যাব্দে। এখন অর্থাৎ ২০০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল শুরু হযেছে ৫১০৩ কল্যাব্দ। সুতবাং যুধিষ্ঠির রাজা হযেছিলেন ৪৪৫০ বছর আগে। আর্যভটও এই তাবিখটা সমর্থন করেছেন। সুতরাং মহাভারতের কাহিনী হরপ্পীয় আমলের হলেও এটি লেখা হয়েছিল অনেকটা পরেই। বৈদিক সভ্যতার শেষ আমলে ব্যাসদেব এটি নতুন কবে রচনা করেন এবং লেখেন লিপিকর গণেশ বা বিনায়ক।

রামাযণ জাতীয় মহাকাব্য। রামাযণের রাম বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। এক সময় কিছু পণ্ডিত মনে কবতেন, রামায়ণ গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড'-এর অনুকরণে লেখা হয়েছে।

কিন্তু বহু গবেষণার পর পণ্ডিতেরা এখন উল্টো কথা বলছেন। তাঁরা মনে করছেন যে, ইলিয়াডের উপর রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। রামায়ণ থেকে হোমার ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী ধার নিয়ে থাকতেও পারেন।

রামায়ণ যে ইক্ষ্বাকু বংশের ইতিহাস সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। রামায়ণ যে হোমারের 'ইলিয়াড'-এর অনুকরণে রচিত হয়েছিল, এ মতবাদ একেবারেই শিশুসুলভ। রামায়ণের ওপর 'ইলিয়াড' কাব্যের প্রভাব সম্বন্ধে প্রথম মতবাদ প্রকাশ করেন গত শতাব্দীতে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ভেবার। কিন্তু তাঁর ওই মতবাদ একেবারে নস্যাৎ করে দেন সমসাময়িক ওঁবই সমকক্ষ আর একজন প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ইয়াকোবি। পরবর্তীকালে ভিনটারনিৎস তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'-এ ইয়াকোবিকেই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন—'সমগ্র রামায়ণ কাব্যটিতে গ্রীকপ্রভাবের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। গ্রীক বা যবনদেব সঙ্গে পরিচয়জ্ঞাপক কোনও উল্লেখই নেই। তাছাড়া, রাম ও সীতার সঙ্গে হেলেন ও ইউলিসিস সম্পর্কিত কাহিনী দুটির মধ্যে সাদৃশ্য খুবই পরোক্ষ।' বর্তমানকালেব একজন বড় পণ্ডিত ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীও খুব দৃঢতার সঙ্গেই বলেছেন—'বামাযণের ওপব কোন গ্রীকপ্রভাব নেই। মূল রামায়ণ গ্রীকগণেব সহিত পবিচিতির কোন প্রমাণই বহন কবে না।' তাছাড়া, বাল্মীকি বর্তমান উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কবি ছিলেন। এই অঞ্চলেব সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে গ্রীকদের কোন পরিচয় ঘটেনি। ওই শতাব্দীব প্রথম দিকে দিমিত্রাস ও শেষেব দিকে মিলিন্দ-এর আক্রমণের ফলে বিহাব ও উত্তরপ্রদেশেব কিছু কিছু অংশ গ্রীকদেব অধীনে যায়। বাল্মীকির বামাযণ তাব আগেই রচিত হযে গিযেছিল। সুতবাং বাল্মীকিব রামায়ণের ওপব গ্রীকপ্রভাবের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ঐতিহাসিক এবং নৃতত্ত্ববিদদের মতে মহাভাবত হরপ্পা সভ্যতার রমরমার কালেব কাহিনী বললেও, রামায়ণের কাহিনী অনেকটা প্রাচীনতব। তাঁরা বলছেন যে, ভাবতীয ট্রাডিশন অনুযায়ী রামকথা ভারতকথা অপেক্ষা পুরানো। সুতরাং ভাবতকথা যদি তাম্রাশ্মযুগের হয়, তাহলে রামকথা তার আগেকার যুগের বা নবোপলীয় যুগের। দু'টি মহাকাব্যই রচিত হয়েছিল কাহিনীকালের অনেক পরে। সেজন্য বচযিতাবা তাঁদের নিজেদের সমকালীন অবস্থা ও সভ্যতার দ্বারা এদুটিকে মণ্ডিত করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীতের কাহিনীকালের কিছু কিছু নিদর্শন এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, বনবাসে যাবার পূর্বে রামের বল্কল ও সীতার চীর পরিধান করা। রামের বল্কল ও সীতার চীর পরিধান করা তো কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার শর্তের মধ্যে ছিল না; তবে কেন রাজবংশের বধূ বসন পরিহার করে পর্ণপত্রদ্বারা নিজেব লজ্জা নিবারণ করলেন? এ দুটি যে নবোপলীয় যুগের বসন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ রামায়ণের পরবর্তী কাণ্ডসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সীতার রাজকীয় বসন ও অলঙ্কার এ দুইই তাঁর অঙ্গে ছিল। পরবর্তীকালের রামায়ণে অবশ্য কৌশল্যার অনুরোধে সীতার রাজকীয় বসন এবং অলঙ্কার ধারণ করে বনে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই অসংগতির একমাত্র কারণ হচ্ছে রামকথা এমন এক যুগের ব্যাপার ছিল, যে যুগে

বল্কল ও চীব পবিধান বীতি ছিল। ভাল কবে বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে যে বামাযণে বর্ণিত বণনীতি ও শৈল্পিক টেকনোলজি নবোপলীয যুগেব। অনুরূপভাবে মহাভাবতে আমবা দেখি যে বাজাবাজডাব ছেলেদেব বসবাসেব জন্য জতুমিশ্রিত এক পর্ণকুটিব তৈবি কবে দেওযা হযেছিল। এ সকল অসংগতি মূল কাহিনী থেকেই নেওযা হযেছিল।

বাল্মীকি বাবণ ও বাক্ষসগণেব চবিত্র অতি কদর্যভাবে অঙ্কিত কবেছেন। কিষ্কিন্ধ্যাব অনার্য অধিবাসীদেব তিনি মানুষ বলতেও কুণ্ঠাবোধ কবেছেন। তাদেব বানব বলে অভিহিত কবেছেন। এ সব থেকে অনার্যদেব প্রতি বাল্মীকিব বিদ্বেষই প্রকাশ পায। কিন্তু মহাভাবতে আমবা অনার্যদেব প্রতি এরূপ কোন বিদ্বেষ লক্ষ্য কবি না। মহাভাবত বচযিতা কৃষ্ণদ্বৈপাযন ব্যাস নিজেই তো এক অনার্য বমণীব অবৈধ সন্তান ছিলেন। মহাভাবতেব কাহিনীব মধ্যে আর্য ও অনার্যদেব মধ্যে যে একটা সংশ্লেষণেব চেষ্টাব চিত্র বযেছে, তা পবস্পব বিবাহেব আদান প্রদান থেকে বুঝতে পাবা যায। ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিষাদ কন্যাকে বিবাহ মহাভাবতেব একাধিক স্থানে আছে। মহাভাবতেব এক জাযগায উল্লিখিত হযেছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ 'পক্ষী জাতিব এক মেযেকে বিবাহ কবেছিলেন। এখানে 'পক্ষী' জাতি বলতে পক্ষী টোটেমবিশিষ্ট কোন অনার্য জাতিকে বুঝাচ্ছে। মহাভাবতীয যুগে বাজাবাজডাবাও অনার্যসমাজ থেকে স্ত্রী গ্রহণ কবতে সঙ্কুচিত হতেন না , শান্তনু তো অনার্য দাসকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ কবেছিলেন। বাজা দেবকও এক অনার্য শূদ্রকন্যাকে বিবাহ কবেছিলেন। নিষাদবাজ নলও বিদর্ভবাজাব মেযে দমযন্তীকে বিযে কবেছিলেন। ভীমও বাক্ষসী হিডিম্বাকে বিবাহ কবেছিলেন। মহাভাবতীয যুগে অনার্য সমাজেব বিবাহপ্রথাসমূহ যে আর্যসমাজে গৃহীত হযেছিল, তা বিভিন্ন শ্রেণীব বিবাহেব নামকবণ থেকে বুঝতে পাবা যায, যথা বাক্ষস বিবাহ, অসুব বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ ইত্যাদি। বস্তুত মহাভাবতীয যুগে তো আমবা গান্ধর্ব-বিবাহেব ছডাছডি দেখি, যথা, শান্তনুব সঙ্গে গঙ্গাব বিবাহ ('গঙ্গা' শব্দটা মুণ্ডা শব্দ), ভীমেব সঙ্গে হিডিম্বাব বিবাহ, অর্জুনেব সঙ্গে উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাব বিবাহ ও ইক্ষ্বাকুবংশীয (যে বংশে বাম জন্মগ্রহণ কবেছিলেন) পবীক্ষিতেব সঙ্গে সুশোভনাব বিবাহ।

বামাযণ যে মহাভাবতেব আগেই বচিত হযেছিল, তা আব এক দিক দিযেও প্রকাশ পায। বামাযণে মহাভাবতীয কোন ঘটনাব উল্লেখ নেই। মহাভাবতে কিন্তু বামাযণেব ঘটনাব উল্লেখ আছে। যথা, সভাপর্বে যুধিষ্ঠিব দ্বিতীযবাব দ্যূতক্রীডায প্রবৃত্ত হলে বৈশম্পাযন তাঁকে যে কথা বলেছিলেন তাব মধ্যে বামেব উল্লেখ আছে। বনপর্বে ভীম যখন দ্রৌপদীব জন্য স্বর্ণপদ্ম আনতে স্বর্গদ্বাবেব দিকে গিযেছিলেন, তখন হনুমানেব সঙ্গে দুজনেব বামাযণ সম্বন্ধে অনেক কথা হযেছিল। এছাড়া, বনপর্বে বামাযণকথা বিস্তাবিতভাবে বলা হয়েছে। দ্রোণপর্বেও অর্জুন যুধিষ্ঠিবকে বলেছিলেন— 'বালীবধেব জন্য বামচন্দ্রেব যেমন কলঙ্ক হযেছে দ্রোণবধেব জন্য আপনাব সেরূপ চিবস্থাযী কলঙ্ক হবে।'

ডঃ অতুল সুব 'হিন্দুসভ্যতাব নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য' বইটিতে লিখেছেন যে, বামাযণেব বামকে বিষ্ণুব অবতাব রূপে প্রতিপন্ন কবতে গিযে মহাকবি বাল্মীকি ব্যর্থ হযেছেন।

রাম ভারতের জাতীয় নায়ক (National Hero)। এই রাম আর্য না অনার্য তা সহজেই বোঝা যায় তাঁর গাত্রবর্ণ থেকে। তিনি 'নবদুর্বাদলশ্যাম' বর্ণের ছিলেন এবং সম্ভবত আর্য ও অনার্যের মিশ্রণে তাঁব জন্ম। আবার রামায়ণ নবোপলীয় যুগেব কাহিনী হলে বাম হবেন পুবোপুরি অনার্য। বৈদিক আমলের শেষে লেখা রামায়ণের রাম তাই আর্য নন, অনার্যও নন, ববং অনার্য ও আর্যের মিশ্রণ এবং 'নবদুর্বাদল শ্যাম'। যাইহোক, বাম সম্বন্ধে ডঃ সুব লিখেছেন ঃ

"রাম-রাবণের যুদ্ধটাকে আমরা আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের যুদ্ধের প্রতিধ্বনি হিসাবেও ধরে নিতে পারি। এর আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে শিব বড না বিষ্ণু বড় প্রমাণ কবা। শিব অনার্য দেবতা ; রাবণ তাঁর পরম ভক্ত। সুতবাং বাম বিষ্ণুর অবতার হিসাবে রাবণকে নিধন করার মানেই হচ্ছে—শিব তাঁর ভক্তকে বক্ষা কবতে পাবেন নি। তবে মনে হয, বাল্মীকিব বামকে বিষ্ণুব অবতাব হিসাবে প্রতিপন্ন করবাব উদ্দেশ্য ছিল না। এটা পববর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত ব্যাপাব। কেননা, বাল্মীকি তাঁব বামাযণে বিষ্ণুব অবতাব তো দূবেব কথা, একজন সাধারণ মানুষেব চেয়েও বামেব চরিত্রকে হীনতর কবেছেন। যেমন, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেব সূচনায় আমবা রামকে কামার্ত অবস্থায দেখি। সেখানে লক্ষ্মণেব মত অনুজ রামকে উপদেশ দিয়ে বলছেন—'পুরুষোত্তম, আপনি চিত্ত স্থিব কবে বিবহ কষ্ট সংবরণ করুন ; আপনার মত জিতেন্দ্রিয নির্মল চবিত্র পুরুষেব এরূপ চিত্তবিকাব শোভনীয নয।' লক্ষ্মণেবও ঊর্মিলাব বিবহে কাতব হবাব কথা। কিন্তু তাঁব কাতবতাব কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। সেদিক থেকে বাম অপেক্ষা লক্ষ্মণ বেশি জিতেন্দ্রিয। লক্ষ্মণ যে বাম অপেক্ষা বেশি জিতেন্দ্রিয ছিলেন, সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। রাবণ যখন সীতাকে অপহবণ কবে নিয়ে যাচ্ছিল, সীতা তখন তাঁব বসন ও অলঙ্কাবসমূহ ভূতলে নিক্ষেপ করেছিলেন। পরে লক্ষ্মণ যখন বাম কর্তৃক সেগুলি সনাক্ত কবতে আদিষ্ট হন, লক্ষ্মণ তখন বলেছিলেন— 'আমি তাঁব কেযূর ও কুণ্ডল চিনতে পাবছি না। কেবল নূপুর দ্বারা চিনতে পারছি, কেননা আমি সর্বদা তাঁব পাদবন্দনা কবতাম।' (নাহং জানামি কেয়ূরং নাহং জানামি কুণ্ডলে। নূপুরত্বভিজানামি নিত্যং পদাভিবন্দনাৎ।।)। এই উক্তি থেকেই লক্ষ্মণের চরিত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। তিনি মাতৃবৎ ভাবীর চবণ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। তথাকথিত বিষ্ণুব অবতার বাম অপেক্ষা লক্ষ্মণ যে অনেকগুণ জিতেন্দ্রিয ছিলেন, তা একদিকে বসন্ত উদ্গমে বামের সীতাব জন্য কামার্ত হয়ে ওঠা ও অপরদিকে লক্ষ্মণেব একবারও ঊর্মিলাব জন্য কাতব না হওযা বা মোটেই চিন্তা না করা থেকে প্রকাশ পায। বিষ্ণুর অবতাব হযেও সুগ্রীব বামকে লজ্জা দিয়ে বলেছিলেন—'আমি হীনজাতীয় বানর হয়েও মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হযেও শোক করছি না।' বিষ্ণুর অবতার হয়ে রামের হীনতা আবার প্রকাশ পায় যখন তিনি নিজ স্বার্থসাধন প্রকল্পে অক্ষত্রিয়ের ন্যায় বালীকে বাণবিদ্ধ করে নিহত করেছিলেন। সেখানেও বালী রামকে বলেছিল—'তুমি শঠ, প্রতারক, ক্ষুদ্রচেতা এবং তোমাব মন মিথ্যাশ্রিত। কি করে তোমার মত পাপাত্মা দশরথের ঔরসে

জন্মগ্রহণ করল?' (৫।৪৩)। আবার বিষ্ণুর অবতাররূপে সর্বজ্ঞ হয়েও তিনি উত্তরকাণ্ডে কি করে বললেন—'যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্মষা। করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্।।' 'জানকীর চবিত্র যদি বিশুদ্ধ হয়, এবং তিনি যদি পাপবিহীন হন, তবে তিনি মহামুনিব (বাল্মীকিব) অনুমতি নিয়ে নিজ শুদ্ধিব পরিচয় দিন।' মোটকথা, যদিও বাল্মীকি প্রচলিত আখ্যানসমূহেব সংযোজনে একখানা মহাকাব্য বচনা কবে বামকে বিষ্ণুর অবতাবরূপে প্রতিপন্ন কববাব চেষ্টা কবেছিলেন, তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তাব প্রমাণ তাঁব (বর্তমান প্রচলিত) কাব্যের মধ্যেই আছে। তাছাড়া, তাঁর কাব্যের মধ্যে বহু পরস্পববিবোধী ঘটনা বা উক্তিব সমাবেশ আছে। তিনি বালীকে নিহত করবাব কারণ দিয়েছিলেন যে সে (বালী) সুগ্রীবেব পত্নীকে হরণ করেছিল। অথচ পরমুহূর্তেই তিনি বালীপত্নী তাবাকে সুগ্রীবেব অঙ্কশাযিনী কবেছিলেন। বালীব মৃত্যুর পব তারার যে বিলাপ (যা কালিদাসেব কুমাবসম্ভবের 'রতিবিলাপ'-এর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল) তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। অথচ সেই বীরভার্যা তারাকে তিনি সুগ্রীবেব আসক্তা কবে তুলেছেন। এছাড়া, বামাযণেব মধ্যে এমন সব অবাস্তব ঘটনাব সমাবেশ আছে, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, যেমন বাবণেব দশমুণ্ড, হনুমানেব বিশল্যকবণী চিনতে না পেবে সমস্ত পাহাড়টাকেই মাথায করে নিযে আসা, কর্দমপুত্র রাজা ইলাব একমাস পুরুষ ও একমাস সুন্দবী নাবী হওযা, ঋক্ষরজার পবমাসুন্দবী নাবীতে পবিণত হওযা ইত্যাদি। এসব অবাস্তব ঘটনাই বামাযণেব ঐতিহাসিক মূল্যকে নষ্ট কবে দিয়েছে। সুগ্রীব প্রভৃতিকে বানর বলাও বাল্মীকিব কল্পনাপ্রসূত, কেননা তাদেব পিতা সুষেণই ছিল সে যুগের একজন সুদক্ষ শল্যচিকিৎসক।"

হিন্দু সংস্কৃতির এই দুই মহীরুহ রামায়ণ ও মহাভাবত নিয়ে হাজাবো বই লেখা হয়েছে— হযেছে বহুল আলোচনা। মহাভারতে অনেক অলৌকিক ঘটনা থাকলেও তার অনেকগুলিই প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ দেওয়া যায়। ঋষি বঙ্কিম তাঁব 'কৃষ্ণচবিত্র' গ্রন্থে ওই সব প্রক্ষিপ্ত নির্ণয়েব সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিব কথা বলেছেন। এইভাবে প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে মহাভারতেব ঘটনাবলীব একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন ঐতিহাসিক ভিত্তি রামায়ণে খুব কম আছে। রাম-রাবণেব যুদ্ধের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোন অলীক ঘটনা নয়। মহাভাবতের ঘটনাবলীব বাস্তবতা আছে। অবশ্য দুটো মহাকাব্যের মধ্যেই প্রক্ষিপ্ত অংশ খুব বেশি। মহাভারতের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকেই জানতে পারা যায় যে, গোড়াতে মহাভারতে মাত্র ৮,৮০০ শ্লোক ছিল। তারপর শ্লোক সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আশি হাজাবে দাঁড়িয়েছে ও হরিবংশ ধরলে এক লক্ষ দশ হাজার। কিন্তু মহাভারতের মধ্যে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকলেও ঐতিহাসিক সত্য সহজেই বের কবা যায়।

মহাভারত কিভাবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, তা দ্রৌপদীর বিবাহ থেকেই বুঝতে পারা যায়। দ্রৌপদীর বিবাহ-কাহিনী থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, মহাভারতের কাহিনীকথার যুগে বিবাহ সম্পাদন করবার জন্য যজ্ঞনিষ্পাদন, মন্ত্র উচ্চারণ, সপ্তপদীগমন ইত্যাদি

বিধিসম্মত কোন পদ্ধতির প্রয়োজন হত না। ওই বিবাহ-কাহিনী অনুযায়ী পাণ্ডব ভ্রাতারা দ্রৌপদীকে জয় করে এনে কিছুকাল তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেছিলেন। পরে তাঁরা আবার দ্রুপদ রাজার গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন যজ্ঞ-সম্পাদন ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য। মনে হয়, পরবর্তীকালের রীতিপ্রথার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যই মহাভারতের মধ্যে এই অংশটি উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। এ রকম বহু প্রক্ষিপ্ত মহাভারতে রয়েছে। তবু মহাভারত রচিত হয়েছে এক ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এর সময়কাল ৪৫০০ বছর আগের হলেও এর রচনাকাল হাজার তিনেক বছর। এর কাহিনীর নায়ক আরেক জাতীয় মহানায়ক (National Hero) শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হিসাবে চিত্রিত। আর অবতারবাদ হরপ্পীয় সভ্যতা থেকে হিন্দুসভ্যতায় এসেছে বলেই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ শ্যামল। এই দুই জাতীয় মহানায়ক রাম ও কৃষ্ণ ভারতের তথা হিন্দুজনগণের অধিকাংশ সংস্কৃতির ভিত্তি।

ঋগ্বেদের সময়েই আর্য ও অনার্য জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। সেই থেকে ওই মিশ্রজাতি প্রাগার্য সমাজের শ্রেণীবিভাগ, গোত্র বিভাগ ইত্যাদি অনুসবণ কবতে শুরু করেছিল। এটা একেবারে সত্যি কথা যে, সমাজ কোন সময় কোন এক বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। বিভিন্ন যুগে তার বিবর্তন ঘটেছিল। এই বিবর্তনমূলক সামাজিক সচলতা নানা কারণে ঘটত। মনে হয়, আর্যরা যখন প্রথম এদেশে এসেছিল, তখন তাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তবে প্রাগার্যদেব মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ ছিল, তার প্রমাণ আমরা হবপ্পা, মহেঞ্জোদাবো, কালিবঙ্গান প্রভৃতি স্থান থেকে পাই। সমাজকে শাসন করত যারা, তারা বাস করত পরিখাবেষ্টিত নগবেব মধ্যে এক উচ্চ পাটাতনের ওপর নির্মিত দুর্গ অঞ্চলে। আর নিচের শহবে বাস কবত সমাজেব অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা। আবার ঘরবাড়ি তৈরির বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে নিচের শহরে যারা বাস করত তাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল। এসব শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত ছিল নানা বৃত্তিধারী শ্রেণী ও শ্রমিক সম্প্রদায়। বৈদিক যুগে এই শ্রেণীবিভাগ কিছুটা পবিবর্তিতভাবে ফিরে আসে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০-তম সূক্তেব ১২শ-তম ঋকে বলা হযেছে যে, প্রজাপতির 'মুখ ব্রাহ্মণ হল, দুবাহু রাজন্য হল, উরু বৈশ্য হল ও পা শূদ্র হল'। এই প্রসিদ্ধ সূক্তকে 'পুরুষসূক্ত' বলা হয়, এবং এটা অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারি বর্ণের উল্লেখ নেই। মোট কথা, ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের মধ্যে কোন বর্ণবিভাগ ছিল না। ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে 'পুরুষসূক্ত'-এর ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। তবে এ থেকে একটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে একই পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বিভিন্ন বর্ণ উৎপন্ন হয়েছিল। মোট কথা, আর্যদের মধ্যে গোড়ার দিকে কোন জাতিভেদ-প্রথা ছিল না, এবং থাকলেও এক জাতি থেকে অপর জাতিতে উন্নীত হতে পারত। মনু সংহিতার পর থেকে জন্মসূত্রে জাতি নির্ণয়ের পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা হয়। এর আগে জাতিভেদ ছিল কর্মভেদ অনুসারী।

ঋগ্বেদে তো বটেই, গীতাতেও এর সমর্থন মেলে। 'চতুর্ব্বর্ণ্যংময়াসৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'। যাইহোক, জাতিভেদ আজও হিন্দুসংস্কৃতি তথা হিন্দুসভ্যতার এক বিশেষ উপাদান।

বর্তমান 'জাতি' বলতে আমরা দুটো জিনিস বুঝি। প্রথম, জাতক যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবার যে জাতিভুক্ত, জাতকও সেই জাতিভুক্ত হয়। দ্বিতীয়, জাতককে নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। তার মানে বংশানুক্রমে জাতকের জাতির আর কোন পরিবর্তন ঘটে না। চতুর্বর্ণ প্রথা যখন প্রথম অবলম্বিত হয়, তখন এটা ছিল না। বর্ণ সম্বন্ধে তখন একটা সামাজিক সচলতা (Social Mobility) ছিল। এক বর্ণের লোক অপর বর্ণে উন্নীত হতে পারত।

বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। এই নিয়ে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সে কাহিনী থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পাবা যায়। তাছাড়া, এ কাহিনী থেকে জানতে পাবা যায় যে, ক্ষত্রিয়দের পুরোহিত ক্ষত্রিয়ই হতেন। যেমন, বর্তমানে ডোমদেব পুবোহিত ডোমই হয়। আমাদের এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র কাহিনী নর্ডিক আর্যগণের সহিত আলপীয় আর্যদের বিরোধ ইঙ্গিত করে। মনে হয কুরু-পাঞ্চাল দেশে যখন এই দুই নরগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ ঘটেছিল, তখনই বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দেওয়া হয়েছিল, এবং বিশ্বামিত্র রচিত মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদেব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটা অসম্ভব নয়, কেননা পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ঋগ্বেদেব মন্ত্রসমূহের বিভিন্ন কাল-স্তব আছে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

স্মৃতিকাবদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহ ছিল ধর্মবিহিত কর্তব্যকর্ম বা সংস্কাব। সকল ব্যক্তিব পক্ষেই এই কর্তব্যপালন বাধ্যতামূলক ছিল, বিশেষ করে পুত্র উৎপাদন করে নরক থেকে পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের জন্য। যদিও মনুর মানবধর্মশাস্ত্রে আট রকম বিবাহের কথা বলা হয়েছে, এবং আপস্তম্ব ও বশিষ্ঠ ছয রকম বিবাহের অনুমোদন করেছেন, তথাপি নীতির কারণে মাত্র সেই বিবাহকেই শাস্ত্রসম্মত বিবাহ বলে গণ্য করা হত, যে বিবাহে মন্ত্র উচ্চারিত হত, হোম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত ও সপ্তপদীগমন অবলম্বিত হত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই বিবাহই ছিল প্রশস্ত বিবাহ। তবে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে আসুর-বিবাহের প্রচলন ছিল। আসুর-বিবাহে মাল্যদান করে কন্যার পাণিগ্রহণ করা হত। সেজন্যই মানবগৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে যে, বিবাহ মাত্র দুই প্রকার—ব্রাহ্ম ও আসুর। যদিও মহাভারতীয় যুগে গান্ধর্ব ও রাক্ষস-বিবাহ আদর্শ বিবাহ বলে গণ্য হত, স্মৃতির যুগে এই উভয়প্রকার বিবাহই অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রসমূহে বলা হয়েছে যে, এরূপ বিবাহ করলে মানুষকে মহাপাপে লিপ্ত হতে হয়।

মনুসংহিতার বহু বিধান আমরা আজও মেনে চলি। এই বিধানগুলিই হিন্দু সংস্কৃতির বহুলাংশ জুড়ে অবস্থান করছে। মনুর বেশ কিছু বিধানের বাইরে যেতে আজও হিন্দুরা ভয় পান। এই বিধানগুলির অনেকগুলিই এখন সংস্কার হয়ে হিন্দু সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। এছাড়া, ধর্মশাস্ত্রসমূহে শুধু বিবাহ সম্বন্ধেই বিধান দেওয়া হয়নি। ধর্মানুষ্ঠান,

খাদ্যাখাদ্য, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, উত্তবাধিকার প্রভৃতি হাজার রকম বিষয় সম্পর্কে অনুশাসন দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এসব অনুশাসন না মানলে পাপ হত। মনু খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে সকল বিধান দিয়েছিলেন, সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যথা ঃ অভক্ষ্যের তালিকায় আছে সিদ্ধ চাউল, লশুন (রসুন), পলাণ্ডু (পিঁয়াজ), গঞ্জন, কবক (ব্যাঙের চাতা), শেলু বা চালতা, প্রসবের পব দশদিন অতিক্রান্ত হযনি সেরূপ গাভীব দুধ, মহিষ ব্যতীত যাবতীয় পশুব দুধ, পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষী, টিট্টিভ, চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, রজ্জুবাল, ডাক ও শূকসারিকা, টিয়া, শালিক, বক, বলাকা, শূকব প্রভৃতিব মাংস। মনুসংহিতাতে বেশ কিছু মৎস্যভোজনও পরিত্যাগ কবতে বলা হয়েছে—'মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্ম্যান্মৎস্যান বিবর্জয়েৎ' (৫।১৫)। তবে বোয়াল, রুই, বাজীব ও সিংগি ও আঁইশবিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য ভক্ষণ করা যেতে পাবে, যদি তা প্রথমে দেবপিতৃ উদ্দেশে উৎসর্গ কবে তবে ভক্ষণ কবা হয। (৫।৫-১৬)। মনুব যুগে গোমাংস ভক্ষণ পবিত্যক্ত হয়েছিল। মহাভাবতেব শিবি উপাখ্যান থেকে জানতে পারা যায় যে, এককালে নরমাংসও ভক্ষিত হত। তা-ও মনুব যুগে পবিত্যক্ত হযেছিল। তবে মনুব যুগে উচ্চকোটি ও নিম্নকোটির লোকদেব মধ্যে, এবং উত্তব ভাবত ও বাঙলাব ব্রাহ্মণদেব মধ্যে, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য ছিল।

হিন্দু সভ্যতা Dynamic। তাই এব সংস্কৃতিব নানা বিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে। হিন্দু সংস্কৃতিতে এক সময় বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে প্রবলভাবে। তাবপব একসময বৌদ্ধ সংস্কৃতিও হিন্দু-সংস্কৃতিতে রূপান্তবিত হযে গেছে। বুদ্ধদেব হয়ে গেছেন বিষ্ণুব নবম অবতার। বুদ্ধ কিন্তু ছিলেন নিরীশ্ববাদী। হিন্দুরা তাঁকে অবতাব বানিয়ে দান করেছে ঈশ্বরত্ব, যেটা তিনি একদম পছন্দ কবতেন না। তিনি ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোব বিবোধী। তিনি ছিলেন সঙ্ঘপন্থী, সাধাবণ মানুযের মঙ্গলকামী, প্রতিষ্ঠান বিরোধী, কোনও Dogma-য় অবিশ্বাসী, সদাপ্রগতিশীল। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে প্রায় পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নেয় বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে।

হিন্দুর বিবাহ ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তার মধ্যেই নিহিত ছিল পরিবারের স্থায়িত্ব এবং এই পরিবারের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করত সমাজের সংহতি। হিন্দুব বিবাহ যে সবর্ণেই হত তা নয়। অসবর্ণেও হত। সবর্ণে বিবাহকে 'অনুলোম' বিবাহ বলা হত, আব অসবর্ণ বিবাহকে বলা হত 'প্রতিলোম' বিবাহ। এই উভয় প্রকার বিবাহের যে ফসল, তার সমাজে একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল, যদিও আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে সে স্থানগুলি অবিসংবাদিত নয়। তা হলেও প্রাচীন সমাজ সে ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল, কেননা তার পিছনে ছিল ধর্মশাস্ত্রের চাপ। না মানলে, পাপপুণ্যের ভয় দেখানো হত। আগেকার দিনের মানুষের পাপপুণ্যের ভয়টা ছিল অত্যন্ত বেশি। যেটার শাস্ত্রীয় অনুমোদন নেই সেটাই হলো পাপ এবং এই পাপের ভয়েই সমাজ সংহত অবস্থায় থাকত। পাপের ভয়কে অগ্রাহ্য করে মানুষ যখন 'অসামাজিক' কোন কাজ করত, তখন তাকে একঘরে করা হত। তখনকার দিনের মানুষ জানত 'একঘরে' হওয়াটা কি ভীষণ বিপদের ব্যাপার!

আবারও বলি, হিন্দু সমাজে এখন বহুজাতি থাকলেও গোড়ার দিকে মাত্র চারটি জাতিই ছিল। জাতি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ভাষ্যে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন ঃ

"আর্যরা যখন এদেশে আসে, তখন একাধিক নরগোষ্ঠীর (Races) লোক এখানে বাস করত। এটা মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল থেকে প্রমাণিত হয়। অন্তত তিনটি প্রধান নরগোষ্ঠী ছিল—(১) আলপীয় নরগোষ্ঠী, (২) দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী ও (৩) দেশজ প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতি। আর্যভাষাভাষী আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা ছিল হ্রস্ব-কপালবিশিষ্ট, মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল ও গায়ের রঙ ফরসা। আর বৈদিক আর্যরা ছিল দীর্ঘশিরস্ক নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক। এরা ছিল বলিষ্ঠ, গৌববর্ণ ও দীর্ঘকায়, মাথা বেশি লম্বা, নাক খুব সরু ও লম্বা এবং দৈহিক ওজন বেশ ভারী। ভারতের জনসমাজের মধ্যে নর্ডিক উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। আব পূর্বদিকে বাঙলাদেশ পর্যন্ত আলপীয় উপাদানই বেশি ;এছাড়া, পশ্চিম ভারতেও এদের দেখতে পাওয়া যায। বলা বাহুল্য যে, আলপীয়রা নর্ডিকদেব আগেই ভারতে এসেছিল। প্রাচীন সাহিত্যে এদেব 'অসুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের আকৃতি ছিল মধ্যমাকার। এদেব মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও রঙ ময়লা। এবা বহির্বাণিজ্য উপলক্ষে দেশবিদেশে ভ্রমণ করত। বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পণি'রা এই গোষ্ঠীর লোক ছিল। আদি মিশরীয়দের সঙ্গে এদের বেশি মিল আছে। আদিতান্নালুর অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাধিপাত্রে ও দক্ষিণ ভারতের সমাধিস্তূপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে, তাদের অধিকাংশই ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর লোকের।

দেশজ প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতির লোকেরা ছিল খর্বকায়। তাদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কালো ও মাথার চুল ঢেউ-খলানো। এরা বর্তমান আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ। প্রাচীন সাহিত্যে এদের 'নিষাদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রয়েছে মংগোলয়েড বা 'কিরাত' জাতি।

বর্ণ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'রঙ'। আমার মনে হয় যে, আর্যরা নিজেদেরও এই তিন বিভিন্ন বর্ণ-বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীকে অবলম্বন করেই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছিল। তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছিল এবং যথাক্রমে আলপীয়দের নাম দিয়েছিল ক্ষত্রিয়, দ্রাবিড়-ভাষাভাষী 'পণি'দের বৈশ্য ও দেশজ প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের শূদ্র। এর সমর্থন আমরা পরবর্তীকালের জনবিন্যাস থেকেও পাই। উত্তর ভারতের নর্ডিক নরগোষ্ঠী অধ্যুষিত বৈদিক ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হত। এটা বাঙলার আদিশূর সম্পর্কিত কিংবদন্তি থেকে প্রমাণিত হয়।

আর পূর্ব ভারতের আলপীয় নরগোষ্ঠীরাই যে আদি ক্ষত্রিয় ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাণিনির 'কাশিকা' টীকার এক উক্তি থেকে পাই। পাণিনি বলেছেন যে, ভরত-বংশীয়রা পূর্ব ভারতের লোক ছিল। সকলেরই জানা আছে যে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে

ভরত-বংশীয়রাই শ্রেষ্ঠ ছিল। যদিও আর্য ব্রাহ্মণরা কিছুদিন যাবৎ তাদের নিজেদের নাম অনুযায়ী এদেশের নাম আর্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত ইত্যাদি রাখবার চেষ্টা করেছিল, তা হলেও শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় ভরত-বংশীয়দের নাম অনুযায়ীই এদেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হয়েছিল। মনে হয়, এই নিয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে একটা বিরোধ ঘটেছিল, যার আভাস আমরা বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ উপাখ্যান থেকে পাই। পরশুরাম উপাখ্যানও এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে।

আর দ্রাবিড়-ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় পণিরাই ('পণি' শব্দ থেকে 'পণ', 'পণ্য', 'বণিক' প্রভৃতি শব্দ উদ্ভূত হয়েছে) ছিল বৈশ্য, যাদের প্রধান বৃত্তি ছিল বাণিজ্য। আর দেশজ অস্ট্রালয়েডরা হযেছিল শূদ্র, যাদের বৃত্তি ছিল অপর তিন বর্ণের সেবা করা। তার মানে, তারাই ছিল সে যুগের 'শ্রমিক শ্রেণী'।"

আর্য-অনার্য সংশ্লেষণ সম্পূর্ণ হযেছিল পৌরাণিককালে। পৌরাণিক যুগ চলেছিল গুপ্ত বাজাদের আমল অবধি। গুপ্তযুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা বচনা কবতে থাকেন পুরাণসমূহ। অনেকগুলি পুরাণ লেখা হয় পৌবাণিককালে। তাদের মধ্যে আঠারোটিকে মহাপুরাণ বলা হয়। বাকিগুলি উপপুরাণ। এই ১৮টি মহাপুরাণ হল ঃ

(১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) শিব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদ পুবাণ, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বরাহ, (১৩) স্কন্দ; (১৪) বামন, (১৫) কূর্ম, (১৬) মৎস্য, (১৭) গরুড় এবং (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

এই পুবাণগুলিব সংস্কৃতিও হিন্দুসভ্যতায় প্রভাব ফেলেছে। ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকাব বলেছেন যে, পুরাণসমূহের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ডঃ ভিনসেন্ট স্মিথ দেখিযেছেন যে, মৎস্যপুরাণে অন্ধ্রদেশের রাজাদের বংশ তালিকা এবং তাঁদের রাজত্বকাল সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে। এফ. ই. পর্জিটার বলেছেন যে, বেদ অপেক্ষা পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। এল. ভি বার্নেটও পর্জিটারের এই মত সমর্থন করেছেন। শ্রীমতী রোমিলা থাপারও বলেছেন, ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস হিসাবে পুরাণগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

তবে ইতিহাস রচনায় প্রাচীন ভারতীয়দের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। কবি কল্হনের 'রাজতরঙ্গিণী' লেখা হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। এর আগে ঠিকঠাক ইতিহাসের বই লেখেন নি ভারতীয়রা। রাজতরঙ্গিণীতে কল্হন বিবৃত করেছেন প্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি কাশ্মীরের ইতিহাস। তার আগে কেউই সঠিকভাবে লেখে নি ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস। প্রাচীন ভারতে ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকাসমূহ যখন সূতগণ কর্তৃক কীর্তিত হত, তখন শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা তার মধ্যে এতো অতিরঞ্জিত, অলৌকিক ও বিস্তর ঘটনার সমাবেশ ঘটাতেন যে, আখ্যায়িকাসমূহের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকতো। এই সূতদের কীর্তনে মহাভারত হয়ে গেছে বিশাল এবং অনৈতিহাসিক কাহিনী মাত্র, যদিও মহাভারতের ঐতিহাসিক

ভিত্তি বর্তমান। রামায়ণের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। পুরাণগুলিও ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা বললেও তার বেশির ভাগই অতিরঞ্জিত এবং অবাস্তব।

তন্ত্র ধর্মের সংস্কৃতিও হিন্দু সভ্যতাকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করেছে। লিঙ্গপূজা নবোপলীয় যুগ থেকেই হয়ে আসছে। লিঙ্গ হচ্ছে শিব বা পুরুষ, যিনি নিষ্ক্রিয় (Passive) এবং শক্তি হচ্ছে ভূমিরূপী পৃথিবী, যিনি ক্রিয়াশীলা (Active)। ক্রিয়াশীল মানেই তিনি শক্তির আধার। অর্থাৎ আদিম নারীরা লিঙ্গরূপ যষ্টি বা লাঙ্গল দিয়ে ভূমিকর্ষণ কবে যখন ফসল উৎপন্ন করতে শিখলো, তারপর শুরু হল নিয়মিত চাষবাস। এরই পর এল শিব-শক্তির কল্পনা। এদের উপাসনা থেকেই উদ্ভূত হল তন্ত্রধর্ম এবং তন্ত্রসাধনা। হরপ্পা সভ্যতায় দেবীপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। আর এই দেবীপূজা হরপ্পা সভ্যতার মুখ্য অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল প্রাচীন বাঙালিরা তাদের তামা এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যেব সঙ্গে। তাবা এই মাতৃপূজা নিয়ে গিযেছিল সুমের সভ্যতাব দেশেও। সিনাইয়ের হাটে তারা তামা বিক্রি কবতে যেত। তাব সঙ্গে তাবা দেবীপূজাব সংস্কৃতি নিয়ে যায় মেসোপটেমিযায। এই তন্ত্র সাধনাব পদ্ধতিসমূহ প্রথমে প্রাক-বৈদিক জনগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। পবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ হিন্দুরা এই ধর্ম গ্রহণ করে। বজ্রযান ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম। মাতৃপূজা ও তন্ত্রধর্মেব পীঠস্থান ছিল গৌড়বঙ্গ। প্রাগার্য বাঙালিবাই মাতৃপূজা হবপ্পা সভ্যতাব বিভিন্ন অঞ্চলে নিযে যায়। পববর্তীকালে যখন সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটে তখন প্রাগার্য দেবীসমূহ হিন্দুধর্মে চলে আসে। সুতরাং হিন্দু সভ্যতায় দেবীপূজা হল বাঙালিদেব অবদান।

পূর্বেই বলা হযেছে, বাংলার বিখ্যাত বন্দব তাম্রলিপ্তই তামা সরববাহ কবতো লোথালে, সিনাইয়ের হাটে, ক্রীট দ্বীপে। তাম্রলিপ্ত এক সময় ছিল প্রাগার্য সভ্যতার ধারক ও বাহক। এর অনেক সংস্কৃতিই হিন্দু সভ্যতায় জায়গা কবে নিযেছে। বহুকাল ধবে বৈদিক সংস্কৃতিব প্রভাব ঠেকিয়ে রেখেছিল তাম্রলিপ্ত তথা বঙ্গদেশ। পরে আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ঘটলে তাম্রলিপ্ত তথা বঙ্গদেশ হিন্দু সভ্যতাকে সামযিকভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে বহু দিন অবধি বাংলা তথাকথিত হিন্দুধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। আবার জৈন এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতি হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে একটা মিশ্রণ তৈরি করে। অবশেষে প্রাগার্য সংস্কৃতির উপাদানে গড়া হিন্দু সংস্কৃতিকে তার জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিশ্রণসহ বঙ্গদেশ গ্রহণ কবে। "The Ancient History of Near East" গ্রন্থে অধ্যাপক হল (P. R. Hall) অনুমান কবেছেন যে, ভারতবর্ষই দ্রাবিড়জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে প্রাচীন বাবিরুষবাসী সুমেরীয় জাতির যে নিকট সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দ্রাবিড়জাতির অস্তিত্ব এবং প্রসারের পরিচিতির প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১ম খণ্ড) গ্রন্থের মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন—"আর্য্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপাসগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধহয় ঋগ্বেদের

দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক 'পক্ষী' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রাবিড়জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বঙ্গবাসীগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাঁহারা দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন।"

ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে এই প্রাচীন দ্রাবিড়জাতি হয়তো উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে না এসে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে এসেছিল। বাঙালি ও গুজরাটীদের মত দেহ গঠন ও গোল করোটিবিশিষ্ট জাতি আমরা গুজরাট, কানাড়া, কুর্গ, মহীশূর, উড়িষ্যা ও বাংলার সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্য করি। সুতরাং এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই প্রাচীন দ্রাবিড় জাতিই কলিঙ্গের আদিম অধিবাসী।

উৎকল এক দেশের নাম, যে নাম মহাভারতের যুগে প্রচলিত না থাকলেও, উড্র অথবা ওড্র নামটি অপ্রাচীন নয়। কপিশা (বর্তমান কংসাবতী অথবা সুবর্ণরেখা নদী) থেকে গোদাবরী অবধি বিস্তৃত ভূভাগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে কলিঙ্গ বলে বর্ণনা করা হতো। কিন্তু তখন বোধহয় এই শব্দটি জাতিবাচক ছিল না। কলিঙ্গের মধ্যে যেমন পরবর্তী যুগের উৎকল জাতিও ছিল, তেমনই ছিল অংশত দক্ষিণী অন্ধ্রেরাও, যদিও অন্ধ্রদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বহু প্রাচীন।

সুতরাং যেহেতু দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে (রাঢ় দেশের) একটি বৃহৎ অংশ এমনকি তাম্রলিপ্তিও (তমলুক) অনেক সময়ে উড়িষ্যা বা উৎকলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই হিসেবে আমরা কলিঙ্গ এই ব্যাপকতর সংজ্ঞাটির মধ্যে দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণদেশীয়, ওড়িয়া ও বাঙ্গালী সকলেরই গন্ধ পাই।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমতে (প্রাচীন বাংলার গৌরব) বঙ্গদেশে দ্রাবিড জাতির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক নগর) তাদের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বন্দর ছিল। এই দ্রাবিড়রাই দামল বা তামল জাতি, যাব থেকে প্রাচীন সংস্কৃতে এই স্থানের নাম পাওয়া যায় দামলিপ্তি এবং পরে তাম্রলিপ্ত। পালি ভাষায় তাম্রলিপ্তির রূপ হয় তামলিপটি।

তামিল শব্দ এই তাম্রলিপ্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলেই মনে হয়। গুপ্ত যুগের আগে তাম্রলিপ্ত আর্যাধিকারে আসে নি। পুন্ড্র, রাঢ় এবং কলিঙ্গদের দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাব তাম্রলিপ্তেও ছিল এবং সেই পৌরাণিক যুগ থেকেই তাম্রলিপ্ত ছিল উত্তরভারতে প্রাক-আর্য সভ্যতার এক ঘাঁটি। ঐতিহাসিক যুগের সূচনার ঠিক আগেই এখানে শৈবধর্ম প্রথমে প্রভাব বিস্তার করলেও, মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে দামলজাতি দক্ষিণ ভারতে বিতাড়িত হয়। এর পরে দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল। লঙ্কা পর্যন্ত সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিকই পণ্ডিত কনকসভাই পিল্লের এই যুক্তি সমর্থন করেছেন যে তামিলেরা তাম্রলিপ্ত থেকে দক্ষিণ ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন

করেছিল, এবং দাড়ী, নাড়ী প্রভৃতি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করতো। এই মর্মে এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন—'যেমন বিজয়সিংহ হইতে সিংহলের নামকরণ হইয়াছে বুঝিতে পারি, তেমনই বঙ্গের এক সময়ের রাজধানী তাম্রলিপ্তের নামানুসারে তামিল দেশের নামকরণ হইয়াছিল বুঝা যায়।'

রাঢ়দেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তের ইতিহাস শুধু যে প্রাচীন, তাই-ই নয়। তাম্রলিপ্তবাসীদের জীবন বিশেষভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ এবং উন্নত ছিল। তারা ছিল বাহুবলসম্পন্ন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সিংহল, সুবর্ণভূমি, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের দ্বারা সংযুক্ত, সুসভ্য এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। এটা দ্রাবিড় জাতির গৌরবময় দিক। এই গৌরব হরপ্পা সভ্যতার অনার্য গরিমার কথাই বলে।

চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ পাঠ করলে মনে হয় যে তাম্রলিপ্ত নগরীতে বহু ধনবানের বাস ছিল। সামরিক জাহাজ এবং বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। মোট কথা, তাম্রলিপ্ত ছিল প্রগতিশীল, সমৃদ্ধিশালী এবং জনবহুল। বৌদ্ধ যুগে তাম্রলিপ্তের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। গ্রীকেরা এই তাম্রলিপ্তসহ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা-কেন্দ্রিক ভূভাগকে গঙ্গারিডি আখ্যা দিয়েছিলেন।

সুপ্রাচীন কাল থেকে তাম্রলিপ্ত প্রাচ্য ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, যেমন, ব্যবসায় ও বাণিজ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, রাজধানী, বন্দর। এই তাম্রলিপ্ত একটি পুরাতন এবং উচ্চস্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে পুষ্ট করে, ইতিহাসে তার স্থান চিরস্থায়ী করে নিয়েছিল। একটি উন্নত প্রাগার্য সভ্যতার স্রোতকে দৃঢ়ভাবে বহন করে তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে এবং সুপরিকল্পিতভাবে দক্ষিণের দিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিল, এই প্রাচীন জনপদ। নিচের উদ্ধৃতিটি তাম্রলিপ্তের গৌরবময় অতীতের উপর বিশেষভাবে আলোপাত করে ঃ

"প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হওয়ার বহুকাল আগে তাম্রলিপ্তের সভ্যতাই দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। তাম্রলিপ্তের অধিবাসীরাই দাক্ষিণাত্যে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং সেখান থেকে গিয়ে তারা খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে সুদূর বাবিরুষ ও অসুরে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল। অধ্যাপক হল অনুমান করেন, ভুমধ্য সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। তারা তখন ধাতব অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাব প্রকাশ করতে সমর্থ ছিল। নানাবিধ শিল্পও তাদের আয়ত্ত হয়েছিল। (Hall's Ancient History of Near East P.171–174)"

কয়েকজন বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের অভিমত অনুযায়ী তাম্রলিপ্তের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে মিশরের গভীর সম্পর্ক ছিল। যেমন, (১) গাঙ্গেয় নৌশিল্পের সঙ্গে মিশরের নৌশিল্পের খুবই সাদৃশ্য আছে। (২) বাংলার দুর্গোৎসব এবং মহিষাসুরবধের কাহিনীর মধ্যেও মিশরের সংস্রব রয়েছে। মহিষাসুর বা শ্রেষ্ঠ অসুর ছিলেন প্রাক-আর্য এক শক্তিশালী নরপতি যিনি বাঙলাকেন্দ্রিক

পূর্ব ভারতকে বৈদিক ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। মহিষ অর্থে শ্রেষ্ঠ এবং মহিষের রূপ থেকে মহিষাসুর পুনরায় আবির্ভূত হতেন। মিশরে প্রাপ্ত একটি জনপ্রিয় চিত্রের ব্যাখ্যায় মিশরতত্ত্ব সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বলেছে এক রাজার কথা যে কখনো মহিষের রূপ ধারণ করে শত্রুর চোখে ধূলি দিয়ে জয়লাভ করেছে।

কিন্তু তাম্রলিপ্তে বিদেশীয় রক্তের উপস্থিতি নিয়ে বিপরীত অন্য একটি বিশেষ ধারণা প্রচলিত আছে। ব্যাবিলন, মিশর ও সুমেরীয় প্রভৃতি সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীনকালে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলের এবং তাম্রলিপ্তের মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল,তার কারণ হল ভারতীয় আসুর সভ্যতা। এই সভ্যতার মূল কেন্দ্র ছিল রাঢ়ভূমি। মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে ও সিংভুম জেলায় অসুব সভ্যতার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এই কথা স্মরণযোগ্য যে মহাভারতের বনপর্বে অঙ্গরাজ কর্ণ অর্জুনকে বধেব প্রতিজ্ঞায় 'আসুব' ব্রত উদযাপন করেছিলেন, মদ এবং মাংস স্পর্শ না করে। বলাই বাহুল্য, এই আসুব শব্দটি সেই অঞ্চলেব তৎকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা বহন কবেছিল। 'মহিষ' শব্দ থেকে নাকি মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি। এই শব্দটি ক্ষত্রিয়েরই নামান্তব বলে অনেকে মনে করেন। হরপ্পীয় আমলে তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাগার্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। তার বহির্বাণিজ্য তাকে করেছিল পৃথিবীর অন্যতম সেরা বন্দর। তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজগুলি একদিকে যেমন সিংহল দ্বীপ ও ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলেব বন্দবগুলিতে যাতায়াত করতো, তেমনি সেগুলি চলে যেত আন্দামান নিকোবব হযে মালয, ইন্দোচীন প্রভৃতি পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে।

তাম্রলিপ্ত ছিল এক আন্তর্জাতিক বন্দর। বিদেশী বণিকেবা জাহাজে এসে এখানকাব আকর্যণীয ও দুষ্প্রাপ্য পণ্য যথা—রেশম, কার্পাসবস্ত্র, জটামাংসী, তেজপাতা, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, হীরকখণ্ড ও মুক্তা প্রভৃতি সংগ্রহ করে মধ্য প্রাচ্যের এবং প্রতীচ্যের বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি করতো এবং প্রভূত বিত্ত অর্জন করতো।

তাম্রলিপ্তের এই গৌরবময় অস্তিত্ব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছিল। "বিশাল বাঙ্গালী" গ্রন্থে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'প্রায় দুই হাজাব বৎসর ধবিয়া গঙ্গোপকুলবর্তী তাম্রলিপ্তি এসিয়ার সর্বপ্রধান বন্দর ছিল। বাংলার জাহাজ বঙ্গোপসাগর হইতে বাংলাব শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী, বাংলার ধর্ম, কৃষ্টি ও বাংলার চারুশিল্পকলা সুদূর প্রাচ্যদেশসমূহে যুগ যুগ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, 'কোলান্দিয়া' নামের এক ধবনের জাহাজ বঙ্গোপসাগবে পাড়ি দিযে যেত সিংহলে, চীনে। মাকক্রিণ্ডিলও অনুমান করেছেন, কোলান্দিয়া চীনের উপকূলে যেত। "...তাম্রলিপ্ত থেকে কোলান্দিয়া নামের পণ্যতবী নিয়মিত দাক্ষিণাত্যে যেত বলেই অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় বাঙলাদেশের সঙ্গে রোমের ব্যববসা-বাণিজ্য চলতো।"

মাকক্রিণ্ডিল তাঁর লেখায় আরও বলেছেন যে, 'বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বন্দর দামিরিকা হয়ে সুদূর রোমেও যে পরোক্ষ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল, তার আভাস

পাওয়া যায় প্লিনী, টলেমি ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থে। ...রোমের বাজারে চাহিদা ছিল গাঙ্গেয় জটামাংসীর (Gengetic Spikenard)।...'

বাঙালির সেই গৌরবময় যুগে গ্রীক ও রোমক গ্রন্থ রচয়িতা এবং লিপিকারদের কাছে বাংলার নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা ও সমভূমি সমন্বিত প্রাচীন এই খণ্ডটিই গঙ্গারিডি বলে পরিচিত হয়েছিল। বঙ্গভূমির বিভিন্ন অংশে আর্য ব্রাহ্মণদের অনুপ্রবেশ মৌর্য যুগ থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা এখানকার ভিন্নতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বশীভুত হয়ে, আপনাদের আর্যসত্তাটি পর্যন্ত সময়ে সময়ে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। গঙ্গারিডি তথা বাঙালিরা সেই যুগে আর্যীভুত না হয়েও অনেক দিক থেকেই আগ্রাসী আর্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল।

তাদের কৃষি ছিল উন্নত, জীবনধারণের প্রণালী ছিল বৈচিত্র্যময়। তাদের ধ্যান, ধারণা, পূজাপদ্ধতি, আচার, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল তাদের মানসিক উৎকর্ষ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মার্জিত রুচি এবং ব্যবহাবের শালীনতা। তদানীন্তন বৈদিক আর্যদের থেকে, বাঙালি ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধবনেব। এই বাঙালিবা ছিল হবপ্পা সভ্যতার ধারক এবং হরপ্পার অনার্য গরিমার সার্থক উত্তরসূরী।

বাঙালি ছিল সম্পদশালী এবং গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি অনেক কারণেই বিদেশীদের মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়েছিল। না হলে মেগাস্থিনিস এবং পরবর্তী বৈদেশিক লেখকেরা তাদেব লিখিত বিববণে বিশেষভাবে গঙ্গারিডি, প্রাসী এবং তাব সঙ্গে কালিঙ্গেয়ীদের নাম বাব বাব উল্লেখ কবতেন না। এদের বাহুবল ও সম্পদ দিগ্বিজযী আলেকজাণ্ডার এবং তাঁর অপবাজেয় সৈন্যবাহিনীর মনে যে তীব্র আতঙ্কেব সৃষ্টি করেছিল, তা শুধু গঙ্গারিডি প্রভৃতি প্রাচ্য দেশ ও জাতিসমূহেব শৌর্য, বীর্য, এবং ঐশ্বর্যের পবিচাযক। তাম্রলিপ্তির সমৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি গঙ্গারিডিব সমৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, এবং খ্যাতির সমার্থক বললে অত্যুক্তি হবে না। সুতবাং তাম্রলিপ্ত তথা বঙ্গদেশ হিন্দু সংস্কৃতিতে তাব অবদান রেখেছিল তাব প্রাগার্য উপাদান দিয়ে। হিন্দু সংস্কৃতিতে বাঙালির অবদান এসেছে হরপ্পা-সংস্কৃতির মাধ্যমে এবং তার বিস্তৃতি অনেকটাই।

মহেঞ্জোদাবো ও হবপ্পায় আবিষ্কৃত মৃন্ময়ী স্ত্রীমূর্তিগুলি প্রমাণ কবে যে শক্তিসাধনা বৈদিক যুগের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। সিন্ধু সভ্যতাব প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আবিষ্কৃত এই মৃন্ময়ী মূর্তির অন্তরালে মাতৃকা পূজাব সম্ভাবনা সম্বন্ধে এক প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকের মন্তব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

"পশ্চিম এসিয়ার মতো এই দেশের সামাজিক জীবনে মাতৃজাতিব প্রাধান্যেব সময়ে এই মাতৃকা পূজার সূত্রপাত হয় এবং এতদ্দেশীয় অনার্যদের জাতীয় দেবতামণ্ডলীর মধ্যে এই পূজার অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। ...শাক্তধর্ম মাতৃকা পূজার (Cult of Mother Goddess) অঙ্গীভূত। শাক্তধর্মের কোন পৃথক অস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ মহেঞ্জোদাবো কিম্বা হরপ্পাতে অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা ভারতের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম। শক্তিপূজা শৈবধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবাপন্ন। ...লিঙ্গ

পূজা যে সিন্ধু উপত্যকায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। লিঙ্গপূজা অনার্য এবং প্রাগার্য সভ্যতার নিজস্ব মৌলিক বস্তু বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। ঋগ্বেদে শিশ্নদের প্রতি যথেষ্ট ভর্ৎসনা বাক্য দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে বুঝা যায়, লিঙ্গপূজা অবৈদিক ধর্ম।"

পরবর্তীকালে বঙ্গদেশসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েক স্থানে এই সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন অল্প বিস্তর পরিলক্ষিত হয়েছে। তারা লিঙ্গপূজক ছিল এটা প্রমাণতিও হয়েছে। তবু অনেকেরই এই অনুমান যে, শক্তিতত্ত্ব ও শাক্তাচার আদৌ অপ্রাচীন নয় এবং বেদের ভগবতী সূত্রগুলি প্রমাণ করে যে তান্ত্রিকতার স্বাক্ষর বৈদিক সাহিত্যেও ছিল। কিন্তু মাতৃপূজা অথবা শক্তিতন্ত্রের প্রভাব বঙ্গদেশের মতো কোথাও এত বিপুলভাবে অনুভূত হয় নি। এগুলি বাঙালি কোন বিশেষ সুপ্রাচীন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেই পেযেছিল। আর সে সংস্কৃতি হরপ্পা সংস্কৃতি।

'বাঙালিবা আজও সিন্ধু সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে আছে'— বলেছেন ডঃ অতুল সুর, তাঁর "বাঙলার সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে। ডঃ সুবের মতে বাঙালিই তাব মাতৃপূজার ঐতিহ্যকে (যা হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য) সুমের, মেসোপটেমিয়া, ক্রীট প্রভৃতি স্থানে বহন করে নিয়ে গিযেছিল। বাংলার ও সুমেরের মাতৃদেবীর কল্পনার মধ্যে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয, যথা, উভয দেশেই মাতৃদেবীর বাহন সিংহ এবং তাঁর ভর্তার বাহন বৃষ। ভারতের মতোই সুমেবেব মাতৃদেবীকে 'পর্বতেব দেবী' বলা হযেছে। এ নিয়ে আগে আলোচনা করা হযেছে বিস্তৃতভাবেই।

মহেঞ্জোদারো এবং হবপ্পা নগরী বিধ্বস্ত হলে, সেখানকার অধিবাসীরা, যাদেব সাধারণভাবে দ্রাবিড় বলেই মনে করা হয় তারা ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং মধ্যভাগ ইতিমধ্যে আর্যদেব অধিকারভুক্ত হওয়ায়, এই বিজিত এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জর্জরিত নরগোষ্ঠী গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করেছিল। এই স্থানান্তরে বসবাসের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগের সময়ে তারা ছিল উন্নত মানের নাগরিক জীবন ধারণে অভ্যস্ত এবং নগব সভ্যতার পথিকৃৎ। নতুন উপনিবেশে তারা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে যত্নবান হয়েছিল, এবং অনেক বিষয়েই নিজেদের উৎকর্ষের জন্য স্থানীয় লোকেদের এই সব বৈচিত্র্যময় ধর্ম, আচার, ব্যবহার, শিল্প প্রভৃতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। এই উদাব এবং সমুন্নত সাংস্কৃতিক ভাবধারার সংস্পর্শে এসে বাঙালির ধর্মে, কর্মে, চিন্তায় একটা ভাবপ্রবণতার এবং একটা উচ্চমন্যতার মানসিকতা জন্ম গ্রহণ করেছিল। বহুকাল ধরেই বাঙালিদের সঙ্গে হরপ্পীয়দের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ওই সময় পারস্পরিক যোগাযোগ আরও নিবিড়তর হয়।

সিন্ধু সভ্যতায় লৌহের ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় এবং অশ্বের কোন চিহ্ন না থাকায়, অনুমান করা হয়েছে যে ঋগ্বেদের পুরন্দরের (ইন্দ্র) অসভ্য ও বর্বরদের উপর

বিজয় লাভ এবং তাদের দুর্গ ধ্বংস করার কাহিনী বৈদিক আর্যদের স্থানীয় অধিবাসীদের উপর জয়লাভেরই প্রতীক। আর্যরা লৌহাস্ত্র এবং অশ্ব এই দুইয়ের ব্যবহারেই পারদর্শী ছিল বলে মনে করা হয়। এ নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। ইন্দ্র অনেক 'লৌহময় পুরী' ধ্বংস করেছিল একথা বলছে ঋগ্বেদ। এই সব লৌহময় পুরী নিশ্চয়ই অনার্য হরপ্পীয়দের লৌহপ্রাচীর বেষ্টিত নগরী। তা হলে, হরপ্পীয়বা লোহার ব্যবহাব জানতো না এমন কথা বোধ হয় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ব্যাপারটা আজও বিতর্কিত রয়ে গেছে।

যাইহোক, আর্য জগতেব বহির্ভূত বঙ্গদেশে এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে সুদূর অতীত থেকেই লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। বীরভুম, বর্ধমান, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় খনিজ লৌহপিণ্ড থেকে লৌহ নিষ্কাশনের দেশীয় প্রণালীতে উৎপাদন সম্পন্ন হতো এবং নানা প্রকার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হতো। এখানেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সুসভ্য জনগোষ্ঠীব উন্নত মানের জীবনধারাই প্রমাণিত হয। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্মরণযোগ্য যে বাঁচী, সিংভুম, পালামৌ প্রভৃতি বৃহৎ বঙ্গেব অসুর সম্প্রদায়ের বর্তমান কালেও মূল জীবিকা হল লৌহ আকর থেকে লোহা প্রস্তুত করা।

সিন্ধু উপত্যকাব মহেঞ্জোদাবো এবং হরপ্পায যে মিশ্র জাতিব বাস ছিল, তার মধ্যে প্রোটো-অস্ট্রেলীয়, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় এবং আলপীযবাই প্রধান। এবাই সকলে গুজরাটী, মারাঠী এবং বাঙালিদেব পূর্বপুরুষ। কেউ কেউ বলেছেন যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা হয দ্রাবিড় জাতি, নয় দ্রাবিড়দেব সদৃশ কোন জাতি। এই সিন্ধু সভ্যতাই আমাদের বঙ্গদেশে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রভাব বিস্তার কবেছিল। আবার এ কথাও সত্যি যে, হরপ্পা সভ্যতাব বমবমাব কালে বাংলাব মাতৃপূজা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি যেমন, বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা, মাছ-ভাত খাওয়া ইত্যাদি লোথাল, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোরা গ্রহণ করেছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিব একটি স্তরে এই দ্রাবিড় সভ্যতাব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবির সন্নিহিত কুনুর, কোপাই, বক্রেশ্বব নদীব উপত্যকা, এবং দক্ষিণ-বাংলার হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানগুলিতে তাম্রাশ্মীয় (Chalcolithic) যুগেব অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতার যুগেব প্রত্নবস্তুমূহ বিপুলভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য কবেছিলেন যে, এতদিন আর্য উপনিবেশ স্থাপনকেই বঙ্গদেশে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা মনে করা হতো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ষাটেব দশকের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এটা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে আর্যদের আধিপত্যের অনেক আগে থেকেই বঙ্গদেশের কয়েক স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব দু-হাজার বৎসরের ন্যায় সুদূর অতীতেও উন্নততর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

প্রাচীন পশ্চিমবঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার তথা দ্রাবিড় কৃষ্টির প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র বঙ্গদেশে এই দ্রাবিড় কৃষ্টির উপর আর্যদের প্রভাব

পড়েছিল এবং এই কৃষ্টির পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। যাইহোক, বঙ্গদেশে আদিবাসীদের মধ্যে দ্রাবিড়রা ছিল বিশেষ উন্নত এবং এই দ্রাবিড়রা হরপ্পা সভ্যতার সংস্কৃতিকে এই দেশে বহন করে এনেছিল এবং স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেছিল। তাম্রলিপ্ত যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় দ্রাবিড়দের একটি কেন্দ্র ছিল, তা আগেই বলা হয়েছে।

বাঙালির মাতৃপূজা ও তন্ত্র সাধনা— এই দ্রাবিড় হরপ্পাসভ্যতা গ্রহণ করেছিল। বঙ্গদেশে এই প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরবর্তীকালে সমন্বিত হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মভাব, কিন্তু তবু রাঢ়দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গের মূল সাংস্কৃতিক রূপ বৌদ্ধধর্মেব সুদীর্ঘ প্লাবনেও নিশ্চিহ্ন হয় নি। বরং রাঢ়ের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হয়ে এবং এই সংস্কৃতিকে প্রচুর পরিমাণে আত্মসাৎ করে বৌদ্ধধর্ম তদানীন্তন জনমনের স্বাধীন চেতনাব নিকটবর্তী হয়ে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। বৌদ্ধ প্রভাব স্তিমিত হলে যে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা আত্মপ্রকাশ করেছিল, বিশেষভাবে এই পশ্চিমবঙ্গে, তা কিন্তু হবপ্পা সভ্যতাব প্রাগার্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণেরই প্রত্যক্ষ ফল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা হিন্দু ধর্মকে এই শক্তিবাদ এবং তান্ত্রিকতার সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছিল।

রাঢ বাংলার তন্ত্রধর্ম হরপ্পা সভ্যতা গ্রহণ কবেছিল। হরপ্পা সভ্যতা থেকেই হিন্দু সভ্যতা সৃষ্টি হওয়ার সময় তা চলে আসে হিন্দু ধর্মে। তাবপব নানা বিবর্তনে ছড়িযে পড়ে সাবা ভাবতে। আগেই বলেছি, সিন্ধুসভ্যতায মূর্তিপূজাব (পশুপতি ও মাতৃপূজাসহ) অস্তিত্ব ও প্রচলন সংশয়াতীত ভাবে প্রতিপন্ন হযেছে। এই প্রভাব সিন্ধুসভ্যতাব পতনেব পরে অন্যত্র সংক্রামিত হয়েছে। বঙ্গদেশে এই সব পূজার প্রবর্তন বিশেষ প্রাধান্য বিস্তাব করেছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, মূর্তিপূজা এবং মাতৃ-উপাসনা বঙ্গদেশে যত প্রচলিত, ভারতবর্ষের আব কোন অংশে তেমন নয়।

"এখানে যজ্ঞের প্রাধান্য নয়। এখানে বৈদিক অগ্নিব স্থান অধিকাব কবিযা আছেন মা কালী, শিব ও বিষ্ণু। ...বেদের দেবগণ উপাসনা হইতে দূবে থাকেন। কিন্তু বঙ্গে কি শিব, কি কালী, কি বিষ্ণু সকল দেবতাই ভক্তের আপনজন, তাহাব নিকট আত্মীয। তাহার পিতা, মাতা, বন্ধু, ভাই, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি রূপের যে কোন একটি ধারণ কবিয়া তাঁহারা ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন।"

হরপ্পা সভ্যতার মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরীর অধিবাসীবা আধুনিক তান্ত্রিকদেব পূর্বসূরি। অবশ্য, এ কথা মনে রাখা দরকার যে, বৌদ্ধধর্মেব সংস্পর্শে এসেই শেষ পর্যন্ত শক্তিতন্ত্র একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করেছিল এবং হরপ্পা সভ্যতাব বিলুপ্তিব বহু শতাব্দী পবে এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

তন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থল গৌড়-বঙ্গভূমি। 'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'। মাতৃভাব বাঙালির মজ্জাগত, তাই বাঙালিকে মা-পাগল জাত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীনতম তন্ত্রের অনেকগুলি গ্রন্থ এই বঙ্গদেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে। শক্তিপীঠগুলি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেই কেন্দ্রীভূত, যদিও বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এবং পাশের দেশেও

অনেকগুলি পীঠ বিদ্যমান। এ সবেরই বীজ হরপ্পা সভ্যতার মধ্যেই উপ্ত হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

সিন্ধু উপত্যকা থেকে তৎকালীন আর্য উপনিবেশের বহির্দেশে এসে এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেছিল। সেই কারণেই বাঙালির দেশে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত হয় নি। বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসীরা তাদের জন্মভূমি সিন্ধু উপত্যকা থেকে আনীত একটি শিথিল-গ্রন্থী সমাজের বন্ধন মেনে চলতো। সিন্ধু-উপত্যকার গোষ্ঠী-প্রাধান্য এখনও পর্যন্ত বঙ্গদেশে বর্তমান। এই স্বাধীন গোষ্ঠীসমূহই পরবর্তীকালে মধ্যদেশীয় আর্য পুরোহিতদের লিখিত স্মৃতিগ্রন্থে মিশ্র ও হীন জাতিতে পরিণত হয়ে অসম্মান ও অশ্রদ্ধার পাত্র হয়েছে। এই সব সত্ত্বেও বঙ্গদেশের প্রাচীন সমাজের গোষ্ঠী- প্রাধান্য খর্ব করা যায় নি। বাঙালির সমাজে সাধারণত বিবাহ এখনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর ভিতরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এইটি হবপ্পা সভ্যতার শিথিলবদ্ধ সমাজব্যবস্থার অবশিষ্ট মাত্র।

নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায ও অববাহিকায সিন্ধুসভ্যতার স্বাক্ষর ও প্রতিপত্তি অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা, এমন কি গুজরাট ও মহারাষ্ট্র সমন্বিত ভারতের পশ্চিম অঞ্চল অপেক্ষাও অনেক বেশি। সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছায়া এখনও বাঙালির এবং বিশেষভাবে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গেব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে। আগেই বলেছি, ডঃ অতুল সুব প্রমুখ পণ্ডিতেরা অনুমান কবেন যে বাঙালিরাই এখান থেকে পশ্চিম এসিযা প্রভৃতি স্থানে গিযে হরপ্পা সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতার পত্তন কবে। ওই পণ্ডিতদের মতে এই বাঙালিরাই মধ্যএসিয়া, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলে বাণিজ্যেব উদ্দেশ্যে গিযে উপনিবেশিত হয়েছিল, এবং নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার কবেছিল।

অসুব পূজক ইন্দো-ইবানীরা ভাবতবর্ষ থেকে ইরানে গিয়েছিল না ইরান থেকে ভারতে এসেছিল, এই প্রশ্নটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, এবং এই বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এই নিযে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। গঙ্গারিডিদের বাণিজ্যের খ্যাতি যেমন বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং সাহিত্য থেকে পাওয়া যায, তেমনই তাদের যুদ্ধের খ্যাতিও কয়েকটি বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ভেলেবিয়াস ফ্লাক্কাশ তাঁব 'আরগনটিকা' পুস্তকে লিখে গেছেন যে, গঙ্গারিডির বাঙালি বীরেবা কৃষ্ণসাগবেব উপকূলে ১৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (ঋগ্বেদ রচয়িতা নর্ডিক আর্যদের পঞ্চনদে এসে উপস্থিত হবাব সমসাময়িক কালে) কলচিয়ান ও জেসনের অনুগামীদের সঙ্গে বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বাঙালিদের এই বীরত্বের কথা আগেই বলেছি।

আর্যরা যখন আর্যাবর্ত অধিকার করে অনার্যদের শাসন করছিল এবং ধীরে ধীরে হরপ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের সংস্কৃতির মিশ্রণে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির তথা হিন্দুসংস্কৃতির

উদ্ভব ঘটছিল, তখন পশ্চিমবাংলায় তথা রাঢ় বঙ্গে যে সভ্যতা তথা যে সংস্কৃতি ছিল তাকে অনেকে বলছেন 'অসুর সভ্যতা'। এই সভ্যতার বহু সংস্কৃতি হরপ্পা সংস্কৃতিতে এসেছিল এবং ওই হরপ্পা সংস্কৃতিই আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করেছিল ভারতীয় আর্য সভ্যতা তথা হিন্দু সভ্যতা। বহু প্রাচীনকাল থেকে এখনকার মানভূম, ধানবাদ, পুরুলিয়া, ধলভূম, ঘাটশীলা, সরাইকেল্লা, সিংভূম এবং গয়া পর্যন্ত পাহাড়ী দেশ গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। এই গঙ্গারিডির সভ্যতা ও সংস্কৃতিই এক সময় ছিল রাঢ় তথা পশ্চিমবঙ্গের সভ্যতা তথা সংস্কৃতি। এই সভ্যতা তার নানা উপাদান দিয়েছে হিন্দু সভ্যতাকে, সমৃদ্ধ করেছে বিশ্বখ্যাত এই সভ্যতাটিকে।

বিনয় ঘোষ তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" গ্রন্থে বলেছেন যে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি রাঢ়দেশে প্রসারিত হয়, পুণ্ড্রবর্ধন এবং বঙ্গের অনেক পরে। রাঢ়ে তথা পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী প্রাক-আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘাঁটি ছিল। এই সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের ধারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাহিত। রাঢ়দেশ কেবলমাত্র বন্য ও বর্বর লোকের আবাসভূমি ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গে তথা গ্রীক বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যে যে সংস্কৃতি ছিল, তার সঙ্গে উত্তর পশ্চিমভারতের আর্যদের একাত্মতা ছিল না। কিন্তু গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের সভ্যতা, সম্পদ ও শক্তির কথা তাদেব অজানা ছিল না।

গঙ্গাবিডিদের সভ্যতার ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য— "আর্যসংস্কৃতিব প্রসাব ও প্রতিষ্ঠাব আগে পশ্চিমবঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তার দিগন্ত বেখা আদি প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত! প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্বের নানা রকমের আয়ুধ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পাওয়া গেছে। মনে হয় ছোটনাগপুব সাঁওতাল পরগণা থেকে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চভূমি সীমা পর্যন্ত প্রধানত আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoid) বা নিষাদজাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানা স্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।..."

আগেই বলা হয়েছে যে, রাঢ় বঙ্গে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও কৃষ্টি তার অস্তিত্ব হরপ্পীয় আমল থেকে বহুকাল ধরে বজায় রেখেছিল। এমন কি বৈদিক সভ্যতা আর্যাবর্তে বিস্তৃত হওয়ার বহুকাল পরেও রাঢ় তার তন্ত্রভিত্তিক আসুব ধর্ম বজায় রাখতে পেরেছিল। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে আর্য সংস্কৃতির বিপরীত এবং শক্তিতন্ত্র নির্ভর। মাতৃপূজা এই সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। এই রাঢ়ভূমির অনার্য দেবতা হলেন শিব ও শক্তি। এই সংস্কৃতি হরপ্পীয়রা গ্রহণ করেছিল হরপ্পা সভ্যতায়। পরবর্তীকালে এগুলি চলে আসে হিন্দু সভ্যতায়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্যাবিলন, মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতা এবং তাম্রলিপ্তের সভ্যতার এক যোগসূত্র ছিল। এই সূত্রটি হলো প্রাচীন ভারতের "অসুর সভ্যতা", যে সভ্যতার স্রোত এইসব বহির্ভারতীয়

দেশসমূহেও প্রবাহিত হয়েছিল। ভারতে এই উচ্চমানের অসুর সভ্যতার মূলকেন্দ্র ছিল রাঢ়ভূমি। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার কোন কোন অংশে প্রাচীন অসুর ভাষার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। "Austro-Asiatic কোলগোষ্ঠীর যে সমস্ত সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে অসুর সম্প্রদায় এখনও তাদের আসুরি ভাষা নিয়ে রাঁচি-সিংভুম-পালামৌ অঞ্চলে বসবাস করছে—যাদের মূল জীবিকা হলো লৌহ আকর থেকে লৌহ তৈবি।" সুতবাং হিন্দু সভ্যতাকে সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার যুগিয়েছে বাংলার তথা রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি।

হিন্দু সভ্যতা এক বিশাল বৈচিত্র্যময় নানা সংস্কৃতির সমাহার। সে সভ্যতায় এসে মিশেছে নানান প্রাচীন সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা। কবিগুরু যেমন বলেছিলেন, 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন/শক-হূণদল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন'—একেবারে প্রায় সেই রকমই। তবে ডঃ অতুল সুর যেমন বলেছেন যে, হিন্দু সভ্যতার তথা হিন্দু ধর্মের চাবভাগের তিন ভাগ উপাদান এসেছে হবপ্পীয় সংস্কৃতি থেকে—তেমন সিদ্ধান্তও একেবারে খাঁটি। অর্থাৎ হিন্দুসভ্যতায় বহু সংস্কৃতির ধারা এসে মিশলেও তার মূল তথা অধিকাংশ উপাদানই এসেছে প্রাগার্য বা অনার্য হরপ্পীয়দের সংস্কৃতি থেকে। আবার হরপ্পীয় সভ্যতায় মিশেছে রাঢ় বাঙলার অসুর সভ্যতা তথা তন্ত্র সংস্কৃতি। সে সংস্কৃতি হবপ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে চলে এসেছে হিন্দু সভ্যতায়। হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা হিন্দু সভ্যতায় তাই বহু বৈপবীত্য, নানান বৈচিত্র্যের বিশাল সমাবেশ। এই সভ্যতাব সবচেযে বড় কথা হল 'যত মত, তত পথ'। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হিন্দু সভ্যতার মূলমন্ত্র।

হিন্দু সভ্যতায বাংলার সাংস্কৃতিক অবদানের কথা শেষ করা যাক মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে এর বিবর্তনের সামান্য কিছু কথা দিয়ে। মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়াব আগে বাংলায় তন্ত্রধর্মের কিছুটা প্রাধান্য ছিল। মুসলমান আমলে সামাজিক এবং ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে তন্ত্রধর্মের প্রাধান্য প্রবলতর হয়। এই ডামাডোলের মধ্যে লোকায়ত দেবদেবীরা আবার সমাজের সবস্তরে পূজা পেতে শুরু করেন। প্রাগার্য দেবদেবীরা আবার একবার নতুনভাবে চলে আসেন বাংলার হিন্দু সংস্কৃতিতে। এঁদের মধ্যে আছেন মনসা, চণ্ডী, বাসুলী, শীতলা প্রভৃতি। রচিত হয় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন এই সব দেবদেবীর গুণকীর্তন করে। লক্ষ্মীদেবী চলে আসেন ঘরে। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার পূজিত হতে থাকেন নিয়মিতভাবে। ডঃ অতুল সুর লিখেছেন ঃ "এছাড়া মধ্যযুগে ইসলামধর্মের সংস্পর্শে এসে এবং তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে হিন্দুসমাজে আরও অনেক দেবদেবী আবির্ভূত হন। তাঁদের অঁন্যতম হচ্ছেন সত্যপীর, গাজীসাহেব, বনবিবি প্রভৃতি। এর মধ্যে সত্যপীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। সত্যপীরের পূজা-কথায় বলা হয় যে, সত্যপীর ও নারায়ণ অভিন্ন। সেজন্য সত্যপীর বর্তমানে সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হন।

মধ্যযুগে এইসকল যুক্তসাধনামূলক গণতান্ত্রিক দেবদেবীর পূজার উদ্ভবের ফলে হিন্দুসমাজ মুসলমান কর্তৃক ধর্মান্তরকরণের ফলে যে ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছিল তা থেকে রেহাই পায়। এই যুক্তসাধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের। শ্রীচৈতন্য তাঁর ধর্মসমাচার জাতি ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে সর্বমানবের উদ্দেশে প্রচার করেন। জনতাকে এ ধর্ম বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেক মুসলমান ছিল। মুসলিম সাহিত্যক্ষেত্রেও চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তাব করে। চৈতন্যের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন আউলচাঁদ ও তাঁর শিষ্য রামশরণ পাল। তাঁরা যে ধর্ম প্রবর্তিত করেন তা সত্যধর্ম বা সতীমার ধর্ম নামে ঘোষপাড়ায় প্রচলিত। এখানে হিন্দু-মুসলমান একত্রে উপাসনা ও খাওয়া-দাওয়া করে।

এরপর বাঙালি সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যখন বাঙালি সমাজ বিদেশী ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসে। প্রথম আসে পোর্তুগীজরা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। এটা ছিল শ্রীচৈতন্যদেব ও স্মার্ত রঘুনন্দনেব সমসাময়িক কাল। চৈতন্যদেব যেমন বাঙালি সমাজে জাতিভেদ প্রথা বিলোপের চেষ্টা করেছিলেন, রঘুনন্দন তেমনই অপহৃতা ও পদস্খলিতা নাবীকে অল্প প্রায়শ্চিত্ত দ্বাবা হিন্দুসমাজে আবার গ্রহণ কববাব বিধান দেন। তার মানে, হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধেব কঠোরতা ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। ফলে পোর্তুগীজবা যখন এদেশে আসে, বাঙালিবা তখন তাদেব সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কবেছিল। বণিকসমাজ তাদেব সঙ্গে বাণিজ্য করে ধনশালী হযেছিল। বাঙালি মেযেবা পোর্তুগীজদেব অঙ্কশাযিনী হতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। অনেক কৃষি ফসলের চাষ পোর্তুগীজরা শুরু কবে দিয়েছিল, যথা, আলু, তামাক, সাগু, কাজুবাদাম, আনারস, আতা, আমড়া, পেঁপে, পেয়ারা ও লেবু। এই কৃষি-বাণিজ্য ও যৌনমিলনের ফলে বহু পোর্তুগীজ শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যথা, আচার, আমড়া, আয়া, আলমিরা, আনারস, আবক, বালতি, ভাঙা, বাট্রা, বৃঞ্জল, বুটিক, কাজু, কামরা, কামিজ, চাবি, কোকো, গুদাম, গির্জা, ঝিলমিলি, লস্কর, নিলাম, মিস্ত্রি, পাদরি, পালকী, পমফ্রেট, পেঁপে, পিওন, বসিদ, সাগু, বারাণ্ডা, কাবাব, আলকাতরা, আতা, বাসন, ভাপ, বজরা, বিস্কুট, বযা, বোতাম, বোতল, কেদারা, কাফ্রি, কাকাতুয়া, কামান, ছাপ, কৌচ, কম্পাস, খ্রীষ্টান, ইস্পাত, ইস্ত্রি, ফিতা, ফর্মা, গরাদ, জোলাপ, জানালা, লানটার্ন, লেবু, মাস্তুল, মেজ, পেয়ারা, পিপা, পিরিচ, পিস্তল, পেরেক, রেস্ত, সাবান, তামাক, টোকা, তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব জিনিসের ব্যবহার পোর্তুগীজদের প্রভাবেই বাঙালি সমাজে প্রবেশ করেছে।"

ইংরেজ আমলে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই হিন্দু সভ্যতায় এক প্রবল বিবর্তন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার তথা ভারতের নব জাগরণের যুগে হিন্দু সভ্যতা তথা হিন্দু ধর্মই এক তুলনাহীন বিশ্বজনীন রূপ লাভ করে। এই নতুন রূপের রূপকার ছিলেন— রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ। এখন উগ্র

সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু ধর্মকে কিছুটা মলিন করে তুললেও এটা কখনই হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সভ্যতা নয়। সমুদ্রে যেমন বহু নদী এসে মিশে যায়, হারিয়ে ফেলে তাদের অস্তিত্ব, তেমনি নানা সংস্কৃতি এসেছে মিশেছে হিন্দু সভ্যতার বিশাল সমুদ্রে। তরঙ্গ সেখানে থাকবেই। কিন্তু কূল-ভাঙ্গা তরঙ্গ তার স্বাভাবিকরূপ নয়। হিন্দু ধর্মের মূলকথা 'যত মত তত পথ'। আব হিন্দু সভ্যতাব ক্ষেত্রেও সে কথা সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য। হিন্দু সভ্যতা বলে সংহতির কথা, ঐক্যেব কথা, মিলনের কথা। হিন্দু সভ্যতাই পারে 'একের অনলে বহুবে আহুতি' দিযে বিভেদ ভুলে জাগিযে তুলতে 'একটি বিরাট হিয়া'। প্রাচীনতম এই সভ্যতাই পাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনতে, যুদ্ধের বদলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, পৃথিবীকে মানুষেব বাঁচাব উপযোগী করে রাখতে।

দশম পরিচ্ছেদ

শেষকথা

'সংস্কৃতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল— শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ। একে কৃষ্টিও (Culture) বলা হয়। আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-সংস্কার, সংস্থা, বিশ্বাস, জীবিকার যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, পোষাক-আসাক, শিল্পকলা ইত্যাদির প্রত্যেকটিই সংস্কৃতির উপাদান। সংস্কৃতি হল 'Organic whole'। কোনও জাতির সংস্কৃতি বলতে তাব জীবনচর্যার এই সব উপাদান এবং শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বাবা লব্ধ সেগুলির উৎকর্ষকেই বোঝায়। সংস্কৃতিতে কোন জাতিব জীবনচর্যাব নানা উপাদান সন্নিবেশিত। তাব কোনো উপাদান বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না। এই বিচাব বিজ্ঞানসম্মতও নয়। সুতবাং কোন নরগোষ্ঠীব জীবনচর্যাব নানা উপাদানেব সমষ্টিই সংস্কৃতি। নৃতত্ত্ববিদদেব মতে, যখন কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীর জীবনচর্যা কোন এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত হয়, তখন আমরা তাকে সেই জাতিব 'সভ্যতা' বলি। সংস্কৃতিব সমষ্টিই রূপ নেয সভ্যতাব। যেহেতু সমাজেব জীবনচর্যা কোনও এক বিশেষ অবস্থানে চিবকাল থাকে না, কালেব আবর্তনে তাই তাব সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে। জীবনচর্যাব পবিবর্তনে সংস্কৃতিব বিবর্তন হয়। আব সংস্কৃতির পবিবর্তনেব সঙ্গে সভ্যতাবও বিবর্তন ঘটে। সভ্যতা তাই Static নয়, সভ্যতা Dynamic। যেমন, হিন্দুসভ্যতা বলতে আমরা হিন্দু সংস্কৃতির সমষ্টিকে বুঝি, তেমনি বুঝি বিশেষ খাতে প্রবাহিত হিন্দুসমাজের জীবনচর্যাকে। হিন্দু সমাজেব গতিশীলতাই তাকে দিযেছে সংহতি। কারণ, নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রাউস (Claude Levi-strauss) বলছেন যে, সামাজিক সংগঠন (Social Structure) আব কিছুই নয, এটা হচ্ছে মানুষের জীবনচর্যাব ঢঙ (Patterns of Living) মাত্র। সমাজকে অবলম্বন করেই কোন বিশেষ নরগোষ্ঠী কোন বিশেষ সভ্যতাকে গ'ড়ে তোলে। হিন্দুসভ্যতাও তেমনি হিন্দু সমাজের সংস্কৃতিসমূহের সমষ্টিগত রূপ। এনিয়ে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৬০ সালে লেভি-স্ট্রাউস নৃবিজ্ঞানেব অধ্যাপক পদ গ্রহণের পর তাঁর অভিষেক বক্তৃতায় তিনিই সম্ভবত প্রথম বলেছিলেন যে, ইতিহাসে আমরা যাকে 'রেনেসাঁস' (Renaissance) বলি তাব সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে ঔপনিবেশিকতা এবং নৃবিজ্ঞানের। অবশ্য তিনি মনে করেছেন যে, নৃবিজ্ঞান এই 'shameful ideology'-র যুগ পেরিয়ে এসেছে এবং নৃবিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে শিখেছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 'অসভ্য' 'আদিম' 'অনুন্নত' মানুষ, জাতি বা জনগোষ্ঠীকে নিরেট 'বস্তু' মনে করে গবেষণা করলে তাঁদের বিজ্ঞানের যত না উন্নতি হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি

উপকার হবে সাম্রাজ্যবাদীদের। ১৯৬০ সালে লেভি-স্ট্রাউস যখন এই সব মন্তব্য করেন তখন ছিল না বর্তমানের 'নব্য-উপনিবেশবাদ' (Neocolonialism)। তিনি দেখেন নি বহুজাতিকদের (Multinationals) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক বিকৃতির সম্প্রসার। এখন এসব দেখলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন যে, নৃবিজ্ঞান তার পুরানো উপনিবেশবাদের দাসত্ব ছেড়ে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই নব্য-উপনিবেশবাদের দাসত্ব করছে।

ইতিহাসের একটা বড় সত্য হল যে, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের সঙ্গে সমান্তরালভাবে। ১৮৫৬ সালে লন্ডনের 'Ethnological Society'-র জার্নালে এক ইংরেজ পণ্ডিত লেখেন ঃ "Ethnology is now generally recognized as having the strongest claims to our attention... especially in this country, whose members, colonies and extensive commerce bring it into contact with so many varieties of the human species differing in their physical and moral qualities both from each other and from ourselves." এর ফলে ভারতবর্ষে ও আফ্রিকায় নৃবিজ্ঞানীদের বিশেষ করে সাদা-চামড়ার নৃবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের অভিযান শুরু হল। বৃটিশ অফিসারদের নৃবিজ্ঞান চর্চা কর্তব্যকর্মের মধ্যে অন্তর্ভূত করা হল। মনে রাখতে হবে, ওই রকম একটা সময়ে ১৮৫৪ সালে ফরাসী লেখক কাউন্ট জোসেফ আর্থার দ্য গোবিনিউ তাঁর বইয়ে দেখালেন যে, সাদা চামড়ার জনজাতি অন্যদের তুলনায় সেরা এবং সাদা চামড়ার জাতিদের মধ্যে আর্যরা সবার সেরা। টিউট্যান (Teutons)-এর বা জার্মান ভাষাগোষ্ঠীর যে কোনটি যাদের মাতৃভাষা তারাই বর্তমানে সবচেয়ে নির্ভেজাল আর্যজাতি। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে পূর্বেই বহু আলোচনা করা হয়েছে। এই সব প্রেক্ষাপটে শুরু হয় বৃটিশ শাসকদের নৃবিজ্ঞানের অনুসন্ধান— ভারতবর্ষে এবং আফ্রিকায়— অর্থাৎ কালা-আদমিদের দেশে। এই দেশগুলি ছিল তখন বৃটিশদের উপনিবেশ। এর ফলে ডাল্টন (Dalton), রিসলে (Risley), হাটন (Hutton) মিল (Mill) প্রমুখ প্রশাসক নৃবিজ্ঞানীদের পেয়েছে ভারতবর্ষ। তেমনি এখানে এসেছেন কানিংহাম (Cunningham) প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদরা। অনেক তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলির থেকে যে সব 'তত্ত্ব' বেরিয়েছে তার অধিকাংশই তুলনাহীনভাবে আজগুবি।

তাই এই সময় অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-লন্ডনে নৃতত্ত্ব নিয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হত, বিশেষ করে বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে যে শিক্ষা দেওয়া হত, তা 'largely mistaken and misguided. It was full of diffusionist and evolutionist assumptions, and confused by doses of physical anthropology, still racialist in orientation, technology, and preposterous theories of religion.' এরপর অবশ্য সংস্কৃতির সংজ্ঞা খুঁজে বেড়ানো হয়। অতঃপর উন্নত হরপ্পা

সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। আর্যগরিমা নস্যাৎ হয়। সাদা-চামড়ার নৃবিজ্ঞানী তথা ঐতিহাসিক তথা পুরাতত্ত্ববিদদের বিকৃত আর্যগরিমার ব্যাখ্যা বাতিল হয়। সংস্কৃতির প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়।

আবার লেভি-স্ট্রাউসের কথায় ফিরে আসি। তিনি বলেছেন, 'any good history book is saturated with anthropology'। তিনি আরও বলেন, "the famous statement by Marx, 'Men make their own history, but they do not know that they are making it' justifies, first history and second Anthropology. At the same time, it shows that the two approaches are inseparable." তিনি 'structural dialectics' সম্বন্ধে বলেন, 'structural dialectics does not contradict historical determinism, but rather promotes it by giving it a new tool." ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। তারা এক পথের যাত্রী, তাদের লক্ষ্য এক, পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গির। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন অচ্ছেদ্য থাকলে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

এখন এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তারা পরস্পরের পরিপূরক। লেভি-স্ট্রাউস আবারও বলেছেন ঃ

"They have undertaken the same journey in the same road in the same direction, only their orientation is different. The anthropologist goes forward, seeking to attain through the consensus, of which he is always aware, more and more of the unconscious, whereas the historian advances, so to speak, backward, keeping his eyes fixed on concrete and specific activities from which he withdraws only to consider them from a more complete and richer perspective."

সুতরাং ঐতিহাসিক এবং নৃবিজ্ঞানীদের হাত ধরাধরি করেই চলার কথা প্রকৃত সত্য—তথ্য ও তত্ত্ব—উদ্ঘাটনের জন্য। সংস্কৃতি সংক্রান্ত তত্ত্বের উদ্ভাবক পণ্ডিতদের মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণীভেদগুলি হল ঃ বিবর্তনবাদী (Evolutionist), বিস্তারবাদী (Diffusionist), উপযোগবাদী (Functionalist), সামাজিক ভাষাতত্ত্ববাদী (Socio-linguist), সংস্থানবাদী (Structuralist) এবং জৈব-নৃতাত্ত্বিক (Bio-anthropologist)।

বিবর্তনবাদীরা মনে করেন যে, মানব সমাজের সংস্কৃতির তথা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে রৈখিক ভাবে (Linear)। বর্বরতার যুগ থেকে আধুনিক সভ্যতার যুগ অবধি যত বিকাশ তাব সবটাই হয়েছে রৈখিক পথ ধরে। তাঁদের মতে সংস্কৃতি হল কতকগুলি উপাদানের (Traits) যান্ত্রিক যোগফল। কোনো একটা উপাদান বিযুক্ত হলে সংস্কৃতি

তথা সভ্যতার ক্ষতি হতে পারে, আবার কোন একটি নতুন উপাদান যোগ হলে সভ্যতার তথা সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং উন্নতি ঘটতে পারে। সভ্যতার এই রৈখিক বিকাশ তত্ত্ব কিন্তু আধুনিককালের বহু পণ্ডিত মানেন না। ১৯৩০ সালে প্রখ্যাত গর্ডন চাইল্ড সভ্যতার আসা-যাওযা, উত্থান-পতনের, কথা বলেছিলেন তাঁর 'Urban Revolution' তত্ত্বে। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্যই হল সংস্কৃতির বিকাশ রৈখিক নয়—তরঙ্গায়িত। সভ্যতার উত্থান আছে, আছে পতন। তরঙ্গায়িত বিকাশের মধ্য দিয়েই ঘটেছে সভ্যতার অগ্রগতি এবং তা এখনও ঘটে চলেছে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকনেইল (William H. McNeill) লিখছেন ঃ

"In the 1930's, V. Gordon Childe tried to relieve the prevailing confusion by connecting civilization with what he called the 'urban revolution.' According to this idea, civilzation came into existence not once but many times, whenever men gathered into cities and began to specialize Occupational specialization, Childe argued, led to the rapid improvement of skills, and the invention of new and better tools. The result was a rather sudden elaboration of the material, intellectual, and artistic aspects of culture to a level of complexity and refinement that deserved to be called 'civilized.'

Childe's idea still holds the field among archaeologists, although there are more speculative thinkers who have begun to suggest that civilization ought to be viewed overall as a middle stage in human experience. This stage, in their opinion, is framed at the start by the invention of agriculture (echoing Morgan) and at the end by the Industrial Revolution (echoing Marx), which has begun to push mankind willy-nilly into a postcivilizational age. Such writers, among whom Kenneth Boulding may be mentioned as an example, emphasize the break between the stage of "civilization"–when the majority of men were farmers and remained for the most part excluded from the refinements of civilized life and the (presumed) stage of postcivilization, when mass communications will make it impractical to maintain cultural barriers between social classes or between different regions of the earth."

বিস্তারবাদীরা বিবর্তনবাদীদের তত্ত্বটাকেই গ্রহণ করে তার কিছুটা বিস্তার ঘটিয়েছেন। তাঁদের মতে, বর্বর ও অসভ্যদেব 'সংস্কৃতি' বলে কিছুই ছিল না কোনকালে। পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এই বিকাশ

ঘটেছে আগে, পরে ঘটেছে বিস্তার। যেমন, আমরা বলেছি হরপ্পার নগর-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে সবার আগে। পৃথিবীর আদি নগর-সভ্যতা হল হরপ্পা সভ্যতা। তারপর এসেছে সুমের, মিশর, মায়া এবং চৈনিক সভ্যতা। বিস্তারবাদীরা অবশ্য এও বলেন যে, প্রথমদিকে সভ্য হওয়া জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটায় সমসাময়িককালে অসভ্য থাকা নরগোষ্ঠীর মধ্যে। এই সভ্যতা তথা সংস্কৃতির কয়েকটি উপাদান হল ঃ চাকার আবিষ্কার, গরু বা ঘোড়ায় টানা রথ, গরু-মোষ-উটের গাড়ি, লাঙ্গল, মৃৎপাত্র, ফসলের বীজ, লোহার হাতিয়ার, অন্যান্য ধাতু যেমন তামা-ব্রোঞ্জ নির্মিত হাতিয়ার ও তৈজসপত্র, নানা প্রকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, শিল্পকলা, স্থাপত্য, পুরাণকথা, দেব-দেবী ও উৎসব-পার্বণ ইত্যাদি। বিস্তারবাদীদের মতে এই সব সাংস্কৃতিক উপাদানের উন্নততর রূপ প্রসারিত হয়েছে অনুন্নত তথা নিম্নতর সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন নরগোষ্ঠীর তথাকথিত 'অসভ্য' অঞ্চলে। একে 'বিকিরণ তত্ত্ব' (Radiation Theory)-ও বলা হয়। এই তত্ত্বের সত্যতা আছে। তবে একে বিকৃতভাবে কাজে লাগিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীরা। মিথ্যা করে বলা হয়েছিল, আর্যরা পৃথিবীর সব দেশকে সভ্য করেছিল। আর্যগরিমার এই প্রচার যে কত ভ্রান্ত তা সপ্তম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এই আর্যগরিমার দোহাই দিয়েই ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ মিথ্যা প্রচার করে যে, ইউরোপের কোনো কোনো অঞ্চলে সংস্কৃতির সূর্যোদয় হয় এবং সেই সংস্কৃতিই বিচ্ছুরিত হয় ভারতবর্ষে, এসিয়ায়, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় এবং চীনে। সুতরাং এই সব অঞ্চলে, ইউরোপের ওই সব দেশের উপনিবেশ স্থাপন করা অনৈতিক কোনও ব্যাপার নয়, বরং তা যুক্তিযুক্ত। বিকিরণ তত্ত্বটা ভুল নয়। ভুল যেটা, তা হল এর অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রয়োগ। সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছা করেই এই ভুল ব্যাখ্যা করে এবং নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগায়।

উপযোগবাদীরা অবশ্য বিকিরণ তত্ত্ব এবং বিবর্তন তত্ত্ব উভয় তত্ত্বের প্রবল সমালোচক তবে তাঁরা স্বীকার করেন যে, উভয়তত্ত্বের মধ্যেই কিছুটা সত্য রয়েছে। তাঁদের মতে সংস্কৃতির বিবর্তনও আছে এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের বিকিরণও হয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম সেরা পণ্ডিত গর্ডন চাইল্ড (V. Gordon Childe) বলেছেন,

"Diffusion is a fact. The transfer of materials from one territory to another is archeologically demonstrated from the Old Stone Age onwards. But if material objects can thus be diffused, so can ideas—inventions, myths, artistic designs, institutions. Evolutionsts have never denied this." আবার 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'-র লেখক বিনয় ঘোষ লিখেছেন ঃ "...পশ্চিমবঙ্গে কোনো স্থানের কাঠের পুতুলের সঙ্গে মিশরের পুতুলের সাদৃশ্য দেখে এখনও অনেক বাতিকগ্রস্ত বিকিরণবাদী মনে করেন মিশর থেকেই এই লোকশিল্পের এখানে আমদানি হয়েছে। এই ধারণা নিশ্চিতভাবেই এক ভ্রান্তি।"

উপযোগবাদীদের মূল বক্তব্য হল যে, সংস্কৃতি কোনও নরগোষ্ঠীর 'Organic

Whole'। এর কোন উপাদান বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না এবং তা করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। একটি বিচ্ছিন্ন কিংবা পৃথক উপাদান (Isolated Trait) কোনো সংস্কৃতিতে মূল্যহীন। এরকম বিচ্ছিন্ন উপাদান ওই সংস্কৃতির অগ্রগতিতে কোনও সাহায্য করে না। বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সংস্কৃতি হল 'organic whole' —তার কোনো উপাদান বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না, করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এইটাই হল উপযোগবাদী বা Functionalist -দের মূল বক্তব্য। Diffusion তাঁবা অস্বীকাব কবেন না, কিন্তু বহিরাগত উপাদান যদি মূল-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিযোজিত না হতে পারে এবং তার সঙ্গে অভিন্নসত্তা না হয়ে যায়, তাহলে তার উপযোগ থাকে না। প্রথা, সংস্কার, সংস্থা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, জীবিকার যন্ত্রপাতি, হাতিয়াব, পোশাক, শিল্পকলা প্রভৃতি প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক উপাদানের একটা বিশেষ উপযোগ (function, utility) আছে এবং তা আছে বলেই বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নানারকমের সমাবেশেব মধ্যে তারা 'hang together'. অভিন্নসত্তায় সুস্থিত হযে থাকে। সংস্থানবাদীবাও (Structuralist) অনেকটা এই কথাই বলেন, সংস্কৃতিব অখণ্ডতার উপর তাঁরা গুরুত্ব দেন এবং বলেন যে তার সংস্থানবেধ (infra-structure) সমগ্রভাবে না দেখলে ও বিচার করলে, তার স্বরূপ প্রকাশ কবা সম্ভব নয়। উপযোগবাদীদের গুরু ম্যালিনৌস্কি (B. Malinowski) থেকে আধুনিক সংস্থানবাদীদেব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত লেভি-স্ট্রাউস পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানেব অভিযান বাস্তবিকই রোমাঞ্চকব। প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে ম্যালিনৌস্কিব অন্বেষণ আবম্ভ এবং লেভি-স্ট্রাউসের অন্বেষণ আরম্ভ প্রধানত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল (১৯৫০ ও ৬০-এর দশক) থেকে। মানুষেব সমাজ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য, মানুষেব মানসলোকের চিন্তাভাবনা, চিন্তার (thought) স্বরূপ ও ধারাবিচার ইত্যাদি বিষয়ে ম্যালিনৌস্কি ও তাঁর ছাত্রশিষ্যদের (র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, বেমন্ড ফার্থ এবং অন্যান্যবা), এবং লেভি-স্ট্রাউস ও তাঁব অনুগামীদের অন্বেষণের ফলে নৃবিজ্ঞানের বিস্ময়কর সমৃদ্ধি হয়েছে।"

উপযোগতত্ত্বের অন্তিম সিদ্ধান্ত হল, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির একটি কৌশল হল 'সংস্কৃতি' এবং এই প্রয়োজন হল মূলতঃ ঔদরিক ও যৌন। এর সঙ্গে থাকে সেই সংস্কৃতি-সম্ভূত কতকগুলি অতিরিক্ত প্রয়োজন। পণ্ডিতদের মতে, একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে একটা প্রথা এবং তার থেকে সংস্থা। প্রত্যেকটি সংস্থা-প্রথার মধ্যে আছে নানা স্তর বিন্যাস। অবশেষে সংস্থা-প্রথাগুলিকে সমাজসম্মত কিংবা বিধিসম্মত (Legiti-mize) কববাব জন্য সৃষ্টি করা হয় নানারকমের অতিকথাব সনদ (Mythical Char-acter) এবং সেগুলিকে প্রলেপ দেওয়া হয়। এর ফলে সংস্কৃতি অখণ্ড রূপে স্থিত হয়। অবশ্য এই উপযোগ তত্ত্ব সকলে মানেন না। এ নিয়েও তর্ক-বিতর্ক রয়েছে।

উপযোগবাদীদের এই সব সিদ্ধান্তের মধ্যে মার্কসবাদ কিছুটা ছায়া ফেলেছে। তবে মার্কসবাদ এখানে অনেকটাই বিকৃত। এই প্রসঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন বিনয় ঘোষ মহাশয়। তিনি উপযোগতত্ত্বের মধ্যে মার্কসবাদের সামান্য উপস্থিতি প্রসঙ্গে

লিখেছেন ঃ

"উপযোগবাদীদের এইসব কথাবার্তার মধ্যে যৎকিঞ্চিত মার্কসবাদের (Marxism) গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা পচাগন্ধ। যেমন ম্যালিনৌস্কি নিজেই বলেছেন ঃ

"It is one of the remarkable paradoxes of social science that while a whole school of economic metaphysics has erected the importance of material interests—which in the last instance are *always food interests*—into the dogma of materialistic determination of all historical process, neither anthropology nor any other serious branch of social science has devoted any serious attention to food. *The anthropological foundations of Marxism or anti-Marxism are still to be laid down.*" (Italics-এ লেখাগুলি বিনয়বাবুর। উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে Malinowski-র 'The Sexual Life of Savages' বইটির থেকে)
।

"তরুণ নৃবিজ্ঞানী কুপাব (জন্ম ১৯৪১) মার্কসবাদ বিষয়ে ম্যালিনৌস্কির এই মন্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ Of all the triumphs of Malinowski's reductionist impulse, this must surely be the greatest, *the reduction of Marxism to a sort of dietetics."*(Italics-এ লেখাগুলি বিনয়বাবুব। উদ্ধৃতিটি নেওযা হযেছে Adam Kuper-এব লেখা থেকে)।

বিনযবাবু লিখেছেন ঃ "ম্যালিনৌস্কির উপযোগতত্ত্বের তরলীকরণেব এইটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত—মার্কসবাদকে এক ধবনের খাদ্যতত্ত্বে দ্রবীভূত করা। আজ যদি ম্যালিনৌস্কি জীবিত থাকতেন তাহলে 'anti-Marxism'-এর সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপনে, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভযক্ষেত্রে, 'functionalism'-এর বিজয় অভিযান লক্ষ্য কবে, বিশেষ করে আমেরিকায়, তিনি চমৎকৃত হতেন। অধিকন্তু মার্কসবাদের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি যে যথেষ্ট দৃঢ়, একথাও তিনি ইচ্ছা থাকলে বুঝতে পারতেন। সংস্থানবাদী (Structuralist) নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রাউস মনে করেন তিনি মার্কসইস্ট, অস্তিবাদী (Existentialist) দার্শনিক-সাহিত্যিক জ্যঁ-পল সার্ত্রও মনে করেন তিনি মার্কসইস্ট, যদিও উভয় মনীষীর মার্কসইজম আমাদেব কাছে অতিশয় দুর্বোধ্য এবং উভয়েরই মার্কসইজম-এব মধ্যে পার্থক্য বিস্তর, তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতর্কও হয়েছে অনেক। লেভি-স্ট্রাউসেব 'স্ট্রাক্‌চারাল ডাযেলেকটিকস' অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অতিসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির অগম্য। তৎসত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সমাজবিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস অনুশীলনের ক্ষেত্রে এবং ইতিহাসের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সংযোগ স্থাপনে লেভি-স্ট্রাউস অনেক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন, অনেক অন্ধকার অলিগলিতে আলোক সম্প্রাত করেছেন, যদিও আদি জনগোষ্ঠীর অতিকথা (Myth), টোটেমিজম প্রভৃতি তাঁর অনুশীলনের নির্বাচিত বিষয়।"

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে নৃবিজ্ঞানীরা 'Culture' শব্দের পরিবর্তে 'Cul-

tures' কথাটা ব্যবহার করছেন। এর ফলে কালচার ব্যাপারটা অনেক বেশি ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। সংস্কৃতিতে এখন প্রবেশ করেছে 'trait', 'complex', 'pattern', 'organic whole' ইত্যাদি। সামাজিক ভাষাতত্ত্ববাদীদের মতে আঞ্চলিক ভাষা (Local Dialect) সংস্কৃতি বিচাবে অত্যন্ত মূল্যবান। ভাষার উচ্চারণ রীতি, ভাষাব ধ্বনি ইত্যাদির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলির সঙ্গে মর্যাদাভেদ, শ্রেণীভেদ, জাতিবর্ণভেদ প্রভৃতির প্রায় প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতিব বিশ্লেষণে এই 'সামাজিক ভাষাতত্ত্ব' নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। অবশ্য এই পদ্ধতিতে সংস্কৃতিব বিশ্লেষণ বেশ জটিল।

সংস্থানবাদীদের (Structuralist) সংস্কৃতি নিয়ে বক্তব্য অনেকটাই উপযোগবাদীদের অনুরূপ। এঁরা জোর দেন সংস্কৃতির অখণ্ডতাব উপর। এঁদের মতে, সংস্কৃতির স্বরূপ প্রকাশ করা যায় কেবলমাত্র তাব সামগ্রিক সুবিন্যস্ত ও সুসংহত স্থায়ী ভিত্তির (Infrastructure) বিচার ও বিশ্লেষণে। লেভি-স্ট্রাউস এই সংস্থানবাদীদের মুখপাত্র। বিখ্যাত এই নৃবিজ্ঞানী নিজেকে মনে কবতেন মার্কসবাদী। উপযোগবাদেব মধ্যে যেমন কিছুটা মার্কসবাদ বযেছে, তেমনি সংস্থানবাদেব মধ্যেও বযেছে মার্কসবাদ। তবে মার্কসবাদ এখানে কিছুটা বিকৃত যা একটু আগেই বলা হযেছে।

একালের বিজ্ঞান সংস্কৃতিব এক নতুন ধবনেব বিশ্লেষণের কথা বলছে। ইদানীং তাই সংস্কৃতির বিচার কবা হচ্ছে 'জৈব-নৃতাত্ত্বিক' (Bio-anthropoligical) দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নৃবিজ্ঞানীবা বলছেন "Culture traits are analogous to genes.... In the gene and further in the chromosome, the information is encoded chemically, in the trait the information is encoded culturally." জৈব-নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই সম্ভবত সংস্কৃতিব বিস্তাববাদতত্ত্ব সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। কোনও বিকৃত স্বার্থান্বেষী ব্যাখ্যা সেটা নিশ্চযই হবে না। জিন-তত্ত্বই বলতে পারবে কেন হরপ্পা-মিশর-সুমেরীয়রা আগে সভ্য হল এবং সমসাময়িককালে আর্যরা বর্বর রয়ে গেল। ব্যাখ্যা করতে পারবে সভ্যতাব বিকাশ বৈখিক (Linear) নয, তরঙ্গায়িত কেন। গর্ডন চাইল্ড যে সভ্যতার উত্থান-পতনেব কথা বলেছেন তাব ব্যাখ্যাও 'ম্ভব হবে এবং হচ্ছেও জিন-তত্ত্বের মাধ্যমে। সংস্কৃতিব ব্যাখ্যায় এই জিন-তত্ত্ব নতুন দিগন্ত এনেছে।

মানুষেব সংস্কৃতিবৃত্ত তাদেব জীবনবৃত্তকে অনেকটা অধিকার করে বসে। উপযোগবাদীদের বক্তব্য মত বহিরাগত উপাদান যদি মূল সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিযোজিত না হযে যায়, তাহলে তাব উপযোগিতা থাকে না। বহিরাগত এই উপাদানকে মূল-সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্নসত্তাসম্পন্ন হতে হবে। তবেই তা মূল-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করবে। আর তা না হলে ওই বহিবাগত উপাদান মূল-সংস্কৃতির অপকর্ষও ঘটাতে পারে। বিনয় ঘোষ মহাশয় 'পশ্চিবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থটি লেখার আগে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামে-গঞ্জে, কারখানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনুসন্ধানের প্রয়োজনে। তিনি দেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের কারখানা অঞ্চলে সংস্কৃতিবৃত্ত কী ভাবে মানুষের জীবনবৃত্তকে গ্রাস করে বসে আছে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা না বললে, বহিরাগত

উপাদান যে মূল-সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না, যদি তা এর সঙ্গে অভিন্নসত্তাসম্পন্ন না হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে আমরা বঞ্চিত হব। ঘোষ মহাশয়ের এই অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কথা বললেও, বাস্তবে তা ওই উপযোগ - তত্ত্বের সত্যতাই প্রমাণ করে। তাঁর লেখায় আসি।

"লেভি-স্ট্রাউস এক্ষেত্রে কাণ্ডারী নন, যদিও তাঁর 'totemism' ও ভারতীয় 'caste system'-এর বিশ্লেষণ অসাধারণ এবং তার দ্বারা 'প্রকৃতি' (Nature) ও 'সংস্কৃতি'র (Culture) পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। সমগ্র প্রকৃতির শ্রেণীভেদ করে কেন মানুষ 'টোটেম'-এর সাহায্যে? 'Why do men go to such lengths to classify out the universe?' মানুষের নিজেদের মধ্যে যখন শ্রেণীভেদ দেখা দিতে থাকে তখন প্রাথমিক অবস্থায় প্রকৃতির প্রতীকের সাহায্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভেদের সীমা টানে। সেই প্রতীক হল টোটেম, অর্থাৎ তোমবা বাজপাখি, আমরা ময়ূর, তোমরা খরগোস, আমরা বাঘ, তোমরা হাতি, এরকম অগুণতি বিভেদবিভাগ, এবং টোটেম থেকে বর্ণ-বৈষম্য (Caste) হল Culture-এ প্রবেশ। আমাদের জাতীয় পতাকা এইরকম, তোমাদের জাতীয় পতাকা ঐরকম, ওদের জাতীয় পতাকা সেইরকম, যুক্তিক্রম অনেকটা এই ধরনের। 'The differences between animals, which man can extract from nature and transfer to culture... are adopted as emblems by groups of men in order to do away,with their own resemblances' এবং 'Castes picture themselves as natural species while totemic groups picture natural species as castes' —উভয়েরই সাহায্যে মানুষ চেষ্টা করে 'to overcome the opposition between nature and culture and think of them as a whole.' (The Savage Mind by Claude Levi-Strauss)

"পশ্চিমবঙ্গে বর্ণবিভেদগত যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য এখনও দেখা যায়, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে, লেভি-স্ট্রাউসের এই বিশ্লেষণরশ্মিতে তার মর্মস্থল অনেকটা আলোকিত হয়ে ওঠে, কিন্তু আরও অনেক আনাচ-কানাচ অন্ধকার হয়ে থাকে। একবৃত্তের গণ্ডির মধ্যে সংস্কৃতির স্থিতি এবং দীর্ঘস্থিতির নিমিত্ত কারণ কি? সেকথা বারংবার মনে হয়।

"প্রধান কারণ, পশ্চিবঙ্গের অধিকাংশ মানুষের একই জীবনবৃত্তে অবস্থান। কোনো বহিরাগত উপাদান-কারণ (Material cause) অথবা ভাবগত-কারণ (Ideological cause) এই জীবনবৃত্ত থেকে তাদের বিকেন্দ্রিত করতে পারেনি, অথবা এই বৃত্তের পরিধিও তেমন প্রসারিত করতে পারেনি। তাই একই সংস্কৃতিবৃত্তে চক্রাকারে আবর্তন এবং দীর্ঘকাল আবর্তনের ফলে জীবনবৃত্তের নিয়ন্ত্রক হিসেবে অনেক বেশি প্রভাবশালী সংস্কৃতিবৃত্ত। আমাদের দেশে তাই ইউরোপ-আমেরিকার মতো Urbanization অথবা Proletarianization হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা সমগ্র সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করার দিক থেকে সামান্য বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে তার বিকাশ আরও উৎকট হয়েছে। বাঙালী

শ্রমিক, কারখানার বাইরে গৃহস্থ অথবা চাষী, আধা-চাষী, গ্রামের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো জেলায় যে-কোনো কারখানার বাঙালী শ্রমিকদের জীবনবৃত্ত পর্যালোচনা করলে এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনা মানসতা আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বেশ দৃঢ়মূল রয়েছে, এমনকি কবচমাদুলিধারী (গ্রহরত্ন তো বটেই) বাঙালী বায়োকেমিস্ট ফিজিসিস্টদের মধ্যেও। তাই কলকারখানার চৌহদ্দির মধ্যে অথবা ময়দানে যে বাঙালী হিন্দু মজুর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে মার্ক্স-লেনিনের নামে বিপ্লবের স্লোগান দেয়, সেই বাঙালী মজুব নিজের ঘরে ফিরে এসে (মজুরদের কোয়ার্টারে নয়) হাতজোড় করে নারায়ণশিলার পূজো করে, গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরে গিয়ে মজুরিবৃদ্ধির জন্য মানত করে। এটা কিন্তু মার্ক্সীয় অর্থে মোটেই Contradiction নয়, কারণ এরকম আচরণ হল ঘরে ফিরে এসে আফিসের পোশাক ছেড়ে ফেলার মতো অর্থাৎ মার্ক্স-লেনিন, ফিজিক্স-কেমেষ্ট্রি, এগুলি আজও আমাদের কাছে আফিসেব পোশাকের মতো, ঘরোয়া পরিবেশে অস্বস্তিকর, তাই পবিত্যাজ্য। আদতে এটা হল সংস্কৃতিবৃত্তের পূর্ণগ্রাস জীবনবৃত্তকে। সংস্কৃতিবৃত্তকে 'Ideological Superstructure' এবং জীবনবৃত্তকে 'Material Base' বলা যায়। সংস্কৃতিবৃত্তেব প্রাধান্য পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক এবং জনসাধারণের জীবনবৃত্তকে তা যে প্রায গ্রাস করে ফেলেছে তাতে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। গোড়াতে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা গত পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুবে, একই গ্রামে একই অঞ্চলে একাধিকবাব গিয়ে, একই উৎসব একই মেলা একই অনুষ্ঠানকর্ম আচাব-বিশ্বাস-দেবদেবী-মন্দির দেখে দেখে একেবারে দূর হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃতিবৃত্ত নিযন্ত্রণ (Control) কবছে জীবনবৃত্তকে এবং জীবনবৃত্তের অর্থনীতিকেও। সংস্কৃতিবৃত্ত এখানে 'Manipulator', জীবনবৃত্ত তাব দ্বারা 'Conditioned', কাজেই এমন যদি কাম্য হয় যে জীবনবৃত্তকে স্থিরশান্ত বাখতে হবে, মধ্যে মধ্যে তার মধ্যে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলে তাকে প্রশমিত করতে হবে, তাহলে সংস্কৃতিবৃত্তকে 'ম্যানিপুলেট' করে তা সহজেই করা সম্ভব হতে পাবে। মার্কসইজমকে যাঁরা 'Dogma' বা বদ্ধসংস্কাব মনে করেন, বিজ্ঞান মনে করেন না, তাঁদের কাছে এরকম কথা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে।”

বিবর্তনবাদ, বিস্তারবাদ, উপযোগবাদ কিংবা জৈব-নৃতাত্ত্বিক মতবাদ আলাদাভাবে যাই বলুক না কেন সব মতবাদেরই কিছু কিছু না সত্যতা রয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে এই সব মতবাদ কোন শেষ কথা বলে না। তবে সংস্কৃতির বিবর্তন বা পরিবর্তনের কিংবা বিভিন্নতার ব্যাখ্যায় একটা মতবাদ হয়ত আরেকটার চেয়ে অনেকটা বেশি যৌক্তিক কথা বলে। উপযোগতত্ত্বের চেয়ে জৈব-নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব সংস্কৃতির বিবর্তনের ব্যাখ্যা আরও অনেক ব্যাপকভাবে, বাস্তবভাবে এবং যৌক্তিকভাবে করতে পারে। তাই কোনও বদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী না হয়ে যা বাস্তব সত্যের অনেক কাছাকাছি এবং যে ব্যাখ্যা অনেকটা বেশি যৌক্তিক তা মেনে নেওয়াই বিজ্ঞানসম্মত।

মূলতঃ ঔদরিক ও যৌন প্রয়োজনেই সংস্কৃতির উৎপত্তি—এ কথা সর্বাংশে সত্য

নয়। মানুষের মন বলে একটা জিনিষ আছে, যা কেবল বস্তুনির্ভর নয়, তারও একটা বিশাল অবদান আছে সংস্কৃতির নির্মাণে। সেটাও উপেক্ষণীয় নয় কোনও মতেই। যাইহোক, এটা একেবারে সত্যি ঘটনা যে, পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নততর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। পৃথিবীর সব জনগোষ্ঠী এক সঙ্গে একই রকম সভ্য হয়ে উঠে নি। এই গ্রহটিব বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ার দাক্ষিণ্যে জিনের ক্রম-বিবর্তন এমনভাবে হয়েছে যে, সমসাময়িক কালে মিশর, মেসোপটেমিয়া, হরপ্পা ,মায়া চৈনিক সভ্যতাব অভ্যুদয় ঘটলেও পৃথিবীর অন্য বহু জনগোষ্ঠী সেই সময় বর্বরই ছিল এবং এই সব জনগোষ্ঠীর সভ্য হয়ে উঠতে আরও দেড়-দু' হাজার বছর লেগেছিল। পৃথিবীর সর্বত্র যেমন ধান কিংবা গমের চাষ একসঙ্গে শুরু হয় নি, তেমনি পৃথিবীর সব বন্য মানুষ এক সঙ্গে সভ্য হয়ে ওঠে নি। স্থানে স্থানে স্তরে স্তরে সভ্যতার ক্রমোন্নতি ঘটেছে এবং সে বিকাশ বিকীর্ণ হয়েছে। হরপ্পার সভ্যতাও বিকীর্ণ হযে অন্যান্য বহু সভ্যতার সৃষ্টি কবেছে। সমসামযিক কয়েকটি কম উন্নত সভ্যতাকেও উন্নত কবে তুলেছে। সুতবাং সমগ্র মানবজাতির একসঙ্গে সভ্য হয়ে ওঠাব কোনও তত্ত্ব এক কল্পকাহিনী মাত্র।

আগেই বলেছি যে, ধান কিংবা গম এই পৃথিবীর সর্বত্র একসঙ্গে চাষ কবা শুরু হয় নি। ভূমিকর্ষণ কবে ধানচাষের শুরু হযেছিল থাইল্যাণ্ডে। বোনাল্ড শিলার (Ronald Schiller) থাইল্যাণ্ডেব নবোপলীয় সভ্যতার বিশদ বিববণ দিযে বলেছেন যে, প্রায ১০,০০০ বছব আগে নবোপলীয় যুগেব শেষভাগে থাইল্যাণ্ডেব মেয়েরা ভূমিকর্ষণ কবে প্রথম যে শস্যটি উৎপাদন কবেছিল তা হল ধান। পৃথিবীব আর কোনও নবোপলীয় যুগেব নরগোষ্ঠী তখনও ধানচাষ কবে নি, যদিও বহু নবগোষ্ঠী তখন নবোপলীয় সভ্যতাব ধারক হয়ে গেছে। সি. ও সযাব (C.O. Sauer) তাঁর 'এগ্রিকালচারেল অরিজিনস্ অ্যাণ্ড ডিসপারস্যাল' গ্রন্থে লিখেছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াই নবোপলীয় বিপ্লবের সবচেযে প্রাচীন লীলাকেন্দ্র। কারলো চিপোলো (Carlo Cipollo) তাঁব 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ওযার্ল্ড পপুলেশন' বইটিতে লিখেছেন যে, ধানের চাষ বঙ্গোপসাগরের আশপাশের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলেই কোন জায়গায শুরু হয়েছিল। আবার পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'একস্‌ক্যাভেসনস্ অ্যাট পাণ্ডুবাজার ঢিবি' গ্রন্থে বলেছেন যে, ধানের চাষ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শুরু হয় বাঙলায এবং এখান থেকে সেই চাষ চলে যায় চীনদেশে।

তেমনি প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন যে, নবোপলীয় যুগের শেষের দিকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগে আফগানিস্তান ও বালুচিস্তানের অনেক জায়গায়ই সর্ব প্রথম গম ও যবের চাষ শুরু হয়েছিল। এগুলি যে ভারতীয় নবোপলীয় সভ্যতার অংশ বিশেষ তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের প্রাক-হরপ্পীয় সভ্যতার অবদান হল কৃষিকার্যের আবিষ্কার এবং গম ও যবের চাষের সূত্রপাত করা। বাঙলাদেশের ধান চাষই চলে যায় হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলে। লোথাল অঞ্চলের লোকজন যে ভাত এবং মাছের ঝোল খেত বাঙালিদের মতই কিংবা বলা যায় বাঙালিদের অনুকরণে, তার বহু প্রত্নতাত্ত্বিক

নিদর্শন মিলেছে এইসব অঞ্চলের উৎখননে। মোদ্দা কথা হল, ধানের চাষ কিংবা গমের চাষ একটা বিশেষ জায়গায় শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তা ঘটেছিল বিভিন্ন সময়ে, বহু সময় ধরে। নবোপলীয় যুগের সব নরগোষ্ঠী কিন্তু একই সঙ্গে ধানের চাষ আবিষ্কার কবেনি এবং গমচাষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তেমনি হরপ্পা সভ্যতার মত নগবভিত্তিক সভ্যতা সে সময়ের পৃথিবীর সব নরগোষ্ঠীর মধ্যে একসঙ্গে আবির্ভূত হযনি। হবপ্পীয়রাই এ ব্যাপারে প্রথম। সারা পৃথিবীতে একমাত্র হবপ্পীয়রাই এমন উন্নত নগর সভ্যতার আবিষ্কাব ও পত্তন করেছিল ৫০০০ বছর আগে। সে সময় হরপ্পা সভ্যতার তুলনা একমাত্র সে নিজেই।

সুতরাং পবিবেশ যেমন ধান, গম, যব চাষেব আবিষ্কার ও চাষ করার সুবিধা করে দিয়েছিল, তেমনি সভ্যতাব উন্নযনে এবং উন্নততর সভ্যতার গোড়াপত্তনে এক বিশেষ নবগোষ্ঠীকে সাহায্য করেছিল তাদেব শরীর কোষের ক্রোমোজমের জিনসমূহ। এই বং.ম নবগোষ্ঠীব জিনের এই পবিবর্তন সম্ভবত ঘটিযেছিল প্রকৃতি এবং তার পরিবেশ। জৈব-নৃতাত্ত্বিক মতবাদ দিয়েই তাই ব্যাখ্যা কবা যায, কেন পৃথিবীর সব নবগোষ্ঠী হরপ্পা সভ্যতাব মত উন্নত নগরবিত্তিক সভ্যতা একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারলো না পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। সংস্কৃতিব দিক থেকে কোন নরগোষ্ঠী তাই অনেক এগিয়ে, আবার বহু নবগোষ্ঠী সংস্কৃতিতে তথা সভ্যতায বহু পিছিযে। তাই হবপ্পা সভ্যতা এসেছে অনেক আগে বা সবাব আগে, অথচ ইউবোপীযবা সভ্য হযেছে বহু পরে। সে কারণেই, বুদ্ধদেব যখন বিহাব অঞ্চল জুড়ে তাঁব জগৎ কাঁপানো ধর্মমত প্রচাব কবছেন, তখনও স্যাকসনরা বাস কবছে গাছে, তখনও তাবা মাটিতে নামেনি। সুতবাং মেনে নিতেই হয় সভ্যতার শুরুতে কিছু ভাগ্যবান জনগোষ্ঠীব মধ্যে প্রথম সংস্কৃতিব বিকাশ ঘটেছিল এবং তারপর ঘটেছে তার বিস্তার।

মানুষেব সভ্যতা বিচারেব পরিমাপ কেবলমাত্র প্রাযুক্তিক কলাকৌশলের দৈনন্দিন প্রযোগেব উপব নির্ভর কবে না। মানুষ তাব পশুজীবন থেকে কতটা মানুষে রূপান্তরিত হযেছে তাব পরিমাপই বলে দিতে পারে কোনও মানুষ কতটা সভ্য। তেমনি কোনো নরগোষ্ঠীব সংস্কৃতিই বলে দিতে পাবে তারা কতটা সভ্য হয়েছে, বেরিয়ে এসেছে তাদের পশুত্ব থেকে। কোন নরগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষেব মধ্যে মানবিক গুণগুলির কতটা বিকাশ ঘটেছে তা প্রতিফলিত হয় তাদের জীবনচর্যায় অর্থাৎ তাদের সংস্কৃতিতে। মানবিক গুণগুলির সমৃদ্ধিই সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। তাই কেবলমাত্র উন্নততব যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রয়োগ দিয়ে সভ্যতার পরিমাপ কবা যায না।

উন্নত সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, যে সব জায়গায় নদীর জলে সহজে চাষবাস করা যেত এবং নদীর বন্যার জলের পলিমাটি জমে চাষের জমি উর্বরহত। সেই জন্য মিশর সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল নীলনদের তীরে, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীব ধারে এবং হরপ্পা সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল সিন্ধুর বিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চলে। পরবর্তীকালে ভাল বৃষ্টিপাত হওয়া অঞ্চলে সভ্যতার বিস্তার

ঘটে। সৃষ্টি-কল্পনা, দক্ষতা, উৎপাদন এবং সম্পদ সংগ্রহ সভ্যতার উন্নতি এবং বিস্তার দুই-ই ঘটায়। ম্যাকনেইল সাহেব (William II McNeill) লিখেছেন ঃ

"Whatever the ultimate driving wheels of civilized history may be, we can safely assume that the skills and ideas, as well as the wealth and beauty, attained by the early civilizations of Sumer, Egypt, and the Indus deeply impressed strangers who came into contact with those ancient cities, temples, and palaces. So far as they could, strangers no doubt wished to acquire for themselves the goods of civilization; but for a long time this was only possible in river flood-plains. Here crops were more abundant because of the natural fertility of the soil. Annual floods deposited fresh silt, and made it possible to harvest wheat or barley year after year from the same fields. Perhaps most important of all, the concerted labour needed to construct and maintain irrigation works required unusual social discipline and centralization of control. Without labour-scale organized common effort, which had to be planned and managed by someone irrigation would break down and crops fail

ওই তিনটি সভ্যতারই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা নিশ্চযই খুব শক্তিশালী ছিল, না হলে এমন উন্নত সুশৃঙ্খল নাগবিক জীবনযাত্রা সম্ভব হত না। হবপ্পা সভ্যতাব অন্ততঃ ৬০টি শহর আবিষ্কৃত হয়েছে। সব শহরগুলির গঠনশৈলী প্রায় একইবকম। এ রকম পবিকল্পিত শহর বানিযে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অমন উন্নত মানে বজায় বাখতে প্রয়োজন দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন এবং হরপ্পার নগবগুলিতে তা ছিল। সে শাসন-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ছিল কিংবা রাজতান্ত্রিক তা ঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান কবা হয যে, তা ছিল রাজতন্ত্রের শাসন। কারণ বর্বর আর্যরা এদেশে এসে সভ্য হওয়াব পব হবপ্পীয়দের রাজতন্ত্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে আর্যাবর্তেও রাজতন্ত্র চালু করেছিল। ঋগ্বেদ অনার্য এবং আর্য উভয় নরগোষ্ঠীরই রাজার কথা বলেছে।

হরপ্পার নগর সভ্যতা যেন হঠাৎই এসেছিল। সভ্যতার রৈখিক অগ্রগতির তত্ত্বটা যেন এই সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলেই মনে হয়। প্রায় ৫৫০০ বছব আগে প্রাক-হবপ্পীয সভ্যতার সূচনা হয় কৃষিকার্যের প্রবল উন্নতির মধ্য দিয়ে। প্রচুব ফসল উৎপন্ন হয়। উদ্বৃত্ত ফসল সম্পদে রূপান্তরিত হয় বাণিজ্যের ফলে। আন্তর্বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে বহির্বাণিজ্যেও হরপ্পীয়রা প্রবল উন্নতি করে। এইভাবে কৃষি এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংগৃহীত হয়ে প্রাক-হরপ্পীয় যুগে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রবল সমৃদ্ধি ঘটলেও সেখানে প্রায় ৪৬০০ বছর আগে যেন হঠাৎই নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। সে আবার যেমন তেমন নগর-সভ্যতা নয়, একেবারে প্রবল আধুনিক নগর সভ্যতা, যার ফলে

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি নগরগুলি হয়ে উঠেছিল একেবারে একালের আধুনিক শহর। এই সব নগর কোন কোনও ক্ষেত্রে আধুনিক শহরগুলির তুলনায় উন্নততরও ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা কিন্তু এমন কোন নিদর্শন খুঁজে পান নি যেগুলিকে প্রাক-হরপ্পীয় কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে হরপ্পীয় উন্নত এই নগর সভ্যতার বিবর্তন স্তর বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এটা এখনও অব্যাখ্যাত যে, সম্পদশালী কৃষিভিত্তিক প্রাক-হরপ্পীয় গ্রামীণ সভ্যতা কেমন করে অতি উন্নত নগর সভ্যতায় রূপান্তরিত হল ৬০০/৭০০ বছরের মধ্যে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা হঠাৎই যেন উন্নততম নগর-সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং ৪৬০০ বছর আগেই তার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। বিকাশের মধ্যবর্তী স্তরগুলি অনুপস্থিত। যদিও হরপ্পায় প্রায় সাতটি বিভিন্ন স্তর এবং মহেঞ্জোদারোতে প্রায় চারটি বিভিন্ন সময়ের স্তর পাওয়া গেছে, তবুও কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা থেকে উন্নত নগবভিত্তিক সভ্যতায় আসতে যে ক্রম-বিবর্তনের প্রয়োজন তা যেন হবপ্পা সভ্যতার ইতিহাসে অনুপস্থিত। হঠাৎই যেন এমন উন্নত নগব সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছে। তাই মনে হয়, কোথায যেন একটা 'মিসিং লিংক' (Missing Link) রয়ে গেছে। ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক সবাই খুঁজছেন সেই 'মিসিং লিংক'। খুঁজছেন কীভাবে ক্রম-বিবর্তনেব ধাবা বেয়ে সম্পদশালী কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা রূপান্তরিত হল হরপ্পাব অত্যুন্নত নগর সভ্যতায়।

সভ্যতার বৈখিক অগ্রগমন কিংবা বিকাশ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। একদল পণ্ডিত মনে করেন সভ্যতার বিকাশ বৈখিক (Linear), অর্থাৎ সভ্যতার ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে। সভ্যতা তাঁদের মতে উন্নত স্তব থেকে উন্নততর স্তরে বিবর্তিত হয়। অপরদল মনে করেন সভ্যতার বিকাশ চক্রবৎ আবর্তিত হয়। অর্থাৎ একবার তার বিকাশ ঘটে এবং সভ্যতা একটা চরমসীমায় পৌঁছায়। আর তারপর তার সংকোচন ঘটে এবং সভ্যতা লয় পায় কিংবা তার প্রাবম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই প্রসারণ-সংকোচন তথা উত্থান-পতন সাবা বিশ্বের ধর্ম এবং সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা বিরাজমান। প্লাটো (Plato) বলতেন যে, বাজতন্ত্র থেকে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) পেরিয়ে আসে গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র থেকে আবার ফিরে আসবে রাজতন্ত্র। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, এক সময় ব্রাহ্মণ্য শাসন-ব্যবস্থা ছিল, সেখান থেকে শাসনব্যবস্থা আসে ক্ষত্রিয়দের হাতে। তারপর ক্ষত্রিয়দের হাত পেরিয়ে তা চলে আসে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের হাতে। এখন তা চলে এসেছে শূদ্র বা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। সভ্যতার বিবর্তনে শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আবার ফিরে যাবে ব্রাহ্মণদের হাতে। হিন্দু দর্শনের মতে সভ্যতা চক্রের মত আবর্তিত হয়, তার উত্থান-পতন আছে এবং তার গতি কেবলই বিকাশমুখী রৈখিক অগ্রগতি নয়। তার গতি তরঙ্গায়িত, উত্থান ও পতন সমন্বিত। ঢেউয়ের মত সভ্যতা একবার তার উন্নতির চরম শিখরে উঠছে এবং কিছুকাল পরে সে আবার অবনতির চরমতম নিম্নতলে নেমে যাচ্ছে। সভ্যতার বিকাশ তাই তরঙ্গায়িত, আর অগ্রগতি উত্থান-পতন সমন্বিত।

বহু সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক সভ্যতার তথা ইতিহাসের এই চক্রাবর্তন মানেন না। তাঁদের মতে সভ্যতা কিংবা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মেনে নিলে এটা মানতে হয় যে, সভ্যতা এবং ঘটনাসমূহ একটা নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে চিরকাল বিরাজ করছে। আর সে রকম কোন বদ্ধ পরিকাঠামোর মধ্যে যদি সভ্যতা কিংবা ইতিহাস অবস্থান করতো তা হলে আমরা ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা বলে দিতে পারতাম। সভ্যতা কিংবা ঘটনাবলীর ভবিষ্যত রূপ আমরা জানিনা। সুতরাং সভ্যতার বা ইতিহাসের চক্রাকারে আবর্তন কিংবা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাদের অগ্রগমন এই সব সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকরা মানেন না। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম ম্যাকনেইলের (William H McNeill) কথায় ফিরে আসি :

"The prospect that men may end up by blowing themselves to bits has given fresh impetus to ancient speculations about the possibility of future decline of civilization. The idea that human affairs pass through a natural cycle of growth followed by inevitable decay is very old. Plato, for example, argued that political constitutions passed from monarchy to aristocracy to democracy and back again to monarchy, which, however, lacking customary limits, would be harshly tyrannical. Variations upon this theme became a commonplace of political wisdon among the ancients, and the idea revived in western Europe with the Renaissance.

The Muslim historian Ibn Khaldun developed a different sort of cyclical theory. He detected in history a pattern of conquest from the desert followed by corruption of the rulers as a result of luxury After three generations, corruption prepared the way for fresh conquest from the desert, to begin the cycle afresh. In more recent centuries, Vico, Herder, Hegel, Karl Lamprecht, and many other European thinkers tried in different ways to combine Judeo-Christian views of time and history as progress in a straight line with the classical notion of historical cycles. On the whole, even those who thought cyclic ups and downs were inevitable accepted optimistic overall estimates of human progress until World Wars I and II. These catastrophes gave the idea of an impending decline and fall a wide hold on popular attention. Oswald Spengler in Germany after World War I and Arnold J. Toynbee in Britain after World war II gained wide audiences for theories of history that seemed to imply

an inevitable future decline of Western Civilization.

Yet most historians and social scientists are not persuaded by the arguments from analogy upon which both Spengler and Toynbee rely. The limits of the possible remain for all mankind a profound enigma. Who can say what the relationship between human wills and the processes that remain beyond human control or even comprehension really is? That there are some regularities and recurrent patterns in human affairs seems self-evident. But this does not prove that the course of human history as a whole is caught and imprisoned within some sort of necessary and inescapable cycle. After all, the discovery of predictable patterns would change the conditions within which men make decisions, and knowing (or believing they knew) the consequences of their acts, men might change their behavior and thus alter the supposed cycle of history.

For the present and foreseeable future, our knowledge of the nature of human society falls far short of permitting accurate or fully credible predictions. The future remains inscrutable. If there is an inevitable pattern to the future, we simply do not know what it is. We must therefore act in ignorance and as though we were free. Like all our predecessors, we have the task and opportunity of modifying mankind's future each day with every task we perform."

ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত গতি কিংবা সভ্যতার তরঙ্গায়িত চলন নিয়ে এই রকম বহু বিতর্ক রয়েছে। ভারতে একদিন নবোপলীয় সভ্যতার উন্নতি ঘটতে ঘটতে এসেছে হরপ্পীয় তাম্রাশ্ম সভ্যতা। নগর সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছে ৪৬০০ বছর আগে। ৩৮০০ বছর আগে হরপ্পীয় সভ্যতার পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় নগর-সভ্যতার। আবার শুরু হয় কৃষিভিত্তিক ভারতীয় আর্যসভ্যতা। এরই শেষ পর্বে ৩০০০ বছর আগে আবার ফিরে আসে নগর সভ্যতা। হরপ্পীয় রাজতন্ত্র থেকে বৈদিক আমলে সামান্য কিছু কাল গণতন্ত্র কিংবা অভিজাততন্ত্র এলেও বৈদিক আমলের শেষে আবার ফিরে আসে রাজতন্ত্র। বুদ্ধদেবের আমলে বজ্জিদের মধ্যে গণতন্ত্র চালু থাকলেও ভারতের অন্যত্র তখন ছিল রাজতন্ত্র। বহুকাল পরে রাজতন্ত্রের বেড়াজাল পেরিয়ে এখন আবার চলছে গণতন্ত্র। সুতরাং পুনরাবর্তন একটা আছেই। কিন্তু সেটা কোনও তত্ত্ব বা সূত্র নির্ভর নয়। একদল ঐতিহাসিক এ ধরনের পুনরাবর্তনের একটা তত্ত্ব খাড়া করতে চাইছেন। এই মতবাদ সম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানীরাও চাইছেন সভ্যতার পুনরাবর্তনের তেমন একটা তত্ত্ব বা সূত্র বের করতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সভ্যতার রৈখিক অগ্রগমনে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা ওই

তত্ত্ব বা সূত্র মানতে পারছেন না এবং নানা প্রশ্ন তুলছেন। এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পেলে একদিন হয়ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে সভ্যতার এবং ইতিহাসের পুনরাবর্তন।

নৃতত্ত্ববিদরা বলছেন যে, সভ্যতার বৈপ্লবিক বিবর্তনে মেয়েরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নবোপলীয় যুগের শেষের দিকে মেয়েরাই আবিষ্কার করে কৃষিকাজ। অনার্য মেয়েরাই এই বৈপ্লবিক আবিষ্কার করেছিল। থাইল্যান্ডেই হোক কিংবা আফগানিস্তানে, কৃষিকাজ সর্বপ্রথম মেয়েরাই শুরু করেছিল। কৃষিকাজ আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের যাযাবর জীবন এবং পশুশিকারের জীবন দুই-ই ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। এই অনার্য মেয়েরা ভারতবর্ষে বহিরাগত বর্বর আর্যদের 'বধূ' হয়ে ভারতীয় আর্যসভ্যতার উদ্ভব ঘটায়। মিশ্রণ ঘটে হরপ্পীয় এবং আর্য সংস্কৃতির। সুতরাং ধর্মের মিশ্রণে, সংস্কৃতির মিশ্রণে, সভ্যতার বিবর্তনে অনার্য মেয়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিম মানবের জীবনচর্যাকেই বদলে দিয়েছে নারী। তারা নিজেদের অজান্তেই সৃষ্টি করে ফেলেছে মানুষের সমাজ জীবন। আব ভারতীয় আর্যসভ্যতার মত উন্নত কৃষ্টির সভ্যতাও ভারতেব অনার্য বমণীদের অবদান। এই অবদান তারা রেখেছে নিজেদের অজান্তেই।

সভ্যতা বিবর্তনের শেষকথা বলে কিছু নেই। আমরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই। তাই সভ্যতার পরিণতি কী হবে তা আমরা আজ বলতে পারি না। অতীত সভ্যতা সম্পর্কে হয়তো শেষকথা বলা যায়। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে শেষকথা এখনও বলা যাচ্ছে না, কারণ তার লিপিগুলিব পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। অপঠিত লিপিগুলি নিযে বহু অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু ওগুলির মধ্যে যে সত্য রয়েছে তা আজও অজানা। তাই হরপ্পা সভ্যতা নিয়ে শেষকথা আজও বলা হয় নি। তবে যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে হরপ্পাব অনার্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব। বর্বর যাযাবর আর্যরা নয় বিশ্ববাসীকে সভ্যতার আলো দেখিয়েছে হরপ্পার অনার্যরা। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীকে অতি প্রাচীনকালে অতি উন্নত সভ্যতায় উন্নীত করেছিল হরপ্পীয়রা। বিশ্বে যদি সভ্যতার গৌরব কারও প্রাপ্য হয়, তবে তা পাবে হরপ্পার অনার্যরা। সমস্ত গরিমাই হরপ্পীয় অনার্যদের, নর্ডিক আর্যদের নয়।

প্রায় এক হাজার বছর ধরে আধিপত্য করার পর এখন থেকে প্রায় ৩৮০০/৩৯০০ বছর আগে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটে। আগেই বলেছি, পণ্ডিতেরা হবপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ নিয়ে একমত নন। তাঁরা বলছেন ঃ

"There is no general agreement regarding the causes of the breakdown of Harappan urban society. Broadly speaking, the prin-cipal theories thus far proposed fall under four headings. The first is gradual environmental change such as a shift in climatic patterns and consequent agricultural disaster perhaps coinciding with rapid population growth. Second, some scholars have postulated more precipitous environmental changes, such as tectonic events lead-

ing to the flooding of Mohenjo-daro, the drying up of the Saraswati River, or other such calamities. Third, it is conceivable that human activities, such as invasions of tribes-people from the hills to the west of the Indus Valley, perhaps even Indo-Aryans, contributed to the breakdown of Indus external trade links or more directly disrupted the cities. The fourth theory posits the occurrence of an epidemic or similar agent of devastation. It appears likely that some complex of natural forces compromised the fabric of society and that subsequent human intervention hastened its complete breakdown."

হরপ্পা সভ্যতা এসেছিল ভারতের নবোপলীয় সভ্যতার বিবর্তনে। আবার বৈদিক সভ্যতা এসেছে হরপ্পা সভ্যতার বিবর্তনে। বৈদিক সভ্যতা বিবর্তিত হয়েছে পৌরাণিক সভ্যতায়। এই ভাবে সভ্যতার ক্রমবিবর্তন চললেও সভ্যতার গুণাগুণের উত্থান-পতন অর্থাৎ এর অগ্রগতির তরঙ্গধর্মিতা চিরকালই বিদ্যমান। হরপ্পার উন্নত নগর সভ্যতা এক সময় শিখর ছুঁয়েছিল। অনুরূপ শিখর-ছোঁয়া নগর সভ্যতার অভ্যুত্থান হল একালে এসে। মাঝখানে বহুযুগের দুস্তর ব্যবধান। এই সভ্যতা একবার উঠছে আবার নামছে, বজায় থাকছে তার তরঙ্গধর্মিতা।

হরপ্পার নগর সভ্যতার পতন ঘটলেও তার সংস্কৃতির নানা ধারা চলে আসে হিন্দু সংস্কৃতিতে তথা হিন্দুধর্মে। ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, উত্তর-হরপ্পীয়রা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে। তাদের নগর সভ্যতার অবসান হলেও তারা নতুন নতুন বসতি স্থাপন করে দাক্ষিণাত্যে। বাংলায় তখন হরপ্পীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকায় আর্যবিজয়ের পর বহু হরপ্পীয় চলে আসে রাঢ় বাংলায়। দক্ষিণ ভারতের প্রাগার্য বসতিগুলিও সমৃদ্ধ হয় হরপ্পীয়দের আগমনে। এইভাবে হরপ্পা সভ্যতার বিকিরণ ঘটে।

"It was stated above that the earliest known settlements in peninsular India appeared early in the 3rd millennium and showed either a mixed agricultural or strongly pastoral character. From about 2000 BC there appears to have been a general expansion of these settlements. It is sometimes suggested that this expansion may have been in some way a result of the end of the Indus Civilization and that large numbers of "Harappans" migrated to the south. There is very little solid evidence to support this view and it appears rather that the development was primarily indigenous. What is particularly interesting is the way in which regional cultural variants occurred throughout peninsular India and often seem to be ances-

tral to the major cultural regions known from later historical times. In Maharastra the excavations at Inamgaon have provided the clearest picture so far of the developments and changes that took place in one of these regions Here can be seen the variety of crops and domestic animals, the changing house types, suggestions of tribal chiefdoms limited craft specialization, and trade Copper and bronze artifacts, though still relatively scarce, appear alongside stone blades and axes This mixed technology continued until the time when iron became common Farther south, in Karnataka and Tamil Nadu, there is similar evidence, although the staple crop here appears to have been millet, and wheat and braley are absent"

হবপ্পীযদেব দক্ষিণ ভাবতে ছডিযে পডাটা বলা যেতে পাবে অনার্যদেব দাক্ষিণাত্য বিজয। আর্যদেব দাক্ষিণাত্য বিজযেব কাহিনী বামাযণে চিত্রিত হযেছে বলে অনেকে মত প্রকাশ কবলেও এটি যে আর্যদেব অনার্য-বিজযেব কাহিনী তা নিযে অনেকে সংশয প্রকাশ কবেছেন। 'নবদুর্বাদল শ্যাম' বর্ণেব বামচন্দ্র সত্যিসত্যিই আর্য ছিলেন কিনা তা বিতর্কিত বিষয। সুতবাং বামচন্দ্রেব দাক্ষিণাত্য বিজয-কাহিনী ওই 'বামাযণ', দক্ষিণ ভাবতেব অনার্যদেব উপব আর্য বিজযেব ইতিহাস কিনা তা নিযে বহু বিতর্কেব অবকাশ বযেছে। ববং এই কাহিনী অনার্য হবপ্পীযদেব দক্ষিণ ভাবতে বিস্তাবলাভেব কাহিনীও হতে পাবে। মোদ্দা কথা হল, অনার্য হবপ্পীযবা আর্যদেব কাছে পবাজিত হযে ভাবতবর্ষেব দক্ষিণে এবং পূর্বে ছডিযে পডে। সাবা ভাবতেই হবপ্পীযবা নতুন নতুন বসতি স্থাপন কবে সে সময, গডে উঠে নতুন নতুন জনপদ—অনার্য জনপদ। কিন্তু হবপ্পাব সেই নগব সভ্যতা ফিবে আসে নি। শহব, নগব আবও অনেকটা পবে, কমপক্ষে হাজাব বছব পবে ভাবতবর্ষে গডে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু অত্যুন্নত হবপ্পীয নগব সভ্যতা বহুকালেব মধ্যে আব সৃষ্টি হযনি। আগেই বলেছি, মহেঞ্জোদাবো, হবপ্পা নগবগুলি ছিল একেবাবে একালেব শহবগুলিব মতই উন্নত এবং আধুনিক।

সাবা ভাবত জুডে হবপ্পীযদেব ছডিযে পডতে সে সময কোন অসুবিধাই হয নি। কাবণ হবপ্পা সভ্যতা ছিল দেশজ সভ্যতা। মিশব দেশেব পুবাণকথা অনুযাযী মিশবীয সভ্যতা ছিল বহিবাগত সভ্যতা। কিংবদন্তী অনুযাযী সুমেব সভ্যতাও ছিল বহিবাগাত এক সভ্যতা। কিন্তু হবপ্পা সভ্যতা সে বকম কোন বহিবাগত সভ্যতা ছিল না। এটি ছিল একেবাবে দেশজ সভ্যতা। এ সভ্যতাব উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটেছিল এই ভাবতবর্ষেই। হবপ্পা সভ্যতা তাম্রাশ্ম সভ্যতা। অবিচ্ছিন্ন ধাবাবাহিকতাব সঙ্গে প্রস্তব-যুগ থেকে তাম্রাশ্ম যুগ পর্যন্ত স্তববিন্যাস পাওয়া গেছে হবপ্পা, কোটদিজি, কালিবঙ্গান, আমবি, মহেঞ্জোদাবো, সান্ধনওযাল ও নাগওয়াবা ইত্যাদি জাযগায। পণ্ডিতেবা সিদ্ধান্ত কবেছেন যে, প্রাক-হবপ্পীয সভ্যতাব ধাবাবাহিক বিবর্তনেব ফলেই হবপ্পা সভ্যতাব উদ্ভব হযেছিল।

আর্যসভ্যতার মত হরপ্পা সভ্যতা কোনও আগন্তুক সভ্যতা ছিল না। হরপ্পা সভ্যতা ছিল একেবারে ভারতের নিজস্ব দেশজ সভ্যতা। তবে আগেই বলেছি, কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতা হঠাৎই কেমন করে অত্যুন্নত নগর সভ্যতায় রূপান্তরিত হল তাব পুরোপুরি ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় নি। নগর সভ্যতায় উন্নীত হওয়ার স্তরসমূহ আজও আবিষ্কৃত হয়নি হরপ্পা ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ উৎখনন করেও। আবার এটাও ঠিক যে, হরপ্পা সভ্যতার সব কেন্দ্রগুলিব পুরোপুরি উৎখনন আজও করা হয় নি।

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৬০ কোটিবছর। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে। অর্থাৎ পৃথিবী তার বয়সের মাত্র ০.০১% সময় ধরে পেয়েছে মানুষকে। তার বয়সের ৯৯.৯৯% সময় ধরে পৃথিবী ছিল মনুষ্যবিহীন। এই পাঁচ লক্ষ বছরের ৪,৬০,০০০ বছরই মানুষ কাটিয়েছে বর্বর বিপদসঙ্কুল ও যাযাবব জীবন। ৪০,০০০ বছব আগে আসে ক্রোম্যানিয়ন। এদের থেকেই এসেছে ককাসয়েড, মংগোলয়েড, আদি অস্ত্রাল ও নিগ্রোয়েড মহাজাতিসমূহ। মানুষেব সভ্যতা বলতে যা বোঝায় তাব বয়স সম্ভবত মাত্র আট-দশ হাজার বছর। সভ্যতার সূচনা থেকেই অন্যান্য প্রাণীব উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের ক্ষমতা ধীরে ধীবে মানুষেব করায়ত্ত হতে থাকে। সে বানায় নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র, তৈরি করে গৃহ, স্থাপন করে জনপদ, শুরু করে চাষ-আবাদ। ঠিক এই সময থেকেই প্রকৃতিব সঙ্গে একাঙ্গীভূত জীবন-যাত্রা প্রণালী ত্যাগ করে মানুষ তার নিজেব চিন্তা ও বুদ্ধিব সাহায্যে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত এক নতুন পবিবেশের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিগুলিব স্বরূপ জানতে ও তা আযত্ত কবতে মানুষকে বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়, যতদিন না আধুনিক বিজ্ঞান তাব করায়ত্ত হযেছে।

মানুষ তার দীর্ঘ জীবনেব শেষ ৩০০ বছবের মধ্যে সভ্যতার নামে, উন্নতিব নামে পৃথিবীব জলস্থল ও বাযুমণ্ডলের ভৌত, রাসাযনিক ও জৈবিক চরিত্রের এমন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিযেছে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য এমনভাবে বিপর্যস্ত করেছে যে, গত ২০০ কোটি বছরের মধ্যে কোনও প্রাণীই কোন যুগে তা করে নি। এর ফলে ২০০ কোটি বছরের পুরানো জীবজগৎ আর ৫০০০ বছর টিকে থাকবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের। মানুষ আব মাত্র ৫০ বছর টিকবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। হরপ্পা এবং অন্যান্য সমসাময়িক সভ্যতার উত্থান-পতন দেখেও মানুষ আজও ভাবে না তার লক্ষ্য কি, সে আজ কোন্ পথে চলেছে এবং সে পথ জীবনের উত্তরণের পথ কিনা! ক্রমবিকাশের স্রোতে মানুয আজ ভেসে চলেছে একা, নিঃসঙ্গ এবং লক্ষ্যহীনভাবে।

মানুষের এই লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, আধুনিক জীবনযাত্রা নিয়ে ডঃ তারকমোহন দাস তাঁর 'পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য' বইটিতে লিখেছিলেন ঃ

"মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে দিন বুদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেই দিনই এই শক্তি তাকে জীবনের ক্রমবিকাশের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মূল কক্ষপথ থেকে উৎক্ষিপ্ত করে এক নতুনতর কক্ষে স্থাপন করেছে। সেখানে সে এক নিঃসঙ্গ, মহাশক্তিধর

মাতালের মত জীবনের অন্ধগলিপথে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ঘুরে মরছে। তার মন বিশ লক্ষ বছরের অতীতকে অস্বীকার করতে চাইছে, অথচ তার দেহ ভুলতে পারছে না পূর্ব অভিজ্ঞতাকে। তার দৃষ্টি সামনের দিকে ৫০-৬০ বছরের বেশি দূরে যাচ্ছে না, অথচ বর্তমানের মধ্যে বার বার খুঁজে ব্যর্থ হচ্ছে তার উত্তরণের পথের নিশানা। তার গতি আছে লক্ষ্য নেই, তার ক্ষমতা আছে নিয়ন্ত্রণ নেই, তার বুদ্ধি আছে জ্ঞান নেই। মানুষকে আরও দীর্ঘকাল যদি পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়, তাহলে তার ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে স্থির লক্ষ্য, বিপুল ক্ষমতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের মিলন ঘটাতে হবে।”

হরপ্পার অনার্য গরিমার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হরপ্পাসহ পনেরোটি মানব সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটেছে মানুষেরই শোচনীয় অবিমৃষ্যকারিতারই জন্য। মানুষের শোচনীয় হঠকারিতার ফলেই হরপ্পারা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানী রিচি কলরাড বলেছেন ঃ “মানুষ প্রকৃতির ওপর করেছে অমানুষিক শোষণ, প্রকৃতি হয়েছে অতি দ্রুত রিক্ত, নিঃশেষিত, ফুরিয়ে গেছে মানুষের খাবার, বেঁচে থাকার রসদ, সভ্যতাগুলি শেষ পর্যন্ত ধূলায় মিশে গেছে।” প্রায় ১৫টি সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল টিউনিসিয়া, সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, সিনাই, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান এবং সিন্ধু নদীর উপত্যকায়। এই সব অঞ্চলেই ছিল মিশরীয়, সুমেরীয়, হরপ্পীয়, গ্রীক ও রোমকদের সমৃদ্ধ সভ্যতা। এই সব সভ্যতার ছিল কল্পনাতীত বিরাট শস্যাগারসমূহ, গড়ে উঠেছিল বিরাট জনসংখ্যার নগরসমূহ। সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সৃষ্টি হয়েছিল অপূর্ব স্থাপত্য কৌশল-সমৃদ্ধ হবপ্পা-মহেঞ্জোদাবোর অনন্য সভ্যতা।

প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মতে, এই সব সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান কারণগুলি হ'ল, জ্বালানীর জন্য বড় বড় বৃক্ষের উৎপাটন, ভুল সেচ-ব্যবস্থা, জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে সবুজের আচ্ছাদন না বাড়ানো এবং সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে অন্তহীন যুদ্ধ-বিগ্রহ, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে পরস্পরের এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের চূড়ান্ত বিনাশ—এই ভুলগুলি মানুষের এক শোচনীয় অবিমৃষ্যকারিতাবই পরিচয় বহন করেছে। শুধু এই পনেরোটি সভ্যতা নয়, আরও বহু সভ্যতা ওই সব কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। হরপ্পা তো তবু প্রায় দেড় হাজার বছর টিকেছিল।

মানুষ কিন্তু তার নিজের ইতিহাস থেকে আজও শিক্ষা নেয়নি। বারে বারে একই ভুল করছে। দশ হাজার বছর ধরে তারা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। তবুও তাদের হুঁশ নেই। তার প্রত্যেকবারের ভুলে গতবারের তুলনায় মানবসভ্যতা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রকৃতির কাছ থেকে বেশি সুবিধা আদায় করে নিতে গিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য তারা বারে বারে নষ্ট করেছে। আধুনিক মানুষের মানসিকতা কিন্তু আজও বদলায় নি। এ কালের সভ্য মানুষেরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের বহু সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছে, কিন্তু গোষ্ঠীগতভাবে তারা বিজ্ঞানসম্মত জীবন-যাপন করছে না। প্রকৃতির কাছ থেকে তারা আজও আদায় করে নিচ্ছে বাড়তি সুবিধা। ফলে, প্রকৃতি

রিক্ত, নিঃশেষিত হয়ে ফুরিয়ে আসছে। বর্তমান সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে আজই প্রকৃতিকে রক্ষা করার অভিযানে নেমে পড়তে হবে। অন্যথায় এই অত্যাধুনিক সভ্যতাও ধ্বংস হয়ে যাবে হরপ্পা-মিশর-মেসোপটেমিয়া সভ্যতাগুলির মত। যে সভ্যতা যতই উন্নতি করুক না কেন, সে যদি প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে তবে তার পতন অনিবার্য। বলা হয়, হরপ্পীয়রা প্রাকৃতিক ভারসাম্য সম্ভবত বজায় রাখতে পারেনি, তাই হরপ্পা সভ্যতা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আর্যদের আক্রমণে তার নগরগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হরপ্পা সভ্যতার পতন হলেও তার সংস্কৃতি ধ্বংস হয় নি। তার অধিকাংশ সংস্কৃতিই পরিবর্তিত রূপ নিয়ে হিন্দু সভ্যতার সংস্কৃতি হয়ে বিরাজমান। হরপ্পার নগরসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু তার অধিকাংশ সংস্কৃতিই আজ হিন্দু সংস্কৃতি হিসাবে পরিগণিত। হরপ্পা ভারতের মাটিতে ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু সে বেঁচে আছে হিন্দু সংস্কৃতিতে, হিন্দু সভ্যতায়। তার এই ৫০০০ বছর ধরে বেঁচে থাকাটাই হরপ্পাসভ্যতার গরিমা, যা নিঃসন্দেহে হরপ্পার অনার্য গরিমা।

যে সব বইয়ের সাহায্য নিয়েছি

১।	ঋগ্বেদ সংহিতা (১ম ও ২য় খণ্ড)	হরফপ্রকাশনী
২।	উপনিষদ (১ম ও ২য় খণ্ড)	ওই
৩।	মহাভারত	কালীপ্রসন্ন সিংহ
৪।	মহাভারতম্	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
৫।	বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড)	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬।	বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড)	ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন
৭।	বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)	ডঃ নীহার রঞ্জন রায়
৮।	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)	বিনয় ঘোষ
৯।	গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি	ডঃ প্রভাত কুমাব ঘোষ
১০।	মানবসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য	ডঃ অতুল সুব
১১।	প্রাগৈতিহাসিক ভারত	ওই
১২।	মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা	ওই
১৩।	সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা	ওই
১৪।	হিন্দুসভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য	ওই
১৫।	শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ	ওই
১৬।	মহাসময়ের ইতিবৃত্ত	প্রশান্ত প্রামাণিক
১৭।	বামিযানের বর্বরতা	ওই
১৮।	সপ্তর্ষি	ওই
১৯।	শব্দের কথকতা	ওই
২০।	দেবতারা কি গ্রহান্তরের মানুষ	এবিখ ফন দানিকেন (অনুবাদ ঃ অজিত দত্ত)
২১।	নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন	ওই
২২।	বীজ ও মহাবিশ্ব	ওই
২৩।	আমার পৃথিবী	ওই
২৪।	পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য	ডঃ তাবক মোহন দাস
২৫।	প্রাচীন ভারতে জ্যামিতি চর্চা	ডঃ প্রদীপকুমাব মজুমদাব
২৬।	মনুসংহিতা	মুরাবি মোহন সেনশাস্ত্রী
২৭।	বেদান্ত দর্শন	ডঃ রমা চৌধুবী
২৮।	ঋগ্বেদ সংহিতা	রমেশ চন্দ্র দত্ত
২৯।	কৃষ্ণকাহিনী মহাভারত	হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৩০।	হিজলীর মসনদ-ই-আলা	মহেন্দ্রন।থ করণ

৩১। The Oxford History of India — Vincent A Smith
৩২। Geometry in Ancient and Medieval India — Dr. T. A. Saraswati Amma
৩৩। The Rigvedic culture of the pre-historic Indus (Vol. : III) — w a m Sankarananda
৩৪। History of Mohenjodaro — -Do-
৩৫। History of Mohenjodaro and Harappa — -Do-
৩৬। Race and Races — Richard A Goldsby
৩৭। World Civilizations — Richard Hooker
৩৮। A Country Study (4th Edition) — Richard F Nyrop
৩৯। The History of Ancient Iran — Richard N Frye
৪০। Encyclopedia Americana
৪১। Encyclopedia Britannica